

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ।
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

वर्ग संख्या

Class No.

पुस्तक संख्या

Book No.

रा० पु०/ N. L. 38.

MGIPC-S4-59 LNL/64-1-11-65-100,000.

१४४४; २७२५

182.6C
917.53

বৈশিক মূল্য ১৫০০

প্রতি সংখ্যা ১০ পয়সা

756-26-29
23 529

সন্দেশ

১১/১১/১১
২০০৮

বৈশাখ

১৩২৬



উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত

সম্পাদক—শ্রীসুকুমার রায়চৌধুরী, বি.এস. সি।

ছিলেন



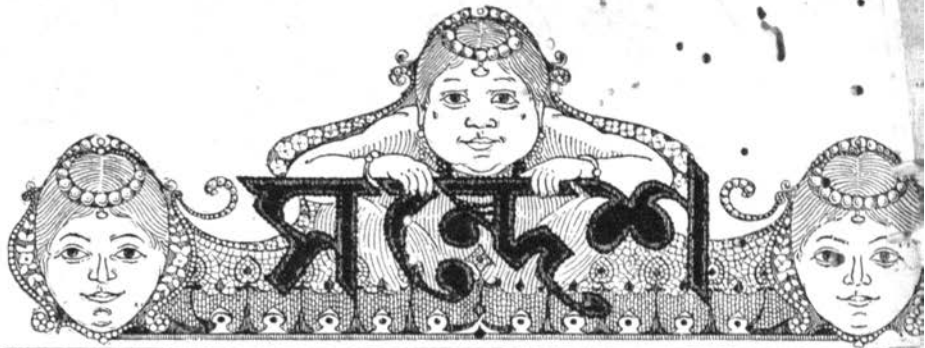
নূতন পাইকা অঙ্করে ছাপা দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে ।
নূতন সংস্করণে ১খানা রঙ্গিন ছবি দেওয়া হইয়াছে ।

মূল্য ৥০ আনা, ভি-পিতে ৥৮০ আনা ।

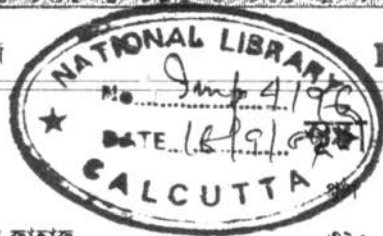
“সন্দেশ” বই পাইয়া যায় ।

182 Dec. 217:53

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত



সপ্তম বর্ষ



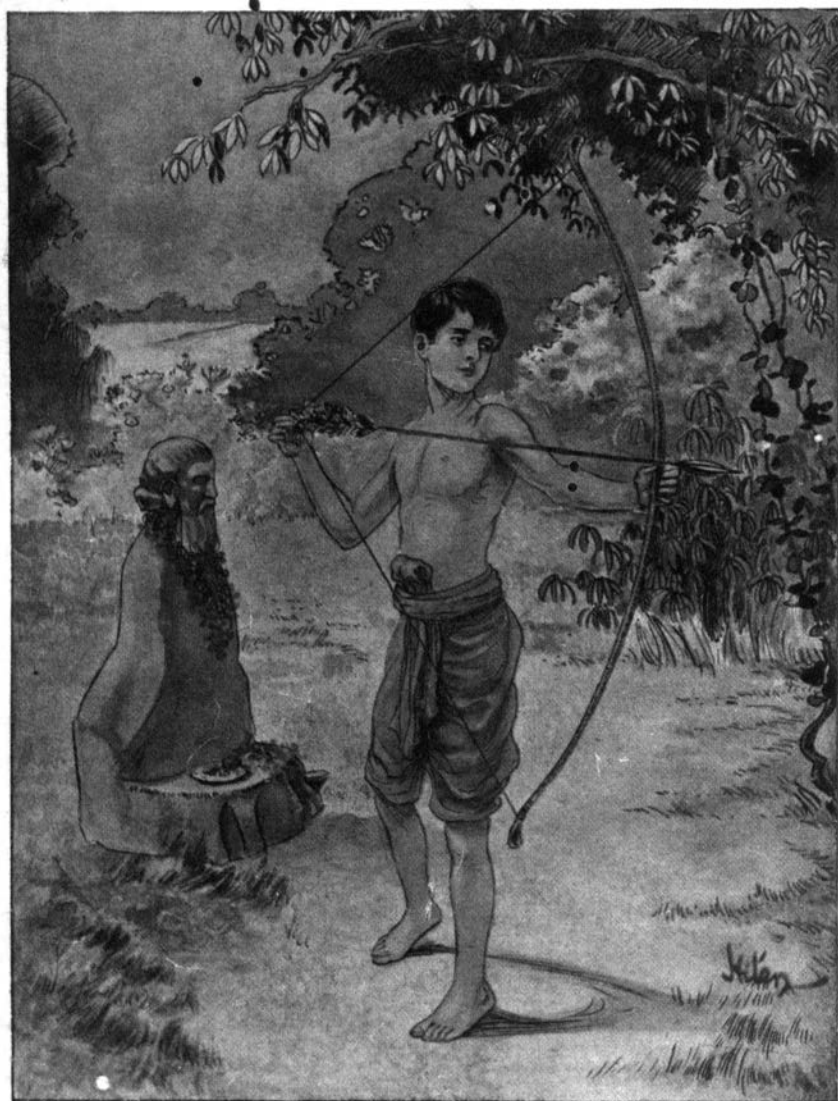
RARE BOOK

পত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অতিকায় জাহাজ	৩২০	কাক ও বেঙ	১০২
অসিলক্ষণ পণ্ডিত	৩৩৬	কাচ	১০৩
অক্ষের বর চাওয়া	২৬৯	কাঠি ফড়িং	১০৪
অঙ্গুলিমাল	৩৩৭	কাঁছনে	১০৫
আকাশ পথের বিপদ	৩১৫	কুড়েরাম	১০৬
আরম্ভণা	২২১, ২৫৭	ঘাঘাঙ্গুর	১০৭
আলোছায়া	২১৫, ২৩৯, ২৯৬, ৩২২	ছাতার মালিক	১০৮
আলিপুত্রের বাগানে	৩৪২	জয় বিজয়ের অভিশাপ	১০৯
আশ্চর্য	২২৫	জোক	১১০
আগ্নের আলো আয়	২৭৩	ডানপিটে	১১১
আংটির গুণ	২৭৮	তুরস্ক বাহাজুর	১১২
উপরিচরের অধঃপতন	৩২৬	দানবীর কার্ণেগী	১১৩
একলব্য	৩২	দুই রকম	১১৪
এক হাত মাজলী	২৬৩	ধাঁধা	১১৫
এত ভ্রুং কেন	৪৩	ধাঁধা ও উত্তর	১১৬
ঐ যা	৬২	ধাঁধা নয়	১১৭

DEC 1 1921

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পায়	১	ভোজের মত ভোজ	১৮৭
মার্থ	১৩৯	মনের মতন	৩২১
শুণ	১০৩	মালপোকা	১৬৬
ডর ভয়	১০৮	মুক্ত	১৯৩
	২৮	রাজা শতানীকের মুক্তি	১৪৬
শাল ২, ৫২, ৬৬, ১১০, ১৪১, ১৮২, ২০৮		রাঠোরের কলঙ্ক	২৫
বৈষণ	৯৫	লক্ষ্মী	৩৩
বন্দন	২৭০	লোহা	১২৩
ফাফার	১৭২	শনির দেশে	১১৪
কার কথা	৯৮, ১৩৪	শরীরের মালমশলা	২৭০
কার কীর্তি	৮৫	জকদেব	১২
মাতন লেখা ১১, ৪৬, ২০৪, ২২৬, ৩২৮		শৈয়ালের বন্ধু	২৭৪
বীর শেষ দশা	১৫	শ্রাবণে	৯৭
তজ্জার দায়	৩৩৩	যর্ণশেন	৭১
দর ঘরে ঘোগের বাসা	২৮২	সহজে কি বড়লোক হওয়া যায়	৭৫, ১১৯, ১৩০
র কথা	২৬৬	সমুদ্রে বন্ধন	৮৭
মান—পাঠ	১৯১	শ্রমস্তক মণি	১৬২
মান শিষ্য	৩১০	সিংহ শিকার	১৫২
পতির অভিমান	১৯৯	সিদ্ধু পরী	৩৪
বন	৯৩	স্বজাতার পুণ্যলাভ	২৪৩
কা বণিক	৭৯	স্ববুদ্ধি গোয়লা	২১৩
মকেশের মাজা	৩৪৫	সেকালের কীর্তি	৩৪৯
মাহুষ	৫৭	সোনার বরণা	১৯৪
সুবিধা	৩১৭	হরিষে বিষাদ	৬৫
		ছলোর গান	১২৭



একলব্য



নবম বর্ষ

বৈশাখ, ১৩২৬

১ম সংখ্যা

নিরুপায়

বসি বছরের পয়লা তারিখে
মনের খাতায় রাখিলাম লিখে—
“সহজে উদরে ধরিবে যেটুক,
সেইটুকু খাব হব না পেটুক।”
মাসতুই যেতে খাতা খুলে দেখি
এরি মাঝে মন লিখিয়াছে একি !
লিখিয়াছে “যদি নেমন্তুনে
কৈদে ওঠে প্রাণ লুচির জন্তে,
উচিত হবে কি কাদান তাহারে ?
কিন্মা যখন বিপুল আহারে,
তেঁড়ে দেয় পাতে পোলাও কালিয়া
পায়েস অথবা রাবড়ি ঢালিয়া—
তখন কি করি, আমি নিরুপায় !
তাড়াতে না পারি, বলি আয় আয়,
চুকে আয় মুখে ছয়ার ঠেলিয়া
উদার রয়েছি উদর মেলিয়া !

পঞ্চুলাল

[পঞ্চুলাল কাঠের পুতুল কিস্তি সে চলেফিরে কথা বলে। গুপী তার বাপ, সে নিজের হাতে পঞ্চুকে বানিয়েছে। বাপ যেমন গরীব, ছেলে তেমনি ডানপিটে ছরস্ব। গুপীর ইচ্ছা, কাঠের ছেলে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়, ছপয়সা রোজগার করে—আর পঞ্চুলাল তার পড়ার বই পর্যন্ত বেচে দিয়ে শেষটায় কিনা পুতুল নাচের তামাসায় গিয়ে হাজির! পুতুল নাচের মালিক কাবাবী মিঞা তাকে পাকড়াও ক'রে সেদিন তার কিছু গুণের পরিচয় পেয়েছেন। তারপর—]

পরদিন কাবাবী মিঞা পঞ্চুকে একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, “বেটা তোমার বাপের নামটি কি?” পঞ্চু বললে, “গুপী।”

মিঞাসাহেব বললে “বেশ, বেশ। তার ঘর বাড়ী পয়সা কড়ি আছে ত?”

পঞ্চু বললে, “কাণা কড়িও তার নেই, এই দেখ না আমার সেলেট বই কিনে দিতে নিজের রূপার খানি বেচে ফেললে!”

কাবাবী মিঞা বললে, “আপশোষ, বেচারী, আমার যে তার জন্তে কলিজায় দরদ লাগছে। এই পাঁচটা মোহর দিচ্ছি, এখুনি নিয়ে যাও, আমার সেলাম জানিয়ে তাকে দিয়ে।” বুঝ-
তেই পারছ,
এত গুলো
টাকা পেয়ে
পঞ্চুরামের কি
আনন্দই না
হল—বার
বার কাবাবী
মিঞাকে ধন্য-
বাদ দিয়ে,
নাচের পুতুল
দের একে
একে সবারি
সঙ্গে বারবার
কোলাকুলি



করে, এমন কি চৌকীদারকে পর্যন্ত সেলাম করে লাফাতে লাফাতে বাড়ী মুখো

চলল। বেশী দূর যায় নি, দেখলে কি একটা খোঁড়া শেয়াল আর একটা অন্ধ বেড়াল সেই পথ দিয়ে চলেছে। দুঃখের দিনের বন্ধুর মত এ ওকে সাহায্য করছে। শেয়াল বিড়ালের কাঁধে ভর দিয়ে চলেছে আর শেয়াল অন্ধ বেড়ালকে, হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। শেয়াল পঞ্চকে দেখে বললে, “সেলাম পঞ্চু সাহেব”—পঞ্চু ত অবাক, জিজ্ঞাসা কলে, “আমার নাম জানলে কি কব্বে?”

শেয়াল বললে, “তোমার বাবাকে আমি খুব জানি, এই ত, কালকেই আমি তাকে দেখলুম খালি গায়ে শীতে হীহী করে কাঁপছিল।”

পঞ্চু বললে “বেচারি বাবা,—আর কাঁপতে হবে না—এবারে খুব সুখেই থাকবে।”

“কেন বল দেখি?” “কেন আবার! শোন কথা, আমি যে ভদ্র লোক হয়েছি।”

“ভদ্র লোক? কে, তুমি?”—এই বলে শিয়াল টিটকিরি দিয়ে হেসে উঠল, বেড়ালটাও হাসি লুকোবার জন্যে সমুখের পায়ের থাবা দিয়ে মুখটা ঢাকা দিলে। পঞ্চু রেগে বললে, “হাসতে হাসতে ফুটির মত ফেটে আট-খানা হয়ে যেয়ো না যেন,—সোণা যদি চোকে কখনো দেখে থাক ত, এই দেখো পাঁচটা মোহর!” এই বলে মোহর কটা তাদের নাকের সামনে ধরে দিলে। সোণার মোহরের রুণু রুণু শব্দ শুনেই শিয়াল মশায় তাঁর খোঁড়া পা খানি, ছোঁ মেরে নেবার জন্যে বাড়িয়ে দিলে, আর অন্ধ বেড়াল এগ্নি চট করে অন্ধ চোখ দুটো খুলে আবার বন্ধ করে ফেলল, যে মনে হল যে দুটো সবুজ লণ্ঠন দপ করে জ্বলে, তখনি আবার নিবে গেল। বোকা পঞ্চু এ সবার কিছু দেখতে পেল না।

শিয়াল দম নিয়ে হেসে হেসে জিজ্ঞাসা কলে, “এত গুলো টাকা নিয়ে কি করবে?” পঞ্চু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে,—কি করব শুনবে? ১নম্বর, বাবার জন্যে একখানি নতুন শাল কিনব, ২নম্বর, নিজের জন্যে বর্ণ পরিচয় কিনব, স্কুলে গিয়ে সত্যিকার লেখা পড়া আরম্ভ করব। শেয়াল বললে—আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ, পড়ার বোঁকেই ত পা আমার পড়তে পড়তে খোঁড়া হয়ে গিয়েছে। বেড়াল বললে, পোড়া পড়া শিখতে গিয়েই ত আমার অমন দুটো জ্বল জ্বলে চোখ একেবারে অন্ধকার হয়ে আছে। এগ্নি সময় পাশের ঘোপ হতে ঝুঁটিওয়ালা বুলবুলি বলে উঠল, “খবরদার পঞ্চু, ওদের কথা শুনো না।”

খুঁশ শিয়াল বললে—পাঁচটি মোহরকে হাজার দু হাজার করতে চাও ত আমাদের

সঙ্গে পেঁচার দেশে চল। সে দেশটাতে পা দিতে না দিতেই পাঁচ হয়ে যাবে পাঁচ হাজার! পেঁচাদের দেশে একটা মাঠ আছে তার নাম “দেব ক্ষেত্র।” এই মাঠে এক জায়গায় ছোট্ট একটি গর্ত করে, একটা মোহর পুঁতে দেবে, যাঁটা দিয়ে তাকে আচ্ছা করে ঢাকবে, তারপর কাছের একটা ঝরণা হতে জ্বল জ্বল এনে তার উপর আস্তে ঢালবে। জল দেওয়া শেষ হলে, দুচুটকি সৈন্ধব নুন তার উপর ছড়িয়ে দেবে। তারপর রাতে চুপ চাপ শুয়ে থাকবে। রাতের বেলায় মোহরটায় ফল গজিয়ে ছোট্ট একটি গাছ হবে, তারপর আস্তে আস্তে ডালপালা হবে আর ভোর বেলাকার সোণার রোদুর যেমনি এসে সেই গাছের গায়ে লাগবে, অগ্নি দেখিবে ভৈষ্ণি বাজীর মত ফুল ফুটছে, ফুল ফুটে না ফুটে ঝরে পড়ে তার জায়গায় ফল ধরেছে। ফুলগুলি যেন এক একটি রূপার কোঁটা—একটি করে ফল পাড়বে আর সেই ফলের মধ্যে হতে দশটি করে মোহর বেরবে—একটা গাছে অমন কত যে রূপার ফল ফলবে আর কত সোণার মোহর পাওয়া যাবে, তা কে বলতে পারে?” একথা শুনেই পঞ্চুর নৃত্য শুরু হল, সে বললে “এ টাকা পেলেই আমি সাড়ে চার হাজার নিজে রাখব, আর তোমাদের দিব নগদ পাঁচ শত।”

শেয়াল মুখ ভার করে বললে, “আমি তোমার টাকার বড় তোয়াক্কা রাখি। তোমার উপকার হবে মনে করেই বলেছি আর তুমি কিনা আমায় স্বার্থপর ভাবছ! ছোঃ! আমি আর কিছুতে নেই।” বেড়াল জোর গলা করে বললে, “শোন একবার কথা! আমাদের টাকা দেবেন—আমরা যেন ভিখারী!” পঞ্চু মনে মনে ভাবলে এমন সাধু সজ্জন তো কখনো দেখিনি, শুধু পরের ভালই করে, নিজের কোন কথা মনেই আনে না। সেই মুহূর্তে বাপের শাল, নিজের সেলেট, লেখা পড়া, বড় হওয়া, সব ভুলে পঞ্চু বলে উঠল, “চল ভাই দেব ক্ষেত্রে যাত্রা করা যাক, আমি তোমাদের সাথী হব।”

চলতে চলতে পা যখন আর চলে না, সন্ধ্যা বেলায় তারা একটা অতিথ শালায় এসে পৌঁছল। শেয়াল বললে, এস এখানে একটু বিশ্রাম করা যাক। অতিথ শালায় গিয়ে সেখানকার কর্তাকে শেয়াল বললে, দেখ আমাদের দুটো ঘর চাই। একটা পঞ্চু বাবুসাহেব মশায়ের, আর একটাতে গরীব আমরা দুজনে থাকব। ছুপর রাতে আমাদের ডেকে দেবে তখনই আমাদের আবার যাত্রা করতে হবে।

“ভাল কথা, ভাল কথা” বলে কর্তা মাথা নেড়ে শেয়ালকে চোখ টিপলে,—ভাব-
খানা এই যে, সব ঠিক হবে, তোমার আমার মংলব তো একই!

বিছানায় পড়তে না পড়তে পঞ্চ গভীর নিদ্রামগ্ন হয়ে সুখ স্বপ্নে হাবুডুবু খেতে
লাগল। কিছুক্ষণ পরে চমকে জেগে উঠল, কর্তা তার ঘুম ভাঙাতে এসেছেন, তখন
রাত ছপুর।

ধড়মড় করে উঠে পঞ্চ জিজ্ঞাসা করলে, “আমার সঙ্গীরা তৈরি আছেন ত?”

“তৈরি? তারা তো ঘণ্টা দুই হল চলে গিয়েছে! বেড়াল বেচারীর বড় ছেলের
অসুখের খবর পেয়ে তারা আর থাকতে পারল না”। “তাদের খাবার খরচাটা দিয়ে
গেছেন ত?” “তারা কি বোকা না অসভ্য—তোমার অতিথি হয়ে এসে খাবার দাম
দিয়ে যদি খায় তা হলে তোমারই ত অপমান। এমন বেয়াদবী তারা করবে কেমন
করে?” মাথা চুলকতে চুলকতে পঞ্চ তখন জিজ্ঞাসা করলে “তবে কি তারা আমার
জন্তে অপেক্ষা করবে বলে গেছে?” “হ্যাঁ কাল সকালে দেব ক্ষেত্রে তাদের
দেখা পাবে।”

অতিথিশালার কর্তা হিসাব চুকবার জন্তে একটা মোহর আদায় করে পঞ্চকে
বিদায় করলেন। পথ তখন ঘুরঘুটি অন্ধকার, কোন রকমে হাতড়ে হাতড়ে পঞ্চ
এগোতে লাগল।

পথে যেতে যেতে পঞ্চ দেখলে গাছের ডালে একটা আলো ঝিকমিক করছে, ঠিক
যেন কে একটি সোণার প্রদীপ জ্বলে রেখেছে। আলোটা জ্বলছে নিবছে, আবার
জ্বলছে! পঞ্চ জিজ্ঞাসা কল্লে, কে তুমি? আলো বল্লে, “দেখ পঞ্চ আমি সেই
বাক্যবাগীশ ঝিঁঝিঁ, তুমি আমায় মেরে ফেলে ছিলে, আমি তোমায় একটু উপদেশ
দিতে চাই। ঝিঁঝিঁ বেচারীর গলায় আর জোর ছিল না সরু কাঁপা গলায় বল্লে—
“দেখ বাছা ফিরে যাও, ওপথে আর এগিয়ে না তোমার বুড়ো বাপ তোমার জন্ত
কেবলি কাঁদছে। যারা বলে মোহরের গাছ জন্মায় তাদের কথায় কি ভোলে?
এসব কথা হয় পাগলে, নয় চোর জুয়োচোরে বলে থাকে। ভালয় ভালয় বাড়ী
ফিরে যাও।” কিন্তু পঞ্চ কি সে কথা শোনে? সে ব’কে ধমকে ঝগড়া করে
জোনাকিকে তাড়িয়ে দিল। তখন চারিদিক আরো বেশী অন্ধকার হয়ে এল।

এমন সময় গাছের পাতাগুলো সিঁড়িসিঁড় করে কেঁপে উঠল, মনে হল কে যেন বিড়
বিড় করে বকছে! ফিরবামাত্র দেখতে পেল শয়তানের মত যেন দুটো কি কয়লার

কালো ছালা পরে এগিয়ে আসছে। তারা গুঁড়ি মেরে পঞ্চুর পিছন পিছন আসছে আর এক একবার লাফিয়ে উঠছে।

মোহরগুলো কোথায় লুকোবে ভেবে ঠিক করতে না পেরে পঞ্চু সেগুলো মুখের মধ্যে পুরে রাখল। তারপর পালাবার জন্য দৌড় দিলে। তিন পা যেতে না যেতে দুটো হাত তাকে আঁকড়ে ধরলে আর ভাঙ্গা ঢোলের মত গলায় একজন বলে “হয় তোমার টাকা দাও, নয় তোমার প্রাণ দাও”।

মুখে টাকা ছিল বলে পঞ্চুর কথা কইবার জো ছিল না—তাই সে আকারে ইঙ্গিতে মাথা লুটিয়ে বার বার নমস্কার করে বোঝাতে চেষ্টা করল যে সে একটা কাঠের পুতুল মাত্র; তার একটি কাণা কড়িও নেই।

লোক দুটির পরণে কয়লার ছালা, মুখ সবটা ঢাকা, শুধু দুটি চোখ দেখা যাচ্ছিল। তারা বলে, “ওসব ছাকানিতে চলছে না—চটপট টাকা বার কর নইলে প্রাণ যাবে”,—প্রতিধ্বনির মত তার সঙ্গী বলে উঠল—“প্রাণ যাবে।”

“তাতেও যদি না হয়, তোকে মেরে তোর বাপকেও খুন করব।” “বাপকেও খুন করব।”

হায় হায় করে কেঁদে উঠে পঞ্চু বলে—“ওগো আমার বাবাকে তোমরা মেরো না, সে বুড়ো মানুষ তাকে মেরো না, মেরো না।” কথা কয়ে উঠবামাত্র পঞ্চুর মুখের মধ্যে মোহরগুলো টুন টুন করে বেজে উঠল—আর যাবে কোথা, তখন ডাকাতির পঞ্চুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলে—“বটেরে ব্যাটা; বোবা সাজা হয়েছিল। জোছোর কোথাকার! শীগগির টাকা ফেল বলছি।”

পঞ্চু কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তখন তারা বলে “বোবা ছেড়ে এখন কালা হয়েছি বুঝি, দাঁড়া তবে।” এই না বলে এক জন ধরলে তার নাকে আর এক জন ধরলে থুতনি, একজন টান দিতে লাগল উপরের দিকে, অন্য জন নীচে। কিন্তু অনেক টানা হেঁচড়াতেও কোন ফল হ’ল না—পঞ্চুর মুখ যেন পেরেক আঁটা কোটোর মত বন্ধ হয়েই থাকল।

তখন ডাকাতের মধ্যে যে বেঁটে সে একখানা ছুরী বার করে পঞ্চুর মুখের মধ্যে ছুতোরের বাটালির মত ঢুকিয়ে দিয়ে চাড়া দিতে লাগল। পঞ্চু তখন বিছাতের মত তাড়াতাড়ি তার হাত দু খানা ধরে ফেলল। হাত ধরেই সে শিউরে উঠল—ওমা এত

মানুষের হাত নয়, এ যে বেড়ালের থাবা! পঞ্চুর লম্বা লম্বা কাঠের নখগুলো এবারে কাজে এল; বেড়ালটাকে সে এগ্নি আঁচড়াতে লাগল যে সে আর তাকে ধরে রাখতে পারল না। ছাড়া পেয়েই পঞ্চু প্রাণপণে দৌড় দিল, বেড়া পার হয়ে, খাল বিল ডিঙ্গিয়ে মাঠের উপর দিয়ে তীরের মত ছুটে চলল, পিছন পিছন ডাকাত ছুটিও ছুটল।

সম্মুখে মস্ত চওড়া ঘোলা জলে ভরা নালা—এক, দুই, তিন, বলে পঞ্চু ঝাঁপ দিয়ে গিয়ে ওপারে পৌঁছল,—ডাকাত ছ জন লাফ দিতে গিয়ে ঝপাৎ করে সেই ঘোলা জলের মধ্যে পড়ে গেল। পঞ্চু সেই ঝপাৎ শব্দ শুনে আর তাদের হাবু ডুবু খাওয়া দেখে—দৌড়তে দৌড়তে হেসে চীৎকার করে বললে—“ভালো ডাকাত বাবুরা, বেশ ডুব দিয়েছ।” তার তখন বিশ্বাস হ’ল আপদ ছোটো ডুবে মরেছে—কিন্তু একটু পরে ফিরে দেখে কি, মরা দূরে থাকুক ছোটোই আবার তার পিছু পিছু দৌড়ে আসছে—ছালার পোষাক বেয়ে জল ঝরে পড়ছে! দূরে একটা বাড়ী দেখে পঞ্চু ভাবলে যদি কোন রকমে ওইখানটাতে পৌঁছতে পারি তবেই রক্ষা। ছুটতে ছুটতে ছুরারের কাছে পৌঁছেই খুব জোরে ঘা দিলে, কিন্তু কারো সাড়া পেল না। বাঁচি কি মরি বলে—সে ছুরারের গায়ে ধমাম ধাক্কা লাগাতে লাগল—তখন জানালার কাছে একটি সুন্দর মেয়েকে দেখতে পেল। মুখখানি তার মোমের মত সাদা, চুলগুলি মেঘের মত ঘন নীল, চোখ দুটি বুজে আছে, হাত দু খানি বুকের উপর জড় করা। ঠোট দুখানি তার আদবেই নড়ল না, কিন্তু কথা শোনা গেল, “এ বাড়ীর সবাই মরে গেছে।”

পঞ্চু তখন চৈঁচিয়ে বলল, “তবে তুমিই না হয় দরজাটা খুলে দাও।”

উত্তর এল “আমিও মরে গেছি”—সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে জানালাটিও বন্ধ হয়ে গেল।

পঞ্চু তখন কাঁদতে কাঁদতে বললে, ওগো সুন্দর মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে, দয়া কর, দরজা খোল—” পঞ্চুর কথা আর শেষ হল না, দুই দম্ভি এসে তার টুঁটি চেপে ধরে বললে—আর পালাতে হচ্ছে না। পঞ্চু বেচারীর কাঠের শরীর তখন এগ্নি ঠক্ঠক্ করে কাঁপতে লাগল যে তার মুখের মধ্যে মোহরগুলোও বেজে উঠল। তখন ডাকাত ছোটো বললে—“এবারে মুখ খুলবি কি না”? এই না বলে ক্ষুরের মত ধারাল একটা ছোরা বার করে তার বুক বিঁধিয়ে দিতে গেল, কিন্তু পঞ্চুর ভাগ্যি যে তার শরীরটা ছিল খুব শক্ত কাঠের—ছুরিটা মট্ করে ভেঙে গেল।

তখন ডাকাত ছোটো বুলে, “ছুরীর কৰ্ম্ম না, এটাকে কাঁসীতে লটকাতে হবে।” আর দেবী না করে পঞ্চুর হাত ছোটো লম্বা করে একটা বটের গাছে বেঁধে, গলায় কাঁস দিলে। “আচ্ছা এখন তবে বিদায় হওয়া যাক বিশ্বাস হ’লে পর যখন ফিরে আসব তখন তুমি এক দম মরে থাকবে, মুখটা হাঁ হয়ে থাকবে, আমরা এসে অনায়াসে মোহর কটা বার করে নিতে পারব।” এই বলে তারা পঞ্চুকে গাছের ডালে লটকিয়ে ঝোপের মধ্যে পালিয়ে গেল। বাতাসের ধাক্কায় ছলতে ছলতে কাঁসটা কষে যেতে লাগল—পঞ্চু আর নিশ্বাস ফেলতে পারে না। ক্রমে তার চোখ ছোটো ঝাপসা হয়ে এল,—প্রাণ বুঝি আর থাকে না। তখন তার আপন বাপকে মনে পড়ল,—মরছে মনে করে সে টেঁচিয়ে কেঁদে উঠল—“বাবা গো তুমি যদি এখানে থাকতে!” বলতে বলতে পঞ্চু লাল অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রিয়দর্শনা দেবী।

জয় বিজয়ের অভিশাপ

(শিবপুরাণ)

পুরাকালে একদিন লক্ষ্মী নারায়ণকে বলিয়াছিলেন—“তোমার এরূপ কোমল শরীরে কিরূপে তুমি যুদ্ধ কর? আমার দেখিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে।” বিষ্ণু বলিলেন—“আচ্ছা, তোমাকে একদিন যুদ্ধ দেখাইব।”

ইহার পর, একদিন বিষ্ণু বসিয়া ভাবিতেছিলেন—“লক্ষ্মীর যুদ্ধ দেখিবার সাধ হইয়াছে। এখন কাহার সহিত যুদ্ধ করা যায়?” এমন সময় দারুণ একটা কোলাহল শুনিতে পাইয়া মন্দিরের দরজায় গিয়া দেখিলেন, এক মহা ব্যাপার উপস্থিত! সনক প্রভৃতি ঋষিকুমারগণ কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার দ্বাররক্ষক জয় ও বিজয়কে শাপ দিয়াছেন এবং সেই জন্যই কোলাহল হইতেছে। তখন সমস্ত বিষয় শুনিয়া বিষ্ণু বলিলেন—“দেখিতেছি উভয় পক্ষেরই অনায়াসে কাজ করা হইয়াছে। কিন্তু যাহা হইয়াছে তাহার আর অন্তথা হইবে না। যাহা হউক, হে ঋষিকুমারগণ! আপনারা জয় বিজয়কে দয়া করুন।”

বিষ্ণুর অনুরোধে কুমারগণ জয় বিজয়কে বলিলেন—“তোমরা যদি বিষ্ণুভক্ত হইয়া পৃথিবীতে জন্মিতে চাও তবে সাত জন্মের পর, আর যদি বিষ্ণুর শত্রুরূপে জন্মিতে চাও, তবে বিষ্ণুর হাতে মরিয়া তিন জন্মের পর, তোমাদিগের শাপ দূর হইবে।” ইহা শুনিয়া জয় বিজয় ভাবিল—শত্রুভাবে জন্মিলে বিষ্ণুর অস্ত্রে শীঘ্র মুক্তি পাইব, অতএব ইহাই ভাল। এই ভাবিয়া বলিল—“আমরা শত্রুরূপেই জন্মিতে চাই।”

তাহাই হইল। জয় বিজয় এই কথা বলিবামাত্র মাটিতে পড়িয়া গেল। তারপর তাহারা ‘হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ’ নামে মহা পরাক্রান্ত ও প্রসিদ্ধ দুই অশুর হইয়া জন্মিল—তখন তাহাদের পিতা ছিলেন মহামুনি কশ্যপ। এই জন্মে বিষ্ণু নৃসিংহরূপ ধারণ করেন। সনকাদি ঋষিকুমারগণ বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ প্রভৃতি অশুর হইয়া জন্মিয়াছিলেন।

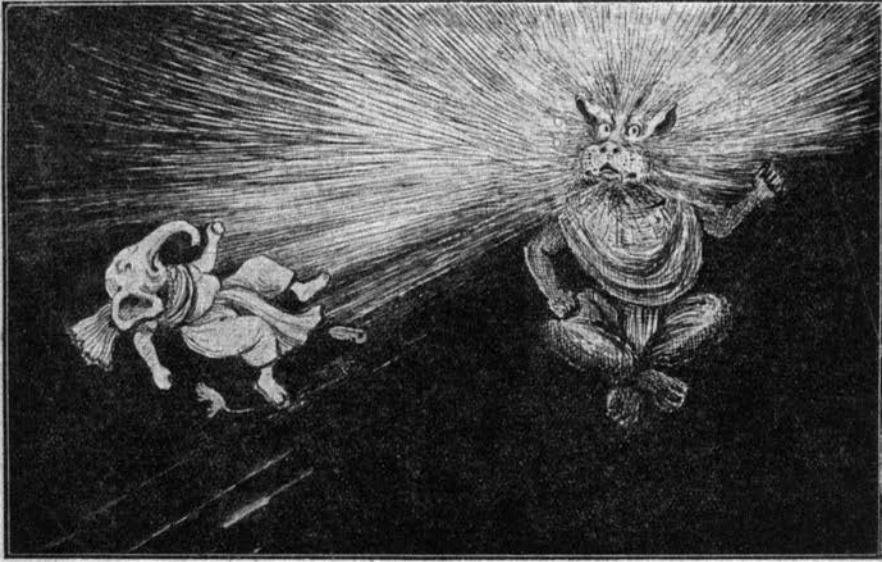
নৃসিংহদেব ক্রুরূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন তাহা তোমরা শুনিয়াছ। হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াও নৃসিংহদেবের তেজ শাস্ত হইল না। সেই তেজে পৃথিবী ছারখার হইবার উপক্রম হইল, দেবতারা প্রমাদ গনিলেন! এখন কে নৃসিংহদেবের নিকটে গিয়া, তাহাকে তেজ শাস্ত করিতে অনুরোধ করিবেন? দেবতারা সকলে মিলিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে অনুরোধ করিলে পর, তিনি ভয় পাইয়া বলিলেন—“যে ভীষণ তেজ, আমি নিকটে যাইতে পারিব না। শেষে কি চক্ষু হারাইয়া অন্ধ হইব?” ব্রহ্মাকে বলিলে তিনি বলিলেন—“না বাবা, আমি যাইতে পারিব না—আমার দাড়ি পুড়িয়া যাইবে।” লক্ষ্মীকে বলা হইল কিন্তু তিনিও রাজি হইলেন না। বলিলেন—“বিষ্ণুর ওরূপ ভীষণ মূর্তি আমি কখন দেখি নাই—আমার ভয় করিতেছে।”

অবশেষে দেবতাগণ প্রহ্লাদকে ধরিয়া বসিলেন। বলিলেন—“বাপু, তুমি যাও। নৃসিংহদেব তোমাকে বড় ভালবাসেন, তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না।” বাস্তবিক তাহাই হইল। প্রহ্লাদ নিকটে যাইবামাত্র নৃসিংহ জিব দিয়া তাহার গা চাটিতে লাগিলেন, আর তাহাকে বুক জড়াইয়া ধরিয়া বার বার আদর করিতে লাগিলেন। তারপর তাহাকে বলিলেন—“এখন তুমি স্থখে রাজ্যপালন কর। আমি বর দিতেছি, তোমার বংশের কেহ আমার হাতে মরিবে না।” প্রহ্লাদকে এই বলিয়াই নৃসিংহ ভীষণ উল্লাসে মুখ দিয়া ঝড়ের মত বাতাস বাহির করিতে লাগিলেন।

দেবতারা ভাবিলেন—প্রহ্লাদকে পাঠাইয়া হিতে বিপরীতে হইল। নৃসিংহদেব শাস্ত হওয়া দূরে থাকুক আবার একি সাংঘাতিক ফুৎকার আরম্ভ করিলেন! তখন

তাঁহার। গণেশকে বলিলেন—“আপনি বুদ্ধিমানের মধ্যে সকলের বড়। আপনি গিয়া নৃসিংহকে কোন রকমে শাস্ত করুন।”

গণেশ সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহর বাহনটিতে চড়িয়া চলিলেন। গণেশের শরীরটি প্রকাণ্ড মোটা, পেটটি তাঁহার ‘লম্বোদর’ নামেরই উপযুক্ত, আবার বাহনটি ইঁহর—তাঁহাকে দেখিয়া দেবগণের বড়ই আমোদ হইল। যাহা হউক, গণেশ যখন গম্ভীর চালে নৃসিংহদেবের নিকটে গেলেন ঠিক সেই সময়ে নৃসিংহও ফুৎকার ছাড়িলেন। আর



যায় কোথা! গণেশের বাহন ফুৎকারের চোটে ডিগ্বাজি খাইয়া মাটিতে পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে গণেশও উল্টাবাজি খাইয়া গড়াগড়ি দিয়া উঠিলেন। এই মজার দৃশ্যটি দেখিয়া শুধু দেবতারা কেন নৃসিংহদেব পর্য্যন্ত হাসিয়া অস্থির!

নৃসিংহদেবের হাসি দেখিয়া দেবতারা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার আর রাগ নাই। কিন্তু তাঁহার তেজ তবুও গেল না দেখিয়া নিরুপায় দেবতাগণ মহাদেবের শরণ লইলেন। মহাদেব তাহাতে অদ্বুত ‘শরভ’ রূপ ধরিয়া অবশেষে নৃসিংহকে শাস্ত করেন।

জয় বিজয় দ্বিতীয় জন্মে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ হইল। সেই জন্মে বিষ্ণু হইলেন রাম, এবং সনকাদি ঋষিরা, বিভীষণ হনুমান প্রভৃতি রূপে জন্মিয়া রামের সেবক হইয়াছিলেন। রাবণের মৃত্যুর পর জয় বিজয় তৃতীয় জন্মে দমঘোষের ঘরে, শিশুপাল ও দন্তবক্র হইয়া জন্মিল। বিষ্ণু জন্মিলেন কৃষ্ণ হইয়া এবং ঋষিকুমারগণ অত্রুর প্রভৃতি হইয়া জন্মিয়াছিলেন। শিশুপাল ও দন্তবক্র কৃষ্ণের ভয়ানক শত্রু ছিল। তারপর কৃষ্ণের হাতে তাহাদের মৃত্যু হইলে, ঋষির শাপ দূর হওয়ায় জয় বিজয় পুনরায় বৈকুণ্ঠে গিয়া বিষ্ণুর দ্বাররক্ষকের কার্যে নিযুক্ত হইল। লক্ষ্মীরও যুদ্ধ দেখিবার সাধ মিটিল।

শ্রীকুলদারজন বায়।

পুরাতন লেখা

(৮ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত)

খুঁত-ধরা ছেলে

বিলাতে চারিটা ভাই একদিন এক যায়গায় বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছিল। তাহাদের আলাপের বিষয়, কে কি করিবে। সকলেরই মনে ইচ্ছা, একটা কিছু হওয়া চাই। সকলের ‘একটা কিছু’ তো আর এক রকম হয় না। তাই চার ভাই চার রকম কথা বলিল।

একজন বলিল, “আমি ইটের কারবার করিব। তাহাতে টাকা হইবে, আর ইট দিয়া আমার একখানা বাড়ী করিব।”

আর একজন বলিল, “দূর হ, তোর নেহাৎ ছোট নজর। আমি তোর চাইতে বেশী একটা কিছু হ’ব—আমি ইঞ্জিনিয়ার হ’ব। কত লোক আমার কাছে ঘর বাড়ীর নক্সা করিয়া নিতে আসিবে; কত লোকের বাড়ী ঘর বাঁধিয়া দিব। আমি একটা ‘দশজনের একজন’ হইব। বলিস্ কি, আমার নামে ষ্ট্রীট যদি না হয়, তখন দেখিস্।”

তৃতীয় ভ্রাতা বলিল, “বিল্ডার, কন্ট্রাক্টর, ইঞ্জিনিয়ার সব বাজে লোক। তোরা হ’বি চিনির বলদ। আমি কি করিব জানিস্? আমি অগ্নের কাজ নিয়া ছুটোছুটি করিতে যাইব কেন। সব কাজে আমার নিজের বুদ্ধি খাটিবে। সব নূতন ফ্যামানে বাড়ী-ঘর করিব। আমার সব এমন হইবে যাহা কেহ কখন দেখে নাই।”

শেষ ব্যক্তি উঠিয়া বলিল, “তোরা যাহাই করিস্ ভাই, এমন কিছু করিতে

পারিবি না যাহার উপর আমার বক্তৃতা না চলিবে। উত্তম হইল; দেখ্ দেখি, তোরা যাহা করিবি, আমি তাহার দোষ ধরিব। আমার কাজের আর অভাব কি”?

চারি ভায়ের পরামর্শ ঠিক হইল। একজন ইটের কাজ করিয়া কিছু টাকা করিল। ইট দিয়া তাহার একটা বাড়ী হইল। তা ছাড়া এক দুঃখিনী বুড়ীকে ঐ ইট দিয়া আর একটা ঘর করিয়া দিল। কণ্ট্রাক্টর ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি মহাশয়ও কথামত কাজ করিলেন। মিউনিসিপালিটিকে খোঁচাইয়া নিজের নামে একটা স্ট্রীট পর্য্যন্ত কেমন করিয়া, করিয়া লইয়াছেন। তিনিও ‘একটা কিছু’ হইয়াছেন। তৃতীয় বেচারী নূতন ধরনে বাড়ী করিতে গিয়া চাপা পড়িয়া মরিল। খুঁত-ধরা মহাশয়ের তো কথাই নাই। তাহার কাজ ফুরায়ই না। মরিবার সময় পর্য্যন্ত সে সন্তোষজনকরূপে প্রশংসার সহিত কর্তব্য-কাজ করিয়া গেল।

একদিন স্বর্গের দরজায় দরওয়ান দেবতা বসিয়া রহিয়াছেন। সে প্রকাণ্ড দরজা। বিশ্বকর্মার হাতের তৈরি। বুঝিতেই তো পার; স্বয়ং বিশ্বকরম ঠাকুর যাহা করিয়াছেন সে কেমন সুন্দর। এত সুন্দর যে আর কি বলিব! দরজায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছুখানা কাচ লাগান। তাহার ভিতর দিয়া দারওয়ান ঠাকুর, কে আসিল দেখিতে পান। কিন্তু সম্প্রতি তিনি তাহা করিতেছিলেন না। অনেক কাল হইতে স্বর্গের লোক আসে না; তাই আজ কাল কাজের ব্যস্ততা কিছু কম। দেবতা দরজা খুলিবার হীরার হ্যাণ্ডেলে হাত বুলাইয়া সোণার টুলে বসিয়া বিমাইতেছেন। এমন সময় কড়াং কড়াং করিয়া দরজায় ঘা মারিবার শব্দ হইল। বাহির হইতে একজন লোক বলিতেছেন—“অনুগ্রহ করুন মহাশয়, আমি কি ভিতরে আসিতে পারি? দরজাগুলি তো মন্দ নয়; কিন্তু স্বর্গের দ্বার বন্ধ থাকিবে কেন? দরজাগুলি আরো বড় হওয়া উচিত।”

“তুই কেরে, পৃথিবীর লোক ক্যাচ্ ম্যাচ্ করিয়া কথা কহিতেছি?”

“অত মোটা সুরে বলিতেছেন কেন?—আমি স্বর্গে যাইতে চাই।”

“বটে? তুই করিয়াছি কি?”

“আমি খুঁতধরা কাজ করিয়াছি। আমার তিন ভাই যে কাজ করিয়াছে তাহার সমস্ত দোষ আমার নোট বহিতে লিখিয়া আনিয়াছি। যে ইট পোড়াইয়াছিল সে আর দুই মণ কয়লা কম খরচ করিলে সুরকীওয়ালা সহজেই খোওয়া করিতে পারিত। যার নামে স্ট্রীট হইয়াছে সে এত রোগা যে অত বড় স্ট্রীটে তাহার কিছু দরকার নাই। যে চাপা পড়িয়া মরিয়াছে—”

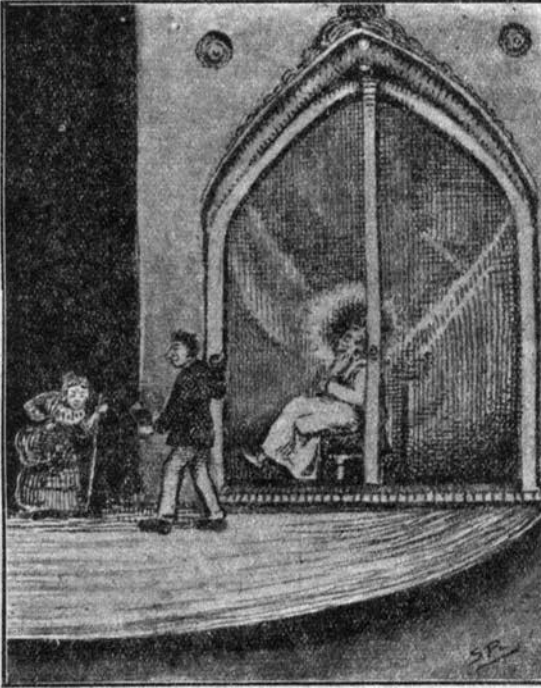
“আরে থাম্ থাম্ ; ও সব কি কাজ ? তুই নিজের হাতে কি করিয়াছিস্ ?”

“এই সব নোট লিখিয়াছি।”

“দূর হ ব্যাটা, তুই কি আর কোন কাজই করিস্ নাই ? কেবল দোষ ধরা কাজই করিয়াছিস্ ?”

“আর স্মৃতি পুস্তিকায় তাহা লিখিয়াছি।”

“যা, যা ! তোর এখানে আসিবার হুকুম নাই।”—“আউ পচারিব কাঙ্ক, জগনাথঙ্ক—” বলিয়া দরোয়ান দেবতা গান ধরিলেন। আমাদের সমালোচক দেখিলেন যে এত পথ খরচ, রেলভাড়া, গাড়ী ভাড়া করিয়া আসিয়াও কোন ফল পাইলেন না।



বিরক্ত হইয়া মনে করিলেন যে কাগজে লেখা উচিত ‘স্বর্গে ভাল অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত নাই।’ গাড়ী পাইতে অনেক দেরী, সুতরাং ইত্যবসরে দরজার দোষগুলি টুকিয়া রাখিতে লাগিলেন। দরজার কথা শেষ হইলে সাহেব দ্বারী ঠাকুরের গানের এক মজার বর্ণনা লিখিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন যে, যে বুড়ীকে তাঁহার ভাই ঘর করিয়া দিয়াছিল, সে আসিতেছে। তিনি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“ও বুড়ী ! তুই কেমন করিয়া আসিলি ?”

“তাই তো বাপু, আমি তো কিছু জানি না। আমি গরিব ছাঃখিনী বুড়ী, এমন তো কিছুই করি, নাই যাহাতে এখানে আসিতে পারি।”

“তুই কি কোন কাজই করিস্ নাই? আমি তো সমালোচনা করিয়াছি।”

“আমার আর তো কিছুই মনে হয় না। তবে একদিন আমার বাড়ীর কাছে পুকুরে জমা বরফের উপরে পাড়ার সকলে খেলা করিতে গিয়াছিল। যাইবার সময় আমাকে সকলেই দেখিয়া মিষ্টি কথা কহিয়া গেল। আমি বড়ই অশুষ্ক ছিলাম। কিছুকাল পরে দেখি, আকাশে এক রকম মেঘ দেখা দিয়াছে। ওরূপ মেঘ আমার জন্মে আমি আর একবার দেখিয়াছিলাম। তখন দুই মিনিটের মধ্যে সমুদায় বরফ ফাটিয়া গিয়াছিল। আমার মনে বড় ভয় হইল। এখনই এতগুলি লোক ডুবিয়া মরিবে ভাবিয়া আমার চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। আমি কি করি। রোগে মরি, উঠিবার শক্তি নাই, ডাকিলেও কেউ আমার কথা শুনবে না। তখন আমি আস্তে আস্তে অনেক কষ্টে বাহিরে আসিয়া আপনার ঘরে আগুন লগাইয়া দিলাম। সকল লোক ‘বুড়ী পুড়িয়া মরিল’ মনে করিয়া দৌড়িয়া আসিল। আমি তারপর কি হইল বিশেষ জানি না। কেবলমাত্র একবার জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘কারও কিছু হয়নি তো?’ একজন লোক বলিল, ‘না, আমরাও আসিয়াছি আর বরফও ভাঙ্গিয়া গলিয়াছে।’ তারপর আর কিছু জানি না। কে যেন আমাকে এখানে আনিয়াছে।”

বুড়ীর কথা শুনিয়া দরোয়ান দেবতা স্বর্গে খবর দিলেন। আর দলে দলে দেবতারা আসিয়া “এসো এসো বুড়ী এসো” বলিয়া আদর করিয়া বুড়ীকে স্বর্গের ভিতর লইয়া চলিলেন। কিন্তু বুড়ী সমালোচকের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল; বলিল, “ওর ভাই আমাকে বাড়ী করিয়া দিয়াছিল, আমার থাকিবার যায়গা ছিল না। ও মুখ কালো করিয়া ফিরিয়া যাইবে, আর আমি কোন্ প্রাণে তোমাদের সঙ্গে স্বর্গে যাইব? আমার মনে বড় লাগে। আমাকে তোমরা স্বর্গে নিও না। এ বেচারী তাহা হইলে বড় কষ্ট পাইবে।”

তখন দেবতারা সমালোচককে বলিলেন, “অলস! অপদার্থ! যা, বুড়ীর জন্ত তোকে স্বর্গে নিয়া যাওয়া হইল। তুই জীবনটা কেবল সমালোচনা করিয়াই কাটাইলি, ভাল কাজ কিছুই করিলি না। তোর মতন লোক আর এর পূর্বে স্বর্গে যায় নাই।”

দেবতারা তারপর বুড়ীর সঙ্গে সমালোচককেও টানিয়া স্বর্গে নিয়া চলিলেন। সমালোচক হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। একবারমাত্র বলিল, “টানিয়া লওয়া বুঝি

তোমাদের অভ্যাস নাই। ভাল করিয়া টানা হইছে না। এমনি ক'রে বুঝি টানে?”

টেকি যেখানেই যাক্, তার ধানভানা কাজ ঘোচে না, আমাদের সমালোচক ভায়া স্বর্গে গিয়াও খুঁত ধরিতে ব্যস্ত! আর কিই বা করে, একটা কাজ তো চাই?

[সন্ধ্যা, ১৮৮৪]

পৃথিবীর শেষদশা

সংসারে কোন জিনিষই চিরকাল একভাবে থাকে না—তা সে ছোটই হউক আর বড়ই হউক। এই যে প্রকাণ্ড পৃথিবীটা, যার উপর তোমার আমার মত কোটি কোটি জীব এমন নিশ্চিন্তে বসিয়া দিন কাটাইতেছি, এই পৃথিবীটাও চিরকাল এমন



ছিল না। এক সময়ে—
সে কত লক্ষ বৎসর
আগেকার কথা তাহা
জানি না—এই পৃথিবী
এমন গরম ছিল যে,
জীবজন্তু থাকাত দূরের
কথা, ইহার উপর বৃষ্টি
পড়িবার ও যো ছিল না।
উপরের আকাশে বৃষ্টি
জমিয়া নীচে পড়িতে না
পড়িতে শূণ্যেই বাষ্প
হইয়া মিলাইয়া যাইত।
যখন আরেকটু ঠাণ্ডা
হইল, তখন তেমন
তেমন বৃষ্টি হইলে তাহা
পৃথিবীতে আসিয়া পড়িত
কিন্তু জল দাঁড়াইবার

উপায় ছিল না। বৃষ্টিধারা ডাঙ্গায় নামিবামাত্র টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিত এবং

চারিদিক গরম ধোঁয়ায় ঢাকিয়া আকাশের জিনিষ আকাশেই ফিরিয়া যাইত। তখন দেখিবার কেহ ছিল না, শুনিবার কেহ ছিল না; ফুটন্ত বৃষ্টিধারার অবিশ্রাম গর্জনের মধ্যে ধোঁয়ায়-ভরা আকাশ যখন পৃথিবীর উপর ঘনঘন বিদ্যুতের চাবুক মারিত, তখনকার সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য কল্পনা করাও সহজ কথা নয়।

তাহারও পূর্বের এক সময়ে পৃথিবীটা প্রকাণ্ড আগুনের পিণ্ডমাত্র ছিল। তখন তাহার শরীরটি ছিল এখনকার চাইতে প্রায় লক্ষগুণ বড়। বেশ একটি ছোটখাট সূর্যের মত সে আপনার প্রচণ্ড তেজে আপনি ধ্বংস করিয়া জ্বলিত। তাহারও পূর্বেরকার অবস্থা কেমন ছিল, সে কথা পণ্ডিতেরা আলোচনা করিয়াছেন। যাহা হউক, মোট কথা এই যে, পৃথিবীর বয়স অনেক হইয়াছে। মানুষের বয়স বাড়িয়া যখন সে বৃদ্ধ হইতে চলে, তখন তাহার শরীরের তেজ কমিয়া যায়, গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা হইয়া আসে। পৃথিবীর এটা কোন্ বয়স? সে কি এখন প্রৌঢ় বয়স পার হইতেছে? ভাবিবার কথা বটে। পৃথিবীর শেষ বয়সটা কি রকম হইবে, তাহার পক্ষে বান্ধিক্যই বা কি আর মৃত্যুই বা কি, তাহার বিচার করা দরকার।

মানুষের মরিবার নানা রকম উপায় আছে। কেউ অল্পে অল্পে বৃদ্ধ হইয়া মরে, কেউ বা তাহার পূর্বেরই মরে, কেউ বহুদিন রোগে ভুগিয়া মরে, কেউ দুর্ঘটনায় হঠাৎ মরে। পৃথিবীর বেলা মৃত্যুটা কি রকমে ঘটিবে তাহা কে জানে? যদি বৃদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে অল্পে অল্পেই মরিতে হয় তবে কোন্ অবস্থাকে তাহার মৃত্যুর অবস্থা বলিব? যখন জীবজন্তু থাকিবে না, মেঘ বাতাস থাকিবে না, নদী সমুদ্র থাকিবে না, পৃথিবী শুকাইয়া চাঁদের মত কঙ্কালসার হইয়া পড়িবে, তখন বলা যাইবে ‘পৃথিবীটা মরিয়াছে’। সে রকম হইবার কোন লক্ষণ দেখা যায় কি? যায় বৈ কি! পৃথিবী যখন শূন্যে ছুটিয়া চলে, তখন সে বাতাসটাকেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলে বটে, কিন্তু তবু কিছু বাতাস চারিদিকে ছিটাইয়া পড়ে; তাহা শূন্যে উড়িয়া যায়, আর পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে না। সেই বাতাসের মধ্যে যে টুকু জল বাষ্প হইরা থাকে, তাহাও এইরূপে আকাশে ছড়াইয়া পড়ে। এই ভাবে যাহা নষ্ট হয়, তাহার পরিমাণ খুবই সামান্য; কিন্তু সামান্য লোকসানও যদি ক্রমাগত লক্ষ লক্ষ বৎসর চলিতে থাকে, তবে শেষে তাহার হিসাবটা খুবই মারাত্মক হইয়া পড়ে। নদী ও সমুদ্রের মধ্যে যে জল আছে, ডাঙ্গার মাটি তাহাকে প্রতিদিনই অল্পে অল্পে শুষিয়া লইতেছে, এবং তাহাতেও জলটা দিন দিনই কমিয়া আসিতেছে; সুতরাং আজ না হউক, হাজার বছরে না

হউক, জল বাতাস সব একদিন শেষ হইবেই। তখন মেঘ থাকিবে না, কুয়াশা থাকিবে না, রামধনুকের শোভা, উদয়াস্তের রঙের খেলা কিছুই থাকিবে না—কেবল নিস্তব্ধ নির্জন শ্মশানের মত পৃথিবীর মৃত কঙ্কাল পড়িয়া থাকিবে।

কিন্তু দিনের পর রাত, রাতের পর দিন, এই যে আলো আঁধারের অবিভ্রাম খেলা, ইহাও কি চিরকাল থাকিবে না? না, তাহাও থাকিবে না। মোটামুটি আমরা যে দিন-রাতের হিসাব ধরি সেই দিনরাতের হিসাবও ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। জোয়ার ভাঁটার আঘাত পৃথিবীকে প্রতিদিনই সহিতে হয়, জলের সঙ্গে ডাঙ্গার ঘষাঘষি প্রতিদিনই বাধিয়া থাকে; তাহার ফলে, পৃথিবীর ঘোরপাকের বেগ ক্রমেই টিলা হইয়া পড়িতেছে। পাঁচ লক্ষ বৎসরে দিনরাতের পরিমাণ এক সেকেন্ড বাড়িয়া যাইবে, এবং ক্রমেই অধিক বেশী করিয়া বাড়িবে। শেষে এমন দিন আসিবে যখন এক পাক ঘুরিতে তাহার এক বৎসর লাগিবে। চাঁদ যেমন তাহার একই মুখ পৃথিবীর দিকে রাখিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, তাহার উল্টাপিঠ আমাদের দেখিতেই দেয় না, পৃথিবীও ঠিক তেমনি করিয়াই ক্রমাগত একই ভাবে সূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহার চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে। বৃষ ও শুক্রগ্রহের আজকালকার অবস্থা ঠিক এইরূপ। এ অবস্থায় যেখানে রাত সেখানে বারো মাসই রাত, যেখানে দিন সেখানে বারোমাস দিনের আর শেষ নাই। একদিক রোদে পুড়িয়া ঝলমিয়া ঝামা হইয়া যায়, আর একদিক শীতে জমিয়া এমন কনকনে ঠাণ্ডা যে বাতাস জমিয়া বরফ বাঁধিয়া যায়! শেষ বয়সে, যতদিন সূর্যের তেজ থাকিবে, ততদিন এই রকম করিয়াই পৃথিবীর দিন চলিবে। তারপর সূর্য্যও যখন নিভিয়া যাইবে, তখনও অন্ধকার আকাশের গায়ে কত লক্ষ লক্ষ তারার আলো এমনি করিয়াই চাহিয়া থাকিবে, কিন্তু বহু দূরের সেই জ্যোতিতে আলো-হারা সূর্য্যকে আর খুঁজিয়াই পাওয়া যাইবে না, পৃথিবী ত কোন ছার!

পৃথিবীর মৃত্যুর কি আর কোন উপায় নাই? হঠাৎ কোন ছর্ষটনা ঘটিয়া তাহার জীবনটা কি নষ্ট হইতে পারে না? ধূমকেতুকে এক সময়ে লোকে বড়ই ভয় করিত। নয় বৎসর আগে এই পৃথিবীটা যখন ছালির ধূমকেতুর ল্যাজের ভিতর ঢুকিয়া গিয়াছিল, তখন আগে হইতেই কত লোকে ভয় পাইয়াছিল, কত লোকে বলিয়াছিল যে এইবার পৃথিবীর আর রক্ষা নাই! কিন্তু তবু ত পৃথিবীর কোন ক্ষতি হয় নাই, বরং ধূমকেতুর ধোঁয়াটে ল্যাজটাই ছিঁড়িয়া শূন্যে উড়িয়া গিয়াছে। এইরূপে কত ধূমকেতু কত

উদ্ধাবৃষ্টির হাত হইতে সে কতবার বাঁচিয়া আসিল ; কিন্তু ধূমকেতুর চাইতে ভারি একটা কিছু সহিত যদি তাহার ধাক্কা লাগে তাহা হইলে অবস্থাটা খুবই সাংঘাতিক হইতে পারে। সুতরাং সেই 'একটা কিছু' আসা সম্ভব কি না, আর আসিলে কি হইবে, তাহার একটু খবর লওয়া যাক্।

পৃথিবীর দেহের বাঁধন ও চাল চলন এমন হিসাব-মাফিক সুন্দর নিয়মে বাঁধা যে হঠাৎ কিছু উলটপালট হওয়া সম্ভব নয়। ভূমিকম্প ঝড়বৃষ্টি অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি যে সব ব্যাপারকে আমরা খুব ভয়ানক মনে করি পৃথিবীর গায়ে সেগুলি সামান্য আঁচড় বা ফোঁস্কার মত। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি সকলকেই অতি আশ্চর্য্য নিয়মের বাঁধনে নিরাপদ করিয়া বাঁধা হইয়াছে। সুতরাং বাহির হইতে একটা কোন উপদ্রবকে হাজির না করিলে, সূর্য্যের এই প্রকাণ্ড সংসারটির বাঁধন ভাঙা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। সূর্য্যদেব সপরিবারে শূন্যের ভিতর দিয়া ঘটায় চল্লিশ হাজার মাইল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন,—কিন্তু আকাশের কূল কিনারা নাই; লক্ষ লক্ষ বৎসর ক্রমাগত ছুটিয়াও তিনি যে কোন দিন কোন তারার উপর গিয়া পড়িবেন এমন আশঙ্কার কোন কারণ এপর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। কিন্তু, চোখে দেখা যায় না এমনও ত অনেক বিপদ থাকিতে পারে। আকাশে যত তারা আছে তাহাদের সকলেরই যে আলো আছে এমন নয়। তাহাদের আলো নিভিয়া গিয়াছে আমরা তাহাদের কোন খবর পাই না। সেইরূপ কোন তারা যদি অন্ধকার পথে চলিতে চলিতে সূর্য্যের উপর আসিয়া পড়ে, তবে অবস্থাটা কেমন হইবে? সেটা যে একেবারেই ভাল হইবে না, তাহা বুঝিতেই পার।

তেনমন একটা তারা যদি আসে তবে সে সূর্য্যের রাজ্যের সীমানায় আসিবার পূর্বেই নেপচুন প্রভৃতি বহু দূরের গ্রহগুলির চাল চলন বিগড়াইতে আরম্ভ করিবে। পণ্ডিতেরা ব্যস্ত হইয়া হিসাব করিতে বসিবেন, উপদ্রবটা কত বড় কত দূরে এবং কোন্ দিকে। সূর্য্যের আলোয় সেই অন্ধকার তারা ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিবে, ক্রমে সে সৌর জগতের ভিতরে আসিয়া পড়িবে। ততদিনে বড় বড় গ্রহেরা পর্য্যন্ত তাহাদের বহু দিনের অভ্যস্ত চাল ভুলিয়া বেচাল চলিতে আরম্ভ করিবে। একদিকে সূর্য্য আর একদিকে নূতন অতিথি, এই দোটার্নায় পড়িয়া পৃথিবী টলমল করিতে থাকিবে। জোয়ারের বিপুল টানে নদীর জল ফুলিয়া উঠিবে, সাগরের তরঙ্গ ভীষণ বেগে পৃথিবী উপর ছুটিয়া পড়িবে ভূমিকম্পে পাহাড় পর্ব্বত ধসিয়া পড়িবে, বহু

দিনের ঘুমন্ত আগ্নেয় গিরি আবার জাগিয়া সহস্র মুখে আগুন ফুঁকিতে থাকিবে।



আর জীবজন্তুর হাহা-
কার ডুবাইয়া ঝড়ের
বাতাস পাগলের মত
ছুটিয়া ফিরিবে। তার-
পর যখন সূর্য্যে তারায়
সংঘর্ষ বাধিবে, তখন-
কার অবস্থা কল্পনা
করাও অসম্ভব।
মূহূর্ত্তের মধ্যে এক সূর্য্য
কোটি সূর্য্যের তেজ
ধারণ করিবে, সূর্য্যের
আগুন অসম্ভব বেগে
সমস্ত গ্রহ চন্দ্র
পৃথিবীকে গ্রাস করিয়া
ফেলিবে। আবার সেই
আদিকালের নীহারি-
কার মত জ্বলন্ত বাষ্পের
আগুন সমস্ত সৌর
জগতের আকাশ
জুড়িয়া জ্বলিতে
থাকিবে। তারপর কত

যুগযুগান্তর পরে তাহার ভিতর হইতে আবার নূতন সূর্য্য বাহির হইয়া নূতন
উৎসাহে নূতন সংসার পাতিয়া বসিবে। এ পৃথিবী তখন না থাকুক, আবার নূতন
পৃথিবীর সৃষ্টি হওয়াই বা বিচিত্র কি ?

ইহার মধ্যে অসম্ভব কিছুই নাই। সেদিন যে হঠাৎ নূতন তারা দেখা গিয়াছিল,
তাহাও সুদূর আকাশে এইরূপ কোন ছর্ঘটনার সামান্য একটু নমুনা মাত্র। আমাদের
এই ছোট জগৎটুকুর মধ্যে যদি তেমন কোন প্রলয় আসিয়া পড়ে, তবে বিপদের

সম্ভাবনা বুঝিবার পর সমস্ত শেষ হইতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর সময় লাগিবে।
সুতরাং অন্তত আরও চল্লিশটা বছর তোমরা সকলেই খুব নিশ্চিত থাকিতে
পার।

কাঁছনে



ছিঁচ কাঁছনে মিচকে যারা শস্তা কেঁদে নাম কেনে,
ঘাঙায় শুধু ঘ্যানর ঘ্যানর ঘ্যান্ঘেনে আর প্যানপেনে—
কুকিয়ে কাঁদে ক্ষিদের সময় ফুঁপিয়ে কাঁদে ধমকালে,
কিন্মা হঠাৎ লাগলে ব্যথা কিন্মা ভয়ে চমকালে,
অল্লে হাসে অল্লে কাঁদে কান্না থামায় অল্লেতেই
মায়ের আদর ছুধের বোতল কিন্মা দিদির গল্লেতেই—
তারেই বলি মিথ্যে কাঁদন ; আসল কান্না শুনবে কে ?
অবাক হবে থমকে র'বে সেই কাঁদনের গুণ দেখে !
নন্দ ঘোষের পাশের বাড়ী বৃথ্ সাহেবের বাচ্চাটার
কান্নাখানা শুন্লে বলি কান্না বটে সাঁচ্চা তার।
কাঁদবে না সে যখন তখন রাখবে কেবল রাগ পুষে,
কাঁদবে যখন খেয়াল হবে খুন-কাঁছনে রাঙ্কুসে !

১ July 1964-19/1/69

PAPERS

LIBRARY



নাইক কারণ নাইক বিচার মাঝরাতে কি ভোরবেলা,
হঠাৎ শুনি অর্থবিহীন আকাশ-ফাটন জোর গলা।
হাঁকড়ে ছোট্টে কান্না যেমন জোয়ার বেগে নদীর বান
বাপ মা বসেন হতাশ হ'য়ে শব্দ শুনে বধির কাণ।
বাসুরে মেকি লোহার গলা? এক মিনিটও শাস্তি নেই?
কাঁদন ঝরে শ্রাবণ ধারে ক্ষান্ত দেবার নামটি নেই!
ঝুমঝুমি দাও পুতুল নাচাও মিষ্টি খাওয়াও একশোবার
বাতাস কর চাপড়ে ধর ফুটবে নাকো হাস্ত তার।
কান্না ভরে উন্টে পরে কান্না ঝরে নাক দিয়ে
গিলতে চাহে দালান বাড়ী হাঁথানি তার হাঁক দিয়ে—
“ওয়া-হঃ হঃ ওয়া-ওয়াঃ-হঃ হয়াঃ হয়াঃ ওয়া-হাঃ-হাক্
কালি মাখব চশমা খাব কামড়ে দেব বাবার নাক।”

কুড়েরাম

(গল্প)

অনেক দিন আগে একটা ছেলে ছিল। মা তার নাম রেখেছিল বলরাম। কিন্তু লোকে তাকে ডাকত কুড়েরাম। সে এমন কুড়ে ছিল যে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যখন-তখন তার খালি ঘুম আর ঘুম। কিন্তু তার বুড়ী মা বেচারার চোখে ঘুম ছিল না, ছবেলা ছমুঠো খাওয়ার চেষ্টায় এই বুড়ো বয়েসে তাকে দিন রাত খেটে খেটে মরতে হত। কুড়েরাম দিনান্তে একটুও কাজ করত না, কাজেই কোন্ কাজ কেমন করে করতে হয় তা জানত না। তার মা তাকে কত বোঝাত যে সংসারে কাজ না শিখলে তার ছুখে শেষাল কুকুর কাঁদবে; কিন্তু কুড়েরাম মায়ের কথা বোঝবার আগেই হাইএর হাওয়ায় পাল তুলে ঘুম নদীর মাঝে উধাও হয়ে যেত।

একদিন তার মা আর সহ্য করতে না পেরে তার কান ধরে বিছানা থেকে টেনে তুলে বললে—“শা, কাজ করগে!” কানের জ্বালায় কুড়েরামের চোখের ঘুম দেশ ছেড়ে পালাল। সে দৌড়ে গিয়ে এক চাষার কাছে বললে—“আমাকে একটা

কাজ দিবিরে ?” চাষা বল্লে—“আয় আমার সঙ্গে মাঠে ।” এই বলে তাকে মাঠে নিয়ে গিয়ে এবড়ো-খেবড়ো চষা জমিতে একখানা মইএর উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে তাতে গরু যুতে তার ল্যাজ মলে বল্লে—“যা ।” গরু অমনি লেজ তুলে সেই মইখানা হিড়্‌হিড়্‌ করে টানতে লাগল । কুড়েরাম ভয়ে কাঠ—পাছে পড়ে যায় ! তার চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এল ; কাজেই কুড়েরামের ঘুম বেচারি ঠাই না পেয়ে ডানা মেলে নীল আকাশে উড়ে গেল ।

সন্ধ্যার সময় চাষা তাকে মই থেকে নামিয়ে বল্লে—“যাও, হয়েছে ।” এই বলে তাকে এক আনা পয়সা দিয়ে বিদেয় করে দিলে । কুড়েরাম আজ পর্য্যন্ত কখনো হাতে পয়সা পায়নি, সেই জন্যে পয়সা কি করে রাখতে হয় তা জানত না । বাড়ী ফেরবার পথে কখন একবার তুলুনি এল আর সেই ঘুমের অন্ধকারে পয়সা চারটে কোথায় যে মিলিয়ে গেল, কুড়েরাম টেরও পেলেন না । বাড়ী ফিরে এসে মাকে সব কথা সে বল্লে । তিনি বল্লে—“গাধা ছেলে ! পয়সা রাখতে হয় ট্যাঁকে, জানিস না !” কুড়েরাম বল্লে—“ও বুঝেছি !”

পরদিন সকালে তার মা আবার তার কান ধরে টেনে বল্লে—“যা কাজে যা ।” সে এক রাখালের কাছে গিয়ে বল্লে—“ভাই আমাকে একটা কাজ দিবি ?” রাখাল তাকে একটা মস্ত শিংওয়ালা কালো গরু দিয়ে বল্লে—“যা, গরু চরাগে ।” কুড়েরাম মনে মনে বল্লে—আঃ আজ ছপুর্নে ঘুমিয়ে বাঁচবো ! গরু ঘাস খাবে আর আমি ঘুম দেব । এই বলে সে মাঠে গিয়ে গরুটাকে এক গাছে বেঁধে, সেই গাছের ছায়ায় পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল । একটু খানিক ঘুমে চোখের পাতা একটু বুজে এসেছে এমন সময় সেই কালো গরুটা লম্বা শিং বেঁকিয়ে একেবারে তার নাকের ডগার কাছে ফাঁস-ফাঁসিয়ে উঠল । “ওরে বাপরে !” বলে কুড়েরাম লাফিয়ে উঠল । তার সর্ব্বশরীর ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগল । সেই কাঁপুনির চোটে কুড়েরামের চোখের ঘুম সে দিনও যে কোথায় ছিটকে পড়ল আর খোঁজই পাওয়া গেল না ।

সমস্ত দিন গরু চরিয়ে সন্ধ্যার সময় কুড়েরাম রাখালকে গরু ফিরিয়ে দিলে । রাখাল বল্লে—“এই নাও তোমার মজুরি ।” এই বলে একটি ছোট্ট কালো ভাঁড় করে এক-ভাঁড় দুধ তাকে দিলে । কুড়েরাম মনে মনে বল্লে—“দুধ পয়সা কাল ভারি ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে ।”—এই বলেই দুধের ভাঁড়টা সে চট করে ট্যাঁকে

গুঁজে ফেলে। বাড়ী ফিরতে মা যখন দেখলেন খালি ছুধের ভাঁড় ছেলের ট্যাক থেকে বেরল, তখন তিনি রেগে বল্লেন—“বোকা কোথাকার! ছুধের ভাঁড় মাথায় করে আনতে হয় জানিস না?” কুড়েরাম বল্লেন—“ও-ও, বুঝেছি।”

পরদিন সকালে কুড়েরাম এক গয়লার বাড়ীতে চাকরী করতে গেল। গয়লা তাকে দিয়ে সমস্ত দিন ঘোল মইয়ে সন্ধ্যা বেলা এক তাল মাখন দিয়ে বিদেয় করলে। কুড়েরাম সেই মাখনের গোলা নিয়েই মাথার উপর রাখল। যেমন রাখা অমনি গড়িয়ে মাটিতে পড়া। কুড়েরাম আবার তুলে মাথায় রাখলে আবার গড়িয়ে পড়ে গেল। এমনি করতে করতে সে যখন বাড়ী পৌঁছল তখন মাখনের তাল একটি ধুলো কাদার তাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। মা তাই দেখে রেগে বল্লেন—“অজবুগ কোথাকার!” কুড়েরাম অবাক হয়ে বল্লেন—“কেন! আজ তো মাথায় করে এনেছি।” মা তার কান ধরে বল্লেন—“গাধা! মাখন কি মাথায় করে আনে? কলাপাতায় মুড়ে হাতে করে আনতে হয়।” কুড়েরাম খানিক ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে বল্লেন—“ও-ও-ও-ও বুঝেছি!”

পর দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রাস্তায় বেরিয়ে যখন কুড়েরাম ভাবছে আজ কাজ কোথায় পাই, এমন সময় ফাঁদ-হাতে এক ব্যাধের সঙ্গে তার দেখা। ব্যাধ বল্লেন—“কুড়েরাম শিকারে যাবি?” কুড়েরাম বল্লেন—“সে কি? সে কোথায়?” ব্যাধ বল্লেন—“চল্না দেখবি।” এই বলে তাকে এক অজগর বনের মধ্যে নিয়ে গেল। ব্যাধ সমস্ত দিন ধরে কত জানোয়ার মারলে, ফাঁদ পেতে কত পাখী ধরলে। কুড়েরাম তার দেখাদেখি ফড়িং ধরতে লাগল। শিকার শেষ হলে ব্যাধ কুড়েরামকে একটা বনবেড়াল বকসিস দিলে। কুড়েরাম মায়ের কথা ভোলেনি। সে বন বেড়ালটাকে কলাপাতায় মুড়ে খুব কসে হাতের মধ্যে চেপে নিয়ে বাড়ীর দিকে যেতে লাগল। বেড়ালটা চটে উঠে তাকে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষত বিক্ষত করে দিলে। কুড়েরাম তবু তাকে ছাড়লে না। মনে-মনে ভাবলে আজ ঠিক নিয়ে যাচ্ছি; আজ আর কেউ বোকা বলতে পারবে না। কিন্তু সে যখন হাতময় রক্ত মেখে বাড়ী পৌঁছল, মা তখন বল্লেন—“তুই একটা আস্ত বাঁদর! বেড়ালকে কি কখনো অমন করে আনে? গলায় দড়ি বেঁধে হিড়্ হিড়্ করে টেনে আনতে হয়।” কুড়েরাম বল্লেন—“আচ্ছা!”

পরদিন সকালে সে এক কসাইয়ের দোকানে কাজ করতে গেল। সমস্ত দিন

কাজ করবার পর কসাই তাকে একটা মস্ত পাঁঠার মুড়ি দিয়ে বিদেয় করলে। কুড়েরাম সেটাকে আচ্ছা করে দড়ি দিয়ে বেঁধে হিড় হিড় করে রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। ধুলোয় কাদায় রাস্তার নোংরায় পাঁঠার মাথার দফা শেষ হয়ে গেল। কুড়েরামের মা তাই দেখে হায় হায় করতে লাগলেন। বল্লেন—“বোকা ছেলে, এমন জিনিসটা মাটি করলি! হাতে ধরেনি তো, পিঠে করে আনতে পারলি না।” এই কথা শুনে কুড়েরামের হুঁখু হল। সে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল, তারপর বলে উঠল—“দেখো এবার কখখনো ভুল হবে না।”

পরদিন সকালে কুড়েরাম এক ধোবার কাছে কাজ করতে গেল, সন্ধ্যা বেলা কুড়েরাম যখন মাইনে চাইলে তখন ধোবা বল্লেন—“কি আর দেবো, তুই এই গোয়াল থেকে একটা গাধা নিয়ে যা।” কুড়েরাম বল্লেন—“আচ্ছা।”

এই বলে সে একটা গাধা নিয়ে পিঠের উপর তাকে তুলতে গেল। গাধা কিছুতেই উঠবে না, কুড়েরামও কিছুতেই ছাড়বে না, এমনি অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তি করে তাকে ঘাড়ের উপর চড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগল। গাধা যতবার লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ে কুড়েরাম ততবার তাকে টেনে টেনে পিঠের উপর তোলে। এমনি করে গাধার পিঠে না চেপে গাধাকে পিঠের উপর চাপিয়ে সে রাস্তা দিয়ে চলেছে, এমন সময় এক রাজকন্যা রাজবাড়ীর জানালার ফাঁক দিয়ে দেখে হো হো করে হেসে উঠল। তার হাসি আর থামেই না।

এখন হয়েছে কি, এই রাজকন্যা ছিল বোবা ও কালা। একবার এক ভারি অসুখ হয়ে তার মুখ আর কান বন্ধ হয়ে যায়। হাকিম বলেছিলেন কেউ যদি তাকে হাসাতে পারে তাহলে রাজকন্যার ওই বন্ধ মুখ আবার খুলবে। রাজা অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কত কাতুকুতু দিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুতেই রাজকন্যার মুখে হাসি ফুটে উঠেনি সেই জন্যে রাজা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, “যে আমার মেয়েকে হাসাতে পারবে তাকে আমার অর্ধেক রাজত্ব, আর এই রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দেব।”

রাজকন্যা যেই হেসে উঠল, অমনি দাসীরা গিয়ে রাজবাড়ীর ঘরে-ঘরে খবর দিলে “রাজকন্যা হেসেছেন, রাজকন্যা হেসেছেন।” সেই শুনে রাজা ছুটে এলেন, রাণী ছুটে এলেন, রাজপুত্র ছুটে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী এলেন, পাত্রমিত্র সবাই এলেন। রাজার আনন্দ দেখে কে! তিনি তখনি কুড়েরামকে ডেকে রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দিলেন, অর্ধেক রাজত্ব দিলেন।

তারপর হ'ল কি? কুড়েরাম মনের স্থখে ঘুমুতে লাগলেন,—আর তাঁকে



কাজের চেষ্টায় ঘুরতে হল না। কোন্ জিনিসকেমন করে বইতে হয় তারও ভাবনা রইল না। কারণ এখন তার পাশে সদাই দাসদাসী ঘুরছে, কোনো জিনিস নিজের হাতে তুলে ধরবার জো নেই।

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

রাঠোরের কলঙ্ক

বিকানিরের রাজারা মরুস্থলীর রাঠোর রাজবংশীয়দের অতি নিকট সম্পর্কীয়। শুনা যায় রাঠোর রাজবংশীয় ভিখাজী নামে এক ব্যক্তি বিকানির অঞ্চলে প্রথম রাজ্য স্থাপন করেন। এই ভিখাজী নাম হইতেই বিকানির হইয়াছে।

একবার মরুস্থলীর রাজার সহিত বিকানিরের রাজার এক খণ্ড ভূমি লইয়া মহা

যুদ্ধ বাধে। মরুস্থলীর রাজা ধনে প্রতাপে সকল বিষয়েই বড়, তাঁহার সম্মুখে বিকানির টিকিতে পারিবেন কেন? অগত্যা রাঠোর সৈন্য গিয়া বিকানির আক্রমণ করিয়া বসিল। মহারাজা বিকানির প্রাণপণ যুদ্ধেও তাহাদের রোধ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি তাঁহার শ্যালক আমের-রাজের সাহায্য চাহিলেন। আমের-রাজ রাঠোরের জামাতা, কিন্তু তবু তিনি ভগ্নীপতির সাহায্যের জন্ত প্রস্তুত হইলেন। তিনি সৈন্য সামন্ত লইয়া একেবারে মরুস্থলীর রাজধানীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিপদ দেখিয়া রাঠোর তৎক্ষণাৎ দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার রাজধানীর সম্মুখেই দুই দলে তুমুল যুদ্ধ হইল, এবং সেই যুদ্ধে আমের রাজারই জয় হইল। তখন রাঠোর রাজ বিকানির হইতে সমস্ত সৈন্য ফিরাইয়া আনিয়া আমেরের দলকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু এবারও রাঠোরদেরই হার হইল। সময় বুঝিয়া বিকানির মহারাজাও পশ্চাৎ হইতে মরুস্থলীর সীমায় আসিয়া রাঠোরদের উপর পড়িলেন। রাঠোর সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলাইতে পথ পাইল না।

মরুস্থলীর মহারাজা মহা বিপদে পড়িলেন। ব্যস্ত হইয়া আমের রাজের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। আমের রাজ বলিয়া পাঠাইলেন যে, তোমার রাজ্যের অংশ আমি চাহি না, আমার খরচাটা পোষাইয়া দিলেই আমি চলিয়া যাই। অনেক বাদানুবাদের পর খরচ ঠিক হইল।

এদিকে ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে মরুরাজার রাজকোষে অর্থের বড়ই অভাব। অথচ আমের মহারাজা খরচা না লইয়া নড়িবার পাত্র নহেন। তখন মরুর পাত্র-মিত্রগণ অনেক মাথা ঘামাইয়া এক ফন্দি বাহির করিলেন। বলিলেন যে অল্প কিছু নগদ টাকা ও কতকগুলি বহু মূল্য অলঙ্কার ও জহরত পাঠাইয়া বলা হইবে যে রাজকোষে অর্থ নাই বলিয়া “বাইয়ের” অর্থাৎ রাজকন্ঠার অলঙ্কার দিয়া দাবী মিটান হইল। “বাইয়ের” অলঙ্কার শুনিলে রাজার জামাতা আমের রাজ নিশ্চয়ই লজ্জা পাইবেন এবং অপ্রস্তুত হইয়া অলঙ্কার গুলি ফেরত দিবেন। তাহা হইলে তাঁহারা অনেক পরিমাণে খরচার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। এবং আমের রাজ বেকায়দায় পড়িয়া জন্ম হইবেন।

পরদিবস যৎকিঞ্চিৎ টাকা ও দুই তিন থালা ভরিয়া অলঙ্কার ও জহরত লইয়া রাঠোর রাজকর্শ্চাৰীরা আমের রাজের নিকট উপস্থিত। আমেররাজ বলিলেন,

“অর্থ চাই, অলঙ্কার আনিয়াছ কেন?” রাজকর্মচারীরা শুনাইয়া দিল যে রাজকোষে এত দূর অর্থের অভাব ঘটিয়াছে যে “বাইয়ের” গহনাগুলি পর্য্যন্ত আনিয়া দিতে হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া আমের রাজ একটু হাসিয়া বলিলেন, “তাহাতে ক্ষতি কি? সে ত বেশ কথা। তোমাদের ‘বাই’ আমাদের আমেরের মহারাণী।” এই বলিয়া সমস্ত টাকা ও গহনা অগ্নান বদনে আত্মসাৎ করিয়া লইলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। তখন পাত্রমিত্র সকলেই বলিল, “ইহার চাইতে সোজাসুজি টাকাটা দিয়া ফেলিলেই ভাল হইত।”

মরুশূলী শত্রুশৃঙ্খল হইতে না হইতেই রাজধানীতে উৎসবের ধুম পড়িয়া গেল। যেন তাহারাই দিগ্বিজয় করিয়া আসিয়াছে। রাজবাটীতে এক বৃহৎ দরবার বসিল। মহারাজ স্বয়ং আসিয়া আনন্দে যোগ দিলেন। পাত্র মিত্র সর্দার সকলেই আসিয়া আপন আপন আসনে বসিলেন। হাসি তামাসা নৃত্য গীতে দরবার মাতিয়া উঠিল। এমন সময় রাজার বাগান হইতে মালী নানা রকম ফুলের মালা ও তোড়া লইয়া রাজদরবারে উপস্থিত। মহারাজ স্বহস্তে সেই সমস্ত ফুল সর্দারদের বিতরণ করিতে লাগিলেন। সর্দারেরা সসম্মানে উঠিয়া মহারাজের অনুগ্রহের দান লইয়া নিজ আসনে বসিতে লাগিলেন। মালা ও তোড়া কেহ বা পাগড়ীতে রাখিলেন কেহ বা গলায় পরিলেন আর কেহ বা কানে গুঁজিলেন; কেহবা অত্যন্ত উৎসাহে ফুলের আভ্রাণ লইতে লাগিলেন। দরবারে রাজার এক চারণ বসিয়া গাথা ও স্তোত্র গান করিত। তাহার পালা আসিলে সে মহারাজার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। মহারাজ তাহাকে একটি সুন্দর গোলাপ ফুল দিলেন। সে নিজ আসনে আসিয়া ফুলটি পাগড়ীতেও গুঁজিল না, কানেও রাখিল না, গন্ধও লইল না, ফুলটা আসনের উপর রাখিয়া তাহার উপরেই বসিয়া পড়িল।

এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া বড় বড় ভুঁড়িওয়ালা সব রাজপুতেরা চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গোঁফে চাড়া দিয়া চারণকে অতি কর্কশ স্বরে বলিলেন,—“তবে রে চারণ! তোর এত বড় আশ্পর্ক! মহারাজের প্রসাদ লইয়া তার অপমান করিস?”

রাজসভায় “মার মার কাট কাট” শব্দ পড়িয়া গেল। চারণের তাহাতে ক্রুদ্ধ হইল না। সে বলিল, “তোমরা আমার কথাটা শুন, তাহার পর আমায় মারিও। আমার হাতেও তলোয়ার আছে। আমিও চুড়ী পরিয়া আসি নাই।” সর্দারেরা বলিল “কি বলিবি বল?” তখন চারণ বলিতে লাগিল :—

“মহারাজদত্ত পুষ্প লইয়া মাথায় রাখিতাম, না হয় আনন্দে আত্মাণ লইতাম। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম আমাদের মাথাও নাই নাক কানও নাই। বিকানীর জয় করিতে গিয়া রাঠোরেরা যে রকম বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে বাস্তবিকই আমাদের মাথা কাটা গিয়াছে। তারপর নাক কান যাহা বাকী ছিল, আমার রাজের সঙ্গে চালাকি খাটাইতে গিয়া তাহাও আমাদের কাটা গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করি—হে রাজপুত বীরগণ! আপনারা এখন এত চক্ষু রাঙ্গাইয়া আফালন করিতেছেন কেন? এত আমোদ এবং উৎসবই বা কিসের? আমরা চারণের জাত। রাজপুতের বীরত্ব গাথা গাহিয়া বেড়ান আমাদের পৈতৃক ব্যবসায়। রাঠোরেরা আজ নাক কান কাটাইয়া যে বীরত্ব দেখাইয়াছে এখন হইতে কি সেই গাথা গাহিয়া বেড়াইব নাকি?”

চারণের কথায় সর্দারেরা কোন উত্তর না পাইয়া লজ্জায় ও ঘৃণায় মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। তারপর সভাস্থল হইতে একে একে সকলেই সরিয়া পড়িলেন। মহারাজাও দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অন্তর মহলে প্রবেশ করিলেন। ভাবিলেন, এ কলঙ্কের যতদিন প্রায়শ্চিত্ত না হয়, ততদিন আর আমোদ উৎসব সাজে না।

শ্রী :—চট্টো

নৌকা

আমি একজন ছেলের কথা জানিতাম, সে কখনও নৌকা দেখে নাই! ইংরাজি বইয়ে সে ছবি দেখিয়াছিল, এবং নৌকা যে জলে ভাসে, এটুকুও তাহার জানা ছিল; কিন্তু সত্যিকারের নৌকা কখনও সে চোখে দেখে নাই। আশা করি সন্দেশের পাঠক পাঠিকাদের এমন কেউ নাই যাহাকে, নৌকা জিনিষটা কিরূপ, তাহা বুঝাইয়া বলা দরকার। এই আমাদের দেশেই নদী নালায় খালে বিলে কত রকম বেরকম নৌকা দেখা যায়। ভারি ভারি বজরা, ছোট ছোট ডিঙ্গী, লম্বা লম্বা ছিপ—এক একটা এক এক রকম।

গাড়ী তৈরী করিবার আগেই বোধ হয় মানুষ নৌকা তৈরী করিতে শিখিয়াছিল। এখনও অনেক অসভ্য জাত দেখা যায় তাহারা গাড়ী ঘোড়ার ব্যবহার জানে না, কিন্তু নৌকা বানাইতে জানে। তার কারণ, ডাঙ্গায় মানুষ যেমন ইচ্ছা হাঁটিয়া

যাইতে পারে, গাড়ী চড়িবার দরকার সে বোধ করে না, সে কথাটা তাহার মাথায়ও আসে না। কিন্তু নৌকা না হইলে জলের মধ্যে কতটুকুই বা যাওয়া আসা চলে? সেই জন্ত মানুষের এমন একটি জিনিষের দরকার যাহা জলে ভাসে, এবং যাহার উপর চড়িয়া এদিক ওদিক চলা ফিরা করা যায়।

সব চাইতে সহজ নৌকা কলার ভেলা! তোমরা হয় ত তাহাকে নৌকা বলিতেই আপত্তি করিবে; কিন্তু তাহাতে নৌকার কাজ যে চমৎকার চলিয়া যায়, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। তবে যদি তুমি সোখিন লোক হও, আর কাপড় চোপড় কিম্বা হাত পা ভিজাইতে তোমার আপত্তি থাকে, তাহা হইলে আট দশটা ভেলার



উপর মাচা বাঁধিয়া তুমি অনায়াসে একটু আরাম করিয়া বসিতে পার। আর ভেলারই বা দরকার কি? চার কোণে চারটা কলসী বা জালা বাঁধিয়া লইলেই ত চমৎকার হয়। কিন্তু সাবধান! কোথাও গুঁতা লাগিয়া কলসী যদি ফুঁটা হইয়া যায়, তবেই কিন্তু বিপদ! একটা বড় রকমের গামলা পাইলে, তাহাতেও নৌকার কাজ বেশ ভাল রকমেই চলিতে পারে।

আমি এগুলি কিছুই কল্পনা করিয়া বলিতেছি না। যত রকমের বর্ণনা দিলাম সব রকমের নৌকারই রীতিমত ব্যবহার হইতে দেখা যায়।

পেরু প্রভৃতি অনেক দেশে

এবং অষ্ট্রেলিয়ার দ্বীপ পুঞ্জ ভেলার উপর লতাপাতা ও ডালপালা দিয়া মাচা

• গমলার নৌকা।

খাটান হয়, অথবা খড়ের গদি বানাইয়া বসিবার চৌকি বানান হয়। মেসোপটে-
মিয়ার লোকেরা এখনও গোল গোল গামলায় চড়িয়া বড় বড় নদী পার হইয়া যায়।
জলের উপর মাচা ভাসাইবার জন্ত বড় বড় জালাও সে দেশে ব্যবহার করে।

অনেক দেশেই বড় বড় গাছের গুঁড়ি লম্বালম্বি চিরিয়া তার মাঝখানটা ফাঁপা
করিয়া নৌকা বানান হয়। যাহারা অস্ত্রের ব্যবহার জানে তাহারা চেরা গাছের
পেট কুরিয়া খোল বানায়। যাহাদের সে বিদ্যাও নাই, তাহারা কাঠের মাঝখানটা
পোড়াইয়া পোড়াইয়া গর্ত করিয়া ফেলে। কিন্তু বোধ হয়, বেশীর ভাগ নৌকাই
আল্গা তক্তা জোড়া দিয়া বানাইতে হয়।



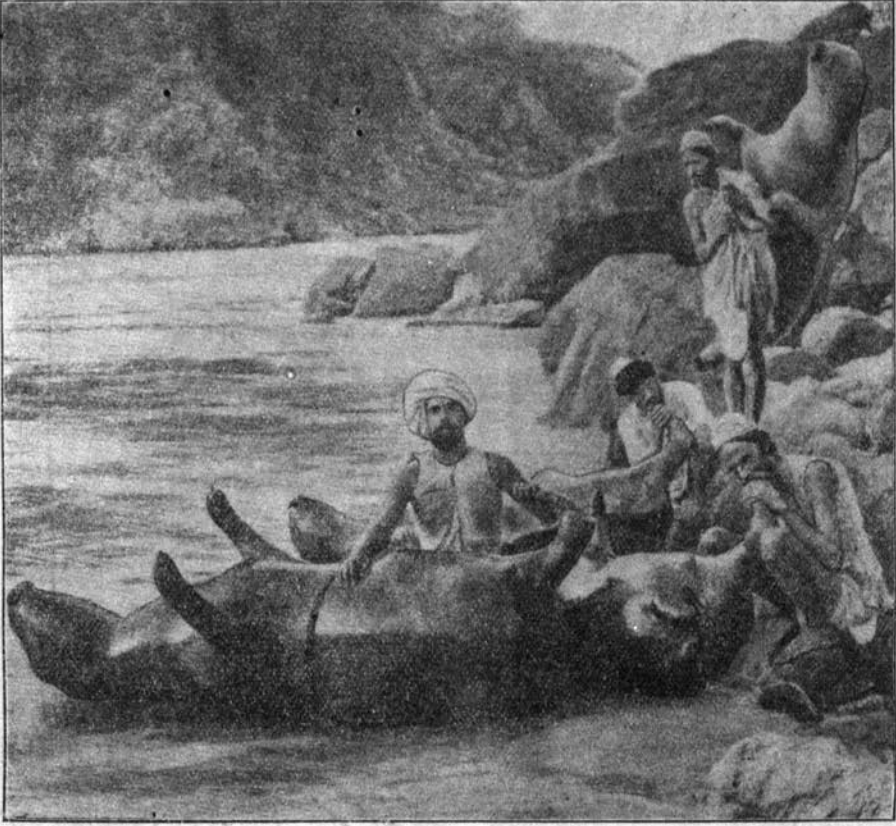
পুরীর সমুদ্রে
জেলেরা যে কাটা-
মারন ব্যবহার করে,
কোন সভ্য দেশের
কোন নাবিক তাহাতে
চড়িয়া সমুদ্রে নামিতে
সাহস পাইবে কিনা
সন্দেহ। কতগুলো
আল্লা কাঠ নারকেলের
দড়ি দিয়া বাঁধিয়া
তাহারা নৌকা বানায়,
আর সেই নৌকায়
চড়িয়া এক মাইল দেড়
মাইল পর্যন্ত সমুদ্রে
অনায়াসে চলিয়া যায়।

সমুদ্রে ব্যবহারের
জন্ত অনেক জাহাজের
সঙ্গে বড় বড় নৌকা
লওয়া হয়। হঠাৎ

জাহাজের কোন বিপদ হইলে লোকেরা জাহাজ ছাড়িয়া নৌকায় করিয়া সমুদ্রে

নামে। এই সমস্ত নৌকাকে life boat অর্থাৎ “প্রাণ-বাঁচান নৌকা”, বলে। জাহাজ বেশী রকম জখম হইলে অনেক সময়ে নৌকা নামান অসম্ভব হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বার্থ সাহেব এক রকম হাল্কা নৌকা বানাইয়াছেন, তাহাকে মুড়িয়া রাখা যায়, এবং জলে ফেলিয়া দিলে আপনি ভাসিতে থাকে। নাবিকেরা তখন তাহার আশে পাশে সাঁতরাইয়া জলের মধ্যেই নৌকা খাটাইয়া ফেলে।

এইবার আমাদেরই দেশের একটা অত্যন্ত অদ্ভুত ‘নৌকা’র কথা বলিয়া শেষ



করি। ভিস্তিওয়ালা আস্ত জন্তুর চামড়া দিয়া যে ‘মশক’ বানায়—সেই যে ঘাহার

মধ্যে সে জল পুরিয়া রাখে,—তাহা দেখিয়াছ ত ? ঐ রকম প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মশকে বাতাস ভরিয়া ফুটবলের মত ফুলাইয়া পঞ্জাব অঞ্চলের লোকে অনেক সময় নদী পার হইয়া থাকে । নৌকাটার চেহারা কি রকম বীভৎস হয় তাহা ছবির দিকে একবার চাহিয়া দেখ ।

ধাঁধা

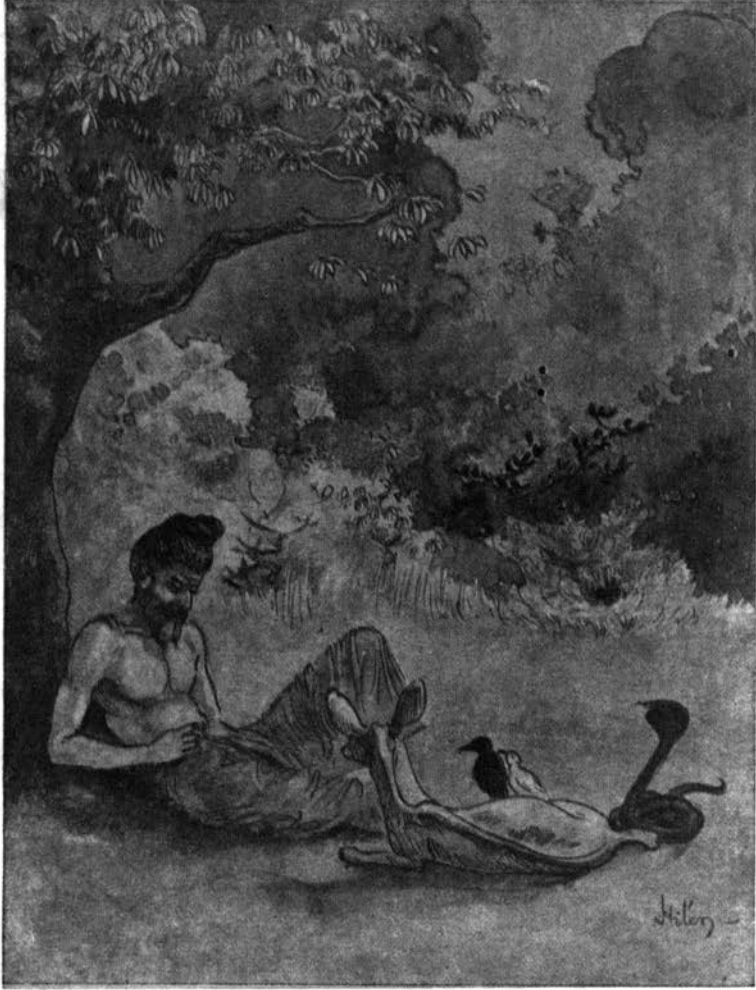
- ১। জলের ভিতরে জন্ম জলে বাস করে,
মানুষে কাটিয়া তারে রাখে ঘরে ঘরে ।
জীবন থাকিতে তার রব নাহি শুনি
মরিয়া তখন করে আনন্দের ধ্বনি ।

শ্রীহীৰেন্দ্ৰকুমার বসু ।

- ২। কাজ কি সহজে করি ? কাজ পেতে চাও,
তুলিয়া আছাড় মার তবে যদি পাপ ।
একটি ধমকে মোর কাজ হবে সারা—
ভাবিয়া কহত ভাই সে কেমন ধারা ?

একলব্য

নিষাদ রাজকুমার একলব্য দ্রোণাচার্য্যের কাছে অস্ত্র শিক্ষা করিতে গেল । দ্রোণ তাহাকে নীচ জাত বলিয়া তাড়াইয়া দিলেন । একলব্য তবু দ্রোণকেই গুরু মানিয়া মাটির দ্রোণমূর্তি বানাইল ; এবং সেই মূর্তির সম্মুখে অস্ত্র অভ্যাস করিয়া অসাধারণ যোদ্ধা হইয়া উঠিল ।



যোগী বলিলেন “ কেন মিথ্যা তর্ক করিতেছ ?”

(৩৬ পৃষ্ঠা)

ঐযুক্ত হিতেন্দ্রমোহন বসু কর্তৃক অঙ্কিত



সপ্তম বর্ষ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬

২য় সংখ্যা

লক্ষ্মী

হাত-পা-ভাঙা নোংরা পুতুল মুখটি ধুলোয় মাখা,
গাল দুটি তার খাবলা-মতন চোখ দুটি তার ফাঁকা,—
কোথায় বা তার চুল বিছুনি কোথায় বা তার মাথা,
আধখানি তার ছিন্ন জামা, গায় দিয়েছেন কাঁথা।

পুতুলের মা ব্যস্ত কেবল তার সেবাতেই রত
খাওয়ান শোয়ান আদর করেন ঘুম ডেকে দেন কত।

বলতে গেলাম “বিশ্রী পুতুল” অমনি বলেন রেগে—
“লক্ষ্মী পুতুল, জর হয়েছে তাইত এখন জেগে”।

দ্বিগুণ জোরে চাপড়ে দিল ‘আয় আয় আয়’ ব’লে—
নোংরা পুতুল লক্ষ্মী হ’য়ে পড়ল ঘুমে ঢুলে।

সিন্ধু-পরী

(তুরস্ক দেশের উপকথা)

মামুদ ছিল জেলে। সে মাছ বিক্রী করে যা পায় তাই দিয়ে কোন মতে তার সংসার চলে। সংসারে তারা তিনটা প্রাণী—সে নিজে, তার স্ত্রী আর ছোট্ট একটি ছেলে। হঠাৎ একদিন মামুদের ভারি অসুখ হল। সে বুঝতে পারল যে সে আর বাঁচবে না। তার স্ত্রীকে বলল—“ওগো! আমি মরে গেলে আমার জালটা লুকিয়ে রেখো। খোকা বড় হলে তাকে জানতে দিও না যে আমি মাছ ধরে খেতাম।”

মামুদ মরে গেল। ক্রমে ছেলে যখন বড় হলো তখন সে ভাবল—একটা কিছু করে ত খেতে হবে? কিন্তু কোন কাজেই সে সুবিধা করে উঠতে পারল না। দেখতে দেখতে কিছু দিন পরে তার মাও মারা গেল। বেচারি সংসারে পড়ে গেল একা। টাকা নাই, পয়সা নাই; কি করে যে খাবে, তারও কিছু ঠিক নাই। বাড়ীতে এমন কিছু জিনিষও বাকী নাই যা বেচলে দু দিন চলে।

ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে খুঁজে খুঁজে হঠাৎ তার বাবার জালটা দেখতে পেয়ে ভাবল—“তাইত! এ যে মাছ ধরার জাল। তবে ত দেখছি আমার বাবা জেলে ছিলেন!” এই ভেবে তখনই জালটা নিয়ে সে সমুদ্রের ধারে গেল। প্রথম বার জাল ফেলতেই, এই বড় ছই মাছ! মাছ দেখে তার আত্মাদের সীমা নাই! একটা মাছ বিক্রী করে তেল, কয়লা, নুন প্রভৃতি দরকারি জিনিষ পত্র কিনে বাকি মাছটা রেঁধে খেল। তখন থেকে এই মাছ ধরাই হল তার ব্যবসা।

একদিন সে জাল দিয়ে এমন সুন্দর একটা মাছ ধরল যে কিছুতেই সেটাকে বিক্রী করতে ইচ্ছা হল না। বাড়ী গিয়ে করল কি, একটা কুয়ো খুঁড়ে মাছটাকে জলে রেখে দিল। সেদিন আর তার খাওয়া দাওয়া হল না।

পরদিন ভোর হতে না হতেই সে জাল নিয়ে সমুদ্রের ধারে উপস্থিত! সারাদিন মাছ ধরে যখন বিকাল বেলা বাড়ী ফিরে এল, তখন দেখল কি, বাড়ী ঘর সমস্ত ফিট ফাট, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—জিনিষ পত্র সব সুন্দর করে গুছান রয়েছে! ব্যাপার দেখে সে অবাক হ'য়ে রইল! অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করল যে—হয়ত প্রতিবেশীরাই দয়া করে তার বাড়ীটা গুছিয়ে রেখেছে।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে সে প্রথম গেল তার পোষা মাছটিকে দেখতে। খানিকক্ষণ মাছটাকে দেখে জাল নিয়ে আবার সমুদ্রে মাছ ধরতে গেল। সে দিনও বাড়ী ফিরে দেখল সব জিনিস পত্র অতি পরিপাটি করে কে গুছিয়ে রেখেছে।

তার বাড়ীর কাছেই একটা সরাইখানা ছিল, সন্ধ্যার পর সেখানে গ্রামের সকলেই এসে জুটত। সেদিন মামুদ সেখানে বসে এই আশ্চর্য্য ব্যাপারটার কথা বসে বসে ভাবছে এমন সময়ে তার এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করল—“কি ভাই! এমন গম্ভীর হয়ে কি ভাবছ?” সে বলল—“ভাই! যা ভাবছি তা শুনলে তোমারও ভাবনা হবে। আমার রাড়ীতে একা আমি আর আমার একটা পোষা মাছ। রোজ মাছ ধরতে যাবার সময় বাড়ীর দরজায় তাল দিচ্ছে যাই, অথচ ফিরে এসে দেখি—কে যেন আমার বাড়ী গুছিয়ে গাছিয়ে সব ঠিক করে রেখে দেয়! ব্যাপারটা কি বল দেখি?” একথা শুনে বন্ধু বলল—“তাই ত ভাই; ভারি আশ্চর্য্য! আচ্ছা, এক কাজ কর না? একদিন লুকিয়ে থেকে দেখ না কেন কে এ কাজ করে?”

পরদিন বন্ধুর পরামর্শ মত সে করল কি, জাল নিয়ে বেরিয়ে খানিক দূর গিয়েই চুপি চুপি ফিরে এসে বাড়ীর ভিতরে লুকিয়ে রইল। খানিক পরেই দেখে, কুয়ে থেকে মাছটা লাফিয়ে উঠেই গা ঝাড়া দিয়েছে। আর অমনি তার ভিতর থেকে আশ্চর্য্য সুন্দরী এক মেয়ে বেরিয়ে এল! মামুদ তখনি করল কি, থপ্ করে হঠাৎ মাছের খোলসটা নিয়েই একেবারে আগুনের মধ্যে ফেলে দিল! তাতে মেয়েটি বলল—“এ কি করলে? হায় হায় কেন আমার খোলস পুড়িয়ে দিলে? আমি সিন্ধু পরী ছিলাম, আমায় মানুষ ক’রে দিলে—এখন আমি কি করি, কোথায় যাই?” মামুদ বলল, “কোথায় আর যাবে? তুমি আমাকে বিয়ে কর—ভুজনে মিলে সুখে ঘর-সংসার করি।” মেয়ে বলল, “বেশ কথা! তাই’লে তাই হোক।” এমন সুন্দরী মেয়ে কেউ কখন দেখে নাই! তাকে যে দেখে সেই বলে—“আশ্চর্য্য সুন্দরী! যেন কোন বাদসার রাণী কি সুলতানের মেয়ে!”

এই কথা বাদসার কাণে গেল। তিনি ভাবলেন, স্বয়ং তিনি বাদসা থাকতে এমন মেয়ের কিনা জেলের সঙ্গে বিয়ে হয়? তিনি মামুদকে ডাকিয়ে বললেন—“চল্লিশ দিনের মধ্যে যদি ঐ সমুদ্রের মাঝখানে আমার জন্তু হীরে বাঁধান সোণার বাড়ী তৈরি করে দিতে পার, তবেই কন্যাকে পাবে। আর তা যদি না পার তবে পালাও এখান থেকে।”

বাড়ী গিয়ে জেলের ছেলে মনের ছুঁখে কাঁদতে লাগল। তার কান্না দেখে কন্যা বলল “কাঁদ কেন?” মামুদ তাকে সব কথা বলল। শুনে সে বলল—“ভাবনা কি! বাদসা যা বলেছেন তাই হবে। এখন এক কাজ কর—যেখানে আমার জাল দিয়ে ধরেছিলে, সেখানে গিয়ে জেলের মধ্যে একটা পাথর ছুড়ে মার। তখন একটা বিকট দৈত্য জল থেকে উঠেই বলবে—‘কি হুকুম?’ তুমি বলো—‘সিদ্ধু পরী তাকিয়া চেয়েছেন।’ এই কথা বললেই দৈত্য একটা তাকিয়া দিবে। সেটা নিয়ে বাদসা যেখানে বাড়ী বানাতে বলেছেন সেইখানে জলে ফেলে দিয়ে, বাড়ী চলে এস।”

জেলের ছেলে তার কথামত সমুদ্রে গিয়ে, পাথর ফেলে, দৈত্যের কাছে তাকিয়া নিয়ে, জলের মধ্যে ফেলে, বাড়ী ফিরে এল। পরদিন সকালে সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখে—যেখানে তাকিয়া ফেলেছিল, সেখানে আশ্চর্য্য এক পুরী হয়ে রয়েছে! চক্চকে সোণা আর স্বর্নকে হীরে! বাদসা যেমন চেয়েছিলেন তার চেয়েও কত যে সুন্দর তা আর বলা যায় না! মহা আনন্দে ছুটে গিয়ে তখনই সে বাদসাকে এই খবর দিল।

বাদসা দেখলেন সত্যি সত্যি সমুদ্রের মাঝখানে অতি আশ্চর্য্য পুরী হয়েছে! তখন ছুট বাদসা আবার বললেন—“পুরীতে যাবার জন্য ফটিকের পোল কোথায়? সেটা ত না করলে চলবে না।”

হুকুম শুনে জেলে আবার বাড়ীতে গিয়ে কাঁদতে বসে গেল। কন্যা সে সব কথা শুনে বলল—“কেঁদ না। আবার সমুদ্রে গিয়ে তেমনি করে সেই দৈত্যকে ডেকে বল—একটা পাশ-বালিস চাই। তারপর বালিসটা ঐ পুরীর সামনে জলের মধ্যে ফেলে দাও।”

কন্যার কথামত সব কাজ করবামাত্র সে দেখল—পুরীর সামনে ফটিকের পোল তৈরি হয়ে গিয়েছে! তখনই সে বাদসার কাছে গিয়ে এই সংবাদ দিল। বাদসাও দেখলেন বাড়ীর সামনে বাস্তবিকই ফটিকের পোল!

এবারে বাদসা হুকুম করলেন—“বেশ বশ! এখনই একটা ভোজের আয়োজন কর ত। দেশের সমস্ত লোক খেয়েও যেন তা শেষ করতে না পারে।” জেলে বাড়ী গিয়ে কন্যাকে সব কথা বলল। কন্যা বলল—“আবার গিয়ে দৈত্যকে ডেকে বল—আমাকে একটা ষাঁতা দাও। কিন্তু দেখ, ষাঁতা নিয়ে আসবার সময় পথে সেটাকে ঘুরিয়ে দিও না।” এত করে সাবধান করা সত্ত্বেও পথে সে হঠাৎ ষাঁতাটাকে

ঘুরিয়ে ফেলেছে, আর অমনি সাত আটটা চমৎকার খাবারভরা থালা ঝন্ ঝন্ করে মাটিতে পড়ে গিয়েছে। সেগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে সে বাড়ীতে এল।

এদিকে বাদসা দেশজুড়ে লোককে বলে পাঠিয়েছেন—অমুক দিন জেলের বাড়ী সকলের নিমন্ত্রণ, কেউ যেন আসতে ভুলে যায় না। নিমন্ত্রণের দিন জেলের বাড়ীতে লোক আর ধরে না—স্বয়ং বাদসাও এসেছেন। তারপর সেই যাছুকরা থালার নানা রকম চমৎকার চমৎকার খাওয়া দিয়ে মামুদ সকলকে যা খাওয়াল। তেমন খাবার বাদসাও কখন খায়নি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এত লোকের খাওয়ার পরেও বাদসা দেখলেন, থালায় থালায় খাবার একেবারে ভর্তি।

এতেও বাদসা ক্ষান্ত হলেন না। আবার জেলেকে হুকুম করলেন—“একটা ঘোড়ার ডিম এঁনে, তা থেকে ঘোড়া বার করে দেখাও।” কন্ঠার উপদেশে জেলে সেই দৈত্যের কাছে থেকে চেয়ে একটা ডিম নিয়ে এল। তারপর সেই ডিম নিয়ে বাদসার কাছে গেল। বাদসা সভায় বসে ছিলেন। সকলের সাক্ষাতে জেলে একটা চোকির উপর দাঁড়িয়ে সেই ডিমটা মাটিতে ছুড়ে ফেলেছে, অমনি তার ভিতর থেকে একটা ঘোড়া বেরিয়ে বাদসাকে এক লাথি! সকলে তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁকে উদ্ধার না করলে সিংহাসন শুদ্ধ উল্টে তিনি গেছিলেন আর কি! ঘোড়াটা তখন ছুটে গিয়ে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাদসা দেখলেন যে, কিছুতেই আর জেলেকে ঠকাতে পারছেন না। তখন একেবারে নিরাশ হয়ে বললেন,—“গল্পে শুনেছি, ছোট্ট একটা খোকার কথা, তার একদিন মাত্র বয়স; কিন্তু সে তড়বড় করে কথা বলে, চটপট করে হাঁটতে পারে। সেই খোকাকে এনে দেখাও।” এবার মেয়ে জেলেকে বলল—“দৈত্যকে গিয়ে বল যে, সিন্ধুপরী তার ছোট্ট ভাইপোটিকে দেখতে চেয়েছেন।”

জেলে গিয়ে দৈত্যকে ডেকে একথা বললে পর দৈত্য বলল—“তাইত, খোকা যে সবেমাত্র আজই জন্মেছে, তাকে কি তার মা ছেড়ে দিবে? আচ্ছা, তুমি একটু দাঁড়াও, একবার চেষ্টা করে দেখি।” জেলে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে রইল। খানিক পরেই দৈত্য সেই খোকাটিকে নিয়ে এসে হাজির। জেলেকে দেখেই খোকা তার কাছে ছুটে গিয়ে বলল—“আমাকে পিসিমার কাছে নিয়ে যাবে—না?” জেলে সেই খোকাকে কোলে নিয়ে বাদসার সভায় গিয়ে উপস্থিত।



সভায় যাওয়ামাত্র একদিনের খোকা দৌড়ে বাদসার কোলে উঠেই তাঁর গালে প্রচণ্ড এক চড় মেরে বলল—“চল্লিশ দিনে হীরেবাঁধান সোণার বাড়ী তৈরি হয়? ফটিকের পোল কি চাইলেই হয়? গরীব জেলে, সে কি দেশের সকলকে নিমন্ত্রণ খাওয়াতে পারে? ডিম থেকে ঘোড়া বেরোয়, এও কি আর সম্ভব?” এক একটি প্রশ্ন, আর সঙ্গে সঙ্গে এক একটি চড়! বাদসা ত ভয়ে একেবারে কাঠ! অবশেষে একেবারে অস্থির হয়ে জেলেকে বললেন—“দোহাই বাবা! মেয়েকে তুমিই বিয়ে কর, আর শীগগির আমাকে এই সর্ব্বনেশে রাক্ষুসে খোকার হাত থেকে বাঁচাও।”

জেলে খোকাকে নিয়ে তখনই বাড়ী ফিরে এল। তারপর পরীকে সে বিয়ে করল, আর বাদসামশাই হিংসেয় কেবল ফুলতে লাগলেন।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

কাঠি-ফড়িং

ভাই সন্দেশ,

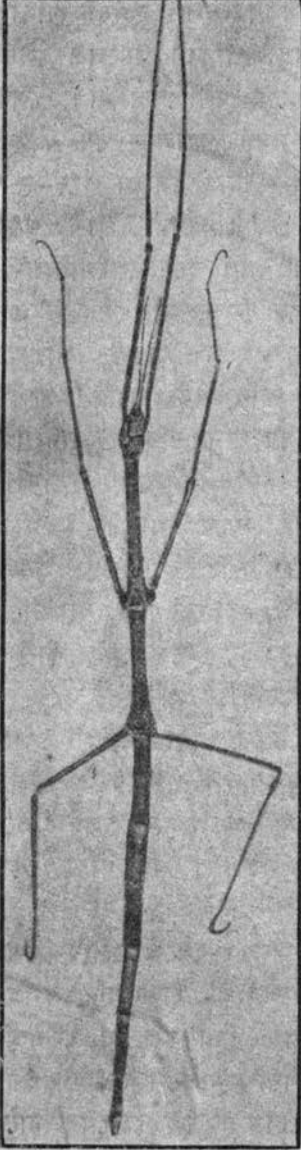
একদিন সন্ধ্যা বেলায় এক বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। যখন বাড়ী ফিরি, তখন রাত্রি আটটা। আমার সঙ্গে আমার চাকর লণ্ঠন ধরে আসছিল। বাড়ীর ঠিক সামনেই একটা ছোট গোল ফুলবাগান। সেটা কাঁটা গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা। যখন সেই বাগান ছাড়িয়ে বাড়ীর কাছাকাছি এসেছি, তখন হঠাৎ দেখতে পেলাম যে আমার পায়ের কাছে ঘাসের উপর এক টুকরো শুকনো কপ্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই দেখে দাঁড়ালাম। একটা শুকনো কাঠি নড়ে বেড়াচ্ছে,—এটা আমার কাছে ভারি আশ্চর্য্য আর অদ্ভুত বোধ হল। আমার ছড়ি দিয়ে সেই কাঠিটাকে একটু নড়ে দিলাম। তারপর দেখি সেটা আর নড়ে চড়ে

না, সেইখানেই অনেকক্ষণ এক ভাবে পড়ে রইল। দাঁড়িয়ে থেকে ভাবলাম যে হয়ত ওটা বাতাসে নড়ছিল, না হয় ওটাকে কোন পোকায় টানছিল। তখনই আবার ভাবলাম—বাতাস ত মোটেই নাই, নড়বে কি করে? আর পোকায় টানলেও সেটা বেশ বড় রকমের পোকা হবে, তা কোন পোকাও ত সেখানে দেখা গেল না। সেই কঞ্চিটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এই সব ভাবছি, এমন সময় দেখলাম যে কঞ্চির আগার দিকে, কাঁটার কাঠির মত সরু লম্বা ছোটো ডাল,—ছিল সোজা হয়ে—সে ছোটো মুড়ে হ'ল “দ” এর মত ভাঙ্গা। তার পরেই দেখি যে, কঞ্চিটার দু পাশ থেকে ঝারও সব সরু সরু ডাল, যা কঞ্চির গায়ের সঙ্গে সোজা লম্বা হয়ে লেগেছিল,—সে গুলোও আস্তে আস্তে ছুঁড়ে “দ” এর মত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, আর সেই ‘দ’ এর মত সরু কাঠিগুলো এগুতে লাগল, আর সেই সঙ্গে সমস্ত কঞ্চিটাও এগুতে লাগল। তখন বেশ বুঝতে পারলাম যে, এই জিনিষটা একটা চলন্ত আর জীয়াস্ত কাঠি! পকেট থেকে রুমাল বের করে, সেই জীয়াস্ত কাঠির সামনে ঘাসের উপর বিছিয়ে দিলাম, আর ছড়ির ডগা দিয়ে সেটাকে রুমালের উপর ঠেলে ফেলে দিলাম। তারপর রুমালের চার খোঁট একত্র করে সেটাকে থলেতে পুরে বাড়ী নিয়ে এলাম।

দিনের আলোতে তাকে ভাল করে দেখব বলে সে রাত্রি তাকে একটা টিনের বাজের ভিতর বন্ধ করে রেখে দিলাম। পর দিন সকাল বেলায় সেই বাজটাকে বারান্দায় টেবিলের উপর রেখে খুললাম। দেখি, বাজের গা বেয়ে সেই কাঠিটা উঠছে। তাকে টেবিলের উপর ছেড়ে দিলাম। খুব ধীরে ধীরে গুটি গুটি করে পা বাড়িয়ে চলতে লাগল। এর গায়ে পেন্সিলের ডগা দিয়ে সামান্য একটু খোঁচা মারলাম, আর তখনি এটা তার সামনের পা যোড়া সম্মুখ দিকে সোজা লম্বা করে বাড়িয়ে দিলে, অন্য পাগুলোও গায়ের পাশে টেনে এনে সোজা লম্বা করে দিয়ে, সত্যিকার কাঠির মত আড়ষ্ট বা “কাঠ” হয়ে পড়ে রইল। আর নড়ে চড়ে না—মৃতবৎ অথবা কাঠিবৎ হয়ে গেল।

আমি মাপ্কাঠি দিয়ে একে মাপলাম। মাথার আগা থেকে পেটের শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ দেহ ও মুণ্ড সর্গয়া সাত ইঞ্চি হল। পিছনের পা যোড়া যদিও পিছন দিকে লম্বিয়ে দিয়েছে তবুও পেটের সীমা ছাড়িয়ে যায় নাই। সামনের পা, যা সম্মুখ দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে, তার আগা থেকে গায়ের শেষ পর্যন্ত মাপলে বার ইঞ্চি হয়। মাথাটা সিকি ইঞ্চি মাত্র, তার মধ্যে ছোট ছোট ছুটি চোখ। দুই চোখের মাঝে

মাথার উপর—গোড়া-মোটা আগা-সরু এমন ছুটি ছোট শিং আছে। মাথার সামনের



দিকে দুটো শুয়ে আছে, তাতে অনেকগুলো গাঁইট। সে দুটো লম্বায় দেড় ইঞ্চি মাত্র।

সব পতঙ্গের বক্ষস্থল বা বুক যেমন তিন ভাগে বিভক্ত থাকে ও প্রত্যেক ভাগের তলার দিক থেকে এক যোড়া পা বেরোয়, এই পোকের বুকও তেমনি।

এরা ফড়িং বর্গের জীব—আমাদের গঙ্গা-ফড়িংএর জাতি ভাই। গঙ্গা-ফড়িংদের অগ্র-বক্ষ বা বকের প্রথম ভাগটা, যার সঙ্গে মাথাটা যোড়া থাকে, সেটা খুব লম্বা হয় এবং উপর দুই ভাগের চেয়ে বড় হয়। কাঠি-ফড়িংদের বুক প্রথম ভাগটা খুব ছোট হয়। এটার অগ্র-বক্ষ সিকি ইঞ্চি মাত্র। কাঠি ফড়িংদের মধ্য-বক্ষ অর্থাৎ বকের মাঝখানের ভাগটা সর্বাপেক্ষা লম্বা হয়। এটার মধ্যবক্ষ দেড় ইঞ্চি লম্বা আর অন্তর্বক্ষ বা শেষ ভাগটা সোয়া ইঞ্চি লম্বা। গঙ্গা ফড়িং সামনের পায়ে চলতে পারে না, তা দিয়ে পোকা ধরতে পারে। কাঠি ফড়িংএর সব কটি পা চলবার উপযোগী করে গড়া।

এর উদর বা পেটটা চার ইঞ্চি লম্বা। তাতে নয়টা গাঁট বা ভাগ আছে। শেষের ভাগ তিনটা খুব ছোট ছোট। আর গুলো বেশ বড় বড়। পেটের শেষ পর্যন্ত প্রায় সমান চওড়া সিকি ইঞ্চি মোটা বা পুরু।

বুকে আর পেটে এই রকম গাঁট আর পাব বা পর্ব থাকতে দেখতে ঠিক বাঁশের কঞ্চির মত দেখায়। গাঁট থেকে কঞ্চির সরু ডালের মত পা বেরিয়েছে, আর শুকনো কঞ্চির মত ক্যাক্সা মেটে রং—তাতে কঞ্চির সঙ্গে সাদৃশ্যটা খুব বেশী।

এর ঠ্যাংগুলো খুব বড় আর সরু। ঠ্যাঙে উরু, জজ্বা, আর চরণ, স্পষ্ট তিন ভাগ আছে। সামনের পায়ের উরুতে গোড়ার দিকে ভিতর-পানে একটা খাঁজ আছে, সে যায়গাটা অর্ধ চন্দ্রাকারে কাটা। পোকা যখন পা ছুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে দেয় তখন দুই পায়ের খাঁজের ভিতর মাথাটা ঢুকে খাপে খাপে বসে যায়। তাতে গা ও পা যেন এক দেখায়।

আমার বাড়ীর উঠানে একটা নেবু গাছ আছে। আমি এই পোকাটা নিয়ে সেই গাছের একটা সরু ডালে বসিয়ে দিলাম। একটু পরে পোকাটা আস্তে আস্তে সেই ডালের উপর চলতে লাগল। এই সময়ে আমার চাকর আমায় কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এল আমি তার দিকে ফিরে উত্তর দিলাম। একটু পরেই ফিরে পোকাটাকে আর দেখতে পেলাম না। অনেকক্ষণ খুঁজলাম। বেশী দূর কখনই যেতে পারে নাই, লাফাতেও পারে না। প্রায় মিনিট দশ খোঁজার পর সেটাকে দেখতে পেলাম। এখানেই আধ হাত দূরে কাছের একটা ডালে ছিল, সেই ডালের রঙ্গে আর তার গায়ের রঙ্গে এমনি মিশে গিয়েছিল, যে ওটা নিশ্চল হয়ে বসে থাকলে মোটেই “ঠাহর” হয় না।

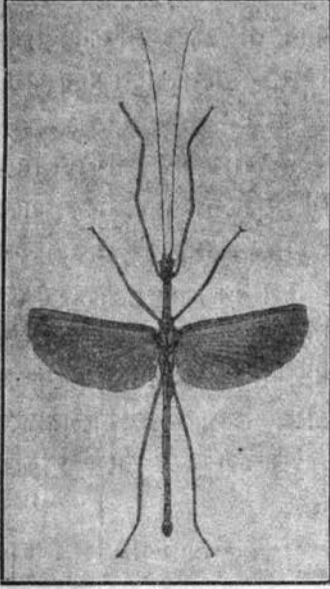
এই পোকাটাকে কলকাতায় আনিয়া তার ফটো তুলিয়েছিলাম। সেটাও এখানে ছাপিয়ে দিলাম।

পৃথিবীতে অনেক জাতের কাঠি ফড়িং আছে। এরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই বাস করে। এক ভারতবর্ষেই পঞ্চাশ ষাট জাতের কাঠি ফড়িঙের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কোন কোন জাত দুই তিন ইঞ্চির বেশী হয় না, কোন কোন জাত চার পাঁচ ইঞ্চ হয় আবার কোন কোন জাত সাত আট ইঞ্চ হয়। আসাম সুমাত্রা ও অষ্ট্রেলিয়াতে দশ ইঞ্চ বড় ফড়িং দেখা যায়।

কোন কোন জাতের গা বেশ মন্থণ হয় আবার কোন কোন জাতের গা-ময় কাঁটা ভরা থাকে। কোন কোন জাতের স্ত্রীপুরুষ সকলেরই পাখা হয়। কোন কোন জাতের শুধু পুরুষদেরই পাখা জন্মে স্ত্রীদের পাখা হয় না। কোন কোন জাতের স্ত্রীপুরুষ কারু পাখা জন্মায় না। আমি যে জাতের কাঠি ফড়িং ধরেছি এদের স্ত্রী-পুরুষ কারু পাখা হয় না।

অধিকাংশ জাতেরই গায়ের রং মেটে হয়, কোন কোন জাতের গায়ের রং সবুজ হয়। যে সব জাতের পাখা জন্মে তাদের মধ্যে কোন কোন জাতের পাখার রং খুব

উজ্জ্বল আর রঙ্গীন হয়। কাঠি ফড়িং যখন হঠাৎ পাখা মেলে উড়ে যায় তখন মস্ত একটা রঙ্গীন জিনিস চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়, তারপর যেই পাখা গুটিয়ে ঝোপে ঝাড়ে বসে তখন চোখের সামনে থাকলেও আর তাকে দেখা যায় না, সে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়। যেন ভেক্সিবাজি।

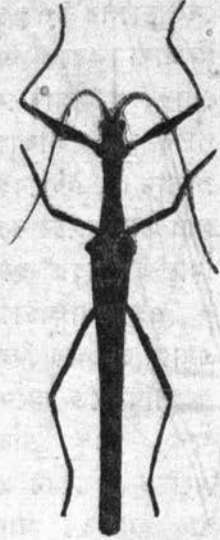


পাখা খোলা ফড়িং

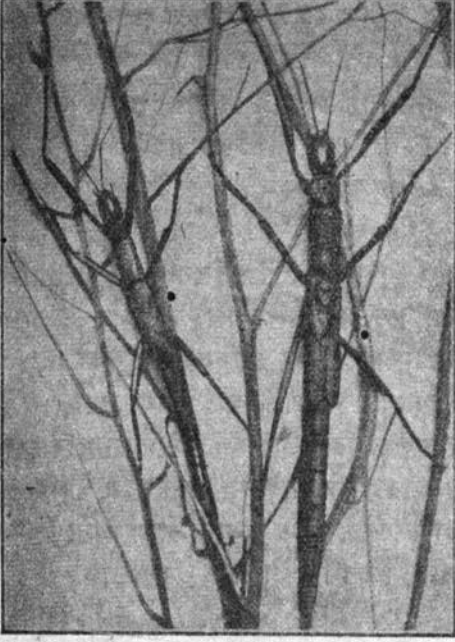
ফড়িং যখন পাখা গুটিয়ে বা ভাঁজ করে পিঠের উপর ফেলে, তখন পাখার উপরের অনুজ্জ্বল রংটাই চোখে পড়ে আর রঙ্গীন অংশটা তার তলায় ভাঁজ হয়ে ঢাকা পড়ে যায়।

কাঠি ফড়িংদের পুরুষরা ছোট ও সরু হয়, স্ত্রীরা হয় পাখা-মোড়া ফড়িং বড় ও মোটা। সব জাতের কাঠি ফড়িংের স্বভাব প্রকৃতি প্রায় একই রকম। ভয় পেলে ঠ্যাংগুলি গায়ের সঙ্গে লাগিয়ে সোজা লম্বা করে দিয়ে শক্ত ও নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে। মরার ভাণ করে। তখন সত্যি শুকনো কাঠি, কি ঘাসের ডাঁটা অথবা জীয়ন্ত পোকা তা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। এই রকম করে এরা পাখি ও অগ্ন্যাগ্নি হিংস্র কীট পতঙ্গের হাত হতে রক্ষা পায়।

এরা বনে জঙ্গলে গাছে ও ঝোপ ঝাড়ে থাকে আর গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে। গঙ্গা ফড়িংের মত পোকা মাকড় খায় না। গাছের পাতা খেলেও



মানুষের কোন ক্ষতি করে না, কারণ চাষ ক্ষেতে বড় একটা থাকে না। এরা রাত্রিচর। দিনের বেলায় ডাল পাশার ভিতর চুপ করে বসে থাকে, রাত্রি হলেই খাবারের অন্বেষণে ঘুরে বেড়ায়।



এরা যখন ডিম পাড়ে তখন ডিম গড়িয়ে মাটিতে পড়ে। ডিমগুলি ছোট মটরের মত, তার উপরের খোলাটা শক্ত ও তাতে খাঁজ কাটা থাকে। সেই ডিমের উপর একটা ঢাকনি বা ছিপি আঁটা থাকে। সেই ঢাকনি খুলে বাচ্চা বেরোয়। ডিম থেকে বাচ্চা যখন বেরোয় তখন দেখতে বড়দেরই মত হয় কেবল আকার খুব ক্ষুদ্র থাকে। তারপর ক্রমে শরীরটা বড় হয়। তখন গায়ের চামড়াটায় টান পড়ে, শরীর আর তার ভিতর আঁটে না। গায়ের খোলসটা পিঠের উপর দিকে ফেটে যায়, আর সেই পুরাণ খোসার ভিতর থেকে ফড়িং

তার সমস্ত শরীরটাকে বের করে নেয়। এই সময়ে ভিতরের নূতন চামড়া নরম থাকে, তারপর ক্রমে শক্ত হয়। আবার খেয়ে খেয়ে ফড়িং যখন বড় হয় আর পুরাণ চামড়ায় টান পড়ে তখন আবার খোলস বদলায়। এইরূপে পাঁচ সাত বার খোলস বদলাবার পর শরীরটা পুরোমাত্রায় বড় হয়।

এদের পায়ের গাঁট বড় সহজে ভেঙ্গে যায়। কিন্তু তাতে বড় ক্ষতি হয় না, আন্তে আন্তে আবার সেটা গজিয়ে ওঠে। দু'চারবার খোলস বদলাবার পর ঠিক যেমন ছিল তেমন হয়। তাতে মাস দু'এক সময় লাগে।

তোমার মেজদাদামশাই

শ্রীধ্বজেন্দ্রনাথ বসু।

এত দুঃখ কেন ?

(রুশ-লেখক টলষ্টয়ের গল্প)

এক বনে এক যোগী থাকিতেন। তাঁহার স্বভাব এতই মিষ্ট ছিল যে বনের পশু পাখীরাও তাঁহাকে দেখিয়া ভয় পাইত না। তিনি পশু পাখীর ভাষা বুঝিতে পারিতেন ও তাদের সঙ্গে আলাপ করিতেন। একদিন যোগী গাছের তলায় শুইয়া আছেন এমন সময় কাক, ঘুঘু, সাপ, ও হরিণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। একথায় সেকথায় তাহাদের ভিতর কথা উঠিল “জগতে এত দুঃখ কেন ?”

কাক বলিল—

“এই পাপ ক্ষুধাতেই সব মাটি করিয়াছে। আমাদের পেট যখন ভরা থাকে তখন আমরা গাছের ডালে দল বাঁধিয়া বসিয়া কত রকম সদালাপই না করি। আর এই পৃথিবী কি মধুরই না মনে হয়—যেন স্বর্গরাজ্য। কিন্তু যেদিন পেটে কিছু থাকে না সেই দিনই মুন্সিল—সব যেন অন্ধকার হইয়া যায়; প্রাণ আই চাই করে,—কি খাই, কি খাই। তখন কেবল খাবারের খোঁজেই ফিরিতে থাকি। যদি বা খাবারের খোঁজ পাইলাম তাহা হইলে আরও মুন্সিল। কারণ যদি খাইবার চেষ্টা করি, দেখিবে, ইট পাথর আরও কত কি আমাদের দিকে ছাড়িতেছে, নয়ত কুকুরে তাড়া করিতেছে। প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসা দায়। এই ক্ষুধার দরুণ কি কষ্টটাই না ভোগ করি। এই ক্ষুধাই যত দুঃখের গোড়া।”

ঘুঘু বলিল—

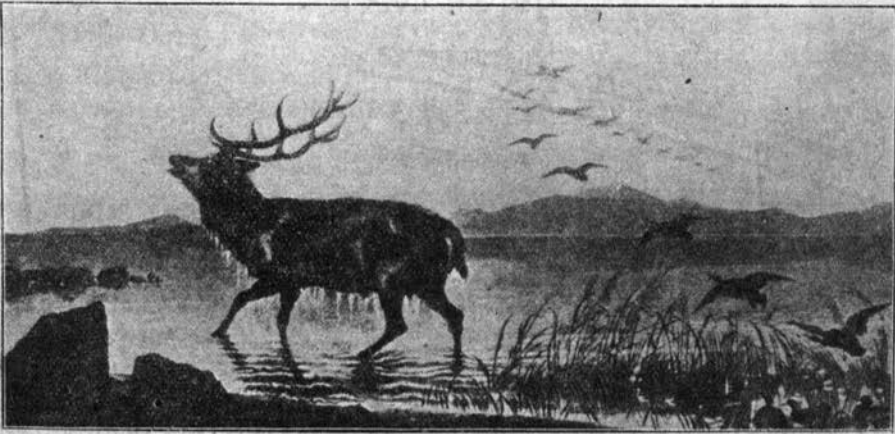
“আমার মতে দুঃখ ক্ষুধা হইতে আসে না। ভালবাসিলেই যত দুঃখ। আমরা যদি একলা থাকিতাম তাহা হইলে কোনও দুঃখ ছিল না। নিজের জন্ত যে কষ্ট সে কষ্টই নয়। পরের জন্ত যে কষ্ট হয় সে একেবারে অসহ্য। তবুও আমরা ভালবাসিতে ছাড়ি না, যাকে ভালবাসি তাকে সঙ্গে লইয়া থাকিবই; আর তাহার ফলটাও তেমনই হাতে হাতে পাই। সর্বদাই ভাবিতেছি, সে পেট ভরিয়া খাইতেছে ত? কোনও কষ্ট হইতেছে না ত? ঠাণ্ডা লাগিল কি?—আর যদি চোখের আড়াল হয়, তাহা হইলে ভাবিয়া সারা হই—‘কি হইল? কোথায় গেল?—বাজে ধরিল কি? না কি মানুষের ফাঁদে পড়িল’? ভিতরে শান্তি নাই, বাহিরেও তাই। এখানে, ওখানে, সেখানে উড়িয়া ফিরিতেছি, কোনও খোঁজ হয় কি না। শেষে হয়ত দেখিলাম মানুষে না হয় বাজে তাহাকে ধরিয়াছে। এই যে জীবন এত

সুখের ছিল হঠাৎ বিষের মতন হইয়া যায়। খাওয়া দাওয়ার আর ইচ্ছা থাকে না। যত দিন বাঁচিয়া থাকি কি ভীষণ কষ্টই না সহ করিতে হয়। না, না,—ক্ষুধার সঙ্গে দুঃখের কোনও সম্পর্ক নাই। আসল কথা ভালবাসিলেই যত দুঃখ।”

সাপ বলিল—

“তা নয়; ক্ষুধা কিম্বা ভালবাসা কোনটাই দুঃখ দিতে পারে না। আমাদের এই বদ মেজাজই যত দুঃখ কিনিয়া আনে। আমরা যদি ভালবাসিয়া থাকিতে পারিতাম তবে ত আর কোনও দুঃখই থাকিত না। তাহা হইলে আমরা এত হিংসা করিয়া বেড়াইতাম না—কেমন আরামে জীবন কাটাইতাম। কিন্তু, হায়! আমাদের এই সৃষ্টিছাড়া মেজাজ ত আর যাইবার নয়। কাহারও ছায়া পর্য্যন্ত সহ হয় না। ভরা পেটেও ইহাকে উহাকে তাহাকে ছোবল মারিয়া বেড়াইতেছি। সামান্য কারণে হয়ত বাপ মাকেও কামড়াইতে ছাড়ি না। আবার আমাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেদের জাতি ভাইদেরই ধরিয়া গিলিতে বসে। হায়, কি লজ্জার কথা! এই স্বভাবের জন্ত কেহ আমাদের দেখিতে পারে না। আচমকা মাথায় লাঠি কিম্বা ইট আসিয়া পড়ে আর প্রাণটা হারাই। অপমৃত্যু আমাদের ধরাবাঁধা। আমি বলি জগতের যত দুঃখ সব এই বদমেজাজ হইতেই আসে।”

হরিণ বলিল—



“ইহাও ঠিক নয়। ক্ষুধা, ভালবাসা কিম্বা বদমেজাজ, কোনটাই দুঃখের কারণ

নয়। ভয়ই যত দুঃখের মূল। দেখ না আমাদের গায়ের জোরটাত আর কম ছিল না, আর ছুটিতেও কম পারি না। তবুও একটি গাছের পাতা নড়িয়াছে কি লাফাইয়া উঠিয়াছি, পাগলের মত এধার ওধার ছুটিয়া হয়ত সত্যি বিপদ আনিয়া ফেলি। আমাদের যে শিং দেখিতেছ এটি বড় কম জিনিষ নয়। ইহার সাহায্যে আমরা ছোটখাট অনেক জানোয়ারের হাত হইতে অনায়াসে রক্ষা পাইতে পারি আর পায়ের সাহায্যে বড় গুলিকে দৌড়াইয়া এড়াইতে পারি; কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, বিনা কারণে ভয় পাইয়া সব মাটি করিয়া বসি। ভয়কে আর এড়াইতে পারি না। একটা কুকুর আর আমাদের কি করিতে পারে? কিন্তু তাহার ডাক শুনিয়াই পালাইতে থাকি ও বন্দুক-হাতে মানুষের সামনে গিয়া পড়ি। এই ভয়ই সংসারে যত দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছে।”

ঘোণীর ঘুমের ব্যাঘাত হইতেছিল, তিনি বলিয়া উঠিলেন—“কেন মিথ্যা তর্ক করিতেছ? ক্ষুধা, ভালবাসা হিংসা ও ভয়, ইহার কোনটাই জগতের সমস্ত দুঃখের কারণ হইতে পারে না। নানা রকম প্রাণী তাদের নানারকম স্বভাব, তাই জগতে তারা নানারকমের দুঃখ গড়িয়া তুলিতেছে।”

শ্রীহিতেন্দ্রমোহন বসু।

পুরাতন লেখা

(উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত)

সহজে কি বড়লোক হওয়া যায়?

[সত্যঘটনামূলক গল্প]

ছেলেবেলা একটু একটু একগুঁয়েমো প্রায় সকলেরই থাকে। আমার কথা শুনিয়া কেহ চটিবেন না। চটিলেও বড় একটা অসুবিধা বোধ করিব না। অনেকের অভ্যাস আছে তাহারা খাঁটি কথা শুনিলে বিরক্ত হয়, কিন্তু কাহাকেও বিরক্ত করা আমার উদ্দেশ্য নহে! আমার নিজের দশা দেখিয়াই আমি উপরের কথাগুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি।

ছেলেমানুষের একটা রোগ আছে। অনেক কাজ তাহারা আপনা আপনি করিয়া অল্প লোককে বিরক্ত করে, আবার যদি কেহ সেই কাজ তাহাদিগকে করিতে

বলিল অমনি সেই কাজের মিষ্টত্বটুকু তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া যায়। দাদা প্রথম প্রথম বই পড়িতে শিখিয়াছে ; তার বইয়ে সুন্দর সুন্দর ছবি। পড়িবার সময় দাদা বই খুঁজিয়া পাইত না। আমার চোখে পড়িলেই আমি বইখানা হস্তে করিয়া, কেহ খুঁজিয়া না পায় এমন কোন জায়গায় যাইয়া বসিতাম। শেষে একদিন শুনিলাম ঐ বইখানা আমারও পড়িতে হইবে। আমার আনন্দের সীমা রহিল না ; তখনই দৌড়িয়া যাইয়া সঙ্গীদের সকলকে খবরটা দিয়া আসিলাম। পরদিন মাষ্টার আসিলেই বই হাতে করিয়া হাজির। মনে করিলাম, প্রথম ছবিটার কথা আজ হইবে। মাষ্টার প্রথম ছবির পাতে একটু আসিলেনও না,—ছবিশূন্য একটা পাত উন্টাইয়া এ, বি, সি, ডি করিয়া কি বলিতে লাগিলেন ! তখন হইতে আর সে বই আমার ভাল লাগিল না।

দাদা ইঙ্কুলে যাইবার সময় মাঝে মাঝে আমাকে সঙ্গে করিয়া নিয়া যাইত। দাদাদের মাষ্টার বড় ভালমানুষ। আমি মনে করিলাম ইঙ্কুলের সকল মাষ্টারই বুঝি ঐরূপ। বাড়ীতে তিন বছর থাকিয়া কয়েকখানা বই শেষ করিলাম। তারপর আমাকেও স্কুলে পাঠাইয়া দিল। কয়েক বছর বেশ চলিতে লাগিলাম ; কিন্তু মাষ্টারকে আর তত ভাল লাগে না। কবে বড় মানুষ হইয়া ইঙ্কুল ছাড়িয়া দিব এই চিন্তাটা বড় বেশী মনে হইত। তখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। ইংরাজি যে কয়েকখানা বই পড়িয়াছিলাম, তাহার একখানাতে এক সাহেবের কথা লেখা ছিল। তিনি বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে গিয়াছিলেন, সেখানে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া শেষটা অনেক টাকা করিয়াছিলেন। সাহেব যে বয়সে বাড়ী ছাড়িয়াছিলেন, মিলাইয়া দেখিলাম আমারও এখন ঠিক সেই বয়স। তবে আর চাই কি ? ক্রাসে সতীশের সঙ্গে আমার বড় ভাব ;—আমি সতীশের কাছে মনের কথাগুলি খুলিয়া বলিয়া ফেলিলাম। কথা শুনিয়া সতীশ যেন আর তার ছোট শরীরটির মধ্যে আঁটে না। তখনই সে লাফাইয়া উঠিল। বোধ হইল বাড়ী হইতে বিদেশে চলিয়া গেলেই বড়লোক হওয়া যাইবে ; সতীশ বলিল, “কালই চল”। কাল চলাটা তত সহজ বোধ হইল না। কিন্তু বেশী দেরী করা হইবে না, সেটা ঠিক করা হইল।

একদিন ইঙ্কুল হইতে ছুটি লইয়া বাড়ী আসিলাম ; সতীশও আসিল। বাবা বাড়ী ছিলেন না। বাড়ীর অত্যাশ্রয় লোকও চুপ করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। চুপি চুপি কয়েকখানা কাপড় দিয়া একটা পুঁটলী বাঁধিলাম। তারপর বাবার বাস হইতে

কতকগুলি টাকা লইয়া ছুজনে চোরের মত বাড়ীর বাহির হইলাম। পাছে কেহ আসিয়া ধরে সেই ভয়ে ছুজনে মাঝে মাঝে দৌড়িতে লাগিলাম। এইরূপে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হাঁটিয়া এক বাড়ীতে যাইয়া উঠিলাম।

সেই বাড়ীর কর্তা আমাদের অবস্থা দেখিয়া বড় হুঃখিত হইলেন; আমাদের সম্বন্ধে যা যা কথা সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমরা কোন কথারই ঠিক উত্তর দিই নাই। স্থানে স্থানে ছ একটা কথা গড়িয়া কহিতে হইল। তিনি আমাদের কথায় বুঝিয়া লইলেন যে আমরা ছুজন পথ হারাইয়া ঘুরিতেছি; বলিলেন, “কাল আমি একজন লোক দিয়া তোমাদের ছুজনকে বাড়ী পাঠাইয়া দিব।”

খাইবার সময় ভদ্রলোকটি আমাদের সম্মুখে বসিয়া থাকিলেন, আমাদের আহার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উঠিলেন না। একটা কুঠরীতে আমাদের ঝুজনের ঘুমাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইল। সেখানে আর কেহ ঘুমাইতে আসিল না। আমি কিছু সুবিধা বোধ করিলাম; ভাবিলাম, কর্তা যাহা বলিলেন তাহা কাজে করিলে আর বড়লোক হওয়া হইবে না; সুতরাং কেহ জাগিবার পূর্বেই কর্তাকে ধন্যবাদ না দিয়া চলিয়া যাওয়া ঠিক হইল। সতীশকে ডাকিলাম “সতীশ! সতীশ!”—সতীশ কথা কয় না। সতীশের চক্ষে জল পড়িতেছে! কর্তার কথায় সতীশের মন ফিরিয়া গেল নাকি? বাস্তবিকও তাই; অনেক পীড়াপীড়ি করার পর বলিল, “আমি তোমার সঙ্গে যাইব না।” আপনারা কি মনে করিতেছেন? সতীশের কথা শুনিয়া আমার মনের ভাব কি প্রকার হইল? বড়লোক হওয়ার ইচ্ছাটা আমার এত বেশী হইয়াছিল, যে বাড়ী ছাড়িয়া অবধি আমার বোধ হইতেছিল যেন বড়লোকের কাছাকাছি একটা কিছু হইয়াছি! সতীশকে আমি কাপুরুষ মনে করিতে লাগিলাম। সতীশেরও মা বাপ আছেন আমারও মা বাপ আছেন। প্রভেদ এই যে আমি স্বার্থপর, সতীশ তাহা নহে। সতীশের মনে যে সকল চিন্তা উঠিতেছিল, আমার অন্তঃকরণে তাহারা স্থান পাইল না। আমি সতীশের অবস্থা বুঝিতে পারিলাম না। মা বাপের মনে কষ্ট দেওয়া আমার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু নিজের কথা লইয়া এত ব্যস্ত ছিলাম যে তাঁহাদের কথা ভাবিবার অবসরই পাই নাই। নানা চিন্তার মধ্যে ঘুম আসিল।

ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বপ্ন দেখিলাম যে আমি বাড়ীতে কি একটা কথা লইয়া মার সঙ্গে রাগ করিয়াছি। মা কত সাধিতেছেন, আমার ভ্রূক্ষেপ নাই; রাগ

যেন ক্রমেই বাড়িতেছে। মার চক্ষে জল পড়িতেছে দেখিয়া যেন আমার প্রতিহিংসার ভাবটা চরিতার্থ হইতে লাগিল। আমি দাঁত খিঁচাইয়া মাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলাম। মা আমার হাতে ধরিতে আসিলেন; আমি পাশের একটা গাছে উঠিতে চেষ্টা করিলাম। হঠাৎ পা পিছলিয়া পড়িয়া যাইতেছিলাম, এমন সময় আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। স্বপ্নের কথা ভাবিয়া চক্ষে দু'কোঁটা জল আসিল; কিন্তু আবার সেই বড়লোক হওয়ার কথা! সতীশের মন ফিরিয়া গিয়াছে। সতীশ জাগিয়া আর যাইতে চাহিবে না, হয় ত আমারও যাওয়া হইবে না। রাত হয়ত আর বেশী নাই; এই বেলা সতীশকে না বলিয়া চলিয়া যাওয়াই ভাল। আমি আস্তে আস্তে উঠিলাম। আমার কাপড় আর টাকাগুলি লইয়া বাহির হইলাম। রাত্রি তখনও অনেক ছিল কিন্তু আমার বোধ হইতে লাগিল যেন এই ভোর হইয়া আসিতেছে। একটা বড় রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। অনেকক্ষণ হাঁটিলাম, কিন্তু রাত ফুরায় না। রাস্তাটা একটা বড় নদীর ধারে যাইয়া শেষ হইয়াছে; আমিও সেই স্থানে যাইয়া থামিলাম;—তারপর যাই কোথা? রাস্তাটা নিশ্চয় ওপারে যাইয়া আবার চলিয়াছে কিন্তু ওপারে যাই কেমন করিয়া? এতক্ষণ রাত ফুরাইল না। হয়তো আরও অনেক দেরি। ঘাটে একখানি নৌকা বাঁধা ছিল—নৌকার ছই নাই। একজন লোককে অনায়াসে ওরূপ নৌকা অনেকবার চালাইতে দেখিয়াছি, আমার বোধ হইতে লাগিল আমিও পারি। নৌকায় উঠিতে বিলম্ব হইল না। যে লগিটিতে নৌকা বাঁধা ছিল তাহা তুলিয়া লইলাম। ডাঙ্গায় ভর করিয়া ঠেলিয়া নৌকা জলে ভাসাইয়া দিলাম। জলের গায় এত জোর আগে ভাবি নাই। শোঁ শোঁ করিয়া নৌকার গায় জল বাঁধিতে লাগিল; নৌকাখানা ঘুরিয়া গেল। হঠাৎ ঘুরিবার সময় তাড়াতাড়িতে লগিটি ছাড়িয়া দিলাম। নৌকা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ডাঙ্গা হইতে অনেক দূরে যাইয়া পড়িল—স্রোতে ভয়ানক বেগের সহিত ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আমি কিছুকাল হতবুদ্ধি হইয়া থাকিলাম।

বিপদের পরিমাণটা প্রথম তত বুঝি নাই, শেষ কিছু কিছু করিয়া হুঁস হইতে লাগিল। মাথা ঘুরিয়া গেল। হুঁহাতে চোখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িলাম। ঢেউগুলি তড়াক্ তড়াক্ করিয়া নৌকাখানাকে দোলাইতে লাগিল। তখন মায়ের সেই মুখখানি মনে হইল। কেন বাড়ী ছাড়িয়া আসিলাম? সেই অন্ধকার রাত্রি, সেই ভয়ানক নদী, আর বাড়ীর ছোট কুঠরীটি—সেই কোমল স্নন্দর বিছানাটি মনে

হইল। দুই চক্ষু জল পড়িতে লাগিল। সেই আঁধারে পড়িয়া মা মা বলিয়া কাদিতে লাগিলাম। কেন সতীশের সঙ্গে গেলাম না? তাহাকে কেন ছাড়িয়া আসিলাম?

(ক্রমশঃ)

কাক ও বেঙ

(তিব্বতী গল্প)

একদিন একটা বুড়ো থুর্থুরে কাক, একটা বাচ্চা বেঙ ধরে এক তেতলার ছাদের উপরে নিয়ে গিয়ে ভাবলে এখানে বেশ আরাম করে খাওয়া যাবে। এই ভেবে সে যেই খেতে গেল অমনি বেঙটা একটু মুচুকে হাসল। কাক তাই দেখে থমকে গেল; সে বললে—“হাসছিস্ কেন রে?” বেঙ বললে—“ওঁ কিছু নয়; একটা কথা মনে পড়ল, তাই হাসলুম!”

কাক বললে—“কি কথা? কি কথা ভাই?” বেঙ বললে—“এখানে কাছেই আমাদের রাজা আমার ব্যাং বাবা থাকেন; তিনি ভয়ঙ্কর রাগী। একবার যদি ব্যাংরাজ শোনেন আমার গায়ে কেউ হাত তুলেছে, তাহলে তখুনি তাকে—ছ্যাডাং!” শুনে কাকের ভারি ভয় হল। সে ভাবলে তবে এখান থেকে পালান যাক। এই ভেবে সে বেঙটাকে ঠোঁটে করে তুলে ছাদের এক টেরে এক কোণে একটা যে নর্দমা ছিল, তার কাছে এনে ফেললে।

তারপর যেই আবার খেতে গেছে, আবার বেঙ হেসে উঠল। কাক বললে—“ফের হাসছিস্ যে!” বেঙ বললে—“একটা কথা মনে পড়ল তাই।” কাক বললে—“কি কথা?” বেঙ বললে—“এখানে আমার ব্যাং খুড়ো থাকেন, তিনি আবার বাবার চেয়েও রাগী! একবার যদি খুড়ো শোনেন কেউ আমাকে ধরেছে তখনই তার মুড়ো গুঁড়ো!”

শুনে কাকের আরো ভয় হল। সে তখুনি তাকে ঠোঁটে তুলে ছাদের আর এক কোণে নিয়ে গেল। সেখানে থাকেন ব্যাং দাদা, তাঁর মাথায় ছাতা! শুনেই বুড়ো কাক ঠক্ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। তারপর যেখানেই নিয়ে যায় সেখানেই শোনে, হয় পিশে, নয় মেশো, নয় মামা হামাগুড়ি মেরে বসে আছে। ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে শেষে কাক তাকে একটা কুয়োর ধারে এনে ফেললে।

কাক এদিক ওদিক চেয়ে বল্লে—“এখানে কেউ নেই ত ?”

বেঙ বল্লে—“না ।” কাক তখন নিশ্চিত হয়ে বেঙটাকে ঠোকুরাতে যাচ্ছে এমন



সময় বেঙ বলে উঠল—“এঃ, তোমার ঠোঁটটা যে ভারী ভোঁতা হয়ে গেছে। ঐ ভোঁতা ঠোঁটে আমাকে ত ভাল করে খেতে পারবে না। যাও ঐ পাথরে আচ্ছা কোরে শান দিয়ে এস ।” কাক ভাবলে ঠিক কথা ! অনেক কষ্টে আজ বেঙ ধরেছি, ভাল করে আরামে খেতে হবে। এই ভেবে সে যেই ঠোঁটে শান দিতে গেল, অমনি বেঙটা করলে কি, না, তুড়ুক্ কোরে একেবারে কুয়োর ভিতরে ! কাক ফিরে এসে দেখে বেঙ নেই। সে এদিক খুঁজলে, ওদিক খুঁজলে—কোথাও দেখতে না পেয়ে যখন কুয়োর ভিতরে উকি মারলে, তখন বেঙ কাঁদো কাঁদো হয়ে বল্লে—“আমি এখানে গড়িয়ে পড়ে গেছি ।”

কাক বল্লে—“উঠে এস।

আমার বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।” বেঙ বল্লে—“আমি ভাই কুয়োর গা বেয়ে উঠব কি ক’রে ? বড্ড পিছল যে। তুমি এসে আমাকে তুলে নিয়ে যাও ।” বলেই সে ভেংচি কেটে অগাধ জলের মধ্যে টুপ্ করে ডুব মারলে। কাক অবাক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

পঞ্চুলাল

(৬)

সুন্দরী মেয়েটি আবার একবার জানালার কাছে এসে, যখন দেখলে বেচারী পঞ্চুর ফাঁসী হয়েছে, তখন তার বড় দয়া হল। হাত দুটি একত্র করে সে, তিনবার হাত তালি দিতেই একটি মস্ত চিল এসে নমস্কার করে বললে “মা লক্ষ্মী—কি চাও তুমি”?

সুন্দরী মেয়েটি যে সে নয়—সেই বনেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁর নাম শ্রীমা বনশ্রী।

বনশ্রী বললেন—“দেখ শোন, তুমি এফুনি যাও তোমার ধারাল ঠোঁট দিয়ে ঐ ফাঁসীর গাঁট কেটে পঞ্চুলালকে নামিয়ে, ঘাসের উপর শুইয়ে দাও”।

চিল তখন উড়ে গেল আর একটুখানি পরে ফিরে এসে বললে, “মা লক্ষ্মী তোমার আদেশ মত কাজ করেছি।” বনশ্রী আবার দুইবার হাততালি দেবামাত্র, গায়ে বড় বড় লোম, মস্ত একটি কুকুর এসে হাজির হল। সে কিন্তু মানুষের মত দুই পায়ে চলে, কোচম্যানের মত জামা জোড়া পরা, আর পাগড়ীধারী। বনশ্রী বললেন, “যাওতো মহেন্দ্র, পঞ্চুলালকে নিয়ে এস।” অবিলম্বে ছোট্ট একখানি সুন্দর গাড়ী আস্তাবল হতে বেরিয়ে এল, মহেন্দ্র ছসিয়ার কোচম্যানের মত কোচবাক্সে চড়ে বসল। একটু পরেই পঞ্চুলালকে শুদ্ধ গাড়ী ফিরে এল। বনশ্রী পঞ্চুলালকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ডাক্তার ডেকে পাঠালেন। ডাক্তার মশায়রা কাছেই থাকতেন, আস্তে দেরী হল না। একজন হচ্ছেন কাক, অন্যটি পেচক, তৃতীয় জনের নাম



ঝিল্লী চক্রবর্তী। বনশ্রী বললেন, “মহাশয়রা দেখুন ত পঞ্চুলাল জীবিত, কি মৃত?”

কাক এগিয়ে এসে প্রথমে পঞ্চুর নাড়ী, তারপর নাক, অতঃপর ডান পায়ের কড়ে আঙুল মনোযোগের

সঙ্গে পরীক্ষা করে গভীর ভাবে বললেন,—“আমি যতদূর বুঝেছি তাতে এ রোগী

সম্পূর্ণ মৃত, তবে যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ না মরে থাকে, তবে সম্ভবতঃ জীবিত আছে।” তারপর পেচক মহাশয় বলে, “ডাক্তার কাকের মতের প্রতিবাদ করতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত, কেননা তিনি জ্ঞানী এবং যশস্বী, তাঁর পসার খুব বেশী। আমার মতে পঞ্চু এখনও জীবিত, কিন্তু দৈবাৎ যদি ম’রে থাকে তবে সেটা তার মৃত্যুর চিহ্ন বলেই ধরে নিতে হবে”।

ঝিল্লী ঝাঁঝাল স্বরে বলে, “এ বিষয় নিশ্চয় ক’রে কিছু বলতে পারি না, তবে রোগীকে আমি পূর্বে দেখিছি, আমি একে ভাল করেই জানি। ওটি একটি পাকা বদ্‌ময়েস, অকস্মাৎ, ভবঘুরে”—পঞ্চু একটি বার চোখ খুলে আবার বন্ধ করলে—“এই অবাধ্য ছেলেটার ব্যবহারে তার বাপের মনে এমনি ব্যথা লেগেছে যে মন-মরা হয়ে সে মরেই যাবে”। পঞ্চু এসব কথা শুনে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। কাক গম্ভীর স্বরে বলে, “মরা রোগী যখন কেঁদে ওঠে তখন বুঝতে হবে সে বাঁচবার পথে আসছে।” ডাক্তার পেচক ঘাড় নুইয়ে বলে, “আমার বন্ধুর বিরুদ্ধে কিছু বলতে আমার দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু আমার মতে মৃত রোগী যখন কাঁদে তখন বুঝতে হবে তার বাঁচবার আশা কম”। তিন ডাক্তার বিদায় হয়ে গেলে বনশ্রী একগ্লাস জলে একটা শাদা গুঁড়ো মিশিয়ে পঞ্চুর মুখের কাছে ধরে স্নেহের স্বরে বলেন, “পঞ্চু এই ওষুধটা খাওতো দেখি, তাহলেই সেরে উঠবে”। পঞ্চু গেলাসটার দিকে চেয়ে মুখ বাঁকা করল, তারপর ভুরু কুঁচকে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে, “ওষুধ তেতো না মিষ্টি?”

“তেতো—কিন্তু খেলে তোমার উপকার হবে।”

“তেতো ওষুধ আমি খেতে পারব না—না না ও আমি খাব না।”

“আমার কথা শোন, লক্ষ্মীটি খাও। তাহলে মিছরি পাবে।”

“মিছরি কোথায় দেখি?”

একটা সোণার বাটী হতে এক টুকরো মিছরি তুলে বনশ্রী পঞ্চুকে দেখিয়ে বলেন “এই যে মিছরি”।

পঞ্চু বলে “আমায় আগে মিছরি দাও—তাহলে আমি তোমার তিতো পাঁচন খাব।” “ঠিক বলছ খাবে?”—“হ্যাঁ ঠিক আমি খাব”। বনশ্রী তার হাতে মিছরি দেবামাত্র পঞ্চু সেটা কড়মড়িয়ে খেয়ে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে লাগল।

বনশ্রী বল্লেন “নাও এবারে ওষুধটা খেয়ে ফেল”। পঞ্চু ওষুধের গেলাস নিয়ে একবার সেটা শুকলে তারপর বল্লেন, “তিতো তিতো গন্ধ করছে—আমায় আর একটু মিছরি দাও তবে আমি খাব।”

বনশ্রী আর একটুকরো মিছরি তার মুখে দিয়ে ওষুধটা আবার মুখের কাছে ধরলেন। পঞ্চু বল্লেন, “এমন করে আমি খেতে পারছি নে।” “কেন?” “পায়ের কাছের বালিশটা আমায় বড্ড জ্বালাতন করছে।” বনশ্রী বালিশটা সরিয়ে দিলেন। তাতেও হল না—পঞ্চু বল্লেন—“ঐ ছয়োরটা যে আধখানা খোলা আছে, ওটা আমায় ভারী বিরক্ত করছে।” বনশ্রী গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এলেন।

তখন আর কোন ছুতে না পেয়ে পঞ্চু কেঁদে উঠে বল্লেন, “আমি তেতো জল খেতে পারব না, পারব না, কিছুতেই পারব না।”

“বাছা এখন খাচ্চনা পরে কিন্তু অনুতাপ করতে হবে।”

“তা’হয় হবে।”

তোমার যে শক্ত ব্যামো—ওষুধ না খেলে সারবে না।”

“তা না হয় নাই সারবে”।

“তুমি কি মরতে ভয় করনা?”

“মরি মরব—ওষুধ কিছুতেই খাবনা।” যেম্নি এই কথা বলা, অগ্নি দরজাটা ধড়াম করে খুলে গেল, চারটে কালো কুচকুচে প্রকাণ্ড বেড়াল একখানা ছোট্ট খাটিয়া ঘাড়ে করে সেখানে এসে বল্লেন, “তৈরী হও—তোমায় নিতে এসেছি”।

“আমায় নিতে, কেন? আমি ত এখনো মরিনি।”

“একটু বাদেই মরবে—ওষুধ যখন খেলে না তখন মরবে নিশ্চয়।”

পঞ্চু চেঁচিয়ে উঠল, “ওগো মা গো কোথায় গেলে গো, শীগ্নির ওষুধ দাও।”

এবার পঞ্চু এক চুমুকে চোঁ চোঁ করে ওষুধ শেষ করে ফেল্লেন। বেড়ালরা খাটিয়াটা আবার কাঁধে তুলে গজ-গজ করে বকতে বকতে চলে গেল।

একটু পরেই পঞ্চু লাফিয়ে খাট হ’তে নেমে পড়ল, তার অস্থিত তখন একেবারে সেরে গিয়েছে। পঞ্চু ঘরময় নেচে বেড়াচ্ছে দেখে বনশ্রী হেসে বল্লেন, “তবে দেখ, ওষুধ তোমার উপকার হয়েছে”। পঞ্চু বল্লেন, “এরপর বলতে না বলতেই ওষুধ খেয়ে ফেলব—কালো বেড়ালগুলোর কথা মনে রইল ত।”

“মোহর চারটে কোথায় রাখলে?”

পঞ্চ একটা মিছে কথা বলে ফেলে। মোহর চারটাই তার পকেটে ছিল, সে কিন্তু চুট করে বলে, হারিয়ে গিয়েছে। এই মিছে কথা বলামাত্র পঞ্চুর নাকটা ছ আঙুল বেড়ে গেল।

“কোথায় হারালে?”

“এই বাড়ীর কাছে বনে।”

“তা’হলে ভাবনা নেই, কেননা এ বনে যা হারায় সব ফিরে পাওয়া যায়।”

পঞ্চ কি যেন ভেবে আবার বলে, “না না বনে হারায়নি, মুখের মধ্যে রেখেছিলাম, ওষুধ খাবার সময় গিলে ফেলেছি।”

বার বার তিনবার মিথ্যে কথা বলবার পর পঞ্চুর নাক লম্বা হতে হতে এতই লম্বা হয়ে গেল, যে সে আর নড়তে পারে না! যে দিকে ফেরে সেই দিকেই নাকটা গিয়ে দেয়ালে আটকে যায়। একবার খাটে, একবার জানালায়, একবার দরজায় গিয়ে ঠক্কর লেগে লেগে নাকটা তুবড়ে যাবার গতিক হয়ে উঠল। বনশ্রী কিছু না বলে খুব হাসতে লাগলেন। পঞ্চ ফাঁপরে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, “অত হাসছ কেন?”

বনশ্রী হেসে বলেন, “তুমি যে মিছে কথা বলেছ তাই হাসছি।”

“তুমি কি করে জানলে আমি মিছে কথা বলেছি?”

“আমার কাছে কিছু লুকোন থাকে না। ছ রকমের মিছে কথা আছে—কতকগুলোর পা খাটো, সে মিছে কথা যে বলে সে ক্রমেই বেঁটে হতে থাকে। অল্প রকমের মিথ্যে কথায় নাক কেবলি বেড়ে চলে। তোমার মিথ্যে লম্বা জাতের, তাই নাক শুধু শুধুই বাড়ছে।” লজ্জায় পঞ্চ ঘর হতে দৌড় দিয়ে পালাতে গেল, পারল না—যে দিকে যায় সেই দিকেই আটকে পড়ে। আধঘণ্টা ধরে পঞ্চ খুব চোঁচামেচি করে কাঁদতে লাগল, কেঁদে তার চোখ দুটো ফুলে চিপি হল, চেহারাটা একেবারে বিশ্রী হয়ে গেল। তখন বনশ্রীর মায়া হ’ল। তিনি আবার হাত তালি দিলেন, অগ্নি হাজার হাজার কাঠ-ঠোকরা এসে, পঞ্চুর নাকের উপর গিয়ে পড়ে, এগ্নি উৎসাহে ঠোকর দিতে লাগল যে ছচার মিনিটের মধ্যেই পঞ্চুর নাক আবার যেমন ছিল তেমন।

চোখ মুছে পঞ্চ বনশ্রীকে বলে “তুমি বড় ভাল, আমি তোমায় খুব ভালবাসি।”

বনশ্রী বলেন, “আমিও তোমায় খুব ভাল বাসব, যদি তুমি আমার কাছে লম্বী হ’য়ে থাক।”

“আমার যে বাবা আছেন তাঁর কি হবে?”

“আমি তোমার বাবাকে বলে পাঠিয়েছি, তিনি একটু পরেই আসবেন”।

“সত্যি? তুমি ত খুব লক্ষ্মী! লক্ষ্মী দিদি তবে আমি যাই, আমার বাবাকে এগিয়ে নিয়ে আসি।” “যাও, কিন্তু সাবধান! পথ হারিয়ে না যেন। বনের ঠিক মাঝখান দিয়ে যে পথ গেছে, তাই ধরে যদি যাও, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে”।

পঞ্চু যাত্রা করল। বনের মধ্যে কিছু দূর যাওয়ার পর তার মনে হল, দুজন মানুষ যেন কোথায় কথা বলছে। তারা আর কেউ নয়, সেই কাণা বেড়াল আর খোঁড়া শেয়াল। পঞ্চুকে দেখেই তারা বলে উঠল, “ওমা এই যে দেখছি, আমাদের পঞ্চু লাল, এখানে এলে কেমন করে?”

“সে সব ঢের কথা। কিন্তু জান, কাল দুজন খুনীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।”

“খুনী! কি সর্বনাশ! কি মতলবে তারা তোমার কাছে এসেছিল?”

“মতলব—আমার মোহর কটি হাত করা।”

“কি হতভাগা মানুষ সব, ছিঃ, ছিঃ। মোহরগুলো ঠিক আছে ত?”

“হ্যাঁ, সব ঠিক আছে, একটা শুধু সেই সরাইখানায় খরচ করেছি।”

“এখন তো মোটে চারটে, মনে করলে হাজার হাজার হতে পারে—তুমি দেব-ক্ষেত্রে সেগুলো পুঁতে রাখনি কেন?”

“দেবক্ষেত্রটা কতদূর বলতে পার?”

“এইত কাছেই—আধ ঘণ্টার মধ্যে সেখানে পৌঁছাতে পার। তখনি যদি মোহর পুঁতে দাও খানিক বাদেই হাজার হাজার হয়ে যাবে, আর আজই সন্ধ্যায় থলে ভরা ভরা মোহর নিয়ে বাপের কাছে যেতে পারবে।”

পঞ্চু কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবলে। বনশ্রীর কথা, তার বাপের অবস্থা, ঝিল্লী চক্রবর্তীর পরামর্শ সব মনে পড়ে গেল, ছবার আপন মনে মাথা নাড়লে, তারপর হঠাৎ বলে উঠল, “চল যাওয়া যাক।”

দুপুর বেলা তারা একটা নির্জন মাঠে গিয়ে পৌঁছল। মাঠটা নিতান্তই সাধারণ রকমের, তাতে দেবত্বের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। পঞ্চু আপন হাতে মাটি খুঁড়ে মোহরগুলো পুঁতে মাটি দিয়ে ঢাকা দিল, তখন শেয়াল বলল, “যাও ঐ খাল্টা থেকে জল এনে এখানকার মাটি ভাল করে ভিজিয়ে দাও”। পঞ্চু কথামত কাজ করে জিজ্ঞাসা করলে, “আর কিছু করতে হবে কি?”

“না; আর মিনিট বিশেক পরেই দেখবে গাছ গজিয়েছে—তারপরেই ডাল পালা সব মোহরের ভারে নুয়ে পড়বে—তুলে নিতে কোন কষ্টই হবে না।”

পঞ্চু তাদের অনেক ধন্যবাদ দিয়ে, বক্শিশ দিতে চাইলে।

তারা দুজন বেজায় সাধুর মত বললে, “ছিঃ! ওকথা বোল না, বক্শিশ আবার কি? নিঃস্বার্থ পরোপকারই আমাদের ব্রত—তার আনন্দই আমাদের পুরস্কার। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রিয়দা দেবী।

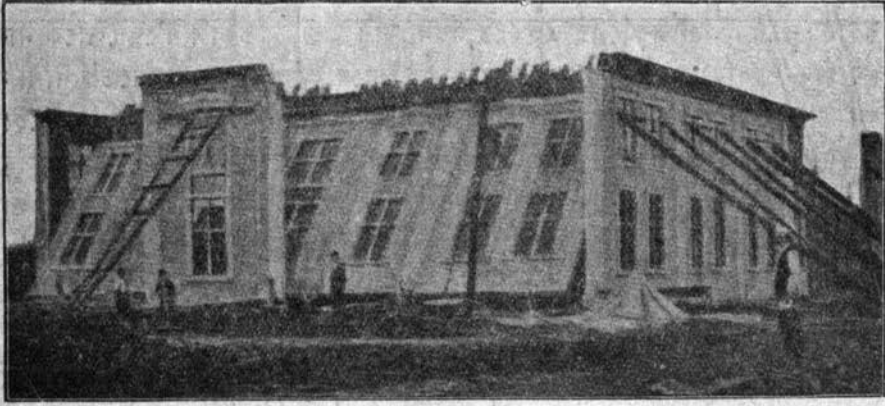
ব্যস্ত মানুষ

অসভ্য মানুষ যে কাজ নিজের হাতে করে, সভ্য মানুষে তারই জন্তু কলকজার ব্যবহার করে। গ্রীষ্মকালের এই যে গরম, যার জন্তু কতকাল ধরে লোকে নানা রকম হাত-পাখার ব্যবহার করে এসেছে, এই গরমে কলে-চালান বিছাতের পাখা না হলে আর আজকালকার মানুষের মন উঠে না। যে মানুষ এক সময়ে পায়ে হেঁটে দেশ দেশান্তর ঘুরে বেড়াত, সেই মানুষ এখনকার যুগে গাড়ী ঘোড়া চড়েও সন্তুষ্ট নয়, কত সাইকেল মোটর ট্রাম রেল, কত বাষ্প বিছাতের কারখানা করে তবে তার চলাফেরা করতে হয়। এক সময় দিনে পঞ্চাশ মাইল গেলে সে ভাবত, “খুব এসেছি”। এখন এরোপ্লেনে চড়ে ঘণ্টায় ১০০ মাইল গিয়েও সে বলছে, “এখনও যথেষ্ট হয়নি”।

এই সকল কলকজার দৌলতে একদিকে মানুষের সুখ হয় আরাম হয়, সময় আর পরিশ্রম বাঁচে, আর একদিকে হাঙ্গামাও বাড়ে, নূতন নূতন বিপদেরও কারণ দেখা দেয়। কলকারখানার চিমনির ধোঁয়ায় সহরের বাতাসকে বিষাক্ত করে মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট করে; রাস্তায় মোটরের উৎপাতে নিরীহ পথিক চাপা পড়ে; জলে স্থলে আকাশে নানা রকম নূতন দুর্ঘটনায় নূতন নূতন ভয়ের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তবু লাভ-লোকসানের হিসাব করে মানুষ সর্বদাই বলে, “লাভের চেয়ে লোকসান অনেক কম”। একশ’ বছর আগে এখান থেকে বিলাত যেতে, তিন মাস চার মাস, কখনও বা আরও বেশী সময় লাগত। এখন ১৬।১৭ দিনে যাওয়া যায়। এরোপ্লেনের বন্দোবস্ত হলে ৪।৫ দিনে যাওয়া যাবে। কিন্তু সে বন্দোবস্ত হতে না হতে এখনই মানুষ ভাবতে বসেছে, তার চাইতেও ভাল ব্যবস্থা সম্ভব কি না,—অর্থাৎ আজকে

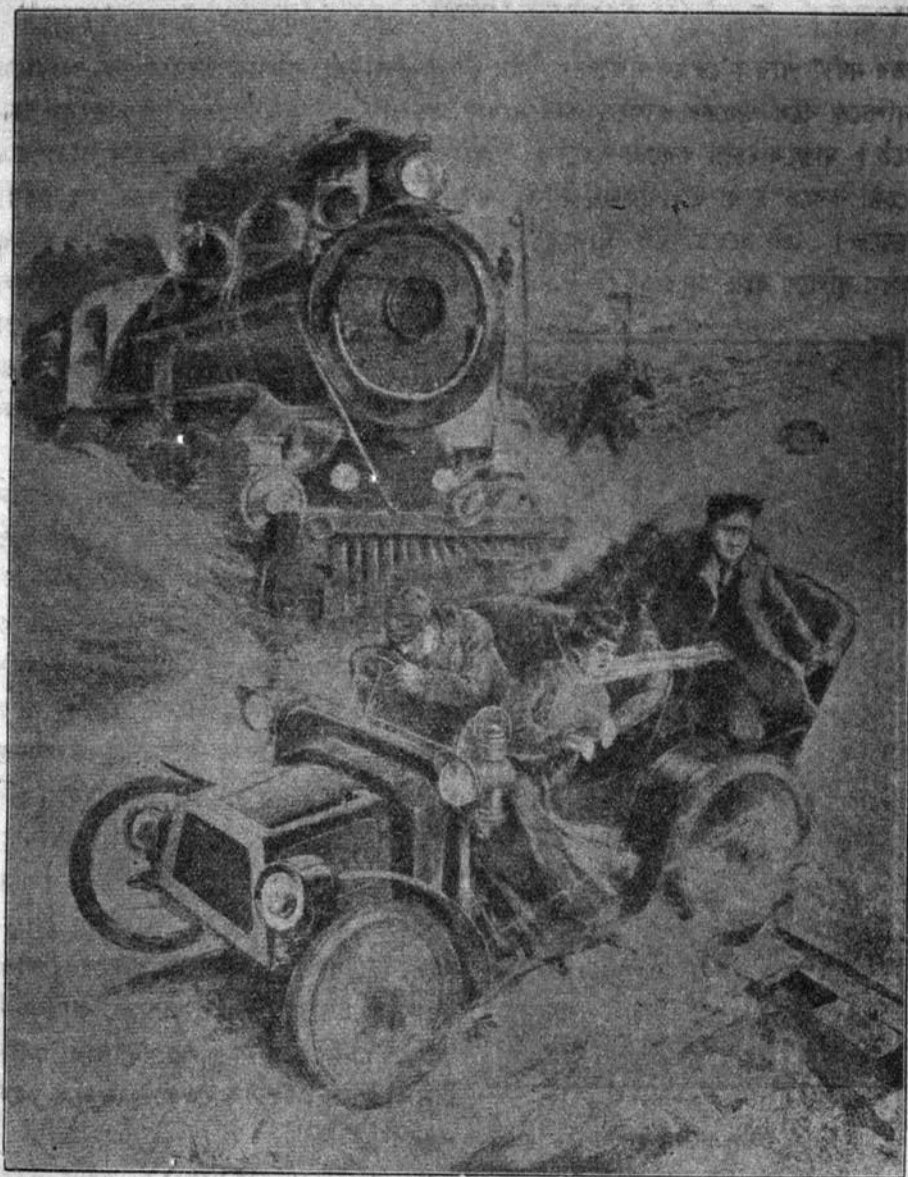
কলকাতায় ভাত খেয়ে বেরুলাম, কাল রাত্রে লণ্ডনে গিয়ে ঘুমোলাম, এই রকম বন্দোবস্ত হয় কিনা !

একখানা বাড়ী বানাতে কত সময় লাগে ? এখন আমেরিকায় শুনতে পাই, সাত দিনের মধ্যে নাকি বাড়ী তৈরী হ'য়ে যায়। যারা তৈরী করে তাদের নমুনা-মত নক্সা পছন্দ ক'রে দিয়ে তুমি নিশ্চিত হ'য়ে বেড়াও—আট দশ দিন বাদে ঘুরে এসে দেখবে তোমার জন্ত দিবা দোতলা দালান তৈরী হ'য়ে আছে। ঢালাই-করা পাথর জমিয়ে এই সব বাড়ী তৈরী হয়। ঢালাই করবার জন্ত নানা রকম তৈরী-ছাঁচ মজুত রাখতে হয়। বাড়ী করতে হ'লে আগে ছাঁচগুলো খাটিয়ে এক একটা ফাঁপা রকমের কাঠাম তৈরী হয়। তারপর সেই ছাঁচের ভিতরে পাথুরে মশলা ঢেলে দেয়। ছুই



দিনের মধ্যে মশলা জমে পাথর হয়ে যায়। এই রকমে এক একখানা আস্ত দেয়াল, আস্ত ছাদ বা মেজে তৈরী ক'রে তারপর সেগুলোকে কল দিয়ে তুলে খাটিয়ে বসালেই বাড়ী হয়ে গেল।

এমনি করে মানুষ একদিকে কাজের সময়টাকে খুব সংক্ষেপ করে আনছে, আর একদিকে দূরের জিনিসকে সে আর দূরে থাকতে দিচ্ছে না। পৃথিবীর এ-পিঠে আমরা ব'সে আছি, আর বারো হাজার মাইল দূরে ও-পিঠের মানুষরা আমেরিকায় ব'সে কি করছে, প্রতিদিন তার খবর পাচ্ছি। কোথায় যুদ্ধ হ'ল, কোথায় জাহাজ ডুবল, কোথায় মানুষের কি নতুন কীর্তির কথা জানা গেল, অগ্নি “সাত সমুদ্র



ব্যস্ততার বিপদ

তের নদী” পার হ’য়ে দেশবিদেশে খবর ছুটল—আমরা সকালে উঠে দিব্যি আরামে নিশ্চিন্তে বসে খবরের কাগজে তার সংবাদ পড়লাম। কিন্তু এতেও কি মানুষের মন ওঠে? মানুষে চেষ্টা করছে, খবরের সঙ্গে সঙ্গে তার ছবি শুদ্ধ টেলিগ্রামে পাঠাতে। “চেষ্টা করছে”ই বা বলি কেন—সত্যি ক’রেই টেলিগ্রামে ছবি পাঠাবার যন্ত্র তৈরী হয়েছে। এই যন্ত্রের এক মাথায় ছবি বসিয়ে তার উপর গ্রামোফোনের মত ছুঁচের কলম বুলিয়ে যায়, আর ২০০১২৫০ মাইল দূরে আরেক মাথায় সেই ছবির অবিকল



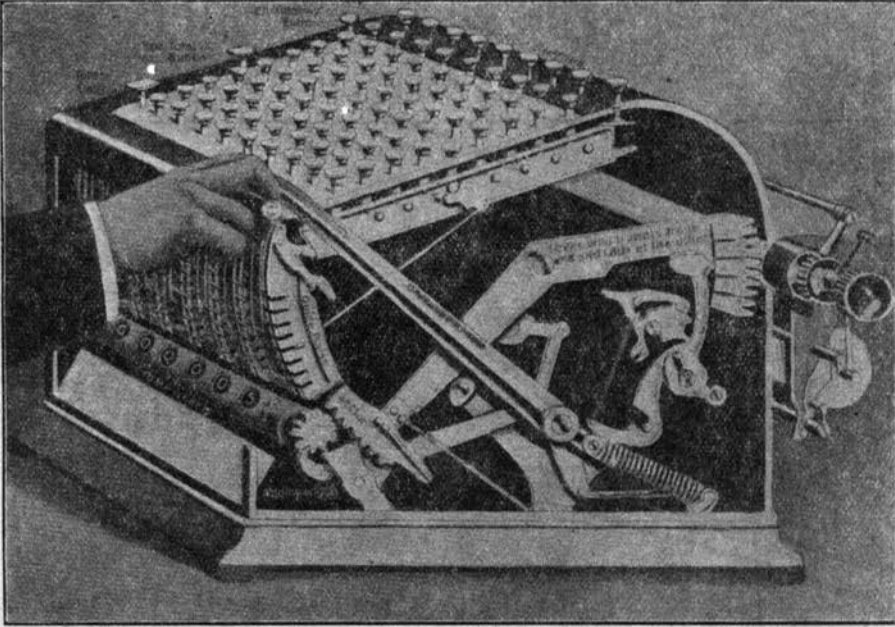
টেলিগ্রাফের ছবি

নকল উঠে যায়। কয়েক বৎসর আগে বিলাতের “ডেইলী মিরার” কাগজের জন্ম লগুন থেকে মাঞ্চেষ্টার (প্রায় ২০০ মাইল দূর) এই রকম ক’রে ছবি পাঠান হ’য়েছিল। তার একখানার নমুনা এইখানে দেখান হ’ল। সেই সময়ে এই ছবি পাঠাতে প্রায় ১৫ মিনিট লেগেছিল। আজকাল এর চাইতেও কম সময়ে আরও ভাল ছবি পাঠাবার যন্ত্র তৈরী হ’য়েছে। হয়ত আরও কয়েক বছর পরে বিলাত থেকে এদেশে ছবি পাঠাবার এই রকম বন্দোবস্ত হতে পারবে। ততদিনে হয়ত বিলাতের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলবারও ব্যবস্থা হবে। তোমরা যদি কেউ সে সময়ে বিলাত যাও, তাহ’লে এদেশের বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে কথা বলতে চলবেই, তারা তোমার চেহারা দেখতে চাইলে, অগ্নি ছবি তুলিয়ে টেলিগ্রাম করলেই তোমার সেই-দিনকার টাটকা ছবি দেখতে দেখতে এসে পড়বে।

একজন ফরাসি বৈজ্ঞানিক এক রকম দ্রুত ডাকের যন্ত্র বানিয়েছেন, তাতে চিঠি-বোঝাই গাড়ীগুলো তার-বাঁধান বিদ্যুতের পথের উপর উড়ে উড়ে চলে। এই উড়ুক

গাড়ী নাকি ঘণ্টায় ৩০০ মাইল বেগে ছুটতে পারে! পঞ্চাশ মণ ওজনের একটা গাড়ীকে অনায়াসেই শূন্যে ঝুলিয়ে পার করা যায়। আজকালকার ডাকের গাড়ী এখান থেকে বর্ধমান যেতে না যেতেই এই গাড়ী একেবারে কাশীতে গিয়ে হাজির হবে।

পরিশ্রমের কাজ, কিস্বা কুলিমজুরের হাতের কাজ, যার জন্য খুব বেশী বুদ্ধি খরচ করতে হয় না, সেগুলো না হয় কলে করা গেল। কিন্তু যাতে মাথা ঘামিয়ে বুদ্ধি খরচ করে পদে পদে হিসাব করতে হয়, তেমন কাজ কি কলে হ'তে পারে? হ্যাঁ, তাও পারে—যেমন, অঙ্কের কল বা পাটিগণিত যন্ত্র। এই অদ্ভুত কলের একটা



ছবি দেওয়া হ'ল। এই যন্ত্রে বড় বড় অঙ্কের যোগফল আপনা থেকেই বলে দেয়। বড় বড় কারখানার জমা খরচের হিসাব এই কলের সাহায্যে চটপট বার করে ফেলা হয়। কলের মধ্যে কাগজ বসিয়ে ঠিক 'টাইপ রাইটারের' মত চাবি টিপে টিপে অঙ্কগুলো লিখে যাও—তারপর ডানদিকের হাতলখানা চেপে দিলেই আপনা থেকেই তার যোগফল কাগজের উপর ছাপা হয়ে যাবে। মানুষে হিসাব করতে গিয়ে অনেক

সময়ে ভুল করে, তাড়াতাড়িতে বড় বড় পণ্ডিত লোকেরও গোল বেধে যায়—কিন্তু কলের কাজ একেবারে নির্ভুল। অঙ্কটা যদি ঠিকমত দেওয়া হয়, কলের জবাবটাও ঠিক হবেই! কারণ কল কখন অগম্যনঙ্গ হয় না—তার ছঁসিয়ারির কোন ত্রুটি হয় না। বড় বড় ব্যাঙ্কের হিসাব রেখে রেখে যারা পাকা হ'য়ে গেছে, এই কলের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে তারা পর্য্যন্ত হার মেনে যায়। তাদের কাজ অর্ধেকটুকু বা সিকিটুকু হ'তে না হ'তেই কলের কাজ শেষ হ'য়ে যায়, আর সেটা ঠিক হ'ল কিনা তাও ছবার ক'রে মিলিয়ে দেখবারও দরকার হয় না।

ঐ যা!



দেখ্ বাবাজি, দেখ্‌রি নাকি—
দেখ্‌রে খেলা দেখ্‌ চালাকি,

ঐ যা !

৬৩

ভোজের বাজি ভেঙ্কি ফাঁকি,
পড় পড় পড় পড়বি পাখী — ধপ্ !
লাফ দিয়ে তাই তালটি ঠুকে
তাক্ করে যাই তীর ধনুকে
ছাড়ব সটান উদ্ধ মুখে
হুশ্ ক'রে তোর লাগবে বুক — খপ্ !
গুড় গুড় গুড় গুড়িয়ে হামা
খাপ্ পেতেছেন গোষ্ঠ মামা
এগিয়ে আছেন বাগিয়ে ধামা
এইবারে বান চিড়িয়া নামা — চট্ !



ঐ যা ! গেল ফস্কে ফেসে—
ও মামা তুই ক্লেপ্লি শেষে ?
ঘ্যাচ্ ক'রে তোর পাঁজর ঘেঁষে
লাগল কি বান্ ছট্কে এসে — ফট্ ?

নূতন ধাঁধা

[শব্দ চৌকি]

তিন অঙ্করে তিনটি কথা—পাশাপাশি পড়িলে যেমন—উপর নীচ
পড়িলেও ঠিক তেমন—তাহার নাম শব্দ চৌকি । যেমন—

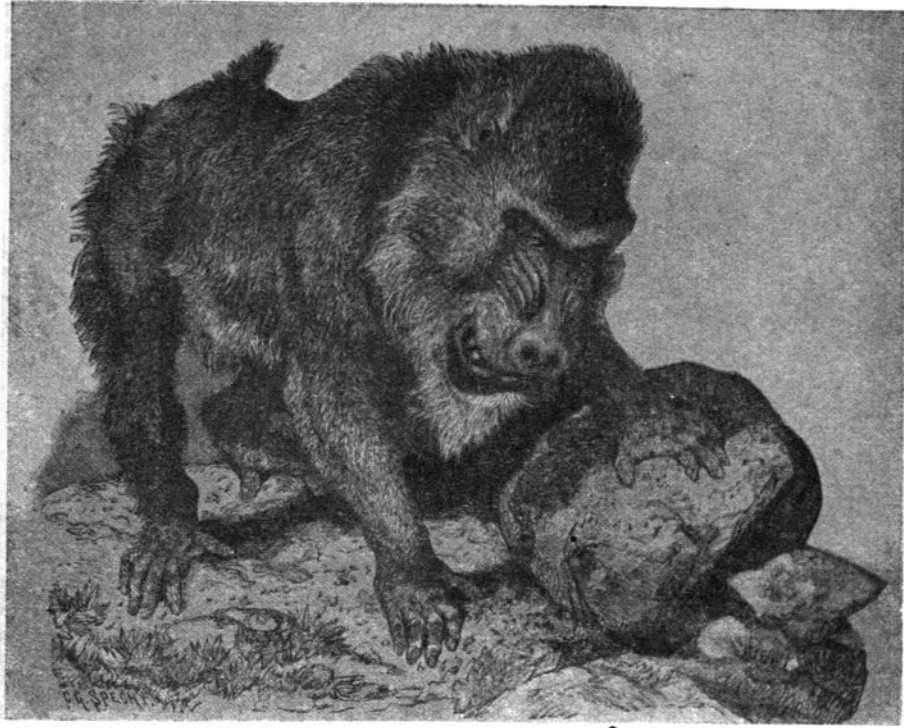
গ গ ন
গ ন ক
ন ক ল

- ১। প্রথম যেন সে রাজার বাড়ী,
দ্বিতীয়ে জানিবে আদর ভারী ।
তৃতীয়ে খুঁজিলে ছুয়ারে পাবে—
চৌকি বাঁধন খুলিয়া যাবে ।
- ২। প্রথমে তুহাতে টানিয়া রাখে,
দ্বিতীয়ে চিনিবে গলার হাঁকে ।
তৃতীয় শুনোছি থাকে সে জলে
সহজ চৌকি দাও ত বলে ॥
- ৩। প্রথম বিহনে জলেতে ডুবি
দ্বিতীয়ে পাইলে আমোদ খুবই ।
তৃতীয়ে চাখিবে সুরস জানি
বাঁধিয়া দেখত চৌকিখানি ॥
- ৪। প্রথমে আয়েসে আলস আনে
দ্বিতীয়ে দেখিলে মরিব প্রাণে ।
তৃতীয় ছাড়া কি রান্না খোলে ?
সেয়ানা কে আছ দাও ত বলে ।

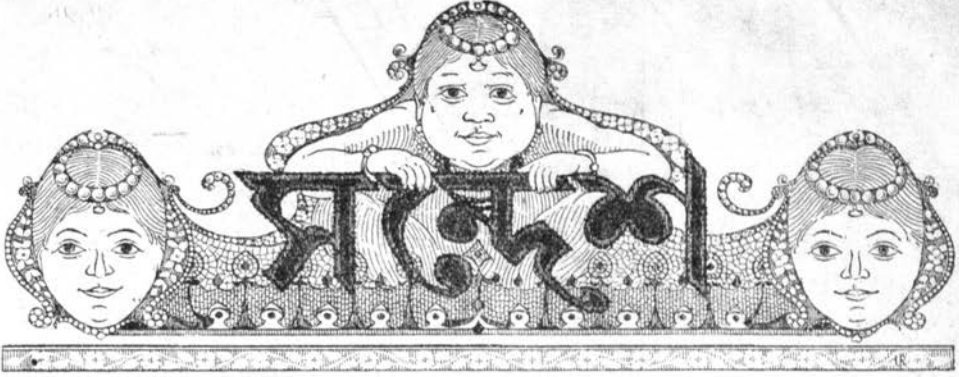
গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। শব্দ ।

২। ভুঁই পটকা ।



ম্যান্ডিল বা সং-বেবুন্



সপ্তম বর্ষ

আষাঢ়, ১৩২৬

৩য় সংখ্যা

হরিশে বিষাদ

দেখছে খোকা পঞ্জিকাতে এই বছরে কখন কবে
ছুটির কত খবর লেখে, কিসের ছুটি কদিন হবে।

ইদ মহরম দোল দেওয়ালি বড়দিন আর বর্ষশেষে—
ভাবছে যত ফুল্লমুখে ফুঁটিভরে ফেলছে হেসে।

এমনকালে নীল আকাশে হঠাৎ-খাপা মেঘের মত,
উথলে ছোটো কান্নাধারা ডুবিয়ে তাহার হর্ষ যত।

“কি হ’ল তোর?” সবাই বলে, “কলমটা কি বিঁধল হাতে?”

“জিবে কি তোর দাঁত বসালি? কামড়াল কি ছারপোকাতে?”

প্রশ্ন শুনে কান্না চড়ে অশ্রু ঝরে দ্বিগুণ বেগে,
পঞ্জিকাটি আছড়ে ফেলে বুলে কেঁদে আগুন রেগে;

“ইদ পড়েছে জ্যষ্টি মাসে গ্রীষ্মে যখন থাকেই ছুটি,
বর্ষশেষ আর দোল ত দেখি রোব্বারেতেই পড়ল ছুটি।

দিনগুলোকে করলে মাটি মিথ্যে পাজি পঞ্জিকাতে—
মুখ ধোবনা ভাত খাবনা ঘুম যাবনা আজকে রাতে।”

পঞ্চুলাল

(৭)

পঞ্চুলালের মোহরের গাছ যে কি রকম হ'য়েছিল, তা তোমরা বুঝতেই পারছ। বেচারী দেবক্ষেত্রে ফিরে গিয়ে চারিদিকে বার বার চেয়ে দেখতে লাগল মোহরের গাছটা কোথায়,—দেখে কি কোথাও কিছুনা, চারি দিক একেবারে শূন্য। যে মোহর কটি এত আশা করে পুঁতেছিল, সেগুলিও কোথায় কখন মিশিয়ে গিয়েছে। পঞ্চুলাল হাত দিয়ে খুঁড়ে, নখ দিয়ে আঁচড়ে চারি দিক চিরে কাঁকুড় চেরা করেও কোন ফল হ'ল না। তখন পঞ্চু দৌড়ে পুলিশ আপিসে গেল। দারোগার কাছে ছুই চোরের নামে ডায়রি লিখে দিয়ে জজসাহেবের কাছে ঘটনার সব কথা খুলে বলল। জজসাহেব বড় গম্ভীর হয়ে শুনলেন, ভারী আগ্রহ দেখালেন, মন তাঁর গলে এলো, চোখে জল দেখা দিল। তারপর পঞ্চুর কথা যখন শেষ হল, তখন ধর্ম্মাবতার জজসাহেব ছকুম দিলেন, “এই ছেলেকে জেলে ভরে রাখ, এর চারটে মোহর চুরি গিয়েছে”। এই অদ্ভুত বিচার দেখে পঞ্চুতো আর নেই। হুড়মুড় করে উঠে সে কি বলতে যাচ্ছিল, তা আর বলা হল না,—ছুটো ডালকুন্ডা পুলিশের সেপাই তার মুখ চেপে ধরে একেবারে সোজা নিয়ে গারদে ভরে ফেলল।

সেইখানেই তার চারচারটে মাস কেটে গেল। আরও কতকাল থাকতে হ'ত কে জানে, কিন্তু কিছুদিন পরেই রাজামহাশয়ের কি একটা যুদ্ধ জয়ের জন্ত চারিদিকে উৎসবের ধুমধাম পড়ে গেল। সেই অবসরে গোটাকত ভারি ভারি কয়েদী ছাড়া পেল, তারি মধ্যে পঞ্চু ছিল একজন। দারোগা প্রথমে পঞ্চুকে ছাড়তে চায়নি; বলেছিল, “তুমি ত ভাগ্যবন্তদের দলে নও, তোমায় ছাড়া হতে পারে না”। পঞ্চু ত মুখ কাঁচুমাচু করে বল্ল, “হুজুর ভুল করছেন, আমিও ঐ দলেরি। চুরি, জাল, জুয়োচুরি এ সবতেই আমার হাত পেকেছে”। জেলের দারোগা তখন লম্বা সেলাম ক'রে দরজা খুলে তাকে খালাস করে দিলে।

ছাড়া পেয়েই পঞ্চু আর দেরী না করে সেই বনের রাস্তা ধরে বনশ্রীর বাড়ীর দিকে ছুটল। কিছু দূর যেতে না যেতে সে দ্বিদের জ্বালায় এগ্নি অগ্নির হয়ে উঠল যে আর থাকতে না পেরে পাশের মাঠ হতে গোটাকত আগুুর ছিড়ে নেবার জন্তে সেইখানে লাফিয়ে পড়ল। যেমনি লাফিয়ে পড়েছে অগ্নি পঞ্চুলালের পা দুখানি

জাঁতিকলে আটকে গেল। শেয়াল এসে ক্ষেতে উৎপাত করে, গৃহস্থের মুরগি হাঁস ধরে নিয়ে যায়, রসাল আঙুরগুলো খেয়ে পালায়; তাই চাষী এই ফাঁদ পেতেছিল, চুরি করতে গিয়ে পঞ্চবাবু সেই ফাঁদে আটকে পড়লেন।

ক্রমে রাত হয়ে এল। একে পায়ের ব্যথা, তার উপর অন্ধকার বন, জনমনিষি কোথাও কেউ নেই—ভয়ে পঞ্চু প্রায় মূর্ছা হয়ে পড়ছিল, এমন সময় দেখলে একটি জোনাকি মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। তার মিটমিটে আলোটুকু দেখে পঞ্চু বললে—“ও ভাই জোনাকি, দয়া করে আমার ফাঁদটা খুলে দেবে ভাই?”

জোনাকি বললে, “আহা বাছা আমার, কে তোমার এ দশা করলে?”

• “আমি ঐ মাঠে গোটাকত আঙুর পাড়তে এসেছিলাম।”

“বটে? পরের জিনিস নিয়ে যেতে কে তোমাকে শিখিয়েছে বলত?”

“বড্ড ক্ষিদে যে পেয়েছিল—”

“ক্ষিদে পেলেই পরের জিনিস নিতে হবে?”

“না না, আর আমি এমন কাজ কখনো করব না—”

এমন সময় ক্ষেতের মালিক এসে উপস্থিত। তার শেয়াল-ধরা ফাঁদে একটা মানুষ ধরা পড়েছে দেখে সেত অবাক। বললে, “ওহো! এবার চোর চক্রবর্তী বোঝা গেছে, রোজ রোজ তুমিই বুঝি আমার মুরগি ছানা নিয়ে পালাও?”

পঞ্চু কাঁদতে কাঁদতে বললে “আমি কখনো তোমার মুরগি ছানা চুরি করিনি, আমি শুধু গোটাকত আঙুর নিতে এসেছিলাম।”

“আঙুর চুরিও যা মুরগি চুরিও তাই! আঙুর চোর বুঝি সাধুপুরুষ?”

তারপর সে ফাঁদটা খুলে, পঞ্চুর টুটি ধরে, ঝুলিয়ে নিয়ে চলল। বাড়ীর উঠোনে পৌঁছে পিতলের কড়া-বসান শক্ত একটা বকলস এনে তার গলায় বেশ করে এঁটে একটা লম্বা শিকল দিয়ে তাকে দেয়ালের সঙ্গে বেঁধে রাখলে। বললে “ভালই হয়েছে, আমার কুকুরটা আজ মারা গেছে—আজ থেকে তুই তার হ’য়ে পাহারা দিবি। দেখ্ রুষ্টি যদি হয় তো কুকুরের ঘরটার মধ্যে গিয়ে শুয়ে থাকবি। দেখিস কান খাড়া করে থাকবি, চোর ডাকাতে এলে যত পারিস চৈঁচাবি।”

ভুকুম দিয়েই কর্তা বাড়ীর মধ্যে গিয়ে ঘুমের আয়োজন করলেন।

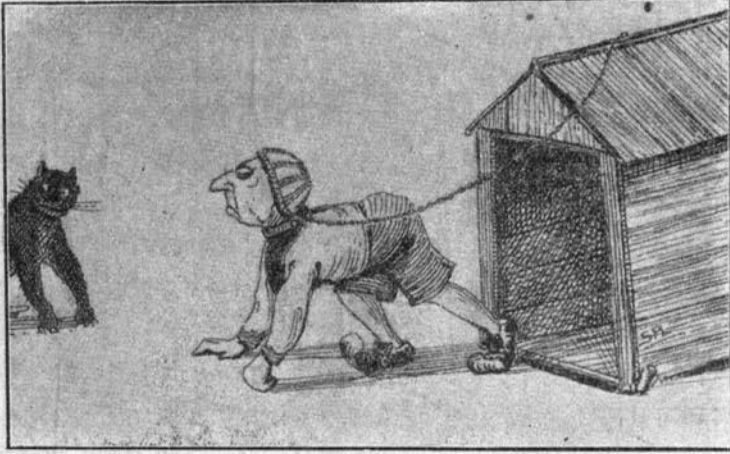
ভয়ে, ক্ষিদেয়, শীতে আধমরা মত হয়ে পঞ্চু মাটির উপর পড়ে রইল। একশবার গলার বকলসে হাত দিয়ে বলতে লাগল, “আহা যদি ভাল ছেলে হ’তাম,

বাবার কথা শুনতাম, তাহলে কি আজ চাষার ছয়োরে শিকল বাঁধা কুকুর হ'য়ে থাকতাম?" আপন মনে বকে বকে সে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘণ্টাকয়েক ঘুমের পরে শুনলে উঠোনে কারা যেন ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছে। ঘরের মধ্যে হতে মুখ বাড়িয়ে দেখে কি চারটে বড় বড় কালো কালো বন-বেড়াল চুপি চুপি কি পরামর্শ আঁটছে। তাদের একজন এগিয়ে কুকুরের ঘরের কাছে এসে চাপা গলায় বললে, "ওরে মানিয়া কি করছিস রে?"

পঞ্চু এগিয়ে এসে বলল, "আমার নাম তো মানিয়া নয়,—পঞ্চুলাল!"

"কেন মানিয়া কোথায় গেল?—সেই যে বড় কুকুরটা?"

"সে ত আজ সকালে মারা গেছে—আমি তার জায়গায় পাহারা দিচ্ছি।"



"তাহলে মানিয়ার সঙ্গে যে বন্দোবস্ত ছিল, তোমার সঙ্গেও তাই করব। হুগুয় আমরা আটটা করে মুরগির ছানা চুরি করে নিয়ে যাব—তার মধ্যে তোমায় একটা দেব! কিন্তু বাপু সাবধান! যদি সোরগোল কিছু কর আর গৃহস্থ খবর পায়, তাহলে তোমায় আর আস্ত রাখব না—ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করব।"

এই ব'লে বেড়াল গুলো আপনাদের নিরাপদ চুপিচুপি আঙ্গিনায় যেখানে মুরগি আর তার ছানাগুলি ছিল সেখানে একে একে গিয়ে ঢুকে পড়ল। সবাই যখন গেছে তখন পঞ্চু দরজাটা খুব জোরে বন্ধ করে তার গায়ে মস্ত একটা পাথর

ঠেসিয়ে দিয়ে কুকুরের মত ভৌ ভৌ করে ডাকতে লাগল। ডাক শুনেই গৃহস্থ বিছানা হতে লাফ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, “ব্যাপার খানা কি?”

পঞ্চু বললে “মুরগির ঘরে ডাকাত পড়েছে।”

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে গৃহস্থ মুরগির ঘরে গিয়ে পড়ল। তার পর বেড়াল কটাকে ছালায় ভরে বললে, “বাছাধনরা সব এতদিনে ধরা পড়েছে। ইচ্ছে করছে তোমাদের গায়ের চামড়া খুলে নিয়ে ডুগডুগি বাজাই। যাক্ তা আর করব না, পাঁঠার মাংসের দোকানে দেব, তারা যা ভাল বোঝে করবে এখন।”

তারপর পঞ্চুকে আদর করে শিকল আর বকলস খুলে তাকে স্বাধীন করে দিলে। ছাড়া পেয়েই পঞ্চু বনশ্রীর বাড়ীর পথে দৌড় দিলে। পথের ধারে বন, বনের মধ্যে সেই মস্ত বট গাছ, যে গাছে পঞ্চুর ফাঁসী হয়ে ছিল,—সবই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল, কেবল বনশ্রীর বাড়ীর চিহ্নমাত্রই কোথাও চোখে পড়ল না। তার বৃকের মধ্যেটা ধড়াস করে উঠল, ভয়ে মুখ শুকিয়ে উঠল। যেখানে বাড়ীখানা ছিল, সেখানে গিয়ে দেখে একটি নতুন ছোট মন্দির রয়েছে—মন্দিরের দরজায় গায়ে লেখা রয়েছে—

শ্যামা বনশ্রী।

তার ছোট ভাই পঞ্চু তাকে ত্যাগ করে গেল—

সেই দুঃখে বনশ্রীর মৃত্যু হয়।

এই তার স্মৃতি মন্দির।

পঞ্চু অতি কষ্টে বানান করে করে যখন এই কথাগুলি পড়লে তখন সে কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে মাথা কুটতে কুটতে বললে, “ও দিদি, কেন তুমি মরে গেলে। আর আমার বাবা, তাকে আমি কোথায় খুঁজে পাব, ওগো আমি কোথায় যাব, কি করব গো, কি আমি করব?” তার এই কান্নাকাটি শুনে একটা পায়রা সেইখানে উড়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, “আচ্ছা, পঞ্চু ব’লে কাউকে তুমি জান?”

“কি বললে? পঞ্চু? ওমা আমিই যে পঞ্চু—।”

কবুতরটা জিজ্ঞাসা করলে, “তুমি গুপী ছুতোরকে জান?”

“জানিনে? বল কি? সে যে আমার বাবা, আমায় তুমি তার কাছে নিয়ে যাবে?”

“তাই ত! আজ তিন দিন হ’ল তাকে যে জগন্নাথক্ষেত্রে দেখে এসেছি”।

“এখান থেকে কত দূরে সেই জগন্নাথক্ষেত্র?” “এই তিনশো ক্রোশ হবে!”

“ওগো নীল পায়রা, ওগো সুন্দর পাখী ! আমায় তুমি সেখানে নিয়ে যাবে” ?

“তা তুমি যদি যেতে চাও তো নিয়ে যেতে পারি।”

বলতে না বলতে পঞ্চ তার পিঠের উপর চড়ে বসে, ঘোড়ার মত হেট হেট করে তাকে চালাতে লাগল।

সারাদিনটা উড়ে উড়ে সন্ধ্যার সময় কবুতর বল্লি আমার ভারী ক্ষিদে লেগেছে। এস আমরা ঐ যে কবুতরের খোপ দেখা যাচ্ছে—ঐখানে ছদণ্ডের জন্তো নামি। একটু খেয়ে জিরিয়ে তাজা হয়ে, তারপর আবার উড়ে যাওয়া যাবে এখন। কাল সকালেই সমুদ্র তীরে পৌঁছে যাব।

তারা একটা খালি কবুতরের খোপে গিয়ে নামল। সেখানে একটা ছোট গামলায় জল আর একটা ডালায় কতকগুলো পায়রা মটর ছিল। কবুতরটা জল খেয়ে কতকগুলো মটর খুঁটে খেয়েই খুসী হয়ে বসে রইল। পঞ্চ বেচারী জীবনে কখনো পায়রা মটর মুখেও দেয়নি, কিন্তু আজ ক্ষিদের জ্বালায় সেও তাই খেয়েই খুসী হ’ল।

খাওয়া দাওয়া সেরে, জিরিয়ে আবার তারা যাত্রা করলে। ভোরের আলো ভাল করে দেখে দেবার আগেই তারা জগন্নাথক্ষেত্রে সমুদ্র তীরে হাজির হ’ল। সেখানে অনেক মানুষ জন, সমুদ্রের দিকে ভারী চোঁচামেচি করছে, একে ওকে তাকে ঠেলা দিয়ে পঞ্চ ভিড়ের মধ্যে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলে “হ্যাঁ গা এত গোলযোগ কিসের ?” একজন বললে, “ছেলে-হারা একটি বাপ, তার ছেলে খুঁজতে ওপারে যাবে বলে যাত্রা করেছে—তারপর ঝড় উঠে, ঐ দেখ না, ছোট নৌকাখানা টলমল করছে, এখনি ডুবে যাবে বুঝি !”

ভাল করে দেখে পঞ্চ গুপীকে চিনতে পেরেই “ঐ যে আমার বাবা,” বলে চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। এদিকে ঝড়ের দাপটে ছোট নৌকা আর বাঁচেনা, এই ডোবে বুঝি ! পঞ্চ হাত পা ছুঁড়ে কত রকম ইসারা ক’রে ডাকতে লাগল—গলা ফাটিয়ে “বাবা গো” বলে ডাক ছাড়লে। একবার যেন মনে হল গুপী তাকে চিনতে পেরেছে ; কিন্তু সেই ঝড়ে আর বৃষ্টিতে তীরে ফিরে আসা অসম্ভব। হটাৎ মস্ত একটা ঢেউ লাফাতে লাফাতে হাত বাড়িয়ে এসে এক হেঁচকা টানে নৌকাখানিকে নিয়ে জলের মধ্যে ডুব মারলে, আর তাকে দেখা গেলনা। তীরের লোক হায় হায় করে উঠল, পঞ্চ ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে একেবারে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাঠের পুতুল হাঙ্কা জিনিষ, কিছু দূর পর্যন্ত ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে, স্পষ্ট দেখা

গেল,—তারপর সেও যে ঢেউএর মধ্যে কোথায় তলিয়ে গেল, আর ঠাণ্ড হ'ল না।
তীরের লোক আবার হায় হায় করে উঠল—কেউ বললে “হায়রে বাপ”, কেউ বললে
“হায়রে হতভাগা ছেলে”—আর বুড়ো শূড়ো মানুষরা জপের মালার থলিটা মাথায়
ঠেকিয়ে নারায়ণ নারায়ণ বলতে বলতে বাড়ীমুখো চলে গেল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রিয়দেবী দেবী।

যর্ণশেৰ্ণ

(গল্প)

এক দেশে মন্ত এক পণ্ডিত ছিলেন। পৃথিবীর যত ভাষা সব তিনি বুঝতেন,
যত রকম বিদ্যা আছে সব তাঁর জানা ছিল। স্বর্গে-মর্ত্তে-পাতালে, আকাশে-
বাতাসে-জলে, আলোয়-আঁধারে যে কেউ আছে, যত কিছু আছে, সকলকার খবর
তাঁর নখদর্পনে ছিল। মানুষদের ত তিনি চিন্তেনই ভূত-প্রেত দৈত্য-দানব যক্ষ-
রক্ষ কিন্নর-গন্ধর্ব এদের সকলকার সঙ্গেই তাঁর পরিচয় ছিল। এত জিনিষ তো
মনে রাখা যায় না, কাজেই লোহার সিন্ধুকের মতন মন্ত একটা খাতা তৈরি করে
এই সব খবর, এদের সব ঠিকানা, সাটে লিখে রাখতেন। তবু এত লিখতে হয়েছিল
যে অত বড় খাতা খানা ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। আকাশের মধ্যে কিম্বা বাতাসের
মধ্যে যারা আছে তাদের কাউকে ডাকতে হলে কিম্বা কিছু খবর পাঠাতে হলে কিম্বা
মন্তর টম্বর পড়ে জাহ্নু করবার দরকার হলে তিনি এই খাতা খুলতেন, নইলে আর
সব সময় লোহার শিকলে বাঁধা সোণার তালা-চাবি দিয়ে সেটা বন্ধ থাকত—
পাহাড়ের গুহার মত অন্ধকার একটা ছোট্ট চোর-কুটুরির মধ্যে। তাঁর বিছার
বলে তিনি লোহাকে সোণা মানুষকে ভেড়া করতে পারতেন; যখন খুসী ভূত-প্রেত
দৈত্য-দানাদের ডেকে সৃষ্টিছাড়া কাজ করিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু কাউকে
তিনি এ বিদ্যা শেখাতেন না। কত লোক তাঁর পায়ে ধরে কাঁদাকাটি করত, তবু
তিনি এই সব বিদ্যার একটি ফোঁটাও কাউকে দিতেন না। পাছে কেউ খাতা থেকে
তাঁর বিদ্যা চুরি করে নেয়, এই ভয়ে খাতা কোথায় লুকোন আছে কাউকে জানতেও
দিতেন না। জানত শুধু তাঁর ক্ষুদ্রে চাকর।

পণ্ডিত যখন সেই অন্ধকার চোর কুঠিরির মধ্যে বসে বসে নানা রকম অদ্ভুত কাণ্ড কারখানা করতেন, তখন ওই ক্ষুদ্রে সেই সব দেখে অবাক হয়ে যেত। সে ছিল ভারি গরীব। তার মনিব বড় বড় কালো কালো লোহার চাঁই গুলোর উপরে মন্ত পড়া জল ছিটিয়ে চক্চকে সোণার চাঁই করে ফেলতেন তাই দেখে তার ভারি লোভ হত। তার মনে হ'ত ওই মন্তুর পড়া জল যদি একটু খানি পাই তাহলে—উঃ কি যে হয়! কিন্তু কিছুতেই তার ভগ্যে ওই জলের একটি ফোঁটাও জোটে না। যখনই সে জল পড়ার বাটির খোঁজ করত, সে দেখত বাটির গায়ে একটি ফোঁটাও জল নেই—সেটা যেন একটা খটখটে মরু ভূমির মতো শুকিয়ে আছে। এমন তাপ যে তার গায়ে হাতই দেওয়া যায় না, তখন তার কেবলই মনে হত যদি ওই বইখানা একবার খোলা পাই তাহলে লোহাকে সোণা করবার মন্তুরটা বার করে নি। কিন্তু সে বই লোহার শিকল দিয়ে এমন আঁপো-পিপো বাঁধা যে খোলে কার সাধ্য। আর তার চাবি তার মনিব যে ফুস্-মন্তুর কোথায় উড়িয়ে দিত খোঁজই পাওয়া যেত না। কাজেই খুব ইচ্ছে হলেও ক্ষুদ্রের লোহা থেকে সোণা করা হয়ে উঠল না। তার দিন যেমন দুঃখে যাচ্ছিল তেমনি দুঃখে যেত লাগল।

একদিন হল কি, ক্ষুদ্রের মনিব-ঠাকুর তাড়াতাড়ি কেমন অন্তমনস্ক হ'য়ে কি কাজে বেরিয়ে গেলেন, তাঁর সেই খাতার চাবি বন্ধ করা হল না—খাতা খোলাই পড়ে রইল। ক্ষুদ্রে গিয়েছিল বাজারে। ফিরে এসে দেখে এই ব্যাপার! তার ভারি ফুর্টি হল। সে ছুটে খাতা খানার কাছে গিয়ে খুব তাড়াতাড়ি তার পাতা উন্টোতে লাগল—কি জানি দেরি হলে যদি মনিব ফস্ করে এসে পড়ে। কোথায় আছে সোণা করবার মন্তুর তাই সে মহা ব্যস্ত হয়ে খুঁজতে লাগল। সোণা, সোণা, সোণা—পাতাই উন্টে যাচ্ছে কিন্তু কোন পাতাতেই সোণার নাম গন্ধও নেই—যা একটু আছে তা কেবল অন্ধরের গায়ে সোণার কালিতে। খুঁজতে-খুঁজতে যতই সময় যায় তার মন ততই ছটফট করে ওঠে। তার মনে হচ্ছিল অনেক কষ্টে অনেক হেঁটে হেঁটে সে সোণার পাহাড়ের কাছে প্রায় এসে পড়েছে—কিন্তু এই বুঝি গেল ফস্কে! এক একবার যেই মনে হয় সিঁড়িতে ঐ বুঝি পায়ের শব্দ—অমনি তার বুকের রক্ত শুকিয়ে ওঠে—হায়, হায়! হল না, হল না!

সে খুব তাড়াতাড়ি পাতা ওন্টোতে লাগল, কিন্তু যতই সে পাতা উন্টোয় ততই

যত সব বিদঘুটে কথা তার চোখে পড়ে। তার একটি কথাও তার জ্ঞানে সে শোনেনি। এমনি করে অনেক পাতা ওপ্টাবার পর হঠাৎ এক জায়গায় থেমে তার মনে হল এইবার বুঝি সোণার সন্ধান পেলুম! পাতার মাথায় বড় বড় সোণার অক্ষরে লেখা রয়েছে—“যর্ণশেৰ্ণ”। সে শুনতে পণ্ডিতমশাই সোনাকে ‘যর্ণ’ বলতেন। মনের আনন্দে সে চীৎকার করে উঠল—“যর্ণশেৰ্ণ”। অমনি এই কথার শব্দ মিলতে না মিলতেই বাড়ী কাঁপিয়ে সেই অন্ধকার চোর-কুঠুরির লোহার দরজা মড় মড় করে ভেঙ্গে এক প্রকাণ্ড কালো মূর্তি ক্ষুদের সামনে এসে হাজির হল। ক্ষুদে ত দেখেই ভয়ে প্রায় অজ্ঞান। হাত থেকে খাতার খোলা পাতাগুলো খসে গেল। সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি কটমট করে বিকট চীৎকার করে উঠল—“কি চাই? কেন



আমায় ডাকলি?” ক্ষুদে কাঁদো কাঁদো হয়ে মুখ ফুটে বলতে না পেরে মনে মনে বিড় বিড় করে বললে—“কখন তোমায় ডাকলুম?” সেই ভীষণ মূর্তি দাঁত কড় মড় করে বলে উঠল—“আমি দৈত্য-রাজ যর্ণশেৰ্ণ। শীগ্গির বল কি চাই।” ক্ষুদে ভয়ে কিছুই বলতে পারল না।

দৈত্য আরো রেগে বলে উঠল—“হুকুম দে বলছি, নইলে এখনি তোর গলা টিপে মেরে ফেলব।” ক্ষুদে এমন ভেবড়ে গেল যে কি হুকুম দেবে কিছু মনেই আনতে পারল না। দৈত্য আবার চীৎকার করে উঠল—“হয় কাজ দে, নয় তোকে খেয়ে ফেলে আমার কাজ চুকিয়ে যাই!” বলতে বলতে তার

লম্বা নখওয়ালা আঙুলগুলো তার গলার কাছে এগিয়ে এল। ক্ষুদের মনে হল, ব্যাস্

গেলুম এইবার। কথা বলতে গেল কিন্তু ভয়ে গলা শুকিয়ে এমন কাঠ হয়ে গেছে যে একটি কথাও বার হল না। একটুখানি জল পাবার জন্তে তখন তার প্রাণ ছটফট করতে লাগল। তারপর যখন দৈত্যের আঙুলগুলো তার টুটি চেপে ধরে ধরে, এমন সময় তার গলা ফেটে শব্দ উঠল—“জল! জল!”

হুকুম পেয়ে দৈত্য তখনি ছুটল জল আনতে। জলের পর জল—ঘড়া ঘড়া জল, জালা জালা জল এনে ঘরের মধ্যে ঢালতে লাগল। জল আনা আর তার থামে না। জল আনার হুকুম পেয়ে সে কেবল জলই আনতে লাগল। দেখতে দেখতে জলে ঘর ভেসে গেল। এক হাঁটু জল, এক কোমর জল, এক গলা জল,—তখনও জল আনা বন্ধ হয় না। কি ক’রে হুকুম থামাতে হয় ক্ষুদে জানত না, তার ভাববার শক্তিও ছিল না। কাজেই দৈত্যের জল আনাও থামল না। ক্ষুদে প্রায় ডুবু ডুবু হয়ে এল। দেখলে আর তার নিস্তার নেই। মনে মনে তার ছুঃখু হতে লাগল—হায় হায়! কেন সোণার লোভ করলুম, শেষে যে প্রাণে মলুম!

দেখতে দেখতে জল এসে ক্ষুদের নাকের ডগায় এসে ঠেকল—দম বন্ধ হয়ে আসবার জোগাড়। ক্ষুদে হাঁপাতে লাগল। ঠিক এই সময় তার মনিব এলেন ফিরে। পথে যেতে যেতে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল—ঐ যাঃ খাতার চাবিটা কি হ’ল? খাতাখানা কি বন্ধ করতে ভুলে গেলাম? তাই তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলেন। এসে দেখেন এই কাণ্ড—বাড়ি জলে জলময়! প্রথমে তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না; শেষে ধ্যানে বসে যখন সব জানতে পারলেন তখনি তিনি মন্ত্র পড়ে সব জল শুষে দৈত্যকে তাড়িয়ে ক্ষুদের প্রাণ রক্ষা করলেন। ক্ষুদে রক্ষা পেলে বটে, কিন্তু পণ্ডিতের সেই অতদিন ধরে অত কষ্টে লেখা খাতাখানি জলে ভিজে একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। সেই ছুঃখে পণ্ডিত যে কোথায় কোন্ বনে চলে গেলেন তাঁর আর কোন খবরই পাওয়া গেল মা। ক্ষুদের সোণার লোভও সেই বানের জলে ভেসে গিয়েছিল, কাজেই সেও মনিবের সঙ্গে সঙ্গেই বনে চলে গেল।

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

সহজে কি বড় লোক হওয়া যায় ?

(উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত)

(২)

এইভাবে কতক্ষণ ছিলাম বলিতে পারি না। হঠাৎ নৌকাখানি একদিকে যাইয়া ঠেকিল। চমকিয়া দেখিলাম কতকগুলি বড় বড় নৌকা, তাহারি একটাতে আমার নৌকা ঠেকিয়াছে। আমি সেই মুহূর্তের জন্য আশ্বস্ত হইলাম, কিন্তু তার পরক্ষণেই নৌকা হইতে কতকগুলি কালো অর্দ্ধ-উলঙ্গ লোক বাহির হইয়া কেউ মেউ করিয়া কি বলিতে লাগিল; আমি বুঝিতে পারিলাম আমাকে গালি দিতেছে। তাহারি আমার কথা বুঝিল বলিয়া বোধ হইল না। আরো বেশী গালাগালি দিতে লাগিল। ক্রমে অস্থান্য নৌকার লোক আসিয়া গোলমালে যোগ দিল। আমার কথা শুনিয়া সকলেই ঐ লোকগুলিকে গালি দিতে লাগিল। একটি ভদ্রলোক সেখানে ছিলেন; তিনি দয়া করিয়া আমাকে তাঁহার নৌকায় লইয়া গেলেন। নিজ হাতে আমার পুটলীটি যত্নপূর্বক এক কোণে রাখিয়া দিলেন। তারপর আমাকে বলিলেন “আমি কা— যাইতেছি; তোমার আপত্তি না থাকিলে আমার সঙ্গে যাইতে পার। আমার বাড়ীতে তোমার কোন ক্লেশ হইবে না।” আমি তাঁহার সঙ্গেই চলিলাম।

কা—ছোট একটা সহরের মত। অনেক লোক। বড় লোকও অনেকগুলি আছেন। আমি যাহার সঙ্গে গিয়াছিলাম, তাঁহাকে এখানে কালিদাস বাবু বলিব, —তিনিও একজন বড় লোক। এ সব দেখিয়া শুনিয়া আমার পুরাতন রোগ আবার দেখা দিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম এখানে থাকিয়া বড় লোক হওয়া যায় কি? যায় বৈ কি। না হইলে ইহারা এত গাড়ী ঘোড়া চড়ে কি করিয়া? বোধ হইল যেন কালিদাস বাবুর বাড়ীতে থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ একদিন বড় লোক হইয়া যাইব।

একদিন কালিদাস বাবু ডাকিলেন। কালিদাস বাবুর উপর প্রথম হইতেই আমার বড় শ্রদ্ধা হইয়াছিল। যখনই তিনি আমাকে ডাকিতেন তখনই একখানা সুন্দর কিছু উপহার পাইতাম। আমার বয়সের অনেকেই এখন ভাল কাজ করিতেছেন; কিন্তু আমার যেন তখনও শিশুভাবটা যায় নাই। কালিদাস বাবুও তাহা বেশ বুঝিতেন; যাহা হউক আমি কালিদাস বাবুর নিকট যাইয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার নাম ধরিয়া বলিলেন, “গিরিশ, এখানে তোমার কেমন লাগে?”

“দিব্যি।”

“বটে ? তা এখান থেকে তোমার আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না ?”

“কোথায় যাব ? এখানেই থাকবো।”

“তা বেশ” বলিয়া কালিদাস বাবু কপাল হইতে চশমা নামাইয়া ছাপার কাগজ পড়িতে লাগিলেন। কাগজের প্রথম পাতে একটা ছবি। আমার সেই সাহেব ! আমি একটু আশ্চর্য্য হইলাম। অনেক দিন পরে কোন পরিচিত বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইলে যেরূপ হয় আমারও সেইরূপ হইল। একটা ছোট কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইল ; আমি বলিয়া উঠিলাম “আরে !” কালিদাস বাবু কাগজ নামাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার অর্থ, ব্যাপার খানা কি ?

আমি বলিলাম, “আজ্ঞে ঐ ছবিটে !”

“ইনি একজন বড়লোক ছিলেন ; তোমারও বড় লোক হতে ইচ্ছে হয় না ?” আমি ভাবিলাম এই বুঝি ! হঠাৎ প্রশ্ন হওয়াতে খতমত খাইয়া বলিলাম, “বড় লোক কি সবাই হয় ?

“হয় বৈ কি। ইচ্ছে করলে তুমিও হ’তে পার।”

“আমি পারি ?”

“অবিশিষ্ট। কাল থেকে তোমাকে ইস্কুলে পাঠিয়ে দিব ভেবেছি। লেখা পড়া না শিখলে বড় লোক হওয়া যায় না। তাই তোমাকে ডেকেছিলাম। কেমন ?”

আমার বাতাসের ঘর ভাঙ্গিয়া গেল। যার চোটে বাড়ী ছাড়া সেই আপদ ! আমি কোন কথা কহিলাম না। কালিদাস বাবু এত সন্দেহ করেন নাই, সুতরাং কিছু বলিলেন না। এরূপ কথাবার্তা কালিদাস বাবুতে আর আমাতে অনেক দিন হইত। তিনি আমার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন :—“সেই রাত্রিতে সেই নৌকায় কেমন করিয়া আসিলে ?” “বাড়ী কোথা ?” “মা বাপ নাই ?” ইত্যাদি ;— আমি প্রায়ই চুপ করিয়া থাকিতাম। কালিদাস বাবুর ইচ্ছা ছিল, সুযোগ পাইলেই আমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু এ সব সম্বন্ধে কোন খবরই আমি তাঁহাকে দিতে চাহিতাম না। তখন তিনি সে বিষয়ে ক্লান্ত হইয়া সেখানেই আমাকে লেখাপড়া শিখাইবার মনস্থ করিলেন।

ইস্কুলে যাইয়া অবধি আমার আর মনে শান্তি ছিল না। কয়েক দিন কোন মতে কাটাইলাম, কিন্তু শেষটা অসহ্য হইয়া উঠিল। কালিদাসবাবুর বাড়ীতে থাকা

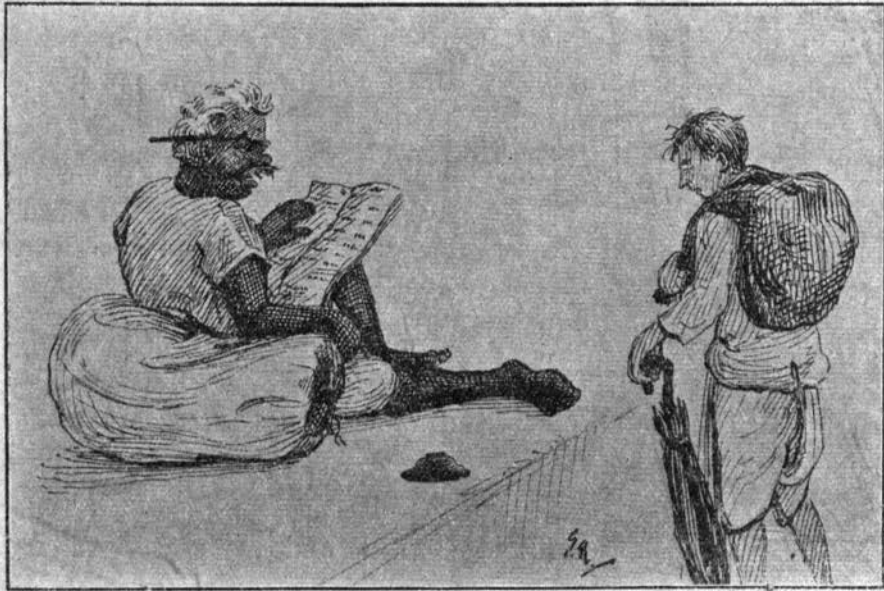
হইবে না। কিন্তু হঠাৎ যাই কোথায় ? গেলেও আর এবার হাঁটিয়া যাওয়া হইবে না। কা—হইতে দুখানা ষ্টিমার ধু—তে যাতায়াত করিত। সপ্তাহে দুদিন ষ্টিমার চলে। ধু— যাইতে তিন দিন লাগে। হিন্দুরা এই তিন দিনের চিড়ে পুটলী বাঁধিয়া লইয়া জাহাজে উঠে। ভোর বেলা কা— হইতে জাহাজ ছাড়ে।

একদিন নদীর ধারে বেড়াইতে যাইয়া দেখি একখানা ষ্টিমার এইমাত্র আসিয়া ঘাটে থামিল। পরের দিন ভোরে চলিয়া যাইবে। হঠাৎ ষ্টিমারে উঠিয়া ধু— চলিয়া যাইতে আমার বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল। বাড়ী আসিয়া কেহ না দেখে এমন ভাবে আমার কাপড় চোপড় সব একত্র জড় করিলাম। কালিদাস বাবুর বাড়ী আসিবার কালে সঙ্গে করিয়া যে টাকা আনিয়াছিলাম তাহার একটীও ব্যয় হয় নাই। কালিদাস বাবুও মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছামত খরচ করিবার জন্য দু একটা দিতেন। আমি সমস্তই সংরক্ষণ করিতাম। শুনিয়াছিলাম বড় লোকেরা সহজে টাকা খরচ করিতে চাহে না।

যাত্রার উপযোগী সকল জিনিষ প্রস্তুত রাখিয়া ঘুমাইলাম। মনে একটা চিন্তা থাকিলে সহজে ঘুম হয় না, ঘুম হইলেও শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যায়। আমারও তাই হইল। বড় কামরার ঘড়ীতে চারিটা বাজিল, আমি অমনি উঠিলাম। সঙ্গে পুটলীটি। পুটলীতে কয়েকখানা কাপড়, একজোড়া চটী জুতা, নগদ কিছু টাকা, কালিদাস বাবু মাঝে মাঝে যে উপহার দিতেন সেগুলি—কয়েকখানা ছবি, একটা বড় ছুরি,—আর আমার স্কুলের পুস্তকগুলি। পুস্তকগুলি কেন সঙ্গে লইলাম ঠিক বলিতে পারি না; তবে কালিদাস বাবু বলিয়াছিলেন “লেখাপড়া না শিখলে বড়লোক হওয়া যায় না,” তাহাতেই মনে কেমন একটা ভয় রহিয়া গিয়াছিল। এইরূপ সাজ সজ্জা করিয়া, ছাতাটা হাতে করিয়া, বিছানার চাদরখানা পুটলীর উপর জড়াইয়া লইয়া আস্তে আস্তে বাহির হইলাম। ষ্টিমার-ঘাটে আসিতে অধিকক্ষণ লাগিল না। সেখানেই মৃদীর দোকান আছে, সেই দোকান হইতে চিড়ে কিনিয়া বিছানার চাদরের এক কোণে বাঁধিয়া লইয়া, জাহাজের একজন লোক আমাকে একটা জায়গা দেখাইয়া দিল, আমি সেইখানে যাইয়া বসিলাম। জাহাজে বিশেষ কিছু ঘটনা হইল না। তবে সঙ্গে যে টাকা আনিয়াছিলাম তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। নিয়মিত সময়ে জাহাজ ধু—পৌঁছিল।

রামলোচন বাবু আমাদের ওদিককার লোক, তিনি ধু—তে থাকেন, সেখানকার

একজন নামজাদা উকীল। আমি ভাবিলাম দেশের একজন লোক, তাঁর কাছে গেলে তিনি অবশ্যই কিছু খাতির করিবেন। জাহাজ হইতে উঠিয়াই তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। একটা ভদ্রলোক তাঁহার বাড়ী দেখাইয়া দিলেন। আমি আস্তে আস্তে বাড়ীর একজন চাকরের মত লোককে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম “রামলোচন-বাবুর এই বাড়ী?” সে লোকটা আমার কথার উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক আমার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না। মুখ বিকৃত করিয়া একটা বড় ঘরে চলিয়া গেল; অগত্যা আমি অস্থায়ী লোকের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সে যাহা বলিল তাহাতে জানিলাম, আমি যাহাকে রামলোচনবাবুর চাকর মনে করিয়াছিলাম, তিনিই রামলোচনবাবু। তাই অত রাগ! আমি ভয়ে ভয়ে রামলোচনবাবুর ঘরের দরজায় দাঁড়াইলাম। তিনি একটা তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। অত কালো আমি আর দেখি নাই। মোটা বেশী নন, কিন্তু প্রায় বৃকের উপর কাপড় পরেন। গৌপগুলি সোজা সোজা। চুল অধিকাংশ পাকিয়া গিয়াছে। কাণে একটা কলম।



হাঁটুর উপর পর্যন্ত কাপড় টানিয়া বসিয়াছেন। উরুদেশের উপর একটা লম্বা

খাতা রাখিয়া তাহাই দেখিতেছেন, আর মাঝে মাঝে উদ্দেশে কাহার প্রতি মুখ বাঁকাইতেছেন। তাকিয়ার একটা অংশ কলম পুঁছিবার স্থান বলিয়া বোধ হইল। কিছুকাল পরে দেখিলাম যে তাহা নহে। পাশে একটা মাটির দোয়াত। তাহা হইতে ঘাঁটিয়া এক কলম কালি লইয়া খাতায় যেন কি লিখিলেন। তারপর কলমটি মাথার চুলে ঘসিয়া কাণে বসাইয়া হাতের দুটা আঙুল তাকিয়ার ঐ স্থানটিতে পুঁছিলেন। তার পরক্ষণেই এক হাতের কল্লুই তাকিয়ার উপর রাখিয়া, এক খানা পা আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া ‘ভাউ’ শব্দে উদগার করিলেন। শেষটা আমার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। প্রথম প্রশ্ন হিন্দি ভাষায় হইল; তাহার পর বাঙ্গালা।

“কি চাই?”

“আজ্ঞে আমি অনেক দূর থেকে এসেছি—”

“আমিও অনেক দূর থেকে এসেছি।”

“আমার নিবাস স্মু—।”

“আমারও নিবাস স্মু—। তারপর?”

“মহাশয় যদি—”

“ম—হা—শ—য়—যদি। কি—কিৎ—সা—হা—য্য? দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার আমার কাছে নাই। হিঁয়াসে চলে যাও।”

(ক্রমশঃ)

বোকা বণিক

(জাতকের গল্প)

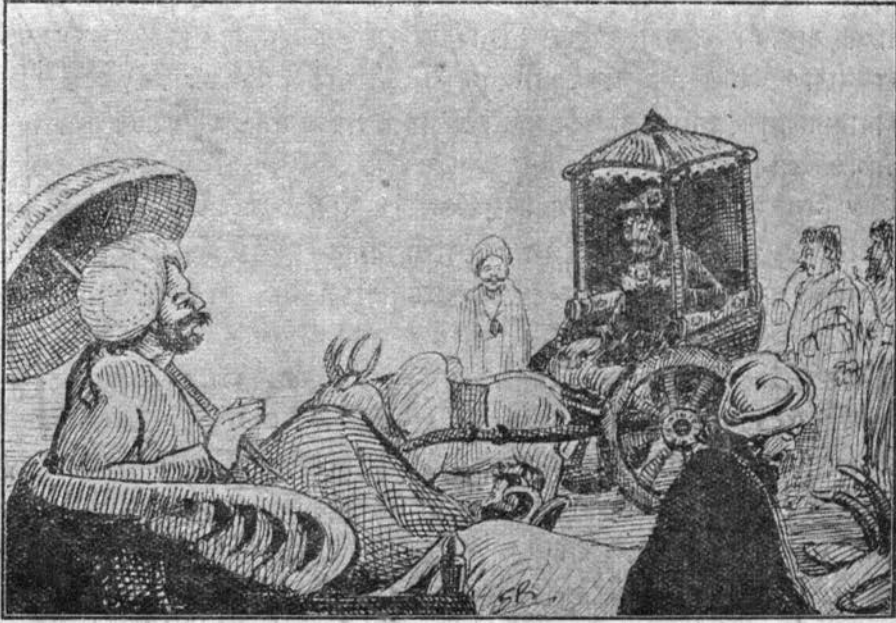
পূর্বকালে বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে এক বণিকের ঘরে জন্মিয়াছিলেন। বড় হইয়া তিনি নানা রকমের জিনিস পত্রে পাঁচশত গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া দেশে দেশে বাণিজ্য করিতে লাগিলেন। তখন বারাণসীতে আরও একজন যুবক বণিক ছিল; তাহার বুদ্ধি শুদ্ধি কম ছিল বলিয়া সকলে তাহাকে “বোকা বণিক” বলিত। লোকটি বাস্তবিকই ভারি বোকা ছিল, কোন্ অবস্থায় কিরূপ ভাবে কাজ করিতে হয় তাহা বুঝিতে পারিত না।

বোধিসত্ত্ব একবার অনেক মূল্যবান জিনিস পত্রে গাড়ী বোঝাই করিয়া কোন দূরদেশে বিক্রয় করিতে যাইবেন, এমন সময় শুনিলে সেই বোকা বণিক্‌ও পাঁচশ গাড়ী মাল লইয়া ঠিক সেই দেশেই যাইবার আয়োজন করিতেছে। তখন বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন—“তুই জনের এক হাজার গাড়ী এক সঙ্গে একই পথে গেলে ভারি অসুবিধা হইবে। এক হাজার লোক ও তুই হাজার বলদের খাও ও জল এক সঙ্গে সংগ্রহ করা সহজ হইবে না। তা ছাড়া এক হাজার বোঝাই গাড়ীর চাকায় রাস্তা যে চূরমার হইয়া যাইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব, একজন আগে এবং অন্ত্রজন কিছুদিন পরে গেলেই ভাল হয়।” মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া বোধিসত্ত্ব সেই বণিক্‌কে ডাকাইলেন এবং তাহাকে সমস্ত কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“এখন বলত, তুমি আগে যাইবে কি পরে যাইবে?” বোকা বণিক্‌ ভাবিল—“আগে গেলে, ভাল রাস্তায় গাড়ী চালাইবার সুবিধা হইবে, বলদগুলিও প্রচুর ঘাস খাইতে পাইবে। আমাদের আহারের জন্ত ফলের অভাব হইবে না, পরিষ্কার জলও পাইব। আর আমার ইচ্ছামত দামে বেচা কেনা করিতে পারিব।” এই ভাবিয়া সে বলিল—“মহাশয়! আমিই আগে যাইব।” বোধিসত্ত্ব মনে মনে ভাবিলেন—“ভালই হইল, পরে গেলেই সুবিধা। বোকা বণিকের গাড়ীর চাকায় পথ সমান হইয়া যাইবে। উহার বলদগুলি খাইবে এখনকার পাকা ঘাস আর পরে যে কচি ঘাস গজাইবে তাহা খাইবে আমার বলদ। কোথাও জলের অভাব হইলে, ইহারা যে সকল কুয়া খুঁড়িয়া যাইবে তাহাতেই যথেষ্ট জল পাইব। জিনিসপত্রের দামও ঐ বণিক্‌ই ঠিক করিয়া যাইবে, সুতরাং দর দস্তুর করিয়া আমাদিগকে আর কষ্ট পাইতে হইবে না।”

ইহার পর একদিন বোকা বণিক্‌ পাঁচশ বোঝাই গাড়ী লইয়া যাত্রা করিল। কিছু দিন পরে গ্রাম ছাড়িয়া, এক ভয়ানক বনে গিয়া উপস্থিত। এই বন ষাট যোজন লম্বা, কোথাও বিন্দুমাত্র জল নাই এবং ইহাতে নরভোজী মায়াবী যক্ষেরা আসে। বনে ঢুকিবার পূর্বে বণিকের লোকেরা বড় বড় জালায় জল ভরিয়া গাড়ীতে তুলিয়া লইল। ক্রমে বোকা বণিকের দল যখন বনের মাঝখানে গিয়াছে তখন যক্ষদের রাজা ভাবিল—“এই বণিক্‌কে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, সঙ্গে করিয়া জল লইবার কোন প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই জল ফেলিয়া দিয়া গাড়ী হাল্কা করিবে। তারপর যখন সকলে পিপাসায় অবসন্ন হইয়া পড়িবে, তখন ইহাদিগকে সহজেই মারিয়া মনের সুখে মাংস খাইব।”

এই ভাবিয়া ছুই যক্ষরাজ মায়াবলে এক সুন্দর গাড়ী প্রস্তুত করিল। সাদা ধপ্পে দুইটি ঝাঁড় গাড়ীখানি টানিতেছে আর যক্ষরাজ জমকাল পোষাক পরিয়া তাহাতে বসিয়া আছে। তাহার মাথায় সাদা ও নীল পদ্মের মালা; চুল পোষাক সব ভিজা, গাড়ীর চাকায় কাদা মাখান। গাড়ীর আগে পিছে দশ বার জন যক্ষ যোদ্ধা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া চলিয়াছে। তাহাদেরও মাথায় পদ্ম, কাপড় চোপড় ভিজা, মুখে পদ্মের মৃণাল আর পায়ে কাদা।

পথ চলিবার নিয়ম এই যে সামনের দিক হইতে বাতাস বহিতে থাকিলে ধূলী এড়াইবার জন্য দলপতি সকলের আগে থাকেন আর পিছনের দিক হইতে বাতাস চলিলে তিনি সকলের পিছনে থাকেন। সেজন্য, সমুখে বাতাস ছিল বলিয়া, বণিক দলের আগে আগে যাইতেছিল। তাহার নিকট আসিলে, যক্ষরাজ নিজের গাড়ীখানি রাস্তার এক পাশে সরাইয়া মিষ্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিল—“মহাশয় কোথা হইতে



আসিতেছেন?” বণিকও যক্ষরাজকে পথ ছাড়িয়া দিবার জন্য নিজের গাড়ী...এক

পাশে সরাইয়া বলিল—“মহাশয়! আমরা বারাণসী হইতে আসিতেছি। আপনার মাথায় ও হাতে দেখিতেছি পদ্ম; আপনার লোকেরা মৃগাল চিবাইতেছে; আপনাদের সকলেরই পোষাক ভিজা আর গাড়ীর চাকাগুলি কাদা মাখান—তবে কি পথে বৃষ্টি হইয়াছে? এবং আসিবার সময় পথে পদ্মপুকুর দেখিয়াছেন কি?”

যক্ষরাজ বলিল—“ঐ যে কিছু দূরে গাছগুলি দেখা যাইতেছে ওখান হইতে সমস্ত বনে কেবলই জল। ওখানে সর্বদাই বৃষ্টি হয়; পথের দুই ধারে শত শত পদ্মপুকুর রহিয়াছে।” এই বলিয়াই আবার জিজ্ঞাসা করিল—“আপনারা কোথায় যাইবেন? এই সব গাড়ীতে কি মাল আছে? শেষের গাড়ীখানা দেখিতেছি খুব বোঝাই হইয়াছে—উহাতে কি মাল?” বণিক্ সকল কথার উত্তর দিয়া বলিল—“শেষের গাড়ীতে কিনা জলের জালাগুলি আছে সেজন্য উহা বেশী বোঝাই হইয়াছে।”

যক্ষ বলিল—“জল আনিয়া ভালই করিয়াছেন, এতক্ষণ জলের খুবই দরকার ছিল। কিন্তু এখন হইতে আর জলের অভাব হইবে না—সম্মুখেই যথেষ্ট জল পাওয়া যাইবে। সুতরাং জলের জালাগুলি ফেলিয়া দিন। গাড়ী হাল্কা হইবে, আপনারাও শীঘ্র শীঘ্র চলিতে পারিবেন।” এই বলিয়া যক্ষ চলিতে আরম্ভ করিয়া আবার বলিল—“আপনারা তবে যান। কথায় কথায় অনেক সময় কাটিয়া গিয়াছে—আমিও এখন চলিলাম।”

খানিক দূরে গিয়া যক্ষ যখন দেখিল যে বণিকের দল অদৃশ্য হইয়াছে, তখন সে নিজের পুরীতে ফিরিয়া গেল। বোকা বণিক দুই যক্ষের ফাঁকিতে ভুলিয়া জালাগুলি ফেলিয়া দিল, এক ফোঁটা জলও রাখিল না। এইরূপে গাড়ী হাল্কা করিয়া খুব তাড়াতাড়ি চলিল বটে কিন্তু বহুদূর গিয়াও জলের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইল না। ক্রমে দারুণ পিপাসায় কিছুতেই তাহারা আর চলিতে পারে না। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। একে পিপাসা তাহার উপর আবার পরিশ্রম, এখন কি আর বিশ্রাম না করিলে চলে? গাড়ীগুলি চারিদিকে সাজাইয়া সকলে বিশ্রামের আয়োজন করিল। কিন্তু বিশ্রাম করিবে কি? বলদগুলি জল খাইতে পাইল না; জলের অভাবে রান্নাই বা করিবে কি করিয়া? সুতরাং পিপাসা ও ক্ষুধা এই দুয়ের জ্বালায় সকলে একেবারে অবসন্ন হইয়া মাটিতে শুইয়া পুড়িল।

মধ্য রাত্রে দুই যক্ষের দল তাহাদের পুরী হইতে বাহির হইয়া গাড়ীর বলদগুলিগুহ্ব বণিকের দলটিকে শেষ করিয়া প্রস্থান করিল। এইরূপে বোকা

বণিক বৃদ্ধির দোষে দলবলের সহিত যক্ষের পেটে গেল। তাহাদের হাড়গুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া রহিল কিন্তু জিনিস পত্রের সহিত গাড়ীগুলি যেমন ছিল তেমনই রহিল—সেগুলিতে কেহই হাত দিল না।

দেড় মাস পরে বোধিসত্ত্ব তাঁহার পাঁচ শত গাড়ী লইয়া যাত্রা করিলেন। একই পথ, স্ততরাং কিছুদিন পরে সেই বনের ধারে আসিয়া উপস্থিত। তখন তিনি বড় বড় জালায় জল ভরিয়া লইলেন এবং সকলকে বলিলেন—“এখন আমরা যে বনের মধ্য দিয়া যাইব তাহার কোথাও জল পাওয়া যায় না। আর শুনিয়াছি, তাহার মধ্যে নাকি নানা রকম বিষাক্ত ফলের গাছ আছে। অতএব আমাদের না জিজ্ঞাসা করিয়া তোমরা কেহ জল খরচ করিও না কিংবা কোন অজানা গাছের ফল মুখে দিও না।”

সকলকে এইরূপে সাবধান করিয়া দিয়া বোধিসত্ত্ব সেই বনে ঢুকিলেন। ক্রমে বনের মধ্যখানে আসিলে যক্ষরাজ পূর্বের মত সাজসজ্জা করিয়া তাঁহার নিকটে আসিল এবং পূর্বের মতই সব বলিল। তাহাকে দেখিয়াই বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন—“এই জলশূন্য দেশে জল কোথা হইতে আসিবে? এব্যক্তির চোখ লাল এবং চেহারা এত উগ্র কেন? কেনই বা মাটিতে ইহার ছায়া পড়ে নাই? এ ব্যক্তি মানুষ নয়, যক্ষ। বেচারি বোকা বণিক নিশ্চয় ইহার কথায় জল ফেলিয়া দিয়া ইহার পেটে গিয়াছে।” এই ভাবিয়া তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন—“হতভাগা! দূর হ। আমরা বণিক, নিজের চোখে জল না দেখিলে কখন সঞ্চিত জল ফেলিয়া দেই না। যখন অল্প জল পাইব তখন নিজে বুঝিয়া শুনিয়াই জালার জল ফেলিয়া দিয়া গাড়ী হালকা করিব—তোমরা কাছে পরামর্শ লইতে যাইব না।” যক্ষরাজ তখন বোকা বনিয়া চলিয়া গেল।

যক্ষরাজ চলিয়া গেলে বোধিসত্ত্বের লোকেরা বলিল—“মহাশয়! ঐ লোকটি যে বলিল, ঐ দূরের গাছগুলির ওখানে বৃষ্টি হইতেছে? দেখিলাম উহাদের সকলেরই মাথায় পদ্মের মালা, চুল কাপড় সব ভিজা, সকলে পদ্মের মৃণাল চিবাইতেছে। এখানে যখন এত জল পাওয়া যায় তখন মিছামিছি জল বহিয়া কষ্ট পাই কেন? আপনি বলেন ত সব জল ফেলিয়া দিয়া গাড়ী হালকা করিয়া লই।”

তখন বোধিসত্ত্ব সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“এই বনে জলাশয় আছে একথা পূর্বের তোমরা কখন শুনিয়াছ কি?” সকলে বলিল—“না মহাশয়! এখানে জলাশয়

নাই এবং সে জন্মই এটাকে নিরুদক কাস্তার (জলশূণ্য বন) বলে।” বোধিসত্ত্ব—
 “উহারা বলিতেছিল—ঐ দূরের গাছগুলির কাছে বৃষ্টি হইতেছে। আচ্ছা, বলত, বৃষ্টি
 হইলে জলো বাতাস কত দূর হইতে টের পাওয়া যায়?”—“এক যোজন দূরে বৃষ্টি
 হইলেও ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগে।” “তোমাদের গায়ে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়াছে
 কি?”—“না মহাশয়।” “বিদ্যুতের চমক কত দূর হইতে দেখা যায়?”—“চার
 পাঁচ যোজন দূর হইতে।” “আজ তোমরা কেহ বিদ্যুতের আভা দেখিয়াছ?”—“না
 মহাশয়।” “মেঘের ডাক কত দূর হইতে শুনা যায়?”—“ছুই এক যোজন দূর
 হইতে। কিন্তু কৈ, আমরা ত আজ মেঘের ডাকও শুনি নাই।”

বোধিসত্ত্ব বলিলেন—“এখন তোমাদিগকে সত্য কথা বলিতেছি। উহারা মানুষ
 নয়—যক্ষ। উহাদের মতলব এই যে, ফাঁকিতে পড়িয়া জল ফেলিয়া দিলে আমরা যখন
 ক্লান্ত হইয়া পড়িব তখন তাহারা অনায়াসে আমাদের খাইয়া পেট ভরিবে।
 আমার ভয় হইতেছে, সেই যুবা বণিক্ নিশ্চয় জল ফেলিয়া দিয়া সকলের সহিত মারা
 গিয়াছে। খুব সম্ভব আজই আমরা তাহার সেই মাল বোঝাই গাড়ীগুলি দেখিতে
 পাইব। তোমরা শীঘ্র চল। সাবধান! একবিন্দু জলও যেন ফেলা না হয়।”

এই বলিয়া বোধিসত্ত্ব সকলের সহিত চলিলেন। ক্রমে সন্ধ্যার সময় তাঁহারা
 বোকা বণিকের গাড়ীগুলির নিকট গিয়া উপস্থিত। সে রাত্রি সকলে সেখানেই
 বিশ্রাম করিল। বোধিসত্ত্বের আদেশে কয়েকজন লোক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সারা রাত্রি
 জাগিয়া পাহারা দিল, পাছে গভীর রাত্রে যক্ষের দল আসিয়া কোন অনিষ্ট করে।

পরদিন সকাল বেলা বোধিসত্ত্ব তাঁহার নিজের কম দামের জিনিস গুলি রাখিয়া
 বোকা বণিকের গাড়ী হইতে মূল্যবান জিনিসগুলি লইলেন। তারপর গন্তব্য স্থানে
 গিয়া প্রত্যেক জিনিস উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিলেন। এইরূপে তিনি অনেক টাকা
 লাভ করিয়া নিরাপদে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার দলের একজনেরও কোন
 অনিষ্ট হইল না।

শ্রীকুলদারঙ্গন রায়।

পোকার কীর্তি

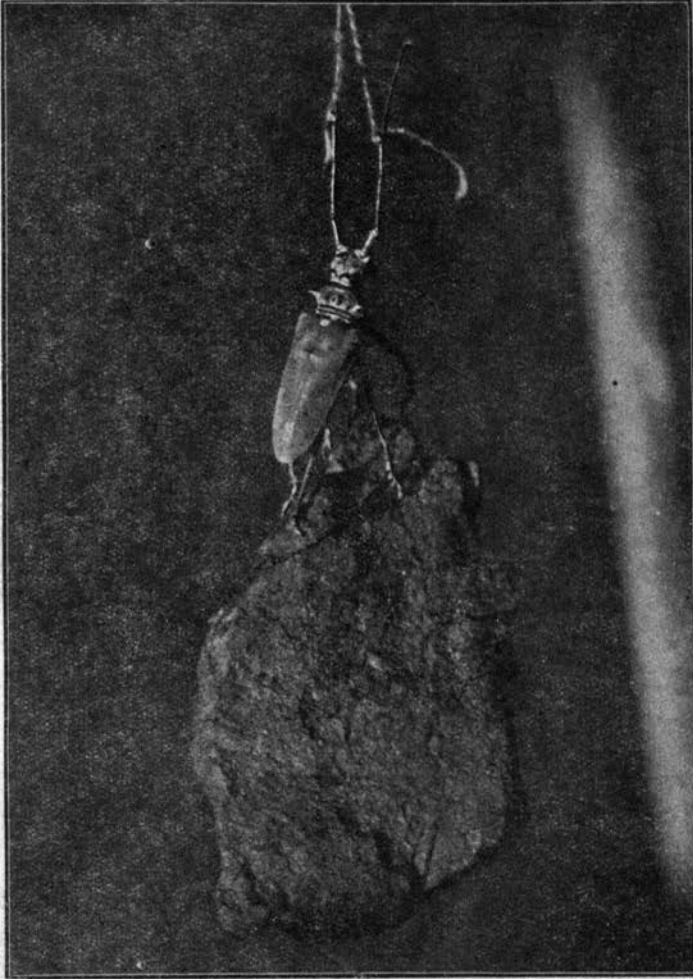
ভাই “সন্দেশ,”

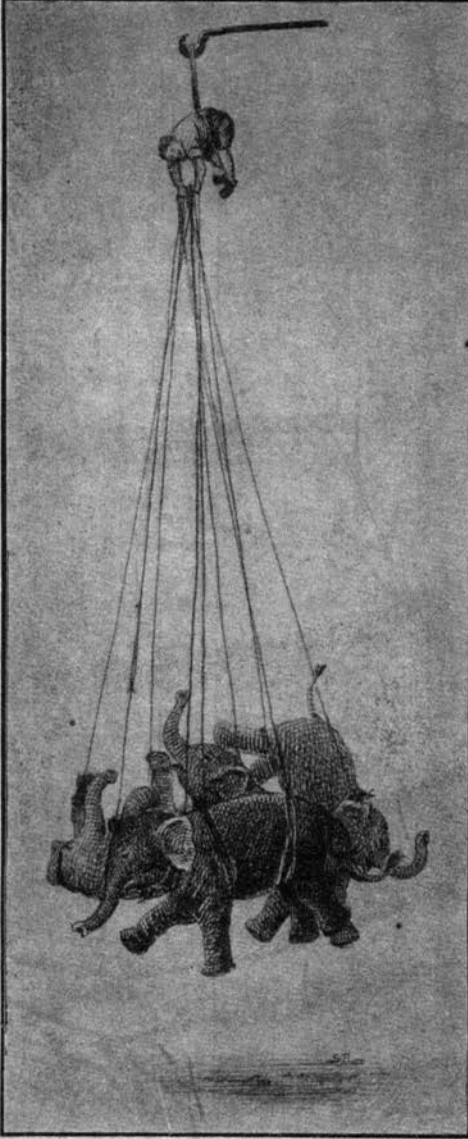
তোমরা মাঝে মাঝে পোকামাকড়ের সংবাদ লেখ—আমরা প’ড়ে আনো

পাই। এইবার
আমি একটা
পোকার সাক্ষাৎ
পেয়েছি—সেটা র
অদ্ভুত কাণ্ড যদি
চোখে দেখতে
তাহ’লে তোমাদের
সেই মেজদাদা-
মশাইকে শুদ্ধ
তামাসা দেখাবার
জন্তু দৌড়ে এনে
হাজির করতে।

সকাল বেলায়
বসে বসে খবরের
কাগজ পড়ছি, এমন
সময় একটি ছেলে
দড়ির আগায়
কয়লার মত কি
একটা ঝুলিয়ে এনে
বলল, “দেখুন ত,
এইটেকে সন্দেশে
দেওয়া যায় কিনা।”
“এইটে” আর
কিছুই নয়, একটি

হাঙ্গা বাদামী রঙের পোকা, তার মাথায় লম্বা ছোটো শিং, সেই শিঙের আগায়





দড়ি বাঁধা। পোকাটা বুলতে বুলতেই ছয় পায়ে একটা মস্ত কয়লার টুকরোকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছে—পোকাও বুলছে, কয়লাও বুলছে।

আমরা একটা লোহার শিকের আগায় কয়লা শুদ্ধ পোকাটাকে বুলিয়ে দিয়ে তার ফটো তুলবার আয়োজন করতে লাগলাম। সব ঠিকঠাক করে ছবি তুলতে আধঘণ্টার বেশী সময় লাগল, পোকাটা তখনও কিন্তু কয়লাটাকে ধরেই রেখেছে। প্রায় দেড় ঘণ্টা কি আরও বেশীক্ষণ ধরে সে কয়লাটাকে স্থিরভাবে বুলিয়ে রেখেছিল। তারপর আমরা জোর ক’রে কয়লাটাকে ছাড়াতে গেলাম, কিন্তু পোকাটা হঠাৎ এমন অদ্ভুত ক্যাটক্যাট ক্যাটক্যাট শব্দ ক’রে চৌচিয়ে উঠল, যে আমরা ভয়ে চমকে উঠে দস্তুরমত ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

পোকাটা একটা আরশুলার চাইতে খুব বেশী বড় হবে না। তার ওজন সিকি তোলা মাত্র। কিন্তু ঐ কয়লাটুকু ওজন ক’রে দেখলাম প্রায় আধসের ওজন হ’ল, অর্থাৎ পোকাটার চাইতে ১৫০ গুণ ভারি। হিসাব করে দেখ, একটা

দুইমণ ওজনের মানুষ যদি ঐরকম বাহাড়ুরি কাণ্ড করতে যায়, তাহ'লে তার পক্ষে কি রকম কসুরং দেখান দরকার। চারটে বড় বড় হাতীর ওজন তিনশ' মণ ধরা যেতে পারে। এই রকম একটি বোঝা যদি সে ঘণ্টাখানেক ঝুলিয়ে রাখতে পারে তাহ'লে তাকেও বলি ঐ পোকাকার মতন বাহাড়ুরি।

ছুংখের বিষয়, এমন অদ্ভুত পোকাকার নাম ধাম পেশা কিছুই খবর আমার জানা নাই, তাই তোমাদের মেজদাদামশায়ের কাছে তার ছবি আর বর্ণনা পাঠিয়ে দিলাম। তিনি যদি এই পোকাকার চালচলন আহার বিহারের সব ঘরাও খবর আমাদের পাঠিয়ে দিতে পারেন, তাহ'লে আমরা খুসী হয়ে পড়ি। বিশেষত, কি খেয়ে তার গায়ে এমন জোর, সেই আসল খবরটা জানতে পারলে, একবার তাই খেয়ে দেখি— কারণ, অনেক দিন থেকেই আমার পালোয়ান হবার বেজায় সখ। ইতি—

সমুদ্রবন্ধন

মানুষ টেলিগ্রাফের কৌশল যখন আবিষ্কার করল, সে প্রায় একশ' বছরের কথা। সেই সময় থেকে এই পৃথিবীটার আট্টেপৃষ্ঠে খুঁটি মেরে তার বসিয়ে মানুষ দেশ বিদেশে খবর চালাচালি করবার ব্যবস্থা করে আসছে। তারের পথ দিয়ে বিদ্যুতের খবর চলে; সেই তার মানুষ যেখান দিয়েই নিতে পেরেছে—সেখান দিয়েই খবর চলবার পথ খুলে গিয়েছে। কেবল ডাঙ্গায় নয়, গভীর সমুদ্রের ভিতর দিয়েও হাজার হাজার মাইল তার পৃথিবীর এপার ওপার জুড়ে ফেলেছে। সমুদ্রের মধ্যে খোঁটা বসাবার যো নাই, এমন কিছু নাই, যার সঙ্গে তার বেঁধে দিয়ে নিশ্চিত থাকা যায়—কাজেই সেখানে টেলিগ্রাফের তার বসাবার একমাত্র উপায় হ'চ্ছে, তারের দুই মাথা ডাঙ্গায় রেখে বাকী সমস্ত তারটিকে জলের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া।

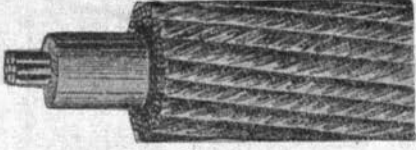
সত্তর বৎসর আগে যখন এই রকম ভাবে ইংলণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের তারের যোগ করবার প্রস্তাব হ'য়েছিল, তখন লোকে সেটাকে পাগলের প্রস্তাব ব'লে ঠাট্টা ক'রেছিল। অথচ এখন তার চাইতে বড় বড়, একটি নয় দুটি নয়, অন্তত দু হাজার টেলিগ্রাফের লাইন, সমুদ্রের নীচে বসান হ'য়েছে। মানুষের যত বড় বড় কীর্ত্তি আছে, তার মধ্যে এই সমুদ্রবন্ধনের কীর্ত্তিটা বোধ হয় কারও চাইতে কম আশ্চর্য্য

নয়। এর জন্ত মানুষকে যে কত রকম বাধাবিপদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে, তা আর বলে শেষ করা যায় না। ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের মধ্যে ২৫১৩০ মাইল সমুদ্রের ফারাক; সে সমুদ্রও খুব গভীর নয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে যখন অনেক হাজার টাকা খরচ করে এইটুকু সমুদ্রের মধ্যে তার ফেলা হ'ল, আর সেই তার দিয়ে এপার-ওপার খবর চলাচল হ'ল—তখন টেলিগ্রাফ কোম্পানির মনে খুবই উৎসাহ হ'য়েছিল। কিন্তু সে উৎসাহ চব্বিশ ঘণ্টার বেশী থাকেনি। কারণ, একটা দিন যেতে না যেতেই জেলে-জাহাজের জালের টানে তারের লাইন ছিঁড়ে গিয়ে খবর আসা বন্ধ হয়ে গেল। পরের বছর আবার দুই লক্ষ টাকা খরচ করে অনেক কষ্টে আরো মোটা আর মজবুত তার বানিয়ে নতুন লাইন বসান হ'ল। সেই তারে অনেক দিন বেশ কাজ চলবার পর লোকের মনে বিশ্বাস হ'ল যে—হ্যাঁ, ছোটখাট সমুদ্রের মধ্যে তার বসান চলতে পারে।

পরের বৎসর ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড থেকে আয়র্লণ্ড পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের লাইন বসাবার জন্ত তিনবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তিনবারই সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। জুবার জোয়ার ভাঁটার বিষম টানে পাহাড়ের গায়ে আছাড় খেয়ে খেয়ে তারের লাইন ভেঙে চূরে ভেসে গেল। আর তৃতীয়বারে তারের জাহাজ সমুদ্রের ওপারে পৌঁছাবার আগেই সব তার ফুরিয়ে গেল—তারের আগাটা সমুদ্রেই প'ড়ে গেল—আয়র্লণ্ড পর্য্যন্ত আর পৌঁছলই না। যাহোক, চতুর্থবারের চেষ্টায় আইরিশ সমুদ্রের ভিতর দিয়ে নিরাপদে তারের লাইন বসান হ'ল। তারপর দেখতে দেখতে পাঁচ দশ বছরের মধ্যে ইউরোপে আমেরিকায় অনেক দেশেই সমুদ্রের ভিতরে, পঁচিশ পঞ্চাশ বা একশ' মাইল পর্য্যন্ত লম্বা তার বসান হ'য়ে গেল। তখন ইংলণ্ডের এক টেলিগ্রাফ কোম্পানি সাহস করে বলল, “আমরা অতলান্তিক মহাসাগরের ভিতর দিয়ে ইংলণ্ড থেকে আমেরিকা পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের তার বসাব”।

লোকে বলল, “সে কি কথা! অতলান্তিকের ওপার যে ছ'হাজার মাইল দূর! সেখানকার সমুদ্র যে তিন মাইল গভীর! সমুদ্রের নীচটা উচুনীচু পাহাড়ের মত, তাতেই যে হাজার মাইল তার খেয়ে যাবে! অসম্ভব লম্বা তার, অসম্ভব রকম ভারি, করতে অসম্ভব খরচ—সবই অসম্ভব!” কিন্তু টেলিগ্রাফ কোম্পানির যারা পাণ্ডা তাঁরা কোমর বেঁধে বসলেন, অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে! কোম্পানির মূলধন হ'ল পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। একুশ হাজার মাইল লম্বা তারকে দড়ির মতন

পাকিয়ে পাকিয়ে, তার উপর আঙ্গুলের মত পুরু ক'রে রবারের প্রলেপ দিয়ে, তার উপর সাড়ে তিন লক্ষ মাইল লোহার তার পেঁচিয়ে টেলিগ্রাফের লাইন তৈরী হ'ল। এই সমস্ত তার যদি একটানা সোজা



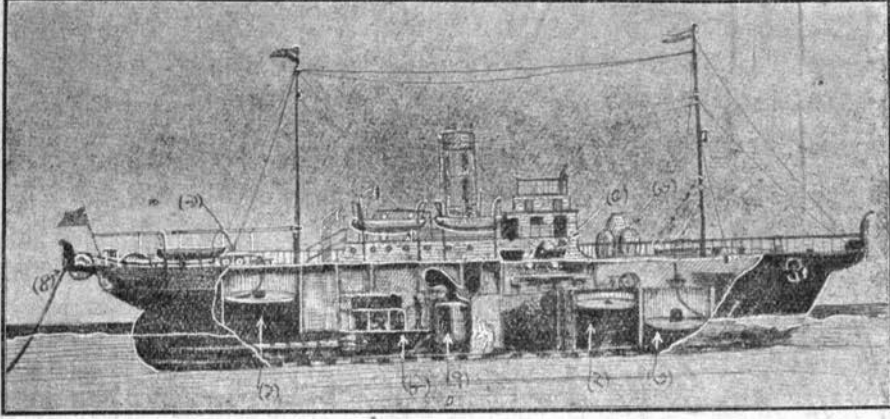
ক'রে বসান হ'ত, তাহ'লে পৃথিবীটাকে প্রায় চোদ্দ বার পাক দিয়ে বেঁধে ফেলা যেত—কিন্তু এখান থেকে চাঁদ পর্যন্ত পৌঁছান যেত! লাইনের ভিতরকার তামার তারটুকু দিয়েই

তামার তার—রবারের খোলস—লোহার তারের বর্ম। বিদ্যুৎ চলে; রবারের কাজ কেবল বিদ্যুৎটাকে তারের মধ্যে আটকে রাখা। লোহার প্যাচাল তারটুকু হ'ল বর্ম। ওটা না থাকলে পাহাড়ের ঘষায় শ্রোতের ধাক্কায় জলজন্তুর উৎপাতে ছুদিনে তার নষ্ট হ'য়ে যায়—গভীর জলে লাইন বসাতে গিয়ে আপনার ভারে তার আপনি ছিঁড়ে যায়। সমস্ত লাইনটির ওজন হ'ল সত্তর হাজার মণ।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে দুই-জাহাজ-বোঝাই তার আমেরিকার দিকে রওনা হ'ল। তারের এক মাথা আয়লণ্ডের তীরের উপর রেখে কোম্পানীর জাহাজ পশ্চিমমুখে তার ফেলতে ফেলতে চলল। বড় বড় চৌবাচ্চার মধ্যে তারের কুণ্ডলী জড়ান রয়েছে। ক্রমাগত ঘষায় ঘষায় তারের লাইন গরম হ'য়ে ওঠে, তাই চৌবাচ্চায় জল ভরে রাখতে হয়। জাহাজের উপরে 'ব্রেক' বসান, তাতে তারটাকে ওজনমত টেনে ধরে,—পাছে ছড় ছড় ক'রে সব তার বেরিয়ে যায়। জাহাজ যদি ঘণ্টায় পাঁচ মাইল যায়, তাহ'লে সমুদ্রের উচুনীচু হিসাব বুঝে, ঘণ্টায় ৬ মাইল কি ৭ মাইল তার ছাড়তে হয়। আবার বেশী টান পড়লে পাছে তার ছিঁড়ে যায় সেই জন্য তারের "টান" মাপবার জন্য একটা যন্ত্র আছে। টান বেশী হ'লেই ব্রেক টিলা ক'রে দেয়। তারের ভিতর দিয়ে দিন রাত ডাঙ্গার সঙ্গে জাহাজের সংস্পর্শে চলতে থাকে। হটাৎ কোথাও তার ছিঁড়ে গেলে বা জখম হ'লে, অমনি সে সংস্পর্শ বন্ধ হ'য়ে যায়। তাহ'লেই জাহাজের লোকেরা বুঝতে পারে কোথাও কিছু গোলমাল হ'য়েছে। তখন আবার তার গুটিয়ে গুটিয়ে সেই জখম জায়গা পর্যন্ত ফিরে গিয়ে নষ্ট লাইন মেরামত করতে হয়।

এমনি সমস্ত আয়োজন ক'রে কোম্পানির জাহাজ রওনা হ'ল। কিন্তু পাঁচ মাইল যেতে না যেতেই হটাৎ কোথায় টান লেগে তারের লাইন ছিঁড়ে গেল। তখন

ফিরে এসে তীরের দিক থেকে সমস্ত তারটিকে টেনে টেনে, তার ভাঙা মুখ বা'র ক'রে তার সঙ্গে নূতন তার জুড়ে, জাহাজ আবার পশ্চিমে চলল। দুতিন দিন



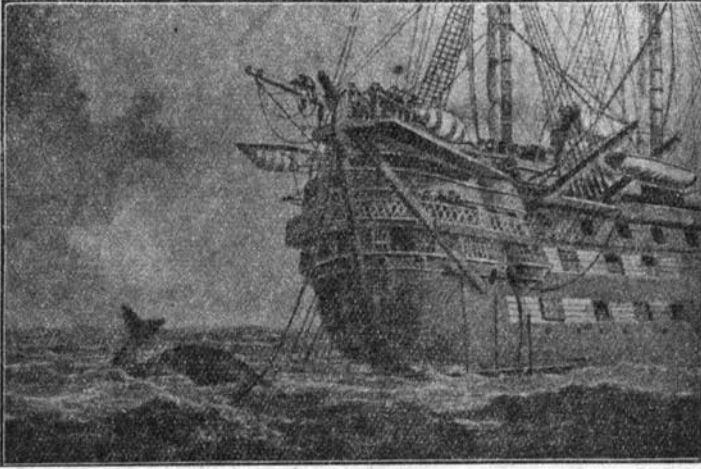
তারবাহী জাহাজ ও তার ভিতরকার বন্দোবস্ত। ১, ২, ৩, তারের চৌবাচ্চা; ৪, তার বাহির হইবার পথ; ৫, বিদ্যুৎখর, ৬, তার ভাসাইবার 'বয়া'; ৭, ৮, জাহাজের কলকজা; ৯, 'ব্রেক'; ১০, 'ব্রেক'।

নিরাপদে চলতে চলতে, প্রায় চারশ' মাইল তার বসাবার পর, হঠাৎ ব্রেক কষাবার দোষে তার ছিঁড়ে আড়াই মাইল গভীর সমুদ্রে তলিয়ে গেল। জাহাজের লোকে হতাশ হ'য়ে বন্দরে ফিরে চলল, কোম্পানির সাড়ে তিন লক্ষ টাকার মাল (৪০০ মাইল তার) সমুদ্রের নীচেই পড়ে রইল।

পরের বৎসর আবার নূতন ক'রে চেষ্টা আরম্ভ হ'ল। এবার স্থির হ'ল এই যে, সমুদ্রের মাঝখানে দুই জাহাজের তারের মুখ একত্র ক'রে তারপর দুই জাহাজ দুই দিকে তার বসিয়ে চলবে—একটা যাবে আমেরিকার দিকে, আরেকটা আয়র্লণ্ডের দিকে। মাঝসমুদ্রে যাবার পথে এমন ভীষণ ঝড় উঠল যে তেমন ঝড় খুব কমই দেখা যায়। সপ্তাহ ভ'রে ঝড়ের আর বিরাম নাই। তারের ভারে বোঝাই জাহাজ ঝড়ের ধাক্কায় ডোবে-ডোবে অবস্থায় সমুদ্রের মধ্যে নিরুপায় হ'য়ে মাতালের মত টলতে লাগল। অনেক কষ্টে প্রাণ বাঁচিয়ে ষোল দিন পর তারা মাঝসমুদ্রে হাজির হ'ল। তারপর এর-লাইন ওর-লাইনে জুড়ে দিয়ে তারা দুই জনে দুই মুখে চলল। তারের ভিতর দিয়ে এক জাহাজ থেকে আরেক জাহাজ পর্য্যন্ত বিদ্যুতের সঙ্কেত

চলছে—কিন্তু চল্লিশ মাইল পার না হতেই হঠাৎ সঙ্কেত বন্ধ হ'য়ে গেল, এক জাহাজ থেকে আরেক জাহাজের কোন সাড়াই পাওয়া যায় না। আবার দুই জাহাজ মুখো-মুখি হ'য়ে তারের সঙ্গে তার জুড়ে, দুই দিকে ছুটল। এবারের দৌড় একশ' মাইল। তারপরেই আর সাড়া শব্দ নাই—আবার কোথায় লাইন কেঁসে গেছে! আরম্ভেই দুই দুইবার ব্যাঘাত পেয়ে আর নানারকমে নাকাল হ'য়ে জাহাজ আবার নিরাশ হ'য়ে ফিরে এল। লাভের মধ্যে, “কোম্পানিকা মাল, দরিয়ামে ঢাল”।

এইবার কোম্পানির উৎসাহ প্রায় নিভে এসেছিল। অনেকেই পরামর্শ দিলেন যে, এ অসম্ভব কাজের পিছনে আর অনর্থক টাকা নষ্ট করা উচিত নয়। কোম্পানির বড় বড় পাণ্ডারা পর্য্যন্ত বলতে লাগলেন এখন তারের লোহালকড় সব বিক্রী ক'রে টেলিগ্রাফ কোম্পানির কারবার বন্ধ ক'রে দেওয়াই ভাল। কেবল দু'একজন উৎসাহী লোক বলল যে তারা এখনও হার মানতে প্রস্তুত নয়। শেষটায় সেই দু'একজনেরই বিশেষ চেষ্টায় সেই বছরেই আর একবার প্রাণপণ আয়োজন ক'রে



অনেক রকম
হাঙ্গামার পর
আয়লণ্ড থেকে
আমেরিকা
পর্য্যন্ত নিরাপদে
লাইন বসান
হ'ল—টেলিগ্রাফ
কোম্পানির
জয়জয়কার পড়ে
গেল। তখন
এদেশের সিপাহী
বিদ্রোহ সবেমাত্র
শেষ হ'য়েছে—

তারের জাহাজের সঙ্গে তিনি নাছের ধাক্কা। অল্পের জন্ত তারটা বেঁচে গিয়েছিল।

কিন্তু সে খবর তখনও আমেরিকায় পৌঁছায়নি। বিদ্রোহের জন্ত কানাডা থেকে দুই দল ইংরাজ সৈন্য এদেশে আসবার জন্ত প্রস্তুত হ'য়েছিল। তারের লাইন বসান হ'তেই ইংলণ্ড থেকে খবর গেল, “সৈন্য পাঠাবার দরকার নাই।” ঐ খবর যদি না যেত

তাহ'লে মিছামিছি সৈন্য় পাঠিয়ে গভর্ণমেণ্টের অন্তত সাত লক্ষ টাকা খামখা বাজে খরচ হ'য়ে যেত। এই কথাটা প্রচার হওয়াতে টেলিগ্রাফ কোম্পানির খুব বিজ্ঞাপন হয়ে গেল। সমুদ্র পার ক'রে টেলিগ্রাফ পাঠাবার সুবিধা যে কি, মানুষকে তা বোঝাবার জন্য আর বেশী ব্যাখ্যা বা বক্তৃতার দরকার হ'ল না। তুমুল উৎসাহে টেলিগ্রাফ কোম্পানির ব্যবসার আরম্ভ হ'ল।

কিন্তু হায়! কয়েক সপ্তাহ যেতে না যেতেই টেলিগ্রাফের সাড়া ক্ষীণ হ'তে হ'তে এক দিন একেবারেই সব বন্ধ হ'য়ে গেল—এপারের বিদ্যুৎ আর ওপারে পৌঁছায়ই না। এত সাধের টেলিগ্রাফ-লাইন, তার কিনা এই অকালমৃত্যু—তিন মাসও তার আয়ু হ'ল না। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা ক'রে বল্লেন যে তারের মধ্যে যে বিদ্যুৎ চালান হ'য়েছে—সেই বিদ্যুতের তেজ খুব বেশী হওয়াতেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

তারপর সাত বৎসর গেল আবার নূতন ক'রে লাইন বসাবার আয়োজন করতে। অনেক রকম আলোচনা আর পরীক্ষার পর আরও মজবুৎ ক'রে নূতন তার তৈরী হ'ল। সেই তারের লাইন প্রকাণ্ড এক জাহাজে ক'রে সমুদ্রে পাঠান হ'ল। জাহাজ ৪৪ মাইল সমুদ্র পার হ'তেই বোঝা গেল তারের মধ্যে কোথাও গলদ রয়ে গেছে। সেটা খুঁজে মেরামত ক'রে তারপর ৭০০ মাইল পর্য্যন্ত বিনা উৎপাতে গিয়ে আবার এক মারাত্মক গলদ। আবার অনেক মাইল তার গুটিয়ে নিয়ে তারপর এক জায়গায় প্রকাণ্ড জখম পাওয়া গেল। সেইটুকু দেখে মেরামত ক'রতে প্রায় দশ ঘণ্টা সময় নষ্ট হ'ল। প্রায় ১২০০ মাইল যাবার পর আবার সেই রকম বাধা। আবার সেই গভীর সমুদ্র থেকে তার টেনে তুলে, কোথায় দোষ আছে খুঁজে বা'র ক'রে, মেরামত করতে হবে। কিন্তু এবারে মাইল খানেক তার গুটিয়ে তুলতেই বাকী তারটুকু চোখের সামনেই পট্ ক'রে ছিঁড়ে জলের মধ্যে ফস্কে পড়ল।

জাহাজের কর্তারা পরামর্শ করলেন, আঁকড়ি দিয়ে ঐ তার তুলতে হবে। প্রকাণ্ড লোহার শিকলের আগায় অদ্ভুত নখ-ওয়ালা যন্ত্র:ঝুলিয়ে, তাই দিয়ে নাবিকেরা সমুদ্রের তলায় হাতড়াতে লাগল। একবার মনে হ'ল আঁকড়িতে তার আঁকড়িয়েছে—অমনি টানাটানির ধুম প'ড়ে গেল। প্রায় আড়াই মাইল গভীর সমুদ্র, তার নীচ পর্য্যন্ত শিকল নেমেছে,—সে শিকল গুটিয়ে তোলা কি সহজ কথা। একহাত দুহাত, দশ হাত বিশ হাত, একশ' হাত দুশ'হাত, এমনি ক'রে প্রায় মাইল খানেক শিকল তুলবার পর তারে-গাঁথা আঁকড়িশুদ্ধ দেড় মাইল শিকল ছিঁড়ে জলের

মধ্যে অন্তর্ধান। তখন মোটা শনের দড়ি দিয়ে আবার সমুদ্রের মধ্যে নতুন ক'রে আঁকড়ি ফেলা হ'ল। তিন চার দিন ক্রমাগত চেপ্টার পর আবার তারের লাইন আঁকড়িয়ে পাওয়া গেল। কিন্তু এবারেও তুলবার সময় তারের ভাঙে দড়িদড়া সব ছিঁড়ে আঁকড়িটা জলের ভিতর তলিয়ে গেল। তারপর আরও দুইখানা আঁকড়ি এই রকমে হারিয়ে জাহাজের শিকল দড়ি সব প্রায় শেষ ক'রে ইংলণ্ডের জাহাজ ইংলণ্ডেই ফিরে চলল।

এত দিনের আশা ভরসার পর এই রকম হুঃসংবাদ! কিন্তু মানুষের প্রতিজ্ঞার কি জোর! পরের বৎসর (১৮৬৬) সেই জাহাজ আবার নতুন তার বোঝাই ক'রে নতুন উৎসাহে সমুদ্রে বেরুল—দুই সপ্তাহের মধ্যে সে জাহাজ সারা সমুদ্র লাইন বসিয়ে আমেরিকার টেলিগ্রাফ স্টেশন পর্য্যন্ত তার জুড়ে ফেলল। তখনকার আনন্দের কথা বর্ণনায় শেষ করা যায় না। কোম্পানির একজন এঞ্জিনিয়ার সে সময়ে লিখেছিলেন, “যখন তার বসান শেষ হ'ল, তোপের গর্জন আর মানুষের আনন্দ ধ্বনির মধ্যে জাহাজের নাবিকেরা পাগলের মত চীৎকার করতে লাগল, তখন গোরবে আমারও শরীরের রক্ত প্রবল বেগে আমার বুকের মধ্যে তোলপাড় করছিল। কতগুলো লোক লাইনের তার ধ'রে নেচে নেচে গাইতে লাগল। কেউ কেউ পাগলের মত তারটাকে জড়িয়ে ধ'রে আদর করতে লাগল। চোখের জলে আনন্দের কোলাহলে হাসিকান্না সব মিশিয়ে সকলে মিলে মহোৎসব লাগিয়ে দিল।”

এখানেও তাদের উৎসাহের শেষ হয়নি। সেই জাহাজ আবার ফিরে গিয়ে ১৮ দিন ধ'রে অজানা সমুদ্রের ভিতর হাতড়িয়ে আগের-বারের সেই হারান লাইন উদ্ধার ক'রে সেই লাইনকেও আমেরিকা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিল। এতদিনে, প্রায় চার কোটি টাকা নষ্ট করবার পর, কোম্পানির কারবারের পাকা প্রতিষ্ঠা হ'ল।

বেবুন্

যে সব বানরের মুখ কুকুরের মত লম্বাটে, যারা চার পায়ে চলে, যাদের ল্যাজ বেঁটে আর গালের মধ্যে থলি আর পিছনের দিকটায় কাঁচা মাংসের মত চিপি, তাদের নাম বেবুন্। বেবুনের আসল বাড়ী আফ্রিকায়, কেউ কেউ এসিয়াতেও থাকেন। বেবুন্ বংশের অনেক শাখা,—হলুদে বেবুন্ লালমুখো বেবুন্, ঝুঁটিওয়ালা



বেবুন।

কালো বেবুন, চিত্রমুখ সং-বেবুন বা ম্যান্ড্রিল, চাক্‌মা বেবুন ড্রিল বেবুন ইত্যাদি। কিন্তু সকলেরই মুখের ভঙ্গী চালচলনও স্বভাব প্রায় একই রকম। উঁচু উঁচু ধারাল দাঁত, বদ্বন্দ মেজাজ আর তার চাইতেও বদ্বন্দ চেহারা। সমস্ত জানোয়ারদের মধ্যে বিদ্যুটে চেহারা যদি কারু থাকে তবে সে ঐ ম্যান্ড্রিলের। টকটকে লাল নাক, খাঁজকাটা নীল গাল ভেংচিকাটা ক্রকুটি মুখ, সব মিলে যে অপূর্ব চেহারা খানা হয়, তার নমুনা এবারের রঙিন ছবিতে দেওয়া হয়েছে।

আফ্রিকার পাহাড়ে জঙ্গলে বেবুনেরা দল বেঁধে লুকিয়ে থাকে। “বল, বুদ্ধি, ভরসা” এই তিন জিনিসের জোরে সে নীচের জমীতে নেমে এসে চাষার ক্ষেতের উপর অত্যাচার ক’রে ফলশস্তা খেয়ে পালায়। তাদের দল বাঁধবার কায়দা, আর পথ ঘাট পাহারা দেবার ব্যবস্থা এমন চমৎকার, আর এমন হঠাৎ এসে লুটপাট ক’রে তারা ফস্ করে পালায়, যে চাষারা তাদের সঙ্গে কিছুতেই পেরে ওঠেনা। পালাবার সময় বেবুনেরা কখনও দলের কাউকে ফেলে যায় না—যদি একজন বিপদে পড়ে অমনি পালের গোদারা তাকে সাহায্য করবার জন্য তেড়ে আসে। একবার একটা বাচ্চা বেবুনকে কতগুলো কুকুরে ঘেরাও ক’রে ফেলেছিল, কিন্তু একটা ধাড়ি বেবুন এসে সেই কুকুরের দলের মধ্যে ঢুকে এগ্নি ছু-তিন ভেংচি দিয়ে তাদের মুখের সামনে থেকেই সেই বাচ্চাটাকে কেড়ে নিয়ে গেল যে কুকুরগুলো ভয়ে কিছুই করতে সাহস পেল না—দূরে শিকারীরা পর্য্যন্ত তার তেজ দেখে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

বিপদে পড়লে বেবুনেরা পিছনের পায়ে ভর ক’রে খাড়া হয়ে বসে—শত্রুকে হাতের কাছে পেলেই নখ দিয়ে খামচে টেনে মুখের কাছে নিয়ে এসে, তার পরেই প্রচণ্ড এক কামড়। কামড়ের জোরে হাড়গোড় পর্য্যন্ত অনায়াসেই গুঁড়িয়ে দিতে পারে। নখ দাঁতই হচ্ছে বেবুনের প্রধান অস্ত্র—কিন্তু দরকার হ’লে তারা পাথর ছুঁড়তেও জানে। বড় বড় পাথর গড়িয়ে শত্রুর মাথায় ফেলতে তারা খুব ওস্তাদ।

পরিবেষণ

‘পরি’পূর্বক ‘বিষ’ধাতু তাহে ‘অনট’ ব’সে

তবে ঘটায় পরিবেষণ, লেখে অমরকোষে।

—অর্থাৎ ভোজের ভাণ্ড হাতে লয়ে মেলা

ডেলা ডেলা ভাগ করি’ পাতে পাতে ফেলা।



এই দিকে এস তবে লয়ে ভোজভাণ্ড
সমুখে চাহিয়া দেখ কি ভীষণ কাণ্ড।
কেহ কহে “দই আন” কেহ হাঁকে “লুচি”
কেহ কাঁদে শূন্য মুখে পাতখানি মুছি।
হোথা দেখি দুই প্রভু পাত্র ল’য়ে হাতে
হাতাহাতি গুঁতাগুঁতি দ্বন্দ্বরণে মাতে।
কেবা শোনে কার কথা সকলেই কর্তা—
অনাহারে কতধারে হ’ল প্রাণ হত্যা।
কোন প্রভু হস্তিদেহ ভুঁড়িখানা ভারি
উর্দ্ধ হ’তে থপ্ ক’রি খাওয়া দেন ছাঁড়ি।
কোন চাচা অন্ধপ্রায় (‘মাইনাস্ কুড়ি’)
ছড়ায় ছোলার ডাল পথঘাট জুড়ি।
মাতব্বর বৃদ্ধ যায় মুদি চক্ষু ছুটি,
“কারো কিছু চাই” বলি তড়বড় ছুটি—
সহসা ডালের পাঁকে পদার্পণ মাত্রে
হুড়মুড় পড়ে কার নিরামিষ পাত্রে।
বীরোচিত ধীরে পদে এস দেখি ব্রহ্মে—
ওই দিকে খালিপাত, চল হাঁড়ি হস্তে।
তবে দেখ, খাওয়া দিতে অতিথির থালে
দৈবাৎ না চোকে কভু যেন নিজ গালে।
ছুটোনাকো গুরুম মিছে খালি হাতে
দিও না মাছের মুড়া নিরামিষ পাত্রে।
অথবা আক্রোশে কিবা অগ্নায় আদরে
ঢেলো না অস্থল কারো নূতন চাদরে।
বোকাবৎ দন্তপাটি করিয়া বাহির
ক’রোনাকো অকারণে কৃত্তিহ জাহির।



শুকদেব



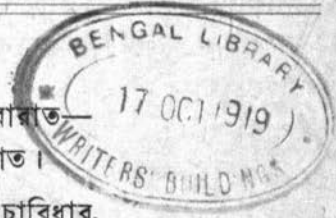
সপ্তম বর্ষ

শ্রাবণ, ১৩২৬

৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণে

জল ঝরে জল ঝরে সারাদিন সারারাত—
অফুরান নাম্তায় বাদলের ধারাপাত ।
আকাশের মুখ ঢাকা, ধোঁয়ামাথা চারিধার,
পৃথিবীর ছাত পিটে ঝামাঝাম্ বারিধার ।
স্নান করে গাছপালা প্রাণখোলা বরষায়
নদীনালা ঘোলাজল ভ'রে ওঠে ভরসায় ।
উৎসব ঘনঘোর উন্মাদ শ্রাবণের
শেষ নাই শেষ নাই বরষার প্লাবনের ।
জলেজলে জলময় দশদিক্ টলমল্
অবিরাম একই গান, ঢালো জল, ঢালো জল ।
ধুয়ে যায় যত তাপ জর্জর গ্রীষ্মের
ধুয়ে যায় রৌদ্রের স্মৃতিটুকু বিশ্বের ।
শুঝু যেন বাজে কোথা নিঃঝুম ধুক্ধুক্
ধরণীর আশাভয় ধরণীর সুখদুখ ।



পোকার কথা

পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ এই সকলের বিষয় জানতে হ'লে, এই সকল শব্দের অর্থ কি, এই সব কথায় কি বুঝায়, তা ভাল ক'রে জানতে হয়।

পোকা-মাকড়ের “মাকড়” শব্দের অর্থ বুঝি মাকড়সা—আর সেই সঙ্গে মাকড়সার মত যত প্রাণী তাদের বুঝি—যেমন মাকড়সা, কাঁকড়াবিছা, কুকুরের গায়ের ঐটেলিপোকা, আর খোস পাঁচড়ার কচ্ছুকীট। এদের সকলের আটটা পা, শরীরে দুই ভাগ ; মাথা আর বুক মিশে এক ভাগ, আর উদর অপর ভাগ।

“পোকা” কি ? আমরা বলি উই পোকা, গুবরে পোকা, শূঁয়োপোকা, কেন্নো-পোকা, ছারপোকা, কাঁচপোকা। এদের অনেকে উড়তে পারে, অনেকে উড়তে পারে না। এদের সকলের পা আছে, হাঁটতে পারে। আবার যে সব ক্ষুদ্র প্রাণী হাঁটতে পারে না, কেঁচো বা কুমির মত কিল্‌বিল্ করে নড়ে চড়ে বেড়ায়, তাদেরও পোকা বলি। যেমন বলি “পোকা পড়েছে”, “পোকা কিল্‌বিল্ করছে”।

তবেই হল যে, যে সব ক্ষুদ্র প্রাণীর শরীরের ভিতরে হাড় নাই, দেহ অস্থিহীন, তারা উড়তে পারুক আর নাই পারুক, তাদের পা থাকুক আর নাই থাকুক, তাদের বলে “পোকা”।

“কীট” বলে, যে সব পোকা উড়তে পারে না। কুমি, কেঁচো, জোঁক, ছারপোকা, উকুন, জুউপোকা (যা থেকে গালা আর ঘালতা হয়) এরা সব “কীট”। ‘কুমি’ একটা শব্দ আছে। এটা কি তা তোমরা জান। অনেক ছেলের পেটে কুমি বা ক্রিমি হয়। পেট থেকে ছোট আর বড় দু'রকমের কুমি বেরুতে তোমরা অনেকেই দেখেছ। এদের মাথা পেট বুক সব এক, গা নরম ও লম্বা, পা নাই, এরা শরীর ঐকে বঁকে কিল্‌বিল ক'রে নড়ে চড়ে। আর কুমির মত যে সব পোকা, যাদের পা নেই, যেমন কেঁচো, জোঁক, তারাও “কুমি”। এই রকম যত পোকা তাদের আমরা বলব “কুমি”। যে সব পোকা কুমি নয় অথচ উড়তে পারে না তাদের আমরা বলব “কীট”। যে সব পোকার পাখা আছে, উড়তে পারে, তারা “পতঙ্গ”। প্রজাপতি, উই, মাছি, মশা, আরশুলা, গুবরে পোকা, ফড়িং প্রভৃতি সব পতঙ্গ। যে পোকা উড়তে পারে না, সাধারণতঃ লোকে তাকে পতঙ্গ বলে না।

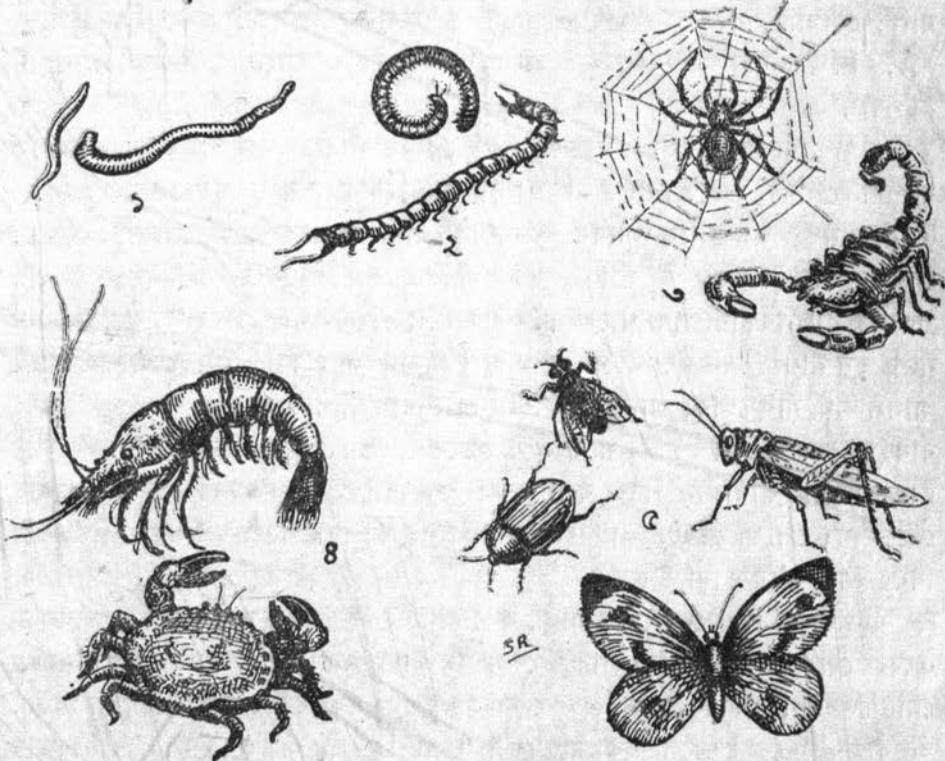
কুমি, কেঁচো ; কেন্নো, তেঁতুলে বিছে ; ছারপোকা, উকুন ; প্রজাপতি, ফড়িং—

এরা সবাই পোকা। কিন্তু নিশ্চয় সুবিধার জন্য প্রাণী-বিজ্ঞায় ভিন্ন ভিন্ন রকমের পোকার ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়েছে। যেমন—

১। কুমির মত পোকা, যেমন কুমি, কেঁচো, জোক—এদের বলে কুমি। ইংরাজিতে চলিত কথায় বলে Worms বিজ্ঞানের ভাষায় বলে Vermes.

২। চেলা বা তেঁতুলে ঝিছে, বিছানী বা গোড়নি, কেন্নো—যে সব পোকার দেহে অনেক খণ্ড পর্ব বা পাব আছে, আর যাদের অনেক পা হয়, তাদের বলে “বহুপদী”। ইংরাজিতে বলে Centipede, Millipede শতপদী সহস্রপদী। বিজ্ঞানের ভাষায় বলে Myropoda.

৩। মাকড়সার মত যত পোকা, যাদের মাথা ও বুক একসঙ্গে জোড়া, আটটা



ক’রে পা থাকে, পা ছাড়া সম্মুখে এক জোড়া দাঁড়া থাকে, যেমন মাকড়সা, কাঁ কড়

বিছা বা বৃশ্চিক, বর্ষাপোকা, এঁটেলি, খোসের পোকা—এদের বলে “অষ্টপদী” বা Octopoda, অথবা বিজ্ঞানের ভাষায় Arachnida বা মাকড়ের দল।

৪। যে সব পোকা অনেকটা অষ্টপদীর মত, অথচ জলে বাস করে, আর যাদের গা পা সমস্ত দেহ শক্ত খোলায় মোড়া থাকে—যেমন কাঁকড়া, চিংড়ি—তাদের নাম “খোলাকী” (crustacea).

৫। যে সব পোকাকর দেহে মাথা, বুক, আর, পেট, তিনটা ভাগ স্পষ্ট থাকে; আর বুক ছয়টা পা থাকে; আর মাথায় ছোট বা বড় ছোটো গুঁড় বা গৌফ থাকে,— তাদের নাম “ষট্‌পদী” (Hexapoda) বা বিজ্ঞানের ভাষায় “খণ্ডিতদেহী” (Insecta)। এদের অনেকেরই পাখা বা পত্র থাকে, উড়তে পারে—যেমন প্রজাপতি, মাছি, মৌমাছি, ফড়িং, গুবরে প্রভৃতি। উকুন, ছারপোকা, জঁউপোকাকর পাখা নাই, কিন্তু ছয়টা পা আছে, গায়ে তিনটা ভাগ আছে। এরা পাখাহীন ষট্‌পদী।

যে সব ষট্‌পদী পোকা উড়তে পারে তাদের সাধারণ নাম পতঙ্গ, আর যে সব ষট্‌পদী পোকা উড়তে পারে না তাদের সাধারণ নাম কীট দেওয়া হয়। কিন্তু এমন অনেক পতঙ্গ আছে যাদের পুরুষদের পাখা গজায়, স্ত্রীদের পাখা হয় না। সেখানে পুরুষটা পতঙ্গ ও স্ত্রীটা পতঙ্গ নয়, এরকম বলা ঠিক হয় না। আবার পতঙ্গের বাল্যাবস্থায় পাখা থাকে না, তাই বলে পতঙ্গ-শিশু “পতঙ্গ” নয়, বলাটা সঙ্গত হয় না। সেই জন্য ষট্‌পদীর আর এক নাম পতঙ্গ রাখা হ’য়েছে। পতঙ্গের আসল অর্থ যাই হোক, আজকাল বিজ্ঞানের ভাষায় ষট্‌পদী আর পতঙ্গ একই অর্থে ব্যবহার হয়। এই ছুটি শব্দেই খণ্ডিতদেহী Insectকে বুঝায়। উকুন আর ছারপোকাকে পাখাহীন পতঙ্গ বলা হয়। পৃথিবীতে ষট্‌পদী বা পতঙ্গ পোকাই বেশী—যত পোকা দেখতে পাই তার অধিকাংশই ষট্‌পদী পতঙ্গ—সুতরাং পতঙ্গদের বিষয় ভাল ক’রে জানা উচিত।

ষট্‌পদী বা পতঙ্গদের দেহে মাথা, বুক, পেট—এই তিন ভাগত আছেই, তা ছাড়া এদের দেহে তেরটা খণ্ড বা পাব থাকে। মাথায় একটা, বুক তিনটা, পেটে নয়টা, মোট তেরটা। কারু কারু এই তেরটা ভাগের সব কটাই স্পষ্ট দেখা যায় না, অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে বুঝা যায়। কিন্তু পতঙ্গের কুমি অবস্থায় বা কীটাবস্থায় প্রায় সকলেরই এই তেরটা ভাগ স্পষ্ট দেখা যায়।

পতঙ্গদের অনেকের পিঠের তিনটা খণ্ডই ভিন্ন ভিন্ন থাকে, কারু কারু প্রথম ভাগটা আল্গা থাকে, কারু কারু বৃকের প্রথম খণ্ডটা দ্বিতীয় খণ্ডের সঙ্গে জুড়ে এক হয়ে যায়। সব পতঙ্গের সর্ব্বাঙ্গ একটা চিম্‌সে ত্বক্ বা চামড়ার আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে। এই খোলসটা ঠিক আমাদের গায়ের চামড়ার মত নয়। শিং যে পদার্থে তৈয়ারি তাও নয়। শিংকে আঙুনে তাতালে সেটা গলে যায়, তার আকারটা আর থাকে না। পতঙ্গের গায়ের খোসাটাকে আঙুনে তাতালে পুড়ে কয়লার মত কাল হয়ে যায়, কিন্তু তার আকৃতিটা বজায় থাকে। চিংড়ির খোলা যে পদার্থের তৈরি, পতঙ্গদের খোলাও সেই পদার্থের তৈয়ারি, কেবল খুব পাংলা। এ পদার্থকে ইংরাজিতে বলে Chitin, আমরা বলি “কঙ্ককিন্‌”। পতঙ্গেরা নিশ্বাস নেয়, কিন্তু নাক মুখ দিয়ে নয়। মুখ দিয়ে যখন বাতাস টানতে বা ফেলতে পারে না, তখন মুখ দিয়ে শব্দও করতে পারে না। অনেক পতঙ্গ শব্দ করে বটে, কিন্তু সে শব্দ, হয় পাখা বা পা নাড়ার জন্ত, না হয় গায়ের কোন অংশে পাখা বা পায়ের ধারের ঘর্ষণ লেগে হয়। তবে এরা নিশ্বাস নেয় কি করে? এদের শরীরের দুই পাশে একসার করে ছোট ছোট ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্রের ভিতর সরু সরু নল থাকে, সেই সব নল থেকে আরো সরু সরু নলের ডাল পালা বেরিয়ে সর্ব্বাঙ্গের সকল স্থানে ছড়িয়ে যায়। সেই সব নল বা ‘শ্বাসনালী’ দিয়ে বাতাস আসে যায়, তাইতে শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ চলে। এই সব ছিদ্রপথই ওদের নাক। দেহের দুই ধারের ছিদ্র পথ সব বন্ধ করে দিলে শ্বাসনালীতে বায়ু চলাচল বন্ধ হ’য়ে যায়, আর পতঙ্গ মরে যায়।

পতঙ্গদের অধিকাংশেরই পিঠের উপর দুই যোড়া বা চারিখানা পাখা থাকে, যেমন প্রজাপতি, ফড়িং, আরম্মুলা, বোলতা, উই, গুবরে পোকা। কোন কোন পতঙ্গের, যেমন মশা আর মাছির, এক যোড়া পাখাই দেখা যায়, আর এক যোড়া খুব ছোট্ট হয়ে ছুঁটা ছোট্ট গোঁজের মত শরীরের দুপাশে থাকে। আবার কোন কোন পতঙ্গের বা ষটপদীর মোটেই পাখা গজায় না, যেমন ছারপোকা, উকুন, কাঠিকড়িং, জুউ পোকা। আবার অনেক পতঙ্গের পুরুষদের পাখা হয়, স্ত্রীদের হয় না।

সব পতঙ্গের খাত্তও সমান নয়। কোন কোন পতঙ্গ রস চুষে খায়—তাদের মুখের গড়ন সেই রকম। কেউ কেউ গাছপালার রস খায় কেহ বা মাংসের রস খায়। কেউ কেউ কামড়ে বা কুরে খায়, তাদের মুখের গড়ন অত্ন রকম। তাদের কেহ কেহ

পাতা, দাঁটা, কাঠ কামড়ে খায়। কোন কোনটা অল্প পোকা ধরে খায়, কোন কোনটা পচা মাংস খায়, কোন কোনটা বিষ্ঠা গোবর খায়। কোন কোন পতঙ্গ কুমি বা কীট অবস্থায় যা খায়, পতঙ্গ অবস্থায় তা খায় না। প্রজাপতি কুমি অবস্থায় পাতা খায় দাঁটা খায়, পতঙ্গাবস্থায় ওসব খেতেই পারে না, তখন মধু শুষে খায়।

পতঙ্গের যত খাওয়া তার কুমি অবস্থাতেই ঘটে। অনেকের পাখা হলে আর বেশী দিন বাঁচেও না। তখন কেবল কোথায় কোন্ যায়গায় ডিম পাড়লে বাচ্চারা ভাল খেতে পাবে আর নিরাপদে থাকবে তাই খুঁজে বেড়ায়। অনেক পতঙ্গ উড়ে বেড়ায় শুধু ডিম পাড়বার যায়গা খুঁজবার জন্য। একবার ডিম পাড়া হয়ে গেলে, তারপর তার বাচ্চাদের কি দশা হল, তা জানতেও পায় না, সে বিষয় ভাবতেও পায় না, পতঙ্গটা মরে যায়। সন্তানের লালন পালনের ভার আর তাকে নিতে হয় না। সন্তানের জন্য যত ভাবনা ভেবে নেয় ডিম পাড়বার সময়ে। যা খেয়ে তার সন্তান বাঁচবে সেই খাবার সামগ্রীর উপরই পতঙ্গ-মাতা ডিম পেড়ে দেয়, অথবা যেখানে ডিম পাড়ে সেখানে তার সন্তানের জন্য খাবার এনে সঞ্চয় করে রেখে দিয়ে যায়। ডিম ফুটে বেরিয়ে বাচ্চা সেই খাবার খেয়ে বড় হয়।

পতঙ্গের “কুমি অবস্থা” বা “কীটাবস্থা” অনেকবার বলেছি, সেটা হয়ত বুঝতে পারনি; তাই বুঝিয়ে বলছি। মানুষ যখন জন্মায়, তখন খুব ছোট্ট থাকে, তাকে শিশু বলি। তার পর একটু বড় হলে বালক হয়, তার পর আরও বড় হলে যুবা হয়, তার পর তার শরীর আর বাড়ে না, বৃদ্ধকাল পর্যন্ত তত বড়ই থাকে। কিন্তু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার রূপটা মানুষের মতই হয়। মানুষ ছাগল গরু কুকুর বিড়াল বাঘ হাতী ইন্দুর প্রভৃতি যারা শিশুকালে মার দুধ খেয়ে বাঁচে তাদের বাচ্চা যখন মার পেট থেকে ভূমিষ্ট হয় তখন তাদের চেহারা বা রূপ তাদের মা বাপেরই মত হয়। ছাগ শিশুর ছাগেরই রূপ, ইন্দুর শিশুর ইন্দুরেরই রূপ আর মানব শিশুর মানবেরই রূপ হয়। আয়তনে কেবল ছোট থাকে। যে রূপ নিয়ে তারা ভূমিষ্ট হয়, সারা জীবনে সে রূপের ধরণটা আর বিশেষ বদলায় না।

পাখী, কুমীর, টিক্‌টিকি, সাপ, কাছিম, মাছ প্রভৃতি অনেক প্রাণীর প্রথমে ডিম হয়, পরে সেই ডিম ফুটে যে বাচ্চা বেরোয়, সে বাচ্চার রূপ তার মা বাপের রূপের মতই হয়। তারপর আমরণ সেই রূপই থাকে। ডিমের রূপটা ত আর সেই

জন্তুর রূপ নয়, সুতরাং এদের জীবনে ছটা রূপ হয়। তাই এদের “দ্বিজ” বা দ্বিজন্মা বলে।

পতঙ্গের বেলায় কি হয়? জন্মকালে পতঙ্গ-শিশুর কি রূপ থাকে? তার পর তার বাল্যাবস্থায়ই বা কিরূপ হয়, আর যৌবন কালেই বা কি রূপ হয়?

(ক্রমশঃ)

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

হুনের গুণ

(বিলাতী গল্প)

এক ধনী সওদাগরের তিন মেয়ে ছিল। তাঁর একদিন জানবার ইচ্ছে হল যে তাদের মধ্যে কে তাঁকে কেমন ভালবাসে, তাই তিনি বড় মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন—“তুমি আমায় কেমন ভালবাস মা?” সে বললে—“বাবা, আমি তোমায় ভালবাসি—আমার প্রাণের চেয়েও।” সওদাগর শুনে খুসী হয়ে তাকে পায়রার ডিমের মতো বড় মুক্তোর একছড়া মালা দিলেন। তারপর তাঁর মেজ-মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন—“তুমি আমাকে কতখানি ভালবাস?” মেজ মেয়ে জবাব দিলে—“আমি? এই পৃথিবী যত বড় ততখানি।” শুনে খুসী হয়ে সওদাগর তাকে একসিন্দুক মোহর দিলেন। তারপর তিনি ছোট মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন। ছোট মেয়ে বললে—“আমি তোমায় ভালবাসি ঠিক হুনের মত।”

“হুন! পৃথিবীর একটা ওঁচা জিনিস, তার মতন ভালবাসা!” সওদাগর চটে উঠে তখুনি ছোট মেয়েকে এক-কাপড়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

মেয়ে আর কি করে? সে কাঁদতে-কাঁদতে বাপের বাড়ী ছেড়ে চলে গেল। অনেক দূর গিয়ে একটা মাঠের মধ্যে এসে দেখলে বড় বড় লম্বা লম্বা ঘাস গজিয়ে আছে। তাই তুলে নিজের গায়ের মাপে পা-অবধি-ঢাকা একটা ঘাসের জামা আর একটা টুপি তৈরি করলে। তারপর তার গায়ে যে জরির কাপড় ছিল তাই ঢেকে এই ঘাসের জামা আর টুপি পরলে। এমন চেহারা হল যে আর তাকে চেনা যায় না।

মাঠ পেরিয়েই রাজার বাড়ী। সেইখানে গিয়ে সে বললে—“আমাকে তোমরা দাসী রাখবে?” রাজার চোপদার বলে উঠল—“না, না, চোপ্।”



মেয়েটি তখন কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলে—“আমি মাইনে চাই না ; আমাকে ছুটি-ছুটি পাত-কুড়িয়ে খেতে দিও ; যা কাজ দেবে তাই করব।” তার কান্না দেখে ভাঁড়ারির দয়া হল। সে তাকে রান্না-ঘরের পোড়া-বাসন মাজবার কাজ দিলে। সে হাসি-মুখে কাজ করতে লাগল, কিন্তু কেউ তার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করলেই কেঁদে ফেলত। একটা নাম তো চাই, কাজেই তার গায়ে ঘাসের কাপড় দেখে রাজ-বাড়ীর লোকেরা তার নাম দিলে ঘেসেটি। সবাই তাকে ওই নামেই ডাকতে লাগল।

এমনি দিন যায়, কিছুদিন বাদে মন্ত্রী মহাশয়ের নাতীর ভাতে খুব ধুমধাম হ’ল। রাজ্যসুন্দর নিমন্ত্রণ।

রাজবাড়ীর সবাই সেই নিমন্ত্রণে গেল—দাস-দাসী কেউ বাদ রইল না। কেবল ঘেসেটিকে অন্য দাসীরা যখন ডাকাডাকি করলে, সে বলে—“আমি আজ যেতে পারব না—আমার অশুখ করেছে।”

তারপর সবাই যখন চলে গেল, তখন সে করলে কি, না আস্তে-আস্তে তার ঘাসের টুপি আর জামা খুলে ফেলে, গা হাত পা ভাল করে পরিষ্কার করে, চুপি চুপি মন্ত্রীর বাড়ীতে গিয়ে ঢুকল। যে দেখে সেই অবাক। সবাই বলাবলি করতে লাগল—এমন চমৎকার কাপড় পরা এমন চাঁদপানা সুন্দর মেয়ে তো কোথাও দেখিনি। রাজপুত্রও সেখানে নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন। মেয়েটিকে দেখে তাঁর চোখ আর ফেরে না। তাঁর মনে হতে লাগল, এ কি স্বর্গের অঙ্গুরা না কিম্বারী। তিনি সে রাত্রে আর কারো সঙ্গে কথা কইলেন না। সমস্তক্ষণ এই মেয়েটির সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। রাজ্যের যত সুন্দর সুন্দর মেয়ে সেখানে গিয়েছিল, তাদের সবাইয়ের হিংসা হতে লাগল। তারপর ঘেসেটি করলে কি, না আসর ভাঙ্গবার

একটু আগে চুপি চুপি সেখান থেকে সরে পড়ল। বাড়ী ফিরে ঘাসের টুপি আর জামা পরে নিজের বিছানায় চুপ করে শুয়ে রইল। অগ্ন দাসীরা ফিরে এসে দেখে ঘেসেটি অকাতরে ঘুমচ্ছে।

পরদিন সকালে তারা সবাই ঘেসেটিকে বল্লে—“কাল যে একটি মেয়ে এসেছিল, তেমন সুন্দর মেয়ে কেউ কখনো দেখেনি। যেমন তার রূপ তেমনি তাঁর সাজ, যেন স্বর্গের দেবী! আমাদের রাজপুত্র তাঁকে দেখে একেবারে মোহিত।”

ঘেসেটি বল্লে—“তাই নাকি! ওমা, আমি দেখতে পেলুম না।”

তারা বল্লে—“আজও আবার নেমন্তন্ন আছে—আজ গেলেও দেখতে পাবি।”

ঘেসেটি বল্লে “আচ্ছা আজ যাব—।”

কিন্তু সন্ধ্যার সময় ঘেসেটি বল্লে—“আজও শরীরটা বড় খারাপ বোধ হচ্ছে।” তারপর সবাই চলে গেলে সে আস্তে আস্তে ঘাসের টুপি আর জামা খুলে রেখে নিমন্ত্ৰণ-বাড়ী চলে গেল। রাজপুত্র সে রাত্রেও আর কারুর সঙ্গে কথা কইলেন না, সমস্তক্ষণ কেবল ওই মেয়েটির সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরতে লাগলেন। তারপর আসন্ন ভাঙ্গবার আগেই ঘেসেটি আবার তেমনি করে সেখান থেকে বাড়িতে এসে শুয়ে রইল।

পরদিন সকালে তারা সবাই বল্লে—“যেমন গেলি না, তেমনি তোর দেখা হল না। মেয়েটি কালও এসেছিলেন।” ঘেসেটি বল্লে—“তাই ত, আমার অদৃষ্টে দেখা হল না।”

তারা বল্লে—“ছঃখ করিসনি, আজকে যাস, তাহলে তাঁকে দেখতে পাবি।”

ঘেসেটি বল্লে—“আজ ঠিক যাব।” কিন্তু সে দিনও সন্ধ্যার সময় সে বল্লে—“আমার অসুখ করেছে।” তারপর সবাই চলে গেলে সে আগের মত সেখানে গিয়ে হাজির হ’ল। রাজপুত্রের আনন্দ আর ধরে না। অনেক সাধ্য সাধনা করে রাজপুত্র মেয়েটির নাম ধাম জানতে চাইলেন কিন্তু সে কিছুতেই বল্লে না। রাজপুত্র নিজের হাতের আংটি খুলে মেয়েটির হাতে পরিয়ে দিয়ে বল্লেন—“আমাকে মনে রেখো।”

সে দিনও আর-সবাই ফিরে এসে দেখলে ঘেসেটি ঘুমচ্ছে। পরদিন তারা সবাই ঘেসেটিকে গঞ্জনা দিতে লাগল—“আর তাঁকে দেখতেও পাবি না। যেমন গেলিনে।” ঘেসেটি ভারি ছঃখ দেখিয়ে বল্লে—“তাইত, আমার যে দেখবার ভারি ইচ্ছে ছিল।”

এদিকে রাজপুত্র বাড়ী এসে সমস্ত রাত্রি সেই মেয়েটির কথা ভাবতে লাগলেন। তাঁর চোখে ঘুম এল না। তাঁর মনে হল মেয়েটি কখনই মানুষী নয়, নিশ্চয়

পরীর দেশের মেয়ে, ছুদিনের জন্ত দেখা দিয়ে কোথায় উড়ে চলে গেছে। তাহলে কি হবে?” ভাবতে ভাবতে রাজপুত্র দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগলেন। শেষে এমন অসুখ হয়ে পড়ল যে বিছানা থেকে উঠতে পারেন না। সকলে হায় হায় করতে লাগল।

রাজা যখন শুনলেন সেই মেয়েটির জন্ত রাজপুত্রের এই অসুখ, তখন তিনি দেশে দেশে দূত পাঠালেন। রাজপুত্রের বন্ধু মন্ত্রিপুত্র এসে বল্লেন—“ভাই রাজপুত্র, ভেব না। দেশে দেশে দূত গেছে, সেই মেয়ের সন্ধান এল বলে।” রাজপুত্র কিছু বল্লেন না, মুখ বুজে শুয়ে রইলেন। ভাবলেন—“হায়! তার খবর মাঝুখে কি করে আনবে?”

রান্নাঘরে খবর এল রাজপুত্রের জন্ত সাবু তৈরি কর। রাধুনি-ঠাকরুন সাবু তৈরি করতে যাচ্ছেন, এমন সময় ঘেসেটি বল্লেন—“আমাকে আজ সাবু তৈরি করতে দাও না বামুন-মা।” বামুন-মা বল্লেন—“না বাছা কাজ নেই, শেষে খারাপ করে ফেলবি।”

অনেক সাধ্যসাধনার পর বামুন-মা তাকে সাবু তৈরি করতে দিতে রাজি হল। ঘেসেটি সাবু তৈরি করে সোণার বাটিতে ঢেলে তার মধ্যে চুপি চুপি হাতের আংটি ফেলে দিয়ে রাজপুত্রের কাছে পাঠিয়ে দিলে।

রাজপুত্র সাবু খেয়ে দেখেন বাটির তলায় একটা আংটি পড়ে। তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে দেখলেন এ সেই তাঁর নিজের আংটিটা। এ আংটি কোথা থেকে এল! রাজপুত্র হাঁক দিয়ে বল্লেন—“ডাক বামনীকে।”

বামনী ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে এসে হাজির হল, রাজপুত্র বল্লেন—“এ সাবু আজ কে তৈরি করেছে?” বামুনঠাকরুন আমতা আমতা করে বল্লেন—“কেন? আমি তৈরি করেছি?” রাজপুত্র বল্লেন—“কোন ভয় নেই, তুমি সত্যি-কথা বল।” বামনী বল্লেন—“সাবু ঘেসেটি তৈরি করেছে।” “সে কে?” “সে রান্না-বাড়ীর দাসী।” “আচ্ছা, তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও।”

ঘেসেটি আসতে রাজপুত্র তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—“সাবু কি তুমি তৈরি করেছ?” সে বল্লেন—“হাঁ।” রাজপুত্র তখন সেই আংটি দেখিয়ে বল্লেন—“এ আংটি তুমি কোথায় পেলি?” ঘেসেটি উদ্ধর করলে—“যাঁর আংটি তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি।” রাজপুত্র চমকে উঠে বল্লেন—“কে তুমি?” সে হেসে বল্লেন—“আমি ঘেসেটি।” গলার স্বরে রাজপুত্র আবার চমকে উঠে বল্লেন—“কে তুমি আমায় শীঘ্র বল।”

যেসেটি বল্লে—“এই দেখ রাজপুত্র আমি কে।” বলেই ঘাসের জামা আর টুপি খুলে ফেল্লে। রূপের আলোয় ঘর ভরে উঠল। রাজপুত্র অবাক হ’য়ে দেখলেন—কি আশ্চর্য্য, এ যে সেই মেয়েটি!

তারপর দেখতে-দেখতে রাজপুত্র সেরে উঠলেন। মেয়েটির সঙ্গে তাঁর বিয়ের ঠিক হয়ে গেল।

রাজপুত্রের বিয়ের ভারি ঘট। রাজ্য শুদ্ধ লোকেরই নেমস্তম্ভ—সেই সঙ্গে মেয়ের বাপ সেই ধনী সওদাগরও নিমন্ত্রণ পেলেন।

বৌ-ভাতের দিন রাজার বৌ রান্না-ঘরে বামনীকে বল্লেন—“আজ তরকারিতে ছুন দিতে মানা।” রাঁধুনী কি করে? মনিবের লুকুম; কাজেই সমস্ত ব্যঞ্জন আলুনী রাঁধল।

লোকেরা যখন খেতে বসল, তখন ব্যঞ্জনের সুন্দর গন্ধে সকলকার জিভে জল আসতে লাগল, কিন্তু ছুন নেই বলে কেউ তা মুখে করতে পারলে না। সবাই একটু একটু মুখে ঠেকিয়ে পাতে ঠেলে রাখতে লাগল। কারুরি কিছু খাওয়া হল না। সবাই ভাবলে রাজবাড়ীর রাজভোগের এ কি ছিরি হল! রাজপুত্র আসল কথা জানতেন, তিনি বল্লেন—“আপনারা কেউ কিছু খাচ্ছেন না কেন?” সবাই বল্লে “ছুন নেই যে!” রাজপুত্র তখন সেই মেয়েটির বাপের কাছে গিয়ে বল্লেন—“একি! আপনার খাওয়া হল না যে? খান খান!” তিনি বল্লেন—“ছুন নেই যে, খাবো কি করে?” রাজপুত্র বল্লেন—“সে কি কথা সওদাগর-মশায়! এমন সব ভাল ভাল জিনিষ থাকতে পৃথিবীর মধ্যে একটা গুঁচা জিনিষ ছুন নাই বা রইল! তাতে কি? আপনি পরিতোষ করে আহাৰ করুন!”

এই কথা শুনে সওদাগরের চোখে জল এল। রাজপুত্র বল্লেন—“একি আপনি কাঁদছেন কেন?”

সওদাগর বল্লেন—“অনেক ছুখে কাঁদছি রাজপুত্র। আমার তিন মেয়েকে জিজ্ঞেস করেছিলুম তোমরা আমায় কেমন ভালবাস? তাতে বড় মেয়ে বল্লে—আমি তোমায় প্রাণের চেয়েও ভালবাসি; মেজ মেয়ে বল্লে, পৃথিবীর চেয়েও ভালবাসি। পরে বুঝতে পেরেছি সে সব কেবল কথার কথা! ছোট মেয়ে বলেছিল সে আমায় ছুনের মতন ভালবাসে। এখন বুঝছি ছুন কেমন জিনিষ! সেই আমায় সত্যি সত্যি ভালবাসত।”

রাজপুত্র বল্লেন “ভালবাস্ত কেন বলছেন? তিনি কি আর এখন ভালবাসেন না।”
সওদাগর কঁাদতে-কঁাদতে বল্লেন—“হায়! সে মেয়ে কি আর আছে? তাকে আমি
বাড়ী থেকে দূর করে দিয়েছিলুম।” বলে সওদাগর ঝর ঝর করে কঁাদতে লাগল।

“আছি বাবা, আছি”—বলে রাণীর সাজে তাঁর মেয়ে দৌড়ে এসে তাঁকে প্রণাম
করলেন। সওদাগর দেখলেন তাঁর মেয়ে রাজার বৌ হয়েছে। আনন্দে তাঁর
চোখে আবার জল এল। তিনি মেয়ে জামাইকে আশীর্ব্বাদ করবার জন্য, তাঁর যত
ধন-দৌলত ছিল, তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে সব এনে হাজির করলেন।

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

নেড়ুর ভয়



মরা কি মাকড়সাকে ভয় পাও? আমি জানি
ছোট ছেলেরাই মাকড়সাকে ভয় করে। কিন্তু
আমাদের “নেড়ু” এত যে বুড়ো ঢেঁকি হ’য়েছে
তবু তার মাকড়সার ভয় আর গেল না। যদি
কোনও ঘরে একটা মাকড়সা দেখা যায়,
তা’হলে কার সাধ্য নেড়ুকে সে ঘরে ঢোকায়।
যতক্ষণ না সেই মাকড়সাকে একেবারে
গুঁড়িয়ে ছাতু করা হবে ততক্ষণ নেড়ুর আর
শান্তি নাই। যদি কেউ তার কাণের কাছে
এসে শুধু বলে “মা-ক-ঈ” তা’হলেই ত
হয়েছে, টেঁচিয়ে মেচিয়ে সে একেবারে হুলুস্থূল
বাধিয়ে তুলবে। আর মাকড়সা বাবাজীও
নেড়ুকে চিনে বসেছে। যত মাকড়সার গুপ্তি,
আর মাকড়সার মামা খুড়ো মেশো পিসে,

সব কি নেড়ুর উপর লাফিয়ে পড়ে? একবার নেড়ু এক বাড়ীতে নেমস্তন্ন খেতে
গেছে। পোলাও মাংসে চৰ্ক্যে চোম্বো পাতখানা একেবারে ভরে গিয়েছে, নেড়ুত

জিভের জল আর সামলাতে পারে না। হাঁ ক'রে সে হাত বাড়িয়ে যেমনি নাকি খেতে যাবে অমনি এক চীৎকার। পাশের লোকেরা অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইল, লোকজন সব দৌড়ে এসে নেড়ুকে তুলে জল দেয় বাতাস করে। একজন বলে, “নিশ্চয় গলায় কাঁটা লেগেছে”—ব'লেই সে গলার মধ্যে আঙ্গুল ঢোকাতে গেছে। তখন নেড়ু অনেক কষ্টে বলে উঠল “মা—মা—মাকড়সা,—পোলাওয়ার পাশ দিয়ে একটা মাকড়সা হেঁটে গেল”। শুনে সবাই যত হাসে, অভিমানে নেড়ুর গাল ততই ফুলে ফুঁপিয়ে ওঠে।

ক্লাসের ছেলেরাও যখন তখন নেড়ুকে জ্বালায়। একদিন নেড়ুর বন্ধু বুড়ো বলে, “ভাই, আজ তোর জন্ম এক কোটো মসলা এনেছি, খাবি?” নেড়ুত মহা খুসী। সে যেমন কোটোখানি খুলেছে ওমনি কিল্‌বিলিয়ে ছুটা মাকড়সা তার গায়ের উপর লাফিয়ে পড়েছে। নেড়ু ত বেশি ডিঙ্গিয়ে কালী উণ্টিয়ে বই ছিটিয়ে “ফিট” হবার যোগাড় করে আর কি! মসলা খাওয়া ত চুলোয় গেল, লাভের মধ্যে কালী উণ্টোনের দরুণ এক ঘণ্টা কোণে দাঁড় খেতে হল।

সব চেয়ে মজা হয়েছে, একদিন ত নেড়ুবাবু স্নানের ঘরে স্নান করতে ঢুকেছেন, হঠাৎ তার হাউ মাউ কান্না আর চীৎকারেতে ঘর দালান সব কেঁপে উঠল। পাশের উঠোনে কতকগুলি রাজমিস্ত্রী কাজ করছিল, তারা সব দৌড়ে এল, ঠাকুর রান্না চড়িয়েছিল, সেত “কঁড় হউছি” ব'লে রান্না ফেলে লাফিয়ে এল, বাড়ীর লোকেরা সব ত হাজির হ'লই, বাইরের কয়েকটি ভদ্রলোকের নেমন্তন্ন ছিল, তাঁরা পর্য্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে ছুটে এলেন।

সবাই বাইরে থেকে জিজ্ঞাসা করে “কি হয়েছে রে নেড়ু?” নেড়ুর আর কোনও কথাটি নাই, কেবল চীৎকার। নেড়ুর বড় দাদা ধমক দিয়ে বলেন, “কি, হয়েছে কি? দরজাটা খোল না দেখি।” নেড়ু তখন বলে উঠল, “দরজা খোলা যাচ্ছে না, দরজার ওপর মা-ক-ডু-সা।” দাদা বলে, “মাকড়সা ত কি হ'য়েছে? তাড়িয়ে দে না”। নেড়ু বলে, “ঐ ঐ—ঐ আমার দিকে তাকিয়ে আছে! তুমি শীগ্‌গির একটা মই দিয়ে উঠে দরজার উপরের ফাঁক দিয়ে ঢোকো”। শেষটায় সত্যি সত্যি নেড়ুর দাদাকে তাই করতে হল। নেড়ুর মা তখন নেড়ুকে কত বকলেন, বলেন যে, “মাকড়সা তাকিয়ে থাকলে কি হয় বাপু?” নেড়ু অনেকক্ষণ পরে বলে, “আমি দেখেছি মাকড়সা যার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, তার হাত পা কেমন অবশ হয়ে যেতে থাকে, শেষটায় অজ্ঞান

হয়ে যেতে পারে। এ রকম করে মাকড়সা মানুষকে ‘হিপনোটাইস’ করতে পারে, আমি যদি না চেষ্টাভীম নিশ্চয় আমাকেও ‘হিপনোটাইস’ ক’রে ফেলত।”

তোমরা ভাবছ এটা একটা গল্প। কিন্তু তা নয়, এর মধ্যে অনেকখানিই সত্যি। তবে যার কথা বলছি, তার নামটা অবশ্য নেড়ু নয়। তার নাম হচ্ছে—থাক, আর নাম ক’রে দরকার নেই।

শ্রীমাধুরীলতা রায়।

পঞ্চুলাল

৮)

পঞ্চু সারাটা রাত ধরে সাঁতার দিল। রাতটাও সহজ নয়,—শুধু বৃষ্টি হলেও মানুষে পারে, তার উপর শিলাবৃষ্টি ঝড় আর বজ্রপাত—আর বিছাতের এগ্নি আতস-বাজি যে রাতকে দিন করে দেয়। ভোরের দিকে মস্ত একটা ঢেউ এসে তাকে আড়কোলা করে তুলে ছোট একটা দ্বীপের উপর এগ্নি জ্বরেই আছড়ে ফেলল যে তার কাঠের হাড় পাঁজর, পায়ের হাঁটু, হাতের কজা, সব খটমট করে উঠল। ক্রমে আকাশ পরিষ্কার হ’ল, সূর্য্যদেব দেখা দিলেন, পঞ্চুলাল ফ্যালফ্যাল করে চারি দিক দেখতে লাগল। কিন্তু সেই ছোট নৌকাখানি কোথাও দেখা গেল না। শুধু জল, নীল জল, কালো জল, ফেনা-ভরা জল, সাপের গায়ের মত চারিদিকে ডুরিটানা অস্থির জল; কেবলি কাঁপছে, কেবলি ঢুলছে, কেবলি শব্দ করছে—যেন মস্ত একটা অজগর। পঞ্চু ভয়ে ডুকরে কেঁদে উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময় দেখলে মস্ত একটি মাছ জলের উপর মাথাটি জাগিয়ে রেখে ধীরে স্তম্বে ডাঙার পাশ দিয়ে যাচ্ছে। তার নাম পঞ্চুর জানা ছিল না—তাই পঞ্চু বললে “ওগো মাছমশায়! একটি কথা বলতে চাই।”

“একটি কেন, দুটিও বলতে পার।”

“যে নৌকোতে আমার বাবা আছেন সে নৌকো দেখেছ কি?”

“বোধ হয়, রাতের ঝড়ে নৌকোখানি ডুবেছে।”

“আর আমার বাবা?”

“তাকে বোধ হয় সেই বোয়াল মাছে গিলে ফেলেছে।”

পঞ্চু কাঁদ’ কাঁদ’ হ’য়ে বলল, “বোয়াল মাছটা কি খুব বড়?”

“বড়! মাগো সেটা এমনি বড় যে পাঁচতলা বাড়ী কোথায় লাগে—আর তার



প্রকাণ্ড মুখের মধ্যে আধ ক্রোশ লম্বা একখানা ট্রেনগাড়ী টুপ করে গলে যায়।”
 “বাপরে! তবে উপায়?”—এই বলেই পঞ্চ তাড়াতাড়ি দৌড় দিলে। তার ভয় হ’ল
 পাছে বোয়াল মাছটা রেল মুখে করেই তাকে তাড়া করে। কিছু দূর যেতেই সে
 ছোট্ট একটি গ্রামে পৌঁছল; তার নাম মধুকর-নিবাস। দেখলে সেখানে পথে
 ঘাটে, ঘরে মাঠে, চারিদিকেই লোকজন কাজে ব্যস্ত। কারো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প
 করবার অবসর নেই। কুঁড়ে পঞ্চ মনে মনে ভাবলে, এ গ্রামে আমার বাস করা
 পোষাবে না। কিন্তু পেটে তখন ক্ষুধার আগুন জ্বলছে, কিছু খাওয়া না পেলে আর
 উপায় নাই। বাপের কাছে সে শিক্ষা পেয়েছিল, যে ভিক্ষা করা করা বড় অপমান।
 কিন্তু তবু ভিক্ষার কথাটাই তার মনে এল। এমন সময় দেখলে কি, একটি বড়
 মানুষ অতি কষ্টে ছুটি ছোট গাড়ীতে করে কয়লা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পঞ্চ তার
 কাছে গিয়ে বললে, “মশায় দয়া করে যদি ছুটি পয়সা দেন, তবে খেয়ে বাঁচি, কাল
 থেকে অনাহারে আছি।” লোকটি বললে, “হু পয়সা কেন, আমি তোমায় হু আনা
 দেব—তুমি আমার এই গাড়ী ছুটি টেনে বাড়ী পৌঁছে দাওত”। বোকা পঞ্চর

ভারী রাগ হল। কি! এত বড় অপমান? আমি কি গাধা যে গাড়ী টানব? সে রেগে মেগে বল্লে—“আপনার তো দেখছি ভারী আক্কেল, আমায় কি গরু মোষ পেয়েছেন যে গাড়ী টানতে হবে? আমার জন্মে কখনো এমন কাজ করি নি।” বুড়ো মানুষটি হেসে বল্লে “ওমা তাইত, জন্মে করনি, দেখো মল্লেও কোরনা যেন! তোমার অহঙ্কারের চাপাটি আর রুটি বানিয়ে খেয়ে থেকো, দেখো যেন অজীর্ণ না হয়।

কিছুক্ষণ পরে একজন রাজমিস্ত্রী সেই পথ দিয়ে এক বুড়ি চূণ ঘাড়ে করে যাচ্ছিল—পঞ্চু আবার বল্লে, “মশায়, দয়া করে যদি ছুটি মাত্র পয়সা দেন, তবে খেয়ে বাঁচি।” রাজমিস্ত্রী বল্লে, “এসো বাছা, আমার এই চূণের বুড়িতে বয়ে দাও, আমি তোমায় দুটো ছেড়ে দশটা পয়সা দেব।” পঞ্চু বল্লে “ও বাবা! তাহ’লে যে বড় পরিশ্রম হবে।” রাজমিস্ত্রী হেসে বল্লে, “তবে বিশ্বাসই কর, হাঁই তুলতে তুলতে পেটখানা ঢাক হ’য়ে উঠবে।” এম্মি করে কত লোক সে পথ দিয়ে গেল; সবাই কাছে পঞ্চু হাত পাতলে, সবাই বল্লে, “ছিঃ, ভিখ মাঙতে লজ্জা করে না? কাজ কর।”

সবাই যখন চলে গেল, একজন আধা-বয়সী স্ত্রীলোক সেই পথে এল। সে দুহাতে দুই বাল্টি ভরে জল নিয়ে যাচ্ছিল। পঞ্চু তাকে দেখে বল্লে, “মাগো, আমায় তোমার বাল্টি হতে একটু জল খেতে দেবে? আমার বড় পিপাসা পেয়েছে।” স্ত্রীলোকটি বাল্টি দুটি নামিয়ে রেখে বল্লে, “পিপাসা লেগেছে? আহা, তবে জল খাও।” জল খেয়ে পঞ্চু বল্লে, “তৃষ্ণাত মিটল কিন্তু ক্ষুধায় যে প্রাণ যায়।” স্ত্রীলোকটি তৎক্ষণাৎ বল্লে, “আমার একটা বাল্টি বাড়ী পৌঁছে দাও; তাহলে আমি তোমায় ভাত খেতে দেব।” পঞ্চু বাল্টির দিকে চেয়ে রইল, হাঁ কি না কিছুই বল্লে না। স্ত্রীলোকটি বল্লে, “শুধু ভাত নয়, খুব ভাল ফুলকপি আর কড়াই সূটির ডালনাও খাওয়াব।” এবারও পঞ্চু হাঁ কি না কিছুই বল্লে না। আবার সেই স্ত্রীলোকটি বল্লে, “শেষে রসে-ভরা এক গণ্ডা রসগোল্লা পাবে।” এ প্রলোভনে পঞ্চু কাবু হয়ে গেল, সে তৎক্ষণাৎ বাল্টি মাথায় করে নিয়ে চলল। বাড়ী পৌঁছে স্ত্রীলোকটি পঞ্চুকে আদর করে বসালে, দিব্যি আসন পেতে, জল দিয়ে থালায় করে ভাত বেড়ে দিলে। দেখতে না দেখতে থালা ফরসা হয়ে গেল। খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে পঞ্চু যখন একটু অবসর পেলে তখন সে সেই স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে রইল—চোখ আর কেরে না, যেন তাকে কেউ যাচ্ করেছে। স্ত্রীলোকটি হেসে বল্লে, “অমন হাঁ করে কি দেখছ বাছা?” পঞ্চু বল্লে, “তুমি কে? সত্যি বল, তুমি কি সেই—তুমি

কি আমার দিদি বনশ্রী ?” বলেই স্বীলোকটির পা জড়িয়ে ধরে উপুড় হয়ে পড়ে পঞ্চু কাঁদতে লাগল। প্রথমে সেত কিছুতেই স্বীকার করে না যে সে শ্যামাবনশ্রী। তারপর যখন দেখলে পঞ্চু ঠিকই তাকে চিনতে পেরেছে তখন হেসে বলে, “হ্যাঁরে ছফ্ট, কি করে বুঝলি যে আমি বনশ্রী ?” “আমি তোমায় বড় ভাল বাসি তাই বুঝতে পারলাম।” “তুমি আমায় যখন ছেড়ে এসেছিলে তখন আমি ছোট ছিলাম—এখন এত বড় হয়েছি যে তোমাকে আমার ছেলে বলে মনে হচ্ছে।” “ভালই হ’ল—এবার হতে তোমায় মা বলব—আমার তো মা ছিল না,—সব ছেলেরি মা আছে, আর মা নেই বলে আমার ছঃখু হত। এখন তুমি মা হলে। আচ্ছা মা, কেমন করে এত শীগুগির এত বড় হয়ে গেলে ?” “আমিও বড় হতে চাই—আমি বুঝি চিরকাল এই বামন অবতার হয়ে থাকব ?” “তুমি যে কাঠের পুতুল, তুমি এর চেয়ে আর কখনো বাড়বে না।” “বাঃ আমি যে মানুষ হতে চাই।” “সেত সোজা কথা, ভাল হও তবেই মানুষ হবে।” “আমি বুঝি ভাল নই ?” “একেবারেই না, ভাল ছেলেরা কথা শোনে।” “তা ঠিক, আমি কথা আদবেই শুনি নে।” “ভাল ছেলেরা লেখা পড়া শেখে, কাজ করে, আর তুমি—?” “আমি শুধু ভব-ঘুরের মত ঘুরে বেড়াই।” “ভাল ছেলেরা সত্যি কথা বলে।” পঞ্চু বলে, “আবার যদি আমার বাবাকে দেখতে পাব জানি তবে আমিও ভাল হই।” “আমার বিশ্বাস তুমি তাঁকে দেখতে পাবে।” তুমি আমার জন্ম অত কেঁদেছিলে, তাই আমি বুঝেছিলাম তোমার মনটা ভাল—চেপ্টা করলে ভাল হতে পারবে। তাই তোমার খোঁজে এসেছি। এখন আমি যা বলব তাই করবে বল—তা হলে তোমার ভাল হবে।” পঞ্চু বলে, “আমি এখন হতে তোমার কথা মত চলব, পুতুল আর থাকতে চাই নে, এবার মানুষ হব।” ঠিক হ’ল পরদিন হতে পঞ্চু স্কুলে যাবে। পঞ্চু ত স্কুলে গেল; কাঠের পুতুলটিকে দেখে ছেলেদের আর আছাদের পার নেই। তাকে নিয়ে নানান্ কাণ্ড করতে লাগল, কেউ নাক ধ’রে টানে, কেউ টুপি কেড়ে নেয়, কেউ বা কালি দিয়ে গোঁপ এঁকে দেয়। পঞ্চু চুপ করে অনেকক্ষণ ছিল তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, “তোমাদের একি ব্যবহার বলত! আমি ভদ্রসন্তান, আমার বিশ্বাস তোমরাও তাই, এবার হ’তে ব্যবহার সেই রকম ক’র।” পঞ্চুর গম্ভীর কথা শুনে সবাই যেন চমকে গেল, আর বিরক্ত করত না। পঞ্চুর ব্যবহার দিন দিনই ভাল হতে লাগল, ভাল পড়া করে, ঠিক সময়ে আসে, ঠিক সময়ে ফিরে

যায়—প্রতিদিন পড়া তৈরি ক’রে আনে। তার চাল চলন দেখে মাষ্টার মশায়ও খুসী হয়ে প্রশংসা করলেন। তবে পঞ্চুর একটি দোষ ছিল, সে যাকে তাকে বন্ধু করত। মাষ্টার মশায় বার বার বলতেন, দেখো, ছুঁছুঁ ছেলেদের সঙ্গে বেশী মিশো না—ওতে তোমার মন্দ হবে—একদিন বিপদে পড়বে। হ’লও তাই। সেদিন বড় চমৎকার দিন, রোদ উঠেছে অথচ বাতাসটি ঠাণ্ডা, আকাশ পরিষ্কার, চারিদিকে পাখী ডাকছে। স্কুলে যাবার পথে পঞ্চুর সাথীরা দুজন বলে “শুনেছিস খবর! সমুদ্রের ধারে মস্ত একটা বোয়াল মাছ এসেছে—পাঁচ তলা বাড়ীর সমান বড়।” “সত্যি নাকি? আমার বাবাকে যে বোয়ালটা গিলে ছিল সেটা নয় ত?”

“তোমার বাবাকে গিলেছিল কিনা সে খবর জানিনে, তবে আমরা সেটাকে দেখতে যাচ্ছি। তুই যাবি?” পঞ্চু বলে “না এখন স্কুলে যাব।” “আরে স্কুলে ত রোজই যাওয়া যায়, অমন বোয়াল মাছ তোমার জন্তে বসে থাকবে নাকি?” “মাষ্টার মশায় বলবেন কি?”—“তারা ত সবই জানেন, বকেন ত বকবেন তাতে আর হবে কি? ওঁরা তো মাইনে পান, তাই অত কথা বলেন।”—“আর মা? মা যে ছুঁছুঁ করবেন।”—“মায়েরা ছাইও জানে না।” “বোয়াল মাছটা আমার একবার দেখা দরকার, তা আমি স্কুলের পর যাব।” “তুমি একটা আস্ত গাধা, জলের মাছ কতক্ষণ তোমার পথ চেয়ে বসে থাকবে—যেন্নি তার খেয়াল হবে অগ্নি সে অগ্নি জায়গায় চলে যাবে।” “আচ্ছা কতক্ষণে ফেরা যায়?” “কতক্ষণ আর? আধ ঘণ্টা।” পঞ্চু তখন উৎসাহ করে বলে, “চল্ ভাই, যে আগে যেতে পারবে সে বকশিস পাবে।” যত সব ছুঁছুঁ ছেলে বই বগলে মাঠের উপর ছুটে চলে—পঞ্চুলাল সবার আগে—মনে হল তার পায়ে যেন পাখা লাগান আছে।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রিয়দা দেবী।

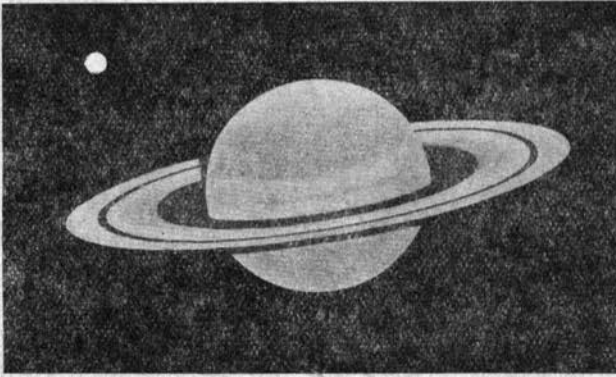
শনির দেশে

কেউ যদি বলে যে, এই পৃথিবীর বাইরে যেখানে বলবে, সেখানে নিয়ে তোমাদের তামাসা দেখিয়ে আনবে—তাহ’লে তোমরা কোথায় যেতে চাও? আমি জানি, সে রকম হ’লে আমি নিশ্চয় শনিগ্রহে যেতে চাইব। পৃথিবীর আকাশে আমরা শুধু চোখে যতটুকু দেখতে পাই, তাতে মনে হয় যে, সব চাইতে সুন্দর জিনিষ হ’ল চাঁদ। সেখানে একবার যেতে পারলে আর কিছু না হোক, এই পৃথিবীটাকে কেমন মস্ত

আর জমকাল চাঁদের মতন দেখায় সেটা নিশ্চয়ই একটা দেখবার মত জিনিষ। কিন্তু শনিগ্রহে যাবার পথে সেটা আমরা দেখে নিতে পারব।

যাক, মনে কর যেন শনিগ্রহে যাত্রা করাই স্থির হ'ল। মনে কর এমন আশ্চর্য্য আকাশজাহাজ তৈরী হ'ল যাতে পৃথিবী ছেড়ে, পৃথিবীর বাতাস ছেড়ে, ফাঁকা শূণ্যের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়া যায়। তোমার বয়স কত? দশ বৎসর? বেশ! তাহ'লে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আমরা স্বপ্নজাহাজে রওনা হ'লাম শনিগ্রহে যাবার জন্য। আমাদের জাহাজটা মনে কর, খুব দ্রুত এরোপ্লেনের মত ঘণ্টায় ১০০ মাইল বা ১২৫ মাইল ক'রে চলে।

আমরা আকাশের ভিতর দিয়ে ছুট ক'রে চলেছি, আর পৃথিবীর ঘর বাড়ী সব ছোট হ'তে হ'তে একে একে মিলিয়ে যাচ্ছে। বড় বড় সহর, বড় বড় নদী, সব বিন্দুর মত, রেখার মত, হ'য়ে আসছে। এই গোল পৃথিবীর গায়ে পাহাড় সমুদ্র দেশ মহাদেশ, ক্রমে সব অতি নিখুঁৎ মানচিত্রের মত দেখা যাচ্ছে। ঐ ফ্যাকাসে হলুদে মরুভূমি, ঐ ঘন সবুজ বন, ঐ ছেয়ে-নীল সমুদ্র, ঐ সাদা সাদা বরফের দেশ। নভেম্বর মাসে আমরা, এখান থেকে চাঁদ যতদূর, তত দূর চলে গিয়েছি। এক বছরে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে, আমরা প্রায় দশ লক্ষ মাইল এসে পড়েছি। পৃথিবী থেকে চাঁদটাকে যেমন দেখি এখন পৃথিবীটাকে



ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে। হিমালয় পাহাড়কে ও আর পাহাড় ব'লে ভাল বোঝাই যাচ্ছে না। চাঁদের যেমন অমাবস্তা পূর্ণিমা হয়, দিনে দিনে কলায় কলায় বাড়ে কমে, পৃথিবীরও ঠিক তেমনি। এমনি ক'রে বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে, কিন্তু কই? শনি গ্রহ ত একটুও

শনিগ্রহ—ঐ গোল বিন্দুটি।
কাছে আসছে ব'লে মনে হয় না। শুনেছিলাম সে এক প্রকাণ্ড গ্রহ, তার

চারিদিকে আংটি ঘেরা। কিন্তু তোমার ত বিশ বছর বয়স হ'ল, গৌফ দাড়ি বেরিয়ে গেল, এখনও ত সে-সবের কিছুই দেখা গেল না। ঐ লাল রঙের মঙ্গল গ্রহটা যেন একটুখানি কাছে এসেছে, কিন্তু সেও ত খুব বেশী নয়। আমাদের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতটি বলছেন, মঙ্গল পর্য্যন্ত পৌঁছতে আরও প্রায় চল্লিশ বৎসর লাগবে। ও হরি! তাহ'লে শনিতে পৌঁছব কবে? শনি পর্য্যন্ত যেতে লাগবে প্রায় আট শ বৎসর! তাহ'লে উপায়? একমাত্র উপায়, আরও বেগে যাওয়া। আরো পাঁচগুণ, দশগুণ, বিশগুণ বেগে, কামানের গোলার মত বেগে, ঘণ্টায় দু'হাজার মাইল বেগে, ছুটতে হবে। তাই ছোট্টা যাক।

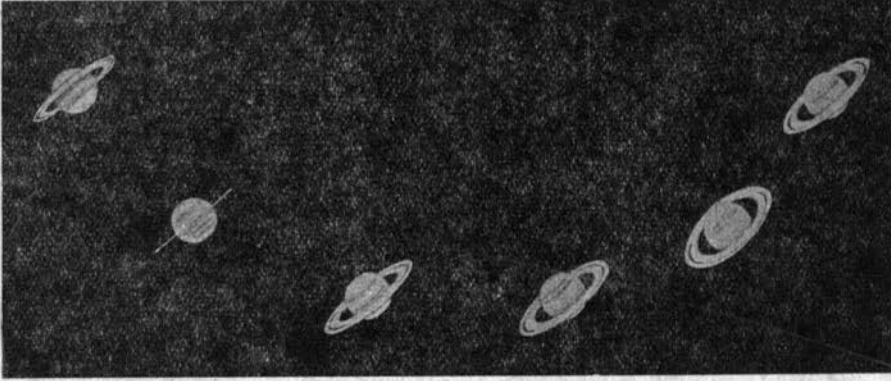
আরও দুই বৎসরে মঙ্গল পর্য্যন্ত এসে পড়া গেল। ওখানে গিয়ে একবার নামলে মন্দ হ'ত না। ওই লম্বা লম্বা আঁচড়গুলো সত্যিকারের খাল কিনা, ওখানে সত্যি সত্যি বুদ্ধিমান জীব কেউ আছে কিনা, একটিবার খবর নেওয়া যেত। কিন্তু আমাদের ত অত অবসর নেই, যেমন ভাবে চলাছি এম্মি ক'রে চল্লেও শনিতে পৌঁছতে আরও অন্তত চল্লিশ বৎসর লাগবে। সুতরাং সোজা চলতে থাকি।

মঙ্গলের পথ পার হ'য়ে এখন বৃহস্পতির দিকে চলেছি। মাঝে মাঝে ছোট-বড় গোলার মত ওগুলো কি সামনে দিয়ে হুস্ ক'রে ছুটে পালাচ্ছে? কোনটা দশ মাইল বিশ মাইল, কোনটা একশ' মাইল বা দুশ' মাইল চওড়া—আবার কোনটা ছোট খাট টিপির মতন বড়। কোন কোনটা সামান্য গুলি গোলার মত। এরা সবাই গ্রহ। যে নিয়মে বড় বড় গ্রহেরা সূর্যের চারিদিকে চক্র দিয়ে ঘোরে—এরাও প্রত্যেকেই, এমন কি যেগুলি ধূলিকণার মত ছোট সেগুলিও, ঠিক সেই নিয়মেই নিজের নিজের পথে, নিজের নিজের তাল বজায় রেখে, সূর্যের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়।

এমনি ক'রে ছুটতে ছুটতে আরো দশ বৎসর কেটে গেল, ছোট ছোট গ্রহগুলিকে আর এখন দেখাই যায় না। পৃথিবী সূর্যের আশে পাশে মিট মিট করে জ্বলছে। সূর্য্যও দেখতে অনেক খানি ছোট্ট হ'য়ে গেছে—সেই পৃথিবীর সূর্য্য আর এই সূর্য্য যেন ফুটবলটার কাছে একটি ক্রিকেট বল। ক্রমে, আরও আট দশ বৎসর ছুটে, গ্রহরাজ বৃহস্পতির চক্রপথের সীমানায় এসে হাজির হওয়া গেল। কোথায় পৃথিবী আর কোথায় বৃহস্পতি! ৩৬৫ দিনে পৃথিবীর এক বৎসর—কিন্তু বৃহস্পতি যে প্রকাণ্ড পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেই পথে একবার পাড়ি দিতে তার প্রায় বারো বৎসর সময় লাগে। ধোঁয়ায় ঢাকা প্রকাণ্ড শরীর—তার মধ্যে হাজারখানেক

পৃথিবীকে অনায়াসেই পুরে রাখা যায়। অথচ এই বিপুল দেহ নিয়েই গ্রহরাজকে লাটিমের মত ঘোরপাক খেতে হচ্ছে। এ কাজটি করতে পৃথিবীর ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে, কিন্তু বৃহস্পতির দশ ঘণ্টাও লাগে না। বৃহস্পতির চারদিকে সাত আটটি চাঁদ—তার মধ্যে চারটি বেশ বড় বড়—তিনটি আমাদের চাঁদের চাইতেও বড়।

বৃহস্পতির এলাকা পার হ'য়েছি, শনির আলো ক্রমে আরো উজ্জ্বল হ'য়ে আসছে—ক্রমে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে তার চেহারাটা ঠিক অণু গ্রহের মত নয়। মনে হয়, কেমন যেন লম্বাটে মতন—ছপাশে যেন কি বেরিয়ে আছে। আরও কাছে গিয়ে দেখ তার গায়ের চমৎকার আংটিটা ক্রমে পরিষ্কার হ'য়ে উঠছে। পৃথিবী থেকে ছোট খাট দূরবীণ দিয়ে যেমন দেখেছি এখন শুধু চোখেই সেই রকম দেখতে পাচ্ছি। আংটিটা বাসনের কানার মত, উকীলের শামলার ঘেরের মত—খুব পাংলা আর চওড়া। শনি গ্রহকে আমরা যে দেখি, সব সময়ে ঠিক এক রকম দেখি না—কখন একটু উঁচু থেকে, কখন একটু নীচু থেকে; কখন আংটির উপর দিকটা, কখন তার

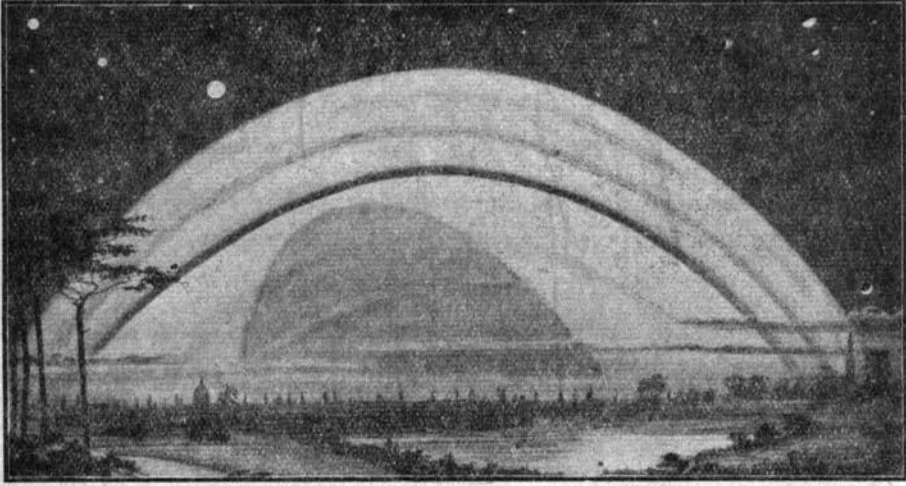


তলাটা; কখন সামনে ঝাঁক, কখন পিছন-হেলান। যখন ঠিক খাড়া ভাবে আংটির কিনারা থেকে দেখি, তখন আংটিটাকে দেখি সরু একটি রেখার মত—এত সরু যে খুব বড় দূরবীণ না হ'লে দেখাই যায় না।

প্রায় চল্লিশ বৎসর হ'ল আমরা পৃথিবী ছেড়েছি—এখন আর আট দশ বৎসর গেলে আমরা শনিতে পৌঁছাব। ততদিনে তোমার চুল দাড়ি গোঁফ সব পেকে যাবে—তুমি ষাট বছরের বুড়ো হয়ে যাবে। শনিকে অনেকখানি ডাইনে রেখে

আমরা ছুটে চলেছি। শনিও ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে ঐ বাঁয়ের দিকে ছুটে আসছে, আর কয়েক বৎসর পরে সে ঠিক আমাদের সামনে এসে হাজির হবে। সেও কিনা সূর্যের প্রজা, কাজেই সূর্যের চারদিকে তাকেও প্রদক্ষিণ করতে হয়। কিন্তু আমাদের উনত্রিশটা বছরেও তার একটা পাক পূরো হয় না।

যাক্—এত দিনে পথের শেষ হ'য়েছে; আমরা শনি গ্রহের উপরে এসে পৌঁছেছি। “আংটি”টার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ, আকাশের উপর দিয়ে, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্য্যন্ত, যেন আলোর খিলান গেঁথে দিয়েছে। খিলানের মধ্যে খিলান,



তার মধ্যে ঝাপসা আলোর আরেকটি খিলান। তার উপর আবার শনিগ্রহের ছায়া প'ড়েছে। সূর্যের এই প্রকাণ্ড রাজত্বের মধ্যে যতদূর যাও, এমন দৃশ্য আর কোথাও দেখবে না—আমাদের পৃথিবীর দূরবীণের দৃষ্টি যতদূর পর্য্যন্ত যায়, এমন জিনিস আর দ্বিতীয় কোথাও পাওয়া যায়নি।

আকাশে কত চাঁদ! একটি নয়, দুটি নয়, একেবারে আট দশটা চাঁদ—ছোট বড় মাঝারি নানা রকমের। সওয়া দশ ঘণ্টায় এখানকার দিন রাত—ঘুমের পক্ষে ভারি অসুবিধা। দিনটিও তেমনি—পৃথিবীর রোদ এখানকার চাইতে একশ' গুণ কড়া। পৃথিবী থেকে সূর্যকে যদি চায়ের পিরিচের মত বড় দেখায়, তবে এখান থেকে তাকে

দেখায় যেন আধুলিটার মত। যখন-তখন চন্দ্র গ্রহণ আর সূর্য্য গ্রহণ ত লেগেই আছে, তার উপর আবার থেকে থেকে চাঁদে-চাঁদেও গ্রহণ লেগে যায় এক চাঁদ আর এক চাঁদকে ঢেকে ফেলে। এখানকার জ্ঞান যদি পঞ্জিকা তৈরী করতে হয়, তবে তার মধ্যে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কেবল গ্রহণের হিসাব লিখতেই কেটে যাবে।

আংটিগুলি যেন অসংখ্য চাঁদের ঝাঁক—ছোট ছোট টিপির মত পাথরের ডেলার মত, কঁাকড়ের কুচির মত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি চাঁদ কেউ কারও গায়ে ঠেকে না, আশ্চর্য্য নিয়মে প্রত্যেকে নিজের নিজের পথে শনিকে প্রদক্ষিণ করছে। আর সমস্তে মিলে আশ্চর্য্য সুন্দর আংটির মত চেহারা হ'য়েছে।

এখন অসুবিধার কথাটাও একটু ভাবা উচিত। গরম বাতাস আর ধোঁয়ার ঝড় ত এখানে আছেই—তার উপর সব চাইতে অসুবিধা, এখানে দাঁড়াবার মত ডাঙ্গা পাবার জো নাই—ডাঙ্গা খুঁজতে গেলে অনেক হাজার মাইল গভীর গরম ধোঁয়াটে মেঘের সমুদ্রের মধ্যে ডুব দিতে হবে। সেই মেঘের মধ্যে জীবজন্তু কেউ বাঁচতে পারে কি না খুবই সন্দেহ। সুতরাং এখন ফিরবার উপায় দেখতে হয়।

এসেছিলাম কামানের গোলার মতন বেগে—কিন্তু তার চাইতেও তাড়াতাড়ি চলা যায় কি ? আলো চলে সব চাইতে তাড়াতাড়ি—প্রতি সেকেন্ডে প্রায় একলক্ষ নব্বই হাজার মাইল। তাহ'লে সেই রকম বেগে, আলোর সওয়ার হ'য়ে ছোট্টা যাক। পৃথিবীতে পৌঁছাতে কতক্ষণ লাগবে ? একঘণ্টা কুড়ি মিনিট।

সহজে কি বড় লোক হওয়া যায় ?

(৮ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত)

আমি আর এক মুহূর্তও সেখানে বিলম্ব করিলাম না। কোথা যাইব ঠিক নাই, কিন্তু রামলোচন বাবুর বাড়ীতে আর পদার্পণ করা হইবে না। রাস্তার বাহির হইয়া একজনের কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, “যে কোন মুদীকে পয়সা দিলেই থাকবার যায়গা আর খেতে দেবে।” মুদীর দোকান খুঁজিয়া লওয়া কঠিন বোধ হইল না। দুদিন মুদীর দোকানে থাইলাম। কিন্তু এরূপ ভাবে থাইলে বেশী দিন পয়সায় কুলাইবে না। এই চিন্তায় রাত্রিতে ঘুম হয় না। একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া মুদীর পয়সা হিসাব করিয়া দিলাম। তারপর পুটলীটি হাতে

করিয়া বাহির হইলাম। রাস্তায় কতদূর হাঁটিয়া দেখি একটা বড় বাড়ী। এ বাড়ীর কর্তা রামলোচন বাবুর মত নাও হইতে পারেন। আস্তে আস্তে বৈঠকখানার দিকে গিয়া দেখিলাম কর্তা বসিয়া আছেন, আর ইয়ার গোছের একটা অভাগত লোক তাঁহার সহিত হাসির কথা কহিতেছেন। আমি দাঁড়াইবা মাত্রই কর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে বাপু?”

আমি।—“আমি পথিক, কষ্টে পড়েছি।”

ইয়ার।—“বড় খিদে পেয়েছে বুঝি?”

আমি কোন উত্তর করিলাম না; ইয়ার-বাবু উত্তর দিকে আদুল নির্দেশ করিয়া চোখ বড় করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—

“হোটেল আছে, হোটেল! বাবুরচি লোক দিব্য রাঁধে! রোজ পাঁচ টাকাতাই চলে।”

আমি নিরাশ হইয়া বাবুর দিকে তাকাইলাম। বাবু ইয়ারের উপর অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিলেন “নিজের বাড়ীতে একটি লোককে খেতে দিতে পার না, আবার অন্য লোকের বাড়ী এসে চাষামো কর! তুমি আর আমার বাড়ী এসো না!” বলা বাহুল্য বাবুর উপর আমার ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সম্মান ইত্যাদি যত হইতে পারে, সব কটা জন্মিয়া গেল। বাবু আমাকে বলিলেন, “তোমার অন্য কোনরূপ কষ্ট না হ’লে আমার বাড়ীতে তোমার থাকবার জায়গা আর খাবার বন্দোবস্ত হতে পারে।”

“আজ্ঞে আমি অমনি থাকতে চাইনে। আপনার কিছু কাজ করে দিব, তার পরিবর্তে যদি কিছু খাবার দেন তাহা হইলে ভাল হয়।”

“উত্তম! তুমি ইংরাজী লিখতে পার?”

“কিছু কিছু ইংরাজী পড়েছিলাম বটে, কিন্তু ভাল লেখাপড়া জানি না।”

“কতদূর পড়িয়াছ?”

আমি বলিলাম।

“বেশ! তাতেই হবে।”

আমি বাবুর বাড়ী রহিলাম। কাজের মধ্যে এই, বাবুর চিঠি পত্র সব একটা করে নকল করিয়া রাখিতে হয়। এখানে থাকিয়া মাঝে মাঝে বাড়ীর কথা ভাবিতাম। বড়লোক হইবার জন্য কত কষ্ট পাইলাম, কিন্তু বড় লোক হইবার

তো লক্ষণ দেখিতেছি না। কেবল বাড়ী হইতে চলিয়া আসিলেই কি বড়লোক হওয়া যায় ? আরো কিছু চাই, আমার তাহা নাই। এইরূপ যত ভাবিতে লাগিলাম,



ততই বাড়ী ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। শেষটা ঠিক করিলাম বাড়ী যাইতে হইবে। আমার হাতে যে কিছু টাকা আছে তাহাতে পথ খরচ চলিবে না। সুতরাং এবার আর ঈমারে যাওয়া হইবে না। বৈ—তীর্থ এখান হইতে বড় বেশী দূরে নয়; সেখানে গেলে সঙ্গী পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপ চিন্তার পর মনে করিলাম, বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বৈ—যাইব; সেখানে সঙ্গী পাইলে তাহাদের সহিত বাড়ী যাইব।

কর্তার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বৈ—আসিতে বড় বেশী দেরী হইল না। যায়গাটা দেখিতে বড় সুন্দর, একটা ছোট পাহাড়, তার উপরে তীর্থস্থান। পাথরের গায় সিঁড়ি কাটা আছে।

ইয়ার-বাবু বলিলেন “হোটেল আছে।” সেই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। অনেকগুলি সিঁড়ি; উঠিতে অনেকক্ষণ লাগে। আমি উঠিতে উঠিতে তিনবার বিশ্রাম করিলাম। প্রথমেই যাহাকে দেখিলাম তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, “যাত্রীরা কোথায় থাকে ?” সে বলিল, যাত্রীদের থাকবার ভাল জায়গা নাই; প্রায় সকলেই পাণ্ডাদের বাড়ীতে থাকে। উপরে যে দেব-মন্দির, সেই মন্দিরের পুরোহিতদের নাম পাণ্ডা। পাণ্ডা খুঁজিতে অধিকক্ষণ ঘুরিতে হইল না। প্রথমে যে পাণ্ডা আমাকে দেখিল সেই হাত ধরিয়া টানিয়া আমাকে তাহার বাড়ী লইয়া গেল।

পাণ্ডার বাড়ী ছদিন থাকিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে বিষয়টা তত সুবিধাজনক নহে। আমি যে সময়ে গিয়াছি সে সময়ে যাত্রীরা প্রায়ই আসে না। সঙ্গী পাইতে হইলে আরো তিন মাস অপেক্ষা করিতে হইবে। তিন মাসের তো কথাই নাই, পাণ্ডা মহাশয় যেরূপ করিলেন তাহাতে তৃতীয় দিনেই আমাকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হইল। তৃতীয় দিন সকালে পাণ্ডা আসিয়া বলিলেন,—“দেখি ? চল”। আমি চলিলাম। অনেক জিনিষ দেখা হইল। শেষে এক জায়গায় গেলাম; সেটা

একটি বড় মন্দির। মধ্যে গহ্বর, গহ্বরের নীচে ছোট একটি বরণার মত। পাণ্ডা বলিল, “এখানে পূজা করিতে হইবে।” কত লাগিবে তাহারও হিসাব দেওয়া হইল। আমি দেখিলাম, তা’ হলে আমার বাড়ী যাওয়া হয় না। আমি বলিলাম, “আমি ছেলে মানুষ, পূজা কি করিব?” পাণ্ডা চটিয়া গেল; সেদিন হইতে আর আমাকে তাহার বাড়ীতে জায়গা দিল না। অগত্যা আমার সেখান হইতে প্রস্থান করিতে হইল। কিছু দূর গেলেই কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে আসিয়া— “পয়সা” “পয়সা” করিয়া আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। আমি কোন মতেই পয়সা দিতে চাহিলাম না। তাহারা ফ্লেপিল। কেহ গাল দেয়, কেহ কাপড় ধরিয়া টানে, কেহ দূর হইতে ছোট ছোট টিল ছুঁড়িয়া ফেলে। আমার মুখা গরম হইয়া গেল। কাছে একখানা ছোট কাঠ পড়িয়াছিল, রাগের চোটে তাহাই হাতে করিয়া লইয়া ছেলেগুলোকে তাড়া করিলাম। মুহূর্তের মধ্যে সকলে অদৃশ্য হইল। আমার যেন ভূত ছাড়িল। সেখান হইতে উদ্ধ্বাসে দৌড়িয়া পাহাড়ের প্রায় অর্দ্ধেক পথ আসিয়া পড়িলাম। তখন মনে হইল, জুতা জোড়াটা ফেলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ইহার পূর্বের ২৫ মিনিটের মধ্যে পাহাড় সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম, তাহাতে মনে ভয়ানক আতঙ্ক উপস্থিত হইতে লাগিল। আমি জুতার আশা পরিত্যাগ করিলাম। চলিবার সময় সর্বদাই চটি জোড়াটি পুঁটলীতে বাধিয়া লইয়া যাইতাম, এক্ষণে তাহাই খুঁজিয়া লইলাম।

পাহাড়ের নীচে নামিতে নামিতে অনেক বেলা হইল। একটু একটু করিয়া ক্ষুধা বাড়িতে লাগিল। কোন দোকানে যাইতে হইলে অন্ততঃ এক প্রহর চলিতে হইবে। সেই রোদে আর এক ঘণ্টা চলাই অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল। পথের ধারে ছ একটা গাছ দেখিলে ইচ্ছা হয় যে সেই খানেই শুইয়া পড়ি। কিন্তু একদিকে তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া যাইতেছে এবং অন্য দিকে ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে। কি করিব কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া পথের ধারে একটা বাড়ী খুঁজিয়া লইলাম। বাড়ীতে উঠিয়া একটা বড় ঘরে গেলাম; সেখানে দুটি ছেলে বসিয়া আছে। আমি তাহাদের নিকটে আমার ক্ষুধার কথা জানাইলাম; তাহারা “তুই” “তুই” করিয়া আমার কথার উত্তর দিতে লাগিল। একজন বলিল—

“বাঙ্গালী লোক চোর আর ঐষ্টান.; বাঙ্গালী লোককে কিছু দিব না।”

“আমি ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ; চোর নই।”

“যা তুই এখান থেকে ; c-r-i-p crip ; d-a-s-h dash.”

আমার তখন ঠাট্টার মেজাজ ছিল না। তথাপি এরপর আর হাসি থামাইতে পারিলাম না। তখন তাহাদের ধরণেই কথা কহিতে লাগিলাম :—

“ওর মানে কি হল ?”

“ও ইংরাজি। Ram is ill. I will not let him run in the sun. বাঙ্গালী লোক চোর ; যা তুই এখান থেকে।”

“তোরা ইস্কুলে পড়িস্ ?”

• এবার যেন তাহারা কিছু ভয় পাইল। বলিল—“আমাদের মাষ্টার বড় বই পড়ে।”

“তোদের মাষ্টারের চাইতে আমি কি কম একটা কিছু ? এই দেখ্ তো !”

আমার পুঁটলীতে যে বইগুলি ছিল, তাহার মধ্যে একখানা Lamb's Talesও ছিল। সেইখানা এখন বাহির করিলাম।

এই বেলা একটু পরিবর্তন দেখা গেল। তাহাদের মুখভঙ্গিতে বুঝা গেল যেন তাহারা মনে করিয়া লইয়াছে যে আমি একটা কিছু হইব। একজন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে উঠিয়া গেল। যে রহিয়া গেল আমি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া তাহার সহিত আলাপ পরিচয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তাহার কথায় বুঝা গেল যে তাহারা দু ভাই। সে ছোট। বাবা নাই ; মা আছেন ; ইস্কুলে পড়ে ; টাকা আছে ; চাকর চাকরাণী আছে। বলা বাহুল্য যে সে বাড়ীতে তখনকার জন্তু আমার বিশ্বাসের সংস্থান হইল।

(ক্রমশঃ)

লোহা

যে সমস্ত জিনিষ মানুষে সর্বদা ব্যবহার করে, আজ যদি হঠাৎ তাহার কোনটির অভাব পড়িয়া যায়, তাহা হইলে ঠিক বোঝা যায়, কোন্ জিনিষটার যথার্থ মূল্য কতখানি। সোণা রূপা মনি মুক্তা সব যদি হঠাৎ একদিন পৃথিবী হইতে লোপ পায়, তবে অনেক সৌখিন লোকে হা-ছতাশ করিবে—মানুষের টাকা পয়সার কারবারে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইবে, রূপার অভাবে ফটোগ্রাফের ব্যবসা প্রায় বন্ধ হইয়া আসিবে, এবং ছোটখাট অনেক রকমের অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। কিন্তু তবু মানুষের জীবন যাত্রার কোন ব্যাঘাত হইবে না। বড় বড় ব্যবসা বাণিজ্য, জ্ঞান-

বিজ্ঞানের চর্চা, যেমন চলিতেছিল, অনেকটা সেই রকমই চলিতে থাকিবে। কিন্তু তেমনি ভাবে যদি লোহার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তবে অবস্থাটা আরও মারাত্মক হইবে। মানুষের কলকারখানা রেল পুল জাহাজ প্রভৃতি, সভ্য দেশে যাহা কিছু না হইলে চলে না, তাহার সমস্তই বন্ধ হইয়া আসিবে। মানুষের যে-কোন অস্ত্র বা যে-কোন যন্ত্র বল—বড় বড় কামান, এঞ্জিন বা মোটর হইতে লাঙ্গল কোদাল কাঁটা পেরেক পর্য্যন্ত—সবটাতেই লোহার দরকার হয়। যার মধ্যে লোহা নাই এমনও অসংখ্য জিনিষ তৈয়ারি করিবার সময়ে, লোহার যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। যে জিনিষে তাহারও দরকার হয় না, যেমন অনেক ডাক্তারি ওষুধ, সেখানেও অনেক সময়েই কয়লার চুল্লী জ্বালিতে হয় এবং সেই কয়লা ভাঙ্গিয়া উঠাইবার জন্য খনিতে লোহার কোদাল আর অনেক কলকজার দরকার হয়। মানুষের সকল রকম কাজে যে সমস্ত তৈজস বা বাসন পত্রের দরকার হয়, তাহার সমস্তই খনিজ জিনিষের তৈয়ারি। সেই সমস্ত জিনিষ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে কাজের উপযোগী করিয়া গড়িতেও লোহার দরকার হয়। ঘরের দরজা জানালা, কড়ি বরগা, আসবাব পত্র, এ সমস্ত কাঠের তৈয়ারি হইতে পারে, কিন্তু সেই কাঠকে কাটিয়া চিরিয়া চাঁচিয়া ঘষিয়া দরকার মত গড়িয়া লইবার জন্য পদে পদেই লোহার কুড়াল করাত র‍্যাদা বাটালি প্রভৃতি যন্ত্রের দরকার হয়।

পৃথিবীতে এমন দেশ নাই যেখানে লোহা পাওয়া যায় না। পথে ঘাটে, মাটিতে জলেতে, খুঁজিতে গেলে সর্বত্রই লোহা পাওয়া যায়। অথচ এক সময়ে লোকে লোহার ব্যবহার জানিত না, লোহা তৈয়ারি করিতে পারিত না। জল লাগিলে লোহায় মরিচা ধরিয়া যায়; লোহা ধাতু আর লোহার মরিচা, দুটা এক জিনিষ নয়। কিন্তু মরিচা বা “লৌহমল” নানা রকমে “শোধন” করিয়া তাহা হইতে আবার খাঁটি লোহা বাহির করা যায়। যে সমস্ত খনিজ জিনিষ হইতে লোহা তৈয়ারি করা হয়, সেগুলিও এই রকম মরিচা-জাতীয় জিনিষ, অনেক হাঙ্গামা করিয়া তাহাদের শোধন না করিলে তাহা হইতে লোহা বাহির হয় না। সোণা রূপা ও তামা অনেক সময়ে খাঁটি ধাতুর আকারেও পাওয়া যায়, এবং খনিজ অবস্থায় তাহাদের শোধনও লোহার চাইতে অনেক সহজ। সেই জন্য তামা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার শিখিবার পরেও মানুষে অনেক দিন পর্য্যন্ত লোহা বানাইবার কৌশল বাহির করিতে পারে নাই।

একবার যদি কোথাও কোন লোহা বানাইবার কারখানায় যাও, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে, লোহার মত সামান্য জিনিষের জন্তও মানুষকে কতখানি চিন্তা পরিশ্রম ও হাঙ্গামা করিতে হয়। আমাদের দেশে সাক্ষাতে টাটা কোম্পানির লোহার কারখানা আছে—সেখানে প্রতি বৎসর হাজার হাজার মণ লোহা আর ইস্পাত তৈয়ারী হয়। প্রকাণ্ড চিম্নির মত বড় বড় পাথরের চুল্লী—তাহার মধ্যে সারাদিন সারারাত আগুনের আর বিশ্রাম নাই। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, রাবণের চিতার মত, সে আগুন জ্বলিতেই থাকে। একবার আগুন নিভিয়া গেলেই হাজার হাজার টাকার চুল্লী ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইবে। তাই দিনরাত সেখানে কাজ চলিতেছে, চিম্নির মুখ দিয়া আগুনের লাল জিভ সারাক্ষণ আকাশকে রাঙাইয়া তুলিতেছে। মাঝে মাঝে চুল্লীর ঢাকনি খুলিয়া গাড়ী-বোঝাই কয়লা-মিশান লৌহ-খনিজের মশলা চুল্লীর মধ্যে ঢালিয়া দেয়—একেবারে বিশ ত্রিশ বা একশ' দুশ' মণ। চুল্লীর মধ্যে সেই সমস্ত মশলা গলিয়া পুড়িয়া তরল লোহা হইয়া জমিতে থাকে। মাঝেমাঝে চুল্লীর নর্দমা দিয়া লোহার ময়লা “গাদ” বাহির করিয়া দিতে হয়। দরকার মত শোধন হইলে পর পাশের একটা নল খুলিয়া, তরল লোহা ঢালিয়া ফেলিতে হয়।

পৃথিবীতে যত লোহার কারখানা আছে, তাহাতে প্রতি বৎসর তিনশ' কোটি মণ লোহা তৈয়ার হয়! এবং বছর বছর ইহার পরিমান বাড়িয়াই চলিয়াছে। লোহা নানা রকমের হয়। যে লোহা ঢালাই করিয়া সাধারণ কড়ি বরগা শিক প্রভৃতি তৈয়ারি হয়, আর যে ইস্পাত-লোহা দুর বা তলোয়ারের জন্ত ব্যবহার হয়, এ দুয়ের মধ্যে অনেকখানি তফাৎ। সাধারণ চুল্লীর মধ্যে যে লোহা তৈয়ারি হয়, তাহা একেবারে খাঁটি লোহা নয়; আমরা যত রকম লোহা সর্বদা ব্যবহার করি, তাহার কোনটাকেই ঠিক খাঁটি লোহা বলা যায় না। এই সব লোহার সঙ্গে অল্প বা বেশী পরিমাণে অঙ্গার বা কয়লা, গন্ধক, ফস্ফরাস প্রভৃতি নানা রকম জিনিষের মিশ্রণ থাকে—এবং সেই মিশ্রণের জন্ত লোহার রূপ গুণ নানা রকম হইয়া যায়। কোনটা নরম, কোনটা শক্ত, কোনটা সহজে ঢালাই হয়, কোনটা বেশ দলিয়া পিটিয়া নানা রকম করা যায়, কোনটা স্প্রিংয়ের মত বাঁকান যায়, কোনটা বাঁকাইতে গেলে ভাঙ্গিয়া যায়, কোনটাকে নানা রকমে তাতাইয়া এবং নানা কৌশলে ঠাণ্ডা করিয়া ইচ্ছামত মজবুত করা যায়, কোনটাকে চমৎকার শান দেওয়া বা পালিশ করা যায়।

এক এক রকম কাজের জন্য এক এক রকম লোহা। আজকাল ভাল ইস্পাত ও উচুদরের লোহা করিতে হইলে আগে খাঁটি কাঁচা লোহা তৈয়ারি করা হয়। তারপর তাহার সঙ্গে, ঠিক দরকার মত, অল্প কোন ধাতু বা কয়লা প্রভৃতি মিশাইয়া আবার সমস্তটা গলাইয়া এক সঙ্গে জ্বাল দিয়া লইতে হয়। প্রথম কাজটির জন্য বিশেষ রকম চুল্লীর দরকার হয়—তাহার গঠন এবং ভিতরকার বন্দোবস্ত সাধারণ চুল্লীর মত নয়।



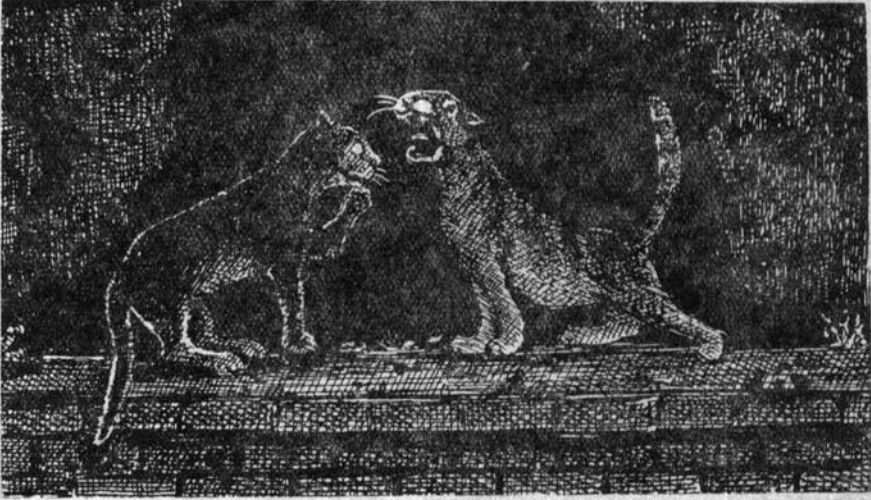
একটা প্রকাণ্ড পিপার মত জিনিষ—তাহার মধ্যে পাঁচশ' বা হাজার মণ মশলা ধরে; সেই পিপার তলার দিকে আগুন জ্বালাইয়া, তাহার ভিতর দিয়া ঝড়ের মত দমকা বাতাস চালাইয়া দেওয়া হয়। বাতাসের ঝাপটায় আগুনের শিখা প্রকাণ্ড জিভ মেলিয়া পিপার মুখ হইতে ছুটিয়া বাহির হয়। লোহার মশলা আগুনের তেজে গলিয়া পুড়িয়া যতই বিগুচ্ছ হইয়া আসিতে থাকে আগুনের রংও সেই সঙ্গে বদলাইয়া আসিতে থাকে। প্রথমে বেগুনী, তারপর ক্রমে

লাল হলুদে সাদা হইয়া, শেষে যখন ঘোর নীল রং দেখা দেয়, তখন আগুনের

তেজ নিভাইয়া, প্রকাণ্ড পিপাটিকে কলে ঘুতাইয়া কাং করিয়া, তাহার ভিতর হইতে তরল কাঁচা লোহা ঢালিয়া ফেলা হয়। তারপর ওজন-মত নানা জিনিষের মিশ্রাল দিয়া সেই লোহাকে নানা কাজের উপযুক্ত করিতে হয়।

এখানেও কি হাঙ্গামার শেষ আছে? সেই লোহাকে আরও কতবার অগ্নি-পরীক্ষায় ফেলিয়া, কত ছুঁমুখ-কলে সাংঘাতিক ভাবে দলিয়া পিষিয়া, কত রকমের উৎপাত সহাইয়া, তবে তাহাকে ভারি ভারি কঠিন কঠিন কাজে লাগান চলে।

হলোর গান



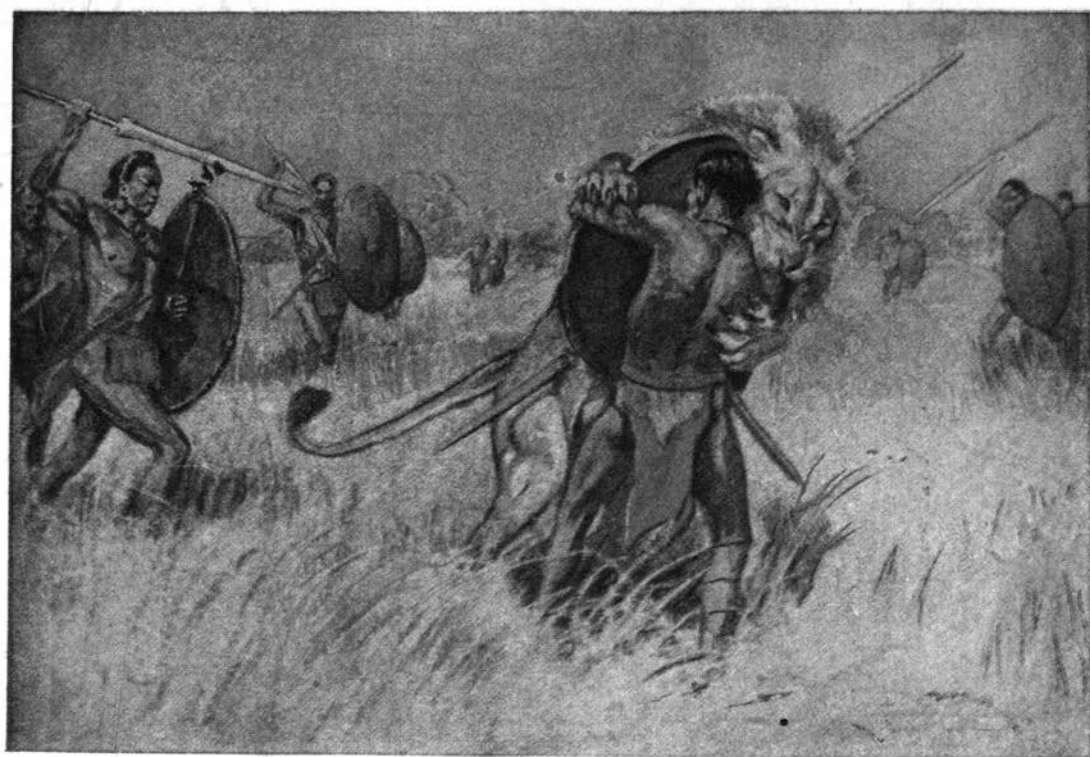
বিদ্যুটে রান্তিরে ঘুটঘুটে ফাঁকা
গাছপালা মিশ্‌কালো মখ্‌মলে ঢাকা।
জটবাঁধা বুল্‌ বোলে বট্‌গাছ তলে
ধক্‌ধক্‌ জোনাকির চক্‌মকি জ্বলে।
ঝাপ্‌সাটে ঘর বাড়ী আবছায়া মত
নিব্বুম নিভে গেছে পীদিম্‌ যত।

চুপ্‌চাপ্‌ চারদিকে ঝোপঝাড় গুলো
 আয় ভাই গান গাই আয় ভাই হলো ।
 গীত গাই কাণে কাণে চীৎকার ক'রে,
 কোন্‌ গানে মন ভেজে শোন বলি তোরে—
 পূর্বদিকে মাঝরাতে ছোপ্‌ দিয়ে রাঙা
 রাতকাণা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা ।
 চট্‌ ক'রে মনে পড়ে মট্‌কার কাছে
 মাল্‌পোয়া আধখানা কাল থেকে আছে ।
 ছড়্‌ছড়্‌ ছুটে যাই দূর থেকে দেখি
 তোফা ব'সে ঠোঁট চাটে ও পাড়ার নেকী ।
 ছল্‌ছল্‌ করে মোর জল্‌জল্‌ আঁখি
 মন বলে সংসারে সব জেনো ফাঁকি ।
 বিল্‌কুল্‌ পৃথিবীটা ভুল দিয়ে ঠাসা
 স্যাৎসেতে ছ্যাপ্‌ছেপে শ্যাঙলার বাসা ॥
 সব যেন বিচ্ছিন্ন সব যেন খালি
 গিন্নীর মুখ যেন চিম্নির কালি ।

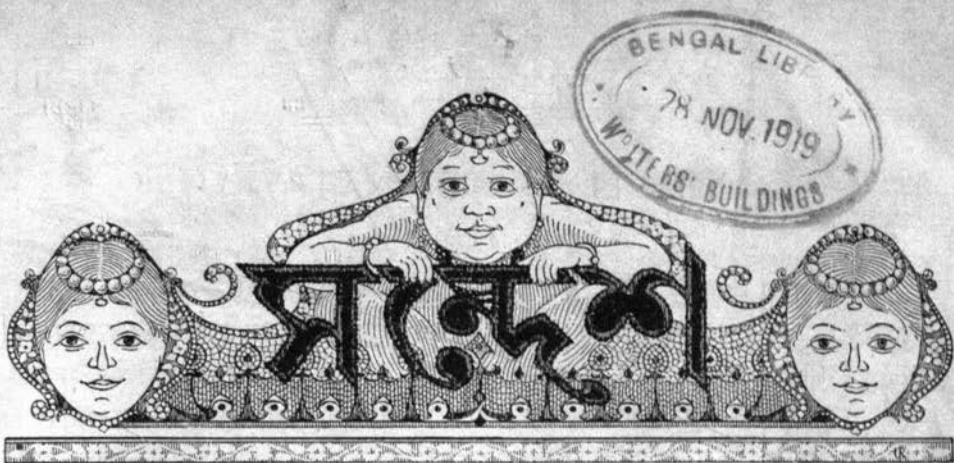
শুকদেব

মহাভারতের গল্পে আছে, ব্যাসদেবের পুত্র মহর্ষি শুকদেব মুক্তিলাভ করিয়া
 সশরীরে স্বর্গে গিয়াছিলেন । জলন্ত আলোক-শিখার মত যখন তিনি আকাশ ভেদ
 করিয়া স্বর্গে উঠিতে ছিলেন, তখন জল স্থল আকাশ স্তব্ধ হইয়া সে আশ্চর্য্য দৃশ্য
 দেখিতেছিল ।

১১৫ পৃষ্ঠায় শনিগ্রহের ছবির নীচে লেখা হইবে—“শনিগ্রহ—ঐ গোল
 বিন্দুটি পৃথিবী ।”



বল্লম দিয়া সিংহ শিকার



সপ্তম বর্ষ

ভাদ্র, ১৩২৬

৫ম সংখ্যা

নিঃস্বার্থ

গোপ্লাটা কি হিংস্রটে মা ! খাবার দিলেম ভাগ ক'রে,
কল্লৈ নাকো মুখেও কিছু, ফেল্লৈ ছুঁড়ে রাগ ক'রে ।
জ্যাঠাইমা যে মেঠাই দিলেন “তুই ভায়েতে খাও” ব'লে—
দশটি ছিল, একটি তাহার চাখ্তে নিলেম ফাও ব'লে ।
আর যে ন'টি, ভাগ করে তায়, তিনটে দিলেম গোপ্লাকে—
তবুও কেবল হ্যাংলা ছেলে আমার ভাগেই চোখ রাখে ।
বুঝিয়ে বলি, “কাঁদিস্ কেন ? তুই যে নেহাৎ কনিষ্ঠ—
বয়েস বুঝে সাম্লে খাবি—তা নৈলে হয় অনিষ্ট ।
তিনটি বছর তফাৎ মোদের, জ্যায়দা হিসাব গুণ্টি তাই,
মোদ্দা আমার ছয়খানি হয়, তিন বছরের তিনটি পাই ।”
তাও মানে না, কেবল কাঁদে—স্বার্থপরের সয়তানী—
শেষটা আমায় মেঠাইগুলো খেতেই হ'ল সবখানি ॥

সহজে কি বড় লোক হওয়া যায় ?

(৩ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত)

আমার জন্ম একটি ছোট ঘর নির্দিষ্ট করা হইল। আমি তাহাতে যাইয়া বসিলাম। তখন সকলের খাওয়া হইয়া গিয়াছে সুতরাং নূতন আহারের আয়োজন করা হইল। একজন আসিয়া আমাকে স্নান করিতে বলিল। আমি কাছের একটা পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম যে জলখাবারের জন্ম কতকগুলি ভিজান চা'ল আর কিছু সন্দেশ লইয়া বড় ছেলেটী আমার ঘরে বসিয়া আছে। চা'লগুলি ভিজিয়া ঠিক ভাতের মত হইয়াছে। *সেখানে খাবার সময় ঐরূপ চা'ল অনেককে খাইতে দেখিয়াছি। আমি খাইতে বসিলাম। ছেলেটী আমার কাছে বসিয়া রহিল। তাহার ভাব ভঙ্গীতে বোধ হইতে লাগিল যেন কিছু বলিতে আসিয়াছে। কিছুকাল পরেই সে আমার গায় মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। আমি কিছু চমৎকৃত হইয়া তাহার দিকে চাহিলাম। সে বলিল—“মা ব'লে দিয়েছেন আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি শাপ দিলে আমার অনিষ্ট হবে। আমি আপনাকে মন্দ কথা ব'লেছি।”

“তোমার উপর আমি রাগ করি নাই। তোমার কথায় আমার কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করব, যেন তিনি তোমার ভাল করেন।” তাহাকে বুঝান কিছু কষ্টকর বোধ হইল। কিন্তু শেষটা সে যেন সুখী হইল এবং বলিল, “তবে যাই, মা'র কাছে বলিগে।”

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিলে সেই ছেলে দুটির নিকট বিদায় লইয়া বাহির হইলাম। সেদিন রাত্রিতে এক বাজারে মুদীর দোকানে ছিলাম। তারপর দুই দিন ঐ ভাবে গেল। সারাদিন পথ চলিতাম; কেবল ছুবেলা খাবার জন্ম কোন মুদীর দোকানে উঠিতাম। রাত্রিতে কোন মুদীকে পয়সা দিয়া তাহার ঘরে থাকিবার জায়গা পাইতাম। তৃতীয় দিন রাত্রিতে থাকিবার জন্ম আর মুদীর ঘর পাইলাম না। কাজেই একজন গৃহস্থের বাড়ী যাইতে হইল। গৃহস্থ জায়গা দিতে কোন আপত্তি করিলেন না। কিন্তু খাওয়া শেষ হইলে “কড়া” “বগুণো” সব দেখাইয়া বলিলেন “কাল চলে যাবার আগে এই গুলো মেজে দিয়ে যেতে হবে। তুমি বাঙ্গালী, তোমার ঐটো কে নেবে?” আমি মহা বিপদে পড়িলাম। বলিলাম “ও

গুলো আমি ছুঁই নাই। তবে আমি যা যা ছুঁয়েছি সেগুলো দাও, এখনি মেজে দিচ্ছি।” সুতরাং একখানা থালা, আর একটা বগুনো (বগুনোতে ডাল ছিল) আমার ঘাড়ে চাপিল। বাড়ীর কাছে একটা পুকুর দেখাইয়া দিল, আমি তথায় যাইয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়া আনিলাম। প্রায় অর্ধ ঘণ্টা সময় লাগিল।

পরিশ্রমের পর সুনিদ্রা হইল। পরদিন গৃহস্থ ডাকিয়া ঘুম ভাঙাইলেন। উঠিয়া দেখি সূর্য উঠিয়াছে। তাড়াতাড়ি পুঁটলী হাতে করিয়া বাহির হইলাম। গৃহস্থের নিকট বিদায় লইবার সময় কা—যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন “একটা বড় মাঠ, তারপর একটা পাহাড়, তারপর কা—। একই পথ, ভুল হবার যো নীই।”

কিছুকাল হাঁটিয়াই মাঠে আসিলাম। সেখানে পথিকদিগের জন্ত একটা ঘর আছে। তথায় একজনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার সঙ্গে একটা ঘোড়া। সে আমাকে দেখিয়াই বলিল, “বেশ, চল। একজন সঙ্গীর জন্ত বসিয়াছিলাম।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “সঙ্গীর প্রয়োজন কি?” সে বলিল, “তুমি আর কখনো এখানে চল নাই? একা গেলে খেয়ে ফেলবে!” আমার ভয় হইল।

মাঠের এপাশ থেকে ওপাশ দেখা যায় না। অতি কম চওড়া পথ; দশ বার হাত অন্তর ছোট ছোট বড় বড় খসখসের ঝোপ। জীব জন্তুর মধ্যে এক জাতীয় পাখী। পক্ষীটা একটা চড়াই অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়, গায়ের রং সবুজ, ঠোট সুরু এবং লম্বা, স্বভাব অত্যন্ত চঞ্চল। ক্রমাগত একই রূপ শব্দ করিতেছে—“টিরিরিণ টিরিরিণ টিরিরিণ।” লেজে একটু নূতনত্ব আছে। লেজের মধ্যদেশ হইতে প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা একটা সুচীর মত বাহির হইয়াছে। আমার সঙ্গী বলিল, “শ্বশুর বাড়ী গিয়ে ছুঁচ চুরি করেছিলেন। তাতেই ঐ শাস্তি।” অতঃপর কিছু না থাকাতে ঐ পাখীকেই বার বার ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম।

বেলা আন্দাজ চারিটার সময় ছোট একটা ঘর দেখিতে পাইলাম। সঙ্গী বলিলেন “আজ এখানেই থাকিতে হইবে।” আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম “চারটের সময়ই বসে থাকতে হবে কেন?” সঙ্গী বলিলেন “মাঠে রাত হলে বাঘে খাবে।” বাঘে খায় এরূপ ইচ্ছা আমার ছিল না। সুতরাং সে “রাত্রি”র জন্ত ঐ ঘরেই থাকিলাম। রাত্রিতে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া অনেক প্রকার শব্দ শুনিতে পাইলাম। সে সব নাকি হাতীর শব্দ। সৌভাগ্যক্রমে হাতিগণ আমাদের কোন

খবর লইতে আসিলেন না। কিন্তু পরদিন উঠিয়া দেখি ঘোড়াটি নাই! ঘোড়ার স্বামী অনেক আক্ষেপ করিলেন।

মাঠ পার হইতে প্রায় বারটা বাজিল। মাঠ যে যায়গায় শেষ হইয়াছে, সেখানেও দেখিলাম একটা ছোট ঘর। সেখানে আসিলে সঙ্গী বিদায় লইয়া অগ্ন্য পথে গেলেন। আমি আমার নির্দিষ্ট পথে আস্তে আস্তে চলিলাম। কতদূর যাইয়া একটি মাছতকে পাইলাম,—সে হাতী লইয়া কা—চলিয়াছে। আমি চারি আনার পয়সা দিব বলাতে সে আমাকে তাহার হাতীর পিঠে একটুকু স্থান দিল। মহাসুখে কা—আসিলাম। কালিদাস বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহস পাইলাম না। রাত্রিতে একটি মুদীর দোকানে থাকিয়া পরদিন ভোরে রওয়ানা হইলাম।

পথে যে সকল ছোট খাট ঘটনা হইয়াছিল তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে এক দিনের কথা বলা আবশ্যক। দুই প্রহরের পর আর মানুষের সাড়া শব্দ পাইলাম না। বেলা যতই কমিয়া আসিতে লাগিল, ততই ক্রমাগত নির্জন স্থানে যাইয়া পড়িতে লাগিলাম, তারপর কেবল একটা মাঠ; দুধারে উলুবন এবং অগ্ন্য ছু একটি ছোট ছোট গাছ। এরূপ যায়গায় সন্ধ্যা হইল। কি করি, কোথায় যাই! প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিলাম। পথ এত সংকীর্ণ যে দুপাশের গাছে গা লাগে। থাকিয়া থাকিয়া আমার বুক গুড় গুড় করিয়া উঠিতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ যেন পিঠে একটা কি লাগিল। চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম একজন পাহাড়ে লোক। সে আমাকে কি এক রকম ভাষায় বলিল “তুই কোথায় যাস? তোর প্রাণের ভয় নাই?” এই বলিয়া সে আমাকে তাহার পিছু পিছু যাইতে সঙ্কেত করিল। আমি সহজেই তাহার আঙা পালন করিতে লাগিলাম। সে দু হাতে উলুবন সরাইয়া শূরুর মত দৌড়িতে লাগিল; আর মাঝে মাঝে আমাকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল “আরে আয়, মরে যাবি।” আমি হতবুদ্ধি হইয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম।

কতক্ষণ এইরূপে চলিলাম বলিতে পারি না। অবশেষে একটা বড় নদীর ধারে আসিলাম। সেখানে দেখিলাম আরো কয়েকজন লোক বসিয়া আছে। পাহাড়ী বলিল যতক্ষণ নৌকা আসিয়া ওপারে না যায়, ততক্ষণ এখানে বসিয়া থাকিতে হইবে। আমি তাহাদের সঙ্গে মাটিতে বসিলাম। অগ্ন্য সকলে পুটলী হইতে খাবার খুলিয়া খাইতে লাগিল। পাহাড়ীর সঙ্গে কতকগুলি কমলালেবু ছিল; সে আমাকে তাহার খাবারটা খাইতে দিল। আমি তাহাই খাইয়া, নাক মুখ কাপড়ে ঢাকিয়া, সেইখানেই

শুইয়া পড়িলাম। অন্যান্য লোকেরা আমাকে বলিতে লাগিল “ঘুমিও না, খেয়ে



ফেল্বে।” তেমন অবস্থায় ঐকুপউপদেশ বাক্যের অত্যন্ত আবশ্যক ছিল, কারণ সমস্ত দিনের পরিশ্রমে আমার গা অবশ হইয়া আসিতেছিল। এবং একটুকু পরেই অতি নিকটে “ঘ্যাওর্” “ঘ্যাওর্” করিয়া বাঘ ডাকিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি চারিপাশে দূরে নিকটে হিংস্র জন্তুর শব্দ হইতে লাগিল। সে রাত্রির কথা আমার জীবনে আর কখনও ভুলি নাই। নৌকাওয়ালা পারে বসিয়া সুখ ভোগ করিতেছে; সেখানে নৌকা

বোঝাই না হইলে ফিরিয়া আসিবে না। সমস্ত রাত্রি আমাদের প্রাণ হাতে করিয়া সেই ভয়ানক স্থানে বসিয়া থাকিতে হইল। পরদিন নৌকা আসিলে আমরা ওপারে গেলাম।

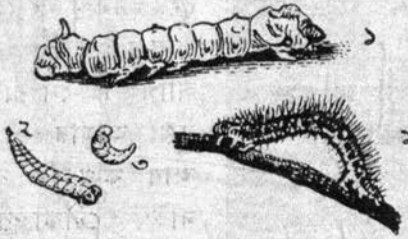
ইহার তিন দিন পরে বাড়ীর কাছের বাজারে আসিলাম। সেখানে দৈ চিড়ে সন্দেশ ইত্যাদি যাহা কিছু মনে হইল উদরস্থ করিয়া পথকষ্টের প্রতিহিংসা বিধান করিলাম। ছুটোর সময় বাড়ী আসিলাম। তখন বাহির বাটীতে কেহ ছিল না।

গা ভয়ানক কাঁপিতে লাগিল ; শীতে অস্থির হইয়া গেলাম । আশেপাশে যে কয়খানা লেপ কাঁথা ছিল, উপর্যুপরি গায় দিয়া বিছানায় পড়িলাম । শক্ত জ্বর হইল । কাঁকি দিয়া বড় লোক হওয়ার স্বপ্নটা ভাল রকমেই ভাঙ্গিয়া গেল । * [সখা-১৮৮৪]

পোকার কথা

২

পতঙ্গদের প্রথমে ডিম হয় । সব পতঙ্গের ডিম একরকম নয়, ভিন্ন ভিন্ন পতঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন রকমের ডিম হয় । তারপর ডিম ফুটে যা বেরোয় সেটা অধিকাংশেরই পতঙ্গের মত হয় না, হয় একটা কুমির মত । এক এক রকম পতঙ্গের এক এক রকম কুমি হয় । এই অবস্থাকে আমরা পতঙ্গের কুমি অবস্থা বা কীটাবস্থা বলি । ইংরাজিতে বলে caterpillar, grub, maggot. ক্যাটারপিলার, যাদের পা থাকে, হেঁটে বেড়ায় ; গ্রুব আর ম্যাগট যাদের পা থাকে না । প্রজাপতিদের কুমির বা কীটের পা থাকে, হেঁটে বেড়ায় । এদের কোন কোন জাতের কুমির গায়ে রোম থাকে, কোন



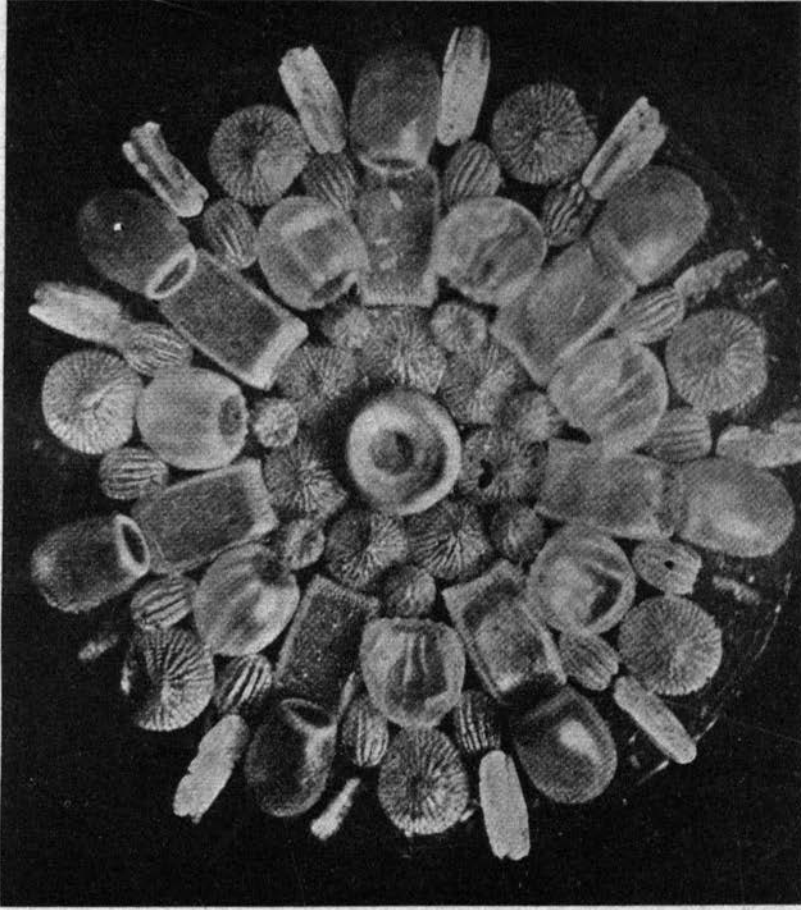
১, ১. 'ক্যাটারপিলার', ২, গ্রুব, ৩, ম্যাগট

কোন জাতের রোম থাকেওনা ; কিন্তু এদের সকলকেই ইংরাজিতে 'ক্যাটার পিলার' বলে, আমরা বলি শূঁয়ো পোকা । মাছদের কুমির রোমও থাকে না, পাও থাকে না, চলে বেড়াতে পারে না, গা ও মাথার তফাৎ বোঝা যায় না ; এদের ইংরাজিতে বলে 'ম্যাগট', আমরা

বলি, পোক, পুকি । গুবরে পোকাদের কুমির মাথা স্পষ্ট থাকে, কারু কারু পা থাকে কারু কারু থাকে না, কিন্তু সকলেই এক জায়গায় অল্প স্থানে নড়া চড়া করে । বাইরে বাতাসে হেঁটে চলে বেড়ায় না, এদের ইংরাজিতে বলে 'গ্রুব' । এদেরও বলে পোক বা পুকি ।

* এটি একটি সত্য গল্প । যে বাঙ্গালী বালকের কথা লেখা হইয়াছে, সে বেচারি অনেক দুঃখ ভোগ করিয়া শেষে বহু কষ্টে মারা যায় । জীবনে আর বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই, কেবল এইটুকু সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছে যে, কোন বিষয়ে মন স্থির না করিয়া কেবল এলোমেলো ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইলে বড় লোক হওয়া যায় না ।

সব পতঙ্গের কুমি বা কীট অবস্থার সাধারণ নাম ইংরাজিতে larva লার্ভা।
আমরা বলিব কুমি অবস্থা বা কীট অবস্থা, অথবা সংক্ষেপে কুমি বা কীট।



নানাজাতীয় পতঙ্গের ডিম।

এই কুমি বা কীট যখন ডিম থেকে ফুটে বেরোয় তখন খুব ছোট থাকে, তারপর
ক্রমাগত খেয়ে খেয়ে আর গায়ের খোলস বদলে বদলে বড় হয়। তারপর, তার এই

অবস্থার বা কুমিজীবনের শেষ হয়। তখন সে আর খায় না। তখন নিজের গা থেকে সূতো বের করে তাই দিয়ে, অথবা লাল বা থুতু আর খড় কুটা মাটি দিয়ে, বা পাতলা চামড়ার মত জিনিষ বের ক'রে তাই দিয়ে, একটা গুটি, কোষ বা কোয়া তৈয়ার ক'রে তার মধ্যে নিজেকে একেবারে বদ্ধ করে ফেলে। তার ভিতরে তখন তার শরীরটা ছোট হয়ে যায়। তার রূপ আর আগের কুমির মত থাকে না, একটা



১, রেশম কীটের গুটি, ২, মোমাছির গুটি, ৩, নানাজাতীয় প্রজাপতির গুটি

টিবলি বা পিণ্ডের মত হয়ে যায়। তখন সে আর নড়ে চড়ে না, খায় দায় না, জড় পিণ্ডের মত পড়ে থাকে। এ অবস্থায় তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গজায় নাই, —বিগত অঙ্গ,—সেই জন্ত ইহাকে ‘ব্যঙ্গাবস্থা’ বলা যায়। এই অবস্থাকে ইংরাজিতে বলে chrysalis, pupa।

আমরা বলি কোষ, কোয়া, গুটি, কোষাবস্থা, মূকাবস্থা, ব্যঙ্গাবস্থা। ইংরাজি সাধারণ নাম pupa, আমরা বলব ‘গুটি’।

কিছু দিন এই অবস্থায় থাকলে তার দেহের ঘোর পরিবর্তন হতে থাকে। কোষের ভিতরে গুটির শেষ যে রূপ হবে, তার মত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অল্পে অল্পে গজাতে থাকে। সে রূপ পূর্ণ হলে পর কোষটা ফেটে যায়, আর তা থেকে পূর্ণ অবয়বযুক্ত পতঙ্গ বা ষটপদী পোকা বাহির হয়। এই তার শেষ অবস্থা বা পূর্ণাবস্থা। অঙ্গযুক্ত, তাই “সাদ্গ” অবস্থাও বলা যেতে পারে। ইংরাজিতে বলে imago—আমরা বলব ‘পূর্ণ পোকা’ বা ‘সাদ্গ পোকা’।

যে সব পতঙ্গের ডিম্ব ছাড়া আর তিনটা অবস্থাতেই, কুমি গুটি আর সাদ্গ, এই তিন ভিন্ন রকমের রূপ হয়, তাদের পূর্ণ রূপান্তর হয় বলি। প্রজাপতি, গুবরে পোকা, মাছি, মশা, পিঁপড়ে, বোলতা প্রভৃতির পূর্ণ রূপান্তর হয়। আবার কোন কোন পতঙ্গের, যেমন ফড়িংএর, এই তিনটা অবস্থায় তিনটা রূপ হলেও সে সব রূপের বড় একটা প্রভেদ থাকে না। ডিম ফুটে প্রথম যে পোকা বেরোয় সে প্রায় তার শেষ পতঙ্গ অবস্থার রূপ নিয়েই বেরোয়। তখন কেবল তার পাখা থাকে না, উড়তে পারে না, লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়। তারপর খোলস বদলে যে রূপ ধরে সেটা আগেরই রূপ, কেবল তাতে ক্ষুদ্র রকমের অকর্ষণ্য পাখা গজায়। তারপর আবার

খোলস বদলে পূর্ণ পাখায়ুক্ত শেষ রূপ পায়। সুতরাং ফড়িংদের আংশিক রূপান্তর হয়।

পতঙ্গদের এই রূপান্তর অতি আশ্চর্য ব্যাপার। পতঙ্গদের এই চারিটা অবস্থা বা জন্ম, তাই পতঙ্গ “চতুর্জ” বা চারি-জন্মা।

নর্দমায় বা বিষ্ঠায় যে ছোট ছোট কুমির মত পোকা কিল্‌বিল্‌ কচ্ছে, সে যে মাছি হয়ে উড়বে, অথবা তোমার কুমড়ো গাছে যে শুঁয়ো পোকাটা পাতা খেয়ে বেড়াচ্ছে, সে যে একটা সুন্দর প্রজাপতি হবে, তা কি তার চেহারা দেখে বুঝতে পার ? যত রকমের শুঁয়ো পোকা দেখতে পাও, সকলেই প্রজাপতি হবে।

তোমরা অনেক সময়ে দেখেছ যে, যেখানে আম খেয়ে ফেলেছ সেখানে অনেক মাছি বসেছে ; তার মধ্যে কোন কোন মাছি খুব ছোট, আর তারই কাছে ঠিক সেই রকমেরই কতকগুলো মাছি, তাদের চেয়ে একটু বড়, বসে আছে। তোমরা মনে করতে পার যে, ঐ ছোট মাছিগুলি বাচ্চা মাছি, বয়স অল্প তাই ছোট। আর একটু বয়স হলে, আর খেয়ে ডাগর ডোগর হলে, বড় মাছিদের মত বড় হয়ে যাবে। তা হবে না। সব পতঙ্গেরই, একবার যার পাখা গজিয়েছে, তার বাড়ের শেষ হয়েছে। সে আর বাড়বে না। ছোট প্রজাপতি আর বড় হয় না, ছোট মাছিটেও আর বড় হয় না। হয় সেটা ভিন্ন জাতের মাছি, না হয় বড়টারই জাতের, কিন্তু বেঁটে। আমাদের মধ্যে যেমন লম্বা মানুষ আর বেঁটে মানুষ দেখতে পাওয়া যায়—এমন কি একই মা বাপের দুই ছেলে, দুই ভাই, একজন লম্বা একজন বেঁটে হয়, জীব জন্তু পোকা মাকড়দেরও সেই রকম হয়।

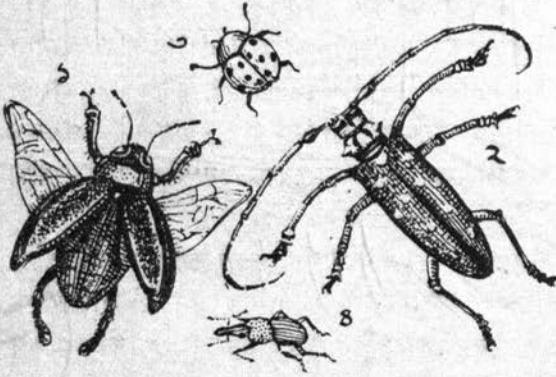
ষট্‌পদী বা পতঙ্গ ত পৃথিবীতে অসংখ্য রকমের আছে। জলে স্থলে, ঘরে বাইরে, মাঠে ঘাটে, বনে জঙ্গলে, গাছের ফলে ফুলে, পাতায় দাঁটায় কাঠে, আস্তাকুঁড়ে আবর্জ্ঞনায়, মাটির তলায়—এমন কি আমাদের গায়ে—সর্বত্রই ষট্‌পদী পোকা আছে। চোখে দেখা যায় না এমন ছোট, আর আমের মত বড়—এরূপ নানা আকারের, নানা ছাঁদের, নানা রঙ্গের ষট্‌পদী আছে।

চিন্তার ও বুঝবার সুবিধার জন্তু এক এক রকমের জিনিষকে এক এক দলে ভাগ করে নিলে কাজটা খুব সহজ হয়। এলোমেলো জিনিষের খোঁজ রাখা বড় কঠিন কাজ। যে কোন বিষয়ই হউক, একটা শৃঙ্খলা থাকলে তার খবর রাখা সহজ হয়। আলোচনার সুবিধার জন্তুই জীবদিগকে তাদের রূপগুণ ধরণধারণ বিচার করে

ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ করা হয়। একে বলে শ্রেণী বিভাগ। খুব বড় দলের নাম “শ্রেণী”। শ্রেণীকে আরও রকম রকম দলে ভাগ কল্পে হয় “বর্গ”। বর্গকে আবার ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ কল্পে সে ভাগকে বলে “বংশ”। বংশকে আরও ছোট দলে ভাগ কল্পে সে ভাগকে বলে “গণ”। গণকে আবার ভাগ করা হয় “জাতি”তে। জাতিই হচ্ছে শেষ ভাগ। জাতি (species), গণ (genus), বংশ (family), বর্গ (order), শ্রেণী (class) এই রকমে শ্রেণীদের শ্রেণী বিভাগ করা হয়।

ষট্‌পদী শ্রেণীর যত রকমের পোকা পণ্ডিতদের নজরে পড়েছে তাদের প্রত্যেকের রূপের বর্ণনা, তাদের শ্রেণী, বর্গ, বংশ, গণ, জাতির নাম ঠিক করা হয়েছে। পণ্ডিতেরা এক ভারতবর্ষ হতেই ত্রিশ হাজার জাতির ষট্‌পদীর খবর নিয়েছেন। আরও কত অজানা আছে। পতঙ্গদের বর্গ বিভাগটা মোটা মুটি এইরূপে করা হয়—

১। যে সব ষট্‌পদীর প্রথম বা উপরের পাখা-ঘোড়া কাঠের মত খুব দৃঢ় বা শক্ত, আর নীচের পাখা ঘোড়া খুব পাংলা, আর পোকা যখন বসে থাকে তখন



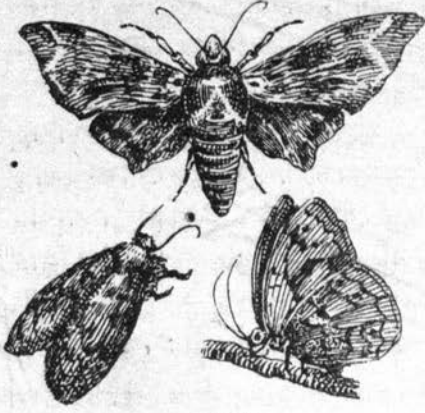
দৃঢ়পত্রী। ১, জলচর কেঠো-পোকা। ২, মালপোকা। ৩, পদ্মিনী বা পদী পোকা (×২)। ৪, কেরী পোকা

উপরের শক্ত পাখা ছুটো নীচের সূক্ষ্ম পাখা ও কোমল দেহকে ঢেকে রাখে, তাদের বলে “দৃঢ়পত্রী”। উপরের শক্ত পাখা দিয়া উড়তে পারে না, নীচের পাংলা পাখা দিয়ে ওড়ে। এদের মুখের গড়ন কামড়িয়ে খাবার উপযোগী। এদের পূর্ণ রূপান্তর হয়— যেমন গোবরিয়া পোকা, বিষ্ঠা পোকা, পচা পোকা, গুজরি

পোকা, খড়া পোকা, কোড়া পোকা, ঘোড়া পোকা, কেরী পোকা, চলে পোকা, প্রভৃতি। ইংরাজিতে চলিত কথায় এদের বলে Beetles. আমাদের অনেকে বলেন গুবরে পোকা। কিন্তু বাস্তবিক গুবরে বলতে সেই বিশেষ বংশের পোকাকেই বোঝায়, যারা গোবরে থাকে, গোবর খায়। এদের পাখা

শক্ত কাঠের খোলের মত ব'লে, আমরা চলিত কথায় বলতে পারি, কাঠুয়া বা কেঠো পোকা—শুদ্ধ ভাষায় “দৃঢ়পত্রী” বা দৃঢ়পত্রী বর্গের পোকা।

২। যে সব ষট্পদীর ছুঁ যোড়া বা চারখানা পাখা, পাখায় হাত দিলে হাতে ধূলা বা রেণুর মত আঁইশ লেগে যায়, তাদের দলের বা বর্গের নাম “রেণুপত্রী”। এদের মুখের গড়ন রস চুষে বা শুষে খাবার উপযোগী। এদেরও পূর্ণ রূপান্তর হয়, যেমন প্রজাপতি।



রেণুপত্রী

৩। যে সব পতঙ্গের খুব পাংলা বা ঝিল্লিবৎ স্বচ্ছ পাখা থাকে, আর নীচের যোড়া প্রায়ই ছোট হয়, পাখায় শির বা শিরা থাকে কিন্তু অল্প, তাদের বলে “ঝিল্লিপত্রী” বা “সূক্ষ্মপত্রী”। কিন্তু এ নাম সঙ্গত নয়, কারণ সব জাতির পতঙ্গেরই উড়বার পাখা পাংলা বা ঝিল্লির মতই হয়।

এই বর্গের পোকা উড়বার সময়ে প্রতি পাশের উপরের আর নীচের পাখা, সন্ধি বা কজায় আটকে এক হয়ে যায়। এই জন্য এই বর্গের পতঙ্গকে “সন্ধিপত্রী” বলাই সঙ্গত। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় “ঝিল্লিপত্রী”ই চলিত হয়ে গিয়েছে। যেমন, ভ্রমর, বোলতা, ভীমরুল, কুমুরে পোকা, কাচ পোকা, মোমাছি, পিঁপড়ে। এদের মুখের গড়ন কেটে খাবার আর চুষে খাবার উপযোগী। এদেরও পূর্ণ রূপান্তর হয়।



৪। যে সব পতঙ্গের মোটে দু'খানা অর্থাৎ শুধু

উপরের পাখা যোড়াই থাকে আর নীচের পাখা

সন্ধিপত্রী। বোলতা, মোমাছি (x২) ও পিঁপড়ে (x২)

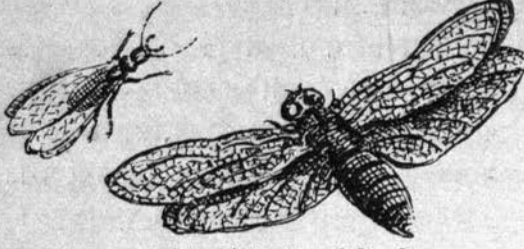
দুটো লুপ্ত হয়ে গিয়ে ছোট ছোট সন্ধি দাঁড়ের মত হ'য়ে থাকে, তাদের বলে “দ্বিপত্রী”—যেমন



দ্বিপত্রী। মাছি (x৩) ও মশা (x৫)

মশা, মাছি। এদের মুখের গড়ন শুষে খাবার উপযোগী। এদেরও পূর্ণ রূপান্তর হয়।

৫। যে সব পতঙ্গের ছই যোড়া পাখাই সমান বড় আর খুব পাংলা ও স্বচ্ছ হয়,

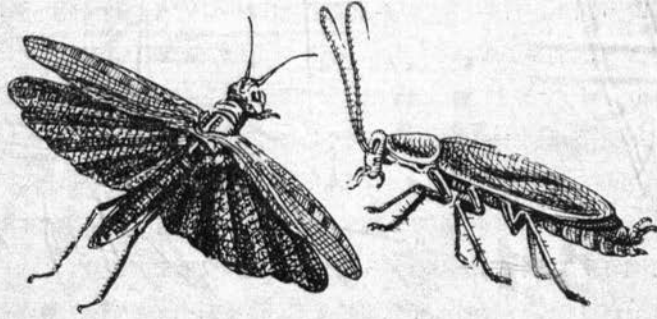


জালপত্নী। উই (x৩) ও ঝিল্লি ফড়িং

আর তাতে অনেক শিরা, সব এমন ভাবে পরস্পরের সঙ্গে মেশান যে দেখতে সূতোর বোনা জালের মত দেখায়, তাদের বলে “জালপত্নী।” এদের কতকগুলির মুখের গড়ন শুধু কেটে খাবার উপযোগী, তারা পোকা ধরে

খায়, আর তাদের আংশিক রূপান্তর হয়, যেমন ঝিল্লি ফড়িং। আবার কতকগুলি আছে, তাদের মুখের গড়ন চুষে বা কেটে খাবার উপযোগী, আর তাদের পূর্ণ রূপান্তর হয়, যেমন উই, আর লেজা ফড়িং। কিন্তু সকলেরই পাখা সূক্ষ্ম জালের মত। ঝিল্লি ফড়িংএর পূর্ণ রূপান্তর হয় না বলে কোন কোন পণ্ডিত তাদের পরের বর্গে ফেলেন।

৬। যে সব পতঙ্গের উপরের পাখা যোড়া পাংলা চামড়ার মত চিম্চে হয় আর নীচের পাখা যোড়া খুব পাংলা ব, সূক্ষ্ম হয়, পোকাটা বসলে নীচের পাখা-যোড়া তালপাতার ভাঁজের মত, সোজা লম্বালম্বি পিঠের উপর ভাঁজ হয়ে উপরের পাখায় ঢাকা পড়ে,



পদ্মপত্নী। পদ্মপাল ও আরহালা।

তাদের বলে “সরলপত্নী” বা “ঋজুপত্নী।” যেমন পদ্ম (পাল), গাং ফড়িং, ঘেসো ফড়িং, পাতা ফড়িং, উচ্চিংড়ে, আরহালা। এদের মুখ কেটে খাবার মত করে গড়া। এদের আংশিক রূপান্তর হয়।

৭। যে সব ষটপদীর ছইযোড়া পাখা থাকে, আর পাখা এমন ভাবে গড়া যে দেখতে আধখানা পাখার মত দেখায় তাদের বলে “অর্ধপত্নী।” এদের কারু কারু

পাখা থাকেও না।



কিন্তু সকলেরই মুখে সরু লম্বা শক্ত চঞ্চু থাকে, খাবার সময়ে খাওয়া সামগ্রীতে সেটা ফুটিয়ে দিয়ে রস চুষে খায়, অন্য সময়ে সেই চঞ্চু বকের উপর ভাঁজ করে রাখে। এই রকম চঞ্চু থাকাতে, এদের “চঞ্চুমুখী” বলা যায়। যেমন উকুন, ঝিঁঝিঁ পোকা, যাব পোকা, ছার পোকা, (বিছানার ছার পোকা বা ওড়সু, আর গাছের ছার পোকা), ইত্যাদি। এদের আংশিক

চঞ্চুমুখী। ঝিঁঝিপোকা রূপান্তর হয়।

(চিংভাবে) ও ছারপোকা (x৪)

এই হল পতঙ্গদের বর্গ বিভাগ। এই কটা কথা যদি বেশ করে মনে রাখতে পার, তবে অনেক ঘটপদী বা পতঙ্গ চিনতে পারবে, কোন্টা কোন্ বর্গের বুঝতে পারবে। সব পোকাই যে সব সময়ে সহজে চট করে চিনে ফেলতে পারবে তা নয়, তবে অনেকগুলো চিনতে পারবে। অন্ততঃ কেঠো পোকা বা beetle চিনতে দেরি হবে না, আর মাছিকে মোমাছির দলে ফেলবে না, প্রজাপতিকে ফড়িং বলবে না। আর এঁটুলি পোকাকে ছারপোকার সামিল করবে না। এই সব কথা বেশ মনে রাখ, তারপর আসছে বারে তোমার সেই যে ভারতোলা পালোয়ান পোকাটা পাঠিয়েছ (আঘাটের “সন্দেশ”) তার কুলের খবর তোমায় বলব।*

ত্রিবিজ্ঞেননাথ বসু।

পঞ্চুলাল

সমুদ্রের ধারে এসে পঞ্চুর দল দেখলে মাছও নেই কিছুই নেই—সমুদ্রের জল আয়নার মত স্থির শান্ত। দেখে পঞ্চুর মেজাজ বিগড়ে গেল। সে রুখে বসে, “এ কি তামাসা পেয়েছ? স্কুল কামাই করিয়ে এনে এখানে এসে বাঁদরামি হচ্ছে”। অন্তরে বলে, “আনব না? রাতদিন পুঁথি পড়ে পড়ে তুই একেবারে বয়ে যাচ্ছিলি, তোকে উদ্ধার করে এনেছি!” “তোদের তাতে কি? আমি যদি শুধু পড়াশুনাই করি—তবে?” “দেখো বেশী জারিজুরি করো না। তুমি একা আমরা সাত জন!” “ওঃ একেবারে সপ্তরথী—কর্ণ, শকুনি, জয়দ্রথ, দুৰ্য্যোধন, দুঃশাসন আর কি!” বলে

* ছবির নীচে (x২), (+৩), ইত্যাদি অঙ্কগুলির অর্থ, পতঙ্গটাকে লম্বায় চওড়ায় দ্বিগুণ বা তিনগুণ বড় করিয়া দেখান হইতেছে।

পঞ্চ ভেংচি কেটে জিভ বার করে নাচতে লাগল। সপ্তরথী আবার চেষ্টা করে বসে, “ভাল চাও তো মাপ চাও—নয়ত গাধা পিটুনি দেব, তুলোধোনা করে ফেলব।”

তারপর দেখতে দেখতে লড়াই বেধে গেল। পঞ্চ যদিও একা, তবু তার কাঠের শরীর—চড় চাপড়ে বড় একটা কিছু হয় না। কিন্তু সে যখন তার কাঠের হাত পা কাজে লাগালে তখন তার শত্রুরা ক্রমে কাবু হয়ে পড়ল। হাতাহাতিতে না পেরে তারা পঞ্চকে বই ছুঁড়ে মারতে লাগল। চালাক পঞ্চও লাফিয়ে বাঁপিয়ে মাথা নুইয়ে আপনাকে বাঁচাতে লাগল। একথানা বইও তার গায়ের কোনখানে লাগল না, সব গিয়ে রূপ রূপ করে সমুদ্রে পড়তে লাগল। সমুদ্রের মাছগুলো হঠাৎ এই জ্ঞানের বৃষ্টিতে একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাবার মত হয়েছিল। ছেলেদের আপন বইগুলি যখন নিঃশেষ হয়ে গেল, তখন তারা পঞ্চর বইগুলি তাকেই ছুঁড়ে মারতে লাগল—সেই যে কথায় বলে “যার শিল যার নোড়া, তারি ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া”। কিন্তু বইগুলি পঞ্চর গায়ে না লেগে তাদের দলের একটি ছেলের কপালে গিয়ে এমনি লাগল যে, কপাল ফেটে ফিন্কে দিয়ে রক্ত ছুটল, সে অজ্ঞান হয়ে ঘুরে পড়ল। তাদের দলের ছেলেরা তখন একেবারে চোঁচা দৌড় দিয়ে কোথায় যে কে চম্পট দিলে, মনে হ’ল যেন হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে গেছে। সবাই গেল, শুধু পঞ্চ গেল না। ছেলেটির নাম অর্জুন, পঞ্চ তার মুখের উপর পড়ে বারবার ডাকতে লাগল—“ও ভাই অর্জুন, চোখ খুলে একবারটি দেখ ভাই, আমি তোকে মারিনি। যারা মেরেছিল, তারা সব পালিয়ে গিয়েছে।” কিন্তু অর্জুনের জ্ঞান হবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। পঞ্চ তাই দেখে ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে মাটির উপর শুয়ে পড়ল। কেন যে ছুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে গিয়েছিল, তাই ভেবে সে মনের দ্বংখে কেঁদে মাটি ভেজাতে লাগল। এমন সময় স্তন্যপেলে সেপাইরা কাওয়াজ করে এলে যেমন শব্দ শোনা যায়, তেমনি শব্দ শোনা যাচ্ছে। পুলিশ আসছে বুঝে পঞ্চর আত্মপুরুষ কাঠ হয়ে গেল।

পুলিসেরা এসে পঞ্চকে মাটিতে পড়ে আছে দেখে পা দিয়ে ঠেলা মেরে জিজ্ঞাসা করলে, “করে তুই? এখানে পড়ে কি করছিস?” পঞ্চ বলে, “আমার এক বন্ধুর বড় আঘাত লেগেছে আমি তাকে সাহায্য করছি।” “আঘাত করলে কে?” “আমি কিন্তু আঘাত করিনি।” “কি দিয়ে আঘাত পেল?” “এই বইখান তার কপালে



লেগেছিল।” “বইখানি কার?” “আমার।” “বাস্ আর প্রমাণ দরকার নেই—
চল এখন হাজতে।” পঞ্চ হাত জোড় করে বলে, “জুর আমার কোন কসুর নেই”—
কিন্তু সে কথা কে কাণে তোলে?

পুলিসের জিম্মায় পঞ্চ চলেছে, এ দেখলে পরি দিদির কত যে কষ্ট হবে, তা
পঞ্চর বুঝতে বাকী ছিল না। সে মনে মনে ঠিক করলে, এদের নজর এড়িয়ে
পালাবেই পালাবে। গাঁয়ের কাছাকাছি গিয়েছে এমন সময় একটা দমকা
বাতাস এসে তার টুপি উড়িয়ে নিয়ে গেল। পঞ্চ দেখল বেশ ছুতো হয়েছে। টুপিটে
‘নিয়ে আসি’ বলে সে দৌড়ে গিয়ে টুপিটা নিয়েই এক ছুটে সমুদ্রের দিকে
পালাতে লাগল। পুলিশ কজন দেখলে পঞ্চ বাতাসের মত ছুটে চলেছে, তাকে
ধরা কারো সাধ্য নয়, তাই তাদের পাহার দেবার ডালকুন্ডাটা তার দিকে লেলিয়ে
দিলে। কুকুরে আর কাঠের পুতুলে পালা দিয়ে দৌড় আরম্ভ হল, আর একটু হলে
পঞ্চ ধরা পড়ে আর কি, এমন সময় সে বাঁপ দিয়ে সমুদ্রের মধ্যে পড়ল। কুকুরটাও
সঙ্গে সঙ্গে জলে পড়ে একেবারে হাবু ডুবু খেতে লাগল। তাই দেখে পঞ্চ বলে,
“বেশ হয়েছে, মর ডুবে মর।” কিন্তু কুকুরটা যখন “মলাম গো, বাঁচাও গো”
বলে ঘেউ ঘেউ করে কেঁদে উঠল, তখন পঞ্চ বলে, “আচ্ছা তুমি আর আমায় তাড়া
করে আসবে না কথা দাও, তবেই তোমায় বাঁচাব।” “দোহাই তোমার, আমি
দিব্যা করছি, তোমায় আর তাড়া করে যাব না।” পঞ্চ তখন সাঁতারে গিয়ে
কুকুরটাকে টেনে তীরে তুলে দিলে। কুকুরটা হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, “ভগবান যদি
কখনো দিন দেন, তাহলে এ ঋণ শোধ করব।”

পঞ্চ আবার সাঁতার দিয়ে যেতে যেতে সমুদ্রের ধারে একটা গহ্বরের কাছে
এসে পৌঁছল। সেখানে রান্নার ধোঁয়া উঠছে, আর ভাজা মাছের গন্ধ আসছে।
পঞ্চ মনে মনে বলে, ভালই হল, এইখানে গিয়ে আগুন পুইয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে নি।
যেন্নি সেদিকে গেছে, অগ্নি জেলের জালে পড়ে গেল, আর যাবে কোথা! জেলেও
ঠিক সেই সময় বাইরে এসে জাল টেনে তুললে। জেলেটার মূর্ত্তি দেখেই পঞ্চর
পিলে চমকে গেল। সেই জেলে জালটা ভিতরে নিয়ে গিয়ে ঝাড়া দিয়ে সব মাছ
বার করে নিল। মোরলা, বাটা, পারসে, ছাদস, পাবদা, বাচা, খলসে, পুঁটি, চিংড়ি,
কাঁকড়া—কত রকমের মাছই খলবল করে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চও খটাস করে
পড়ল। সবই জেলের চেনা মাছ, কেবল পঞ্চকে দেখে সে অবাক হয়ে বলে, “এ

আবার কোন্ দেশী মাছ ?” পঞ্চু বলে, “মাছ হবো কেন ? আমি যে কাঠের পুতুল !” জেলে কাণে খাট ছিল, সে ‘কাঠের পুতুল’ শুনতে, ‘কাঁকড়া’ শুনে ভারী খুসী হয়ে বলে, “ভালই হ’ল। অনেকদিন কাঁকড়া চচ্চড়ি খাওয়া হয়নি।” এই না বলে পঞ্চুকে দিব্যি করে উপেটপাণ্টে ময়দা মাখাতে লাগল। এদিকে সেই কুকুরটাও ভাজা মাছের গন্ধ পেয়ে আস্তে আস্তে সেই গুহায় এসে ঢুকল। মস্ত একটা কুকুর এসে গুহার মধ্যে ঢুকেছে দেখে জেলেটা চটে গিয়ে, হেই হেই করে তাড়াতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই সে যেতে চায় না। এমন সময় পঞ্চু একবার কৈঁদে উঠল। কুকুরটা তার কান্না শুনে, পঞ্চুর গলার স্বর চিন্তে পেরে, তখুনি ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মুখে করে নিয়ে বাইরে চলে গেল। জেলে তার সখের কাঁকড়া হাতছাড়া হয়ে গেল দেখে মনে মনে অসন্তুষ্ট হ’ল ; কিন্তু কুকুরটাকে কিছু করতে সাহস হল না।

পঞ্চুকে রাস্তায় রেখে কুকুরটা আস্তে আস্তে চলে গেল। পঞ্চুও একটু পরে কাছেকার একটা কুটীরে গিয়ে দেখলে এক বুড়ো বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলে “হ্যাঁগা, অর্জুন বলে একটি ছেলে এখানে পড়েছিল তার কি হ’ল বলতে পার ?” “সে সুস্থ হয়ে বাড়ী গিয়েছে।” পঞ্চুর মনটা নিশ্চিত হল, কিন্তু শীতে সে হিহি করে কাঁপছিল। তার কাগজের তৈরি ইজার জামা জলে ভিজে একেবারে গলে গিয়েছিল। সে বুড়োকে বলে, “আমি সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিলাম, কাপড় চোপড় সব ফেঁসে গিয়েছে, এক টুকরো কাপড় আমায় দিতে পার ?” বুড়ো বলে, “আমি হতদরিদ্র, কাপড় কোথা পাব বাছা ? এই ছোট ছালাটা আছে এইটে কোন রকমে পার ত পর।” পঞ্চু সেই ছালা জড়িয়ে আস্তে আস্তে পরির বাড়ীর সম্মুখে এসে দাঁড়াল। দরজা জানালা সব বন্ধ। তখন বৃষ্টি হচ্ছে, পঞ্চু গিয়ে খুব জোরে দরজায় ধাক্কা দিলে। আধ ঘণ্টা পর উপরের একটা জানালা খুলে গেল, পঞ্চু দেখলে মস্ত একটা শামুক—তার মাথার উপরে মোম বাতি জ্বলছে ! সে জিজ্ঞাসা করলে, “এত রাতে কে তুমি দরজা ঠেলাঠেলি করছ ?” পঞ্চু বলে “পরি দিদি কি বাড়ী আছেন ?” “আছেন, তবে ঘুমিয়ে আছেন। তুমি বাছা কে ?” “আমি পঞ্চু।” “তুমি ? আচ্ছা দাঁড়াও, আমি দরজা খুলে দিচ্ছি।” পঞ্চু বলে “চট করে এসো—শীতে আর ফ্রিডেয় আমি আধমরা হয়ে গেছি।” শামুক বলে “জানইত বাছা আমি তাড়াতাড়ি করতে পারি নে।” শামুকের নীচে নেমে আসতে রাত্তির প্রায় কেটে গেল। ততক্ষণে পঞ্চুও এক লাথিতে দরজা ফাটিয়ে ফেলেছে, আর সেই ফাটার

মধ্যে পা আটকে গিয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। পঞ্চু বলে “আমার পা’টা ছাড়িয়ে



দাও।” শামুক বলে “সে ত ছুতরের কাজ.” “তবে আমি পড়ে থাকি? আমায় কিছু নয় ত খেতেও দাও।” শামুক বলে “তাইত, তাইত, বড় ভুল হয়ে গেছে, এই যে খাবার নিয়ে আসি।” সেই যে গেল, আবার ফিরে আসতে আরো দুঘণ্টা কেটে গেল। তারপর যখন খাবার এসে পৌঁছল তখন সে আর কিছুই নয়, মাটি দিয়ে গড়া মাছ আর ভূষি দিয়ে গড়া রুটি! পঞ্চু কিছুই খেতে পারল না। কাঁদতে কাঁদতে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। যখন জ্ঞান হল তখন দেখলে সে বিছানায় শুয়ে আছে আর শ্যামা বনশ্রী তার কাছে বসে আছেন।

শ্যামা বলেন, “আমি আর একবার তোমায় ক্ষমা করব, কিন্তু এরপর যদি অপরাধ কর তবে আর তোমার দুঃখের অবধি থাকবে না।” পঞ্চু আবার ভাল হবে বলে প্রতিজ্ঞা করলে। বৎসরের বাকী ক’মাস সে খুব ভাল করে পড়া করলে, ক্লাসে প্রথম হল, প্রাইজ পেল। মাষ্টার মশায়রা সবাই তার খুব প্রশংসা করলেন। শ্যামার বড় আনন্দ হল, তিনি পঞ্চুকে আদর করে বলেন—“কাল হতে তুমি আর কাঠের পুতুল থাকবে না; তোমায় আমি মানুষ্য করে দেব।” পঞ্চু আনন্দে যে কি করে বেড়াতে লাগল তা না দেখলে বোঝান কঠিন। পরদিন স্কুলশুদ্ধ সকলের নিমন্ত্রণ—দুশ’ বাটা ক্ষীর তৈরি হল, আর কত রকমের যে পিঠে পুলি তার আর গোনা গাথা নেই। পরদিন সকালটিও চমৎকার গেল, কিন্তু—

যারা মানুষ্য নয়, পরের হাতের পুতুল, তাদের জীবনে ঐ একটা ছোট্ট “কিন্তু”তেই সব মাটি করে দেয়।—

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রিয়স্বদা দেবী।

রাজা শতানীকের মৃত্তি

(শিবপুরাণের গল্প)

পূর্বকালে শতানীক নামে অতিশয় ধার্মিক এবং পরাক্রান্ত এক রাজা ছিলেন। শতানীক সকল শাস্ত্রে এবং সকল বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। তিনি প্রতিদিন অজস্র স্বর্ণ ও বস্ত্র দান করিতেন। এইরূপে অনেক দিন রাজত্ব করিয়া বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সহস্রাণীক রাজা হইলেন। সহস্রাণীকও পিতার মতই গ্রায় ও ধর্মের সহিত পৃথিবী শাসন করিতেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার পিতার গ্রায় দাতা হইতে পারিলেন না।

একদিন কয়েকজন ব্রাহ্মণ রাজসভায় আসিয়া বলিলেন—“মহারাজ! তোমার পিতার সময়ে আমাদের সুখের সীমা ছিল না। সে সময়ে প্রতিদিন রাজভাণ্ডার হইতে প্রচুর ধন ও বস্ত্র বিতরণ করা হইত। কিন্তু এখন তুমি দান বন্ধ করিয়া দিয়াছ, সে জন্য কত সাধু ব্রাহ্মণ তোমার দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। কেবল আমরা কয়টি পরিবার এখনও মনের দুঃখে পড়িয়া আছি। মহারাজ! আর বুঝি পারা গেল না, এখন হয়ত আমাদেরকেও অগ্র দেশে চলিয়া যাইতে হইবে।”

ব্রাহ্মণগণের কথা শুনিয়া সহস্রাণীক হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“গ্রায় পূর্বক সংপাত্রে দান করিলে পরলোকে মঙ্গল হয়—একথা শাস্ত্রে বলে। কিন্তু আমার একটি কথা বলিবার আছে। আপনারা বলুন দেখি, আমার পিতা, দাতাশ্রেষ্ঠ শতানীক, মৃত্যুর পর কিরূপ ভাবে কোথায় আছেন?”

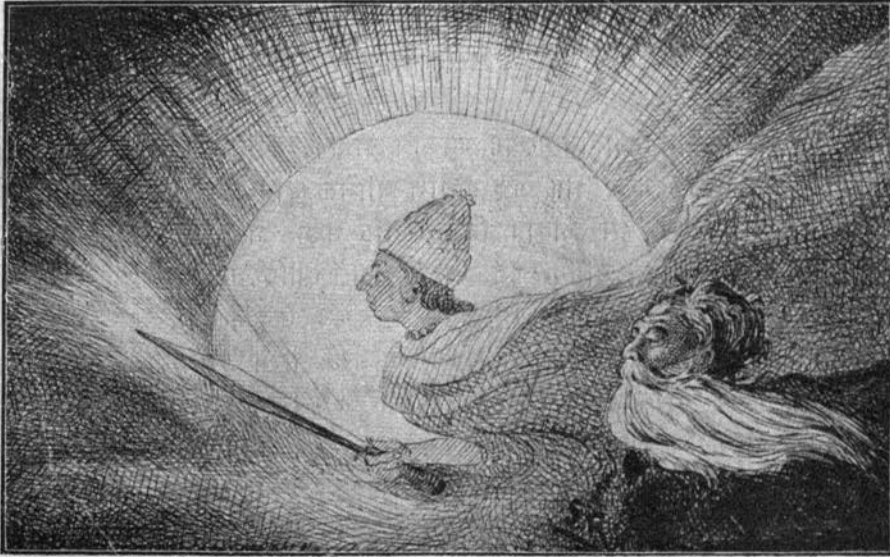
ব্রাহ্মণেরা কি উত্তর দিবেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা মাথা নীচু করিয়া মনের দুঃখে সভা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাদিগের দুঃখ দূর হইল না। যাগ, যজ্ঞ, হোম প্রভৃতি নিত্যকর্ম ছাড়িয়া মনের কষ্টে তাঁহারা কিছুদিন চুপ করিয়া কাটাইলেন।

যাগ যজ্ঞের সময় আগুনে যে আলতি দেওয়া হয় সেই আলতি নাকি সূর্য পাইয়া থাকেন। সূর্য তুষ্ট হইলে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইলে শস্য জন্মে এবং সেই শস্য হয় জগতের খাদ্য। এদিকে ব্রাহ্মণেরা যাগ যজ্ঞ সব ছাড়িয়াছেন, সূর্য আর আলতি পান না। কাজেই বৃষ্টি বন্ধ হইল। বৃষ্টি বন্ধ হইলে শস্য জন্মিবেনা এবং তারপর দুর্ভিক্ষ! এই সকল কথা ভাবিয়া সূর্য ব্যস্ত হইলেন। তখন তিনি বুড়া এক ব্রাহ্মণ

সাজিয়া সেই ব্রাহ্মণদিগের নিকট গিয়া বলিলেন—“তোমরা যাগ যজ্ঞ ছাড়িয়া দিয়া ভাল কর নাই—ইহাতে যে জগতের মহা অনিষ্ট হইবে! রাজার প্রশ্নের যিনি উত্তর দিবেন, সেই সাধু তপস্বী এই পুরীতেই আসিয়াছেন—তোমরা নিশ্চিন্ত হও।”

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তাঁহারা বৃদ্ধের পায়ের ধূলা লইয়া তখনই চারিদিকে সন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেক খুঁজিয়া এক স্থানে গিয়া দেখিলেন, মহামুনি ভার্গব এক পায়ে দাঁড়াইয়া উর্দ্ধবাহু হইয়া গভীর তপস্যায় নিমগ্ন হইয়াছেন! ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে সূর্য্য পশ্চিম দিকে গেলে পর ভার্গবের ধ্যান ভঙ্গ হইল। ব্রাহ্মণেরা তখন কৃতাজ্জলি হইয়া রাজা সহস্রাণীকের প্রশ্নের কথা তাঁহাকে বলিলেন।

ব্রাহ্মণগণের ছুরবস্তার কথা শুনিয়া মহামুনি ভার্গবের দয়া হইল। তিনি রাজা শতানীকের সন্ধান দক্ষিণে যমপুরীর দিকে চলিলেন। ভার্গবকে দক্ষিণে যাইতে দেখিয়া



তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিবার জন্ত সূর্য্যদেবও তাঁহার আগে আগে ছুটিয়া চলিলেন। ভার্গবও তপোবলে প্রচণ্ড বেগে সূর্য্যের পিছন পিছনই চলিলেন।

চলিতে চলিতে তাঁহারা ক্রমে যমরাজ্যের অষ্টাশী যোজন পথ ছাড়াইলেন। সেই পথে জল নাই, খাদ্য নাই, গাছের ছায়া নাই—কেবল দারুণ বাতাস আর অন্ধকার। এই পথের পরে আটশ কোটি নরক! সূর্য্যদেব সেই নরকের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহামুনি ভার্গবও নরকের সেই গভীর ক্রন্দন ও চীৎকার শুনিতে শুনিতে চলিতে লাগিলেন। তখন হঠাৎ এক দণ্ডপাণি ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার পথ আটকাইয়া বলিল—“ঠাকুর! আমার সেই দক্ষিণা না দিয়া কোথায় যাইতেছ? যখন পৃথিবীতে ছিলাম, তখন যে তুমি আমাকে দক্ষিণা দিবে বলিয়াছিলে, সে কথা মনে পড়ে কি?” ভার্গবের সব কথা মনে পড়িল, তিনি বলিলেন—“হাঁ, তোমাকে এক কাহন দক্ষিণা দিব বলিয়াছিলাম বটে। আচ্ছা, বাড়ীতে গিয়া পরে দিব, এখন পথ ছাড়িয়া দাও।” ব্রাহ্মণ বলিল—“পৃথিবীতে ‘পরে দিব’ বলা চলে, কিন্তু যমরাজ্যে সেরূপ বলা চলে না। তোমাকে এখনই দক্ষিণা দিতে হইবে।” ভার্গব বলিলেন—“আমার সঙ্গে ত কিছুই নাই, তোমাকে কি দিব?” ব্রাহ্মণ বলিল—“ধর্ম্মই লোকের পরম ধন। তোমার ধর্ম্মের অর্দ্ধেক আমাকে দান কর।” ভার্গব বলিলেন, “বাপুহে, সমস্ত জীবনের সঞ্চিত ধর্ম্মের অর্দ্ধেক তোমায় দিয়া ফেলিব, ইহাও কি সম্ভব হয়?” কিন্তু ব্রাহ্মণও ছাড়িবার পাত্র নয়। শেষে সূর্য্যদেবের কথায় ভার্গব তাঁহার ধর্ম্মের ষষ্ঠভাগ ব্রাহ্মণকে দান করিলেন।

আর কিছু দূর গেলে পর এক রাখাল আসিয়া ভার্গবকে ধরিল। পূর্বের গরু চরাইবার বেতন স্বরূপ সে তাঁহার নিকট পাঁচ গণ্ডা কড়ি পাইত, কিন্তু লজ্জায় তাহা চাহিতে পারে নাই; ভার্গবও সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অতএব রাখালও ভার্গবের ধর্ম্মের ষষ্ঠ ভাগ লইল। এইরূপে ক্রমে এক ধোপা, এক তাঁতি, এক তীর্থকার (যে তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়ায়) ও এক পাণ্ডা আসিয়া ভার্গবের সব ধর্ম্মবল তাঁহাদের পাণ্ডনা স্বরূপ আদায় করিল। তখন ধর্ম্মবল হারাইয়া মহামুনি ভার্গব একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন—কিছুতেই আর চলিতে পারেন না। ইহা দেখিয়া সূর্য্যদেব নিজে ভার্গবের হাত ধরিয়া, যেখানে শতানীক নরকে যজ্ঞণা পাইতেছিলেন সেখানে লইয়া গেলেন।

শতানীক নরকে কষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া, বিস্মিত ভার্গব জিজ্ঞাসা করিলেন—
“মহারাজ! আপনি চিরজীবন দান ও পুণ্য করিয়াছেন। তবে কেন আপনি মৃত্যুর পর স্বর্গে না গিয়া নরকে কষ্ট পাইতেছেন?”

শতানীক বলিলেন—“প্রভু! আমি অস্থায়রূপে প্রজার ধন লইয়া ব্রাহ্মণদিগকে চিরকাল দান করিয়া আসিয়াছি। সেই প্রজাপীড়নের জন্তই আমার এ দুর্দশা। এখন আমাকে যদি উদ্ধার করিতে চান তবে শীঘ্র গিয়া আমার পুত্র সহস্রাণীককে বলুন—সে যেন নিজে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া আমাকে নরক হইতে মুক্ত করে।”

রাজার কথা শুনিয়া ভার্গব সূর্য্যদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“প্রভু! সহস্রাণীক কোন্ পুণ্য করিলে শতানীক নরক হইতে উদ্ধার পাইবেন?” সূর্য্যদেব বলিলেন—“যথাবিধি সংযম ও উপবাস করিয়া যদি সহস্রাণীক ঋণায়মে উপার্জিত অর্থ মহাদেবকে অর্পণ করিয়া গরু এবং ধন দান করে, তবে শতানীকের পাপক্ষয় হইবে।” সূর্য্যের উপদেশ শুনিয়া ভার্গব ফিরিয়া আসিলেন এবং সহস্রাণীকের নিকট সব কথা বলিলেন।

তখন সহস্রাণীক মন্ত্রী উপর রাজ্যভার দিয়া ঋণায়পথে নিজে ধন উপার্জন করিবার জন্ত বিদেশে যাত্রা করিলেন। এক জায়গায় গিয়া দেখিলেন, প্রকাণ্ড এক পুকুর কাটা হইতেছে; সহস্রাণীক বেতন লইয়া সেই পুকুর কাটার কাজে নিযুক্ত হইলেন। যতদিন পর্য্যন্ত ভার্গবের কথামত দান করিবার এবং গরু কিনিবার উপযুক্ত ধনসঞ্চয় না হইল, ততদিন সে কাজ ছাড়িলেন না। তারপর রাজ্যে ফিরিয়া শুদ্ধ দেহে শুদ্ধ মনে দান করিলেন। রাজা শতানীক নরক হইতে মুক্তি পাইয়া স্বর্গে গেলেন।

শ্রীকুলদারজন রায়।

দানবীর কার্ণেগী

বড় লোক হবার সখ থাকলেই যে মানুষ বড় লোক হ'তে পারে না, তার একটি সামান্য দৃষ্টান্ত সন্দেশের গল্পে তোমরা পড়েছ। এখন একটি সত্যিকারের বড় লোকের কথা বলব, যিনি গরিব বাপ-মায়ের ঘরে জন্মেও কেবল আপনার চেষ্ঠায় ও আগ্রহে, জগতের মহাধনী ক্রোরপতিদের মধ্যে নিজের স্থান ক'রে নিয়েছিলেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে স্কটলণ্ডের এক সামান্য পল্লীগামের এক নগণ্য পরিবারে এন্ড্রু কার্ণেগীর জন্ম হয়। তাঁর বয়স যখন তেরো বৎসর মাত্র তখন তাঁর বাবা উপার্জনের চেষ্ঠায় সপরিবারে আমেরিকায় চাকরী করতে যান। সেইখানে গিয়েই এক সূতোর কারখানায় তাঁতির মজুর হ'য়ে কার্ণেগী মাসে সাড়ে বারো টাকা রোজগার করতে

আরম্ভ করলেন! এই তাঁর প্রথম রোজগার। তারপর চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁর আরেকটু ভাল একটা চাকরী জুটল, তিনি এক টেলিগ্রাফ আফিসের ছোকরা-পিয়নের কাজ পেলেন। এই কাজ তিনি কেমন ক’রে জোগাড় করলেন, সে গল্পটিও বড় চমৎকার।—

টেলিগ্রাফ আফিসের দরজায় বিজ্ঞাপন ছিল, “ছোকরা পিয়ন চাই।” তাই দেখে কার্ণেগী খোঁজ নেবার জন্য ভিতরে ঢুকলেন। টেলিগ্রাফের কেরাণী একটা অচেনা ছোকরাকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেখেই হাঁক দিয়ে বলল, “কি চাও?” কার্ণেগী বললেন, “বড় সাহেবকে চাই।” কেরাণী তেড়ে উঠে বলল, “যাও, যাও, দেখা হবে না।” পরের দিন সকালে কার্ণেগী আবার ঠিক তেমনি ভাবে সেখানে গিয়ে হাজির। কেরাণী দেখলে, সেই ছোকরা আবার এসেছে। সে আবার জিজ্ঞাসা করলে “কি চাও?” জবাব হ’ল “বড় সাহেবকে চাই।” সেদিনও কেরাণী তাকে চটপট ঘর থেকে বার ক’রে দিল। পরের দিন আবার সেই সময়ে সেই ছোকরা এসে হাজির,—বলে “বড় সাহেবকে চাই।” কেরাণী ভাবল, ব্যাপারটা কি? আচ্ছা একবার বড় সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা যাক। বড় সাহেব সব শুনে বললেন, “পাঠিয়ে দাও ত, দেখি ছোকরা কি চায়।” সেই দিনই কার্ণেগী টেলিগ্রাফ আফিসের কাজে ভর্তি হলেন। বাপমায় ভাবলেন, ছেলে ‘চাকরে’ হ’য়ে উঠল—বেশ ছু পয়সা রোজগার করবে।

পিয়নের কাজ করতে করতেই কার্ণেগী টেলিগ্রাফের কলকায়দা সব শিখে ফেললেন, আর কিছুদিন বাদেই তিনি সেখানকার রেলস্টেশনের তার-ওয়ালা বা অপারেটর হ’য়ে বসলেন। তারপর দেখতে দেখতে ক্রমে টেলি-বিভাগের বড় সাহেব বা সুপারিন্টেন্ডেন্ট হ’তেও তাঁর বেশী দেরী লাগল না। এই সময় থেকে তিনি রেল গাড়ী আর খনির তেলের ব্যবসা ক’রে খুব টাকা করতে আরম্ভ করেন। লাভের টাকা আবার নূতন নূতন ব্যবসায় খাটিয়ে তিনি বড় বড় কারবার জমিয়ে তুললেন। তারপর ক্রমে পাঁচ সাতটা প্রকাণ্ড লোহার কারখানা কিনে ফেলে, তিনি নিজে সেইগুলো চালাতে লাগলেন। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স না হ’তেই তিনি পৃথিবীর মধ্যে একজন নামজাদা লোহার মালিক হ’য়ে উঠেছিলেন।

এমি ক’রে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার ক’রে, তিনি ৫৬ বৎসর বয়সে সব বিষয় কর্ম থেকে অবসর নিয়ে স্কটলণ্ডে সেই তাঁর

জন্মস্থানে গিয়ে বসলেন। বল্লেন, “রোজগার যথেষ্ট করেছি, এখন এই বৃড়ো বয়সে আর ‘টাকা টাকা’ ক’রে ছুটে বেড়ান ভাল দেখায় না। এতদিন যা সঞ্চয় করেছি, এখন দানের মত দান ক’রে তার সদ্যবহার করতে হবে।” সেই থেকে তাঁর মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি তাঁর দানব্রত পালন ক’রে গিয়েছেন।

কার্ণেগীর মত অথবা তাঁর চাইতেও বড় লোক পৃথিবীতে আরও আছেন— কিন্তু এমন অজস্র ভাবে দান আর কেউ করেছেন কিনা সন্দেহ। কত দেশে, কত সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে, কত ছোট ছোট পাঠশালায়, কত বড় বড় কলেজে, তাঁর কীর্তির পরিচয় রয়েছে। শুধু লাইব্রেরী করবার জন্তই নানা জায়গায় তিনি প্রায় বিশ কোটি টাকা খরচ করে গেছেন। স্কটল্যান্ডের গরীব ছাত্রদের পড়ার সাহায্যের জন্ত তিনি অন্তত তিন কোটি টাকা দান করেছেন। তাঁর নিজের জন্মস্থান সেই ছোট্ট গ্রামটি আজ বেশ একটি সহর হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে কেবল তাঁর দানের জোরে। এই সহরটির উন্নতির জন্ত তিনি যে সম্পত্তি রেখে গেছেন তার আয় হয় বছরে চার লক্ষ টাকা। বীরত্বের পুরস্কারের জন্ত আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে তিনি দুটি Hero Fund বা বীরভাণ্ডার স্থাপন ক’রে গেছেন; বিপদের সময়ে অন্তের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে যারা নিজেরা আহত ও অকর্মণ্য হ’য়ে পড়ে, এই ভাণ্ডার থেকে তাদের খাওয়া পরার সমস্ত খরচ দেওয়া হয়। এমনি ক’রে ছোট বড় যত অসংখ্য রকমের দান তিনি ক’রে গেছেন, সব যদি এক সঙ্গে ধরা যায়, তাহ’লে তাঁর দানের হিসাব হয় প্রায় একশ’ কোটি টাকা।

এত টাকা আমাদের ভাল ক’রে কল্পনাই হয় না। হিসাব বলবার সময় “অযুত লক্ষ নিযুত কোটি অর্ব্বুদ বৃন্দ” সব আমরা গড়গড় ক’রে ব’লে যাই, কিন্তু সে যে কত বড় অঙ্কের হিসাব তার ধারণা করতে গেলেই মাথায় গোল লেগে যায়। একশ’ কোটি টাকা কতখানি জান? একজন লোক যদি প্রতি সেকেন্ডে একটি ক’রে টাকা দান করে, তা হ’লে একদিনে তার ছিয়াশি হাজার টাকা খরচ হয়ে যায়। কিন্তু এই হিসাবেও একশ’ কোটি টাকা খরচ করতে তার অন্তত বত্রিশ বৎসর সময় লাগবে— তাও, যদি সারাদিন সারারাত না খেয়ে না ঘুমিয়ে সে কেবল ঐ কাজই করতে থাকে! একশ’ কোটি টাকা ভাঙ্গিয়ে যদি পয়সা আনাও তাহ’লে সেই পয়সা দিয়ে এই কলকাতার মত গোটাছুই সহরকে একেবারে ঢেকে দেওয়া যাবে। এই ভারতবর্ষের সমস্ত লোক, ছেলে বৃড়ো স্ত্রী পুরুষ, সবাই মিলে যদি

সেই পয়সা কুড়োতে আসে তাহ'লে প্রত্যেকে প্রায় দুইশ' পয়সা নিয়ে বাড়ী ফিরতে পারবে।

এই কয়েকদিন হ'ল কার্ণেগীর মৃত্যু সংবাদ এদেশে এসেছে। তাঁর জীবনের সম্ভিত টাকা তিনি প্রায় সমস্তই দান ক'রে গিয়েছেন—তার তুলনায় যা বাকী রয়ে গেছে সে কেবল সিঙ্কুরের মধ্যে এক মুষ্টির মত।

সিংহ শিকার

আফ্রিকা হ'ল সিংহের দেশ। ইউরোপ আমেরিকার বড় বড় শিকারীরা সেখানে বন্দুক নিয়ে দলেবলে সিংহ শিকার করতে যান। তাঁরা মনে করেন, যত রকম শিকার আছে তার মধ্যে সিংহ শিকার খুব একটা বড় ব্যাপার; কারণ তাতে শিকারীর সাহস এবং বাহাদুরির পরিচয়টা ভাল করেই পাওয়া যায়। যে শিকারী সিংহ মেরেছে লোকে তাকে ওস্তাদ শিকারী ব'লে মানে। সিংহ শিকারের বিপদ খুব বেশী। আজকাল বন্দুকের এত যে উন্নতি হ'য়েছে, তবুও এখনও কত শিকারী সিংহের হাতে প্রাণ হারান। তিন চারটা সাংঘাতিক গুলি খাবার পরেও একশ' গজ দৌড়ে এসে সিংহ তার শিকারীকে শিকার ক'রেছে, এমন ঘটনার কথাও শোনা যায়। তার মধ্যে একটি গুলি সিংহের হৃৎপিণ্ড ফুঁটো ক'রে বেরিয়ে গিয়েছিল, তবু মরবার আগে সে তার মরণ-কামড়টি না দিয়ে ছাড়েনি! তা হ'লে ভাব সিংহ কি জিনিষ!

এমন যে সিংহ, তাকে আফ্রিকার 'মাসাই' ও 'নান্দি' জাতের নিগ্রোরা বল্লম দিয়ে শিকার ক'রে থাকে। প্রেসিডেন্ট রুজ্‌ভেল্ট আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি এবং অসাধারণ মনস্বী লোক ব'লে সকল দেশে পরিচিত, কিন্তু শিকারী হিসাবেও তাঁর প্রতিপত্তি বড় কম নয়। তিনি নান্দিদের সিংহ-শিকার স্বচক্ষে দেখে তার যে বর্ণনা লিখে গিয়েছেন, তা পড়লে অবাক হ'তে হয়।

নান্দিদের শিকার দেখবার জন্ত তিনি একদিন আফ্রিকার জঙ্গলে দলেবলে সিংহের খোঁজে বেরিয়েছিলেন। কথা ছিল, সিংহ পাওয়া গেলে নান্দিরা শিকার করবে; সাহেবেরা কেউ সে শিকারে যোগ দেবেন না, কিছু বলতে পারবেন না; তাঁরা কেবল দূরে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখবেন। রোপ জঙ্গল ঘেঁটে অনেক খোঁজার পর

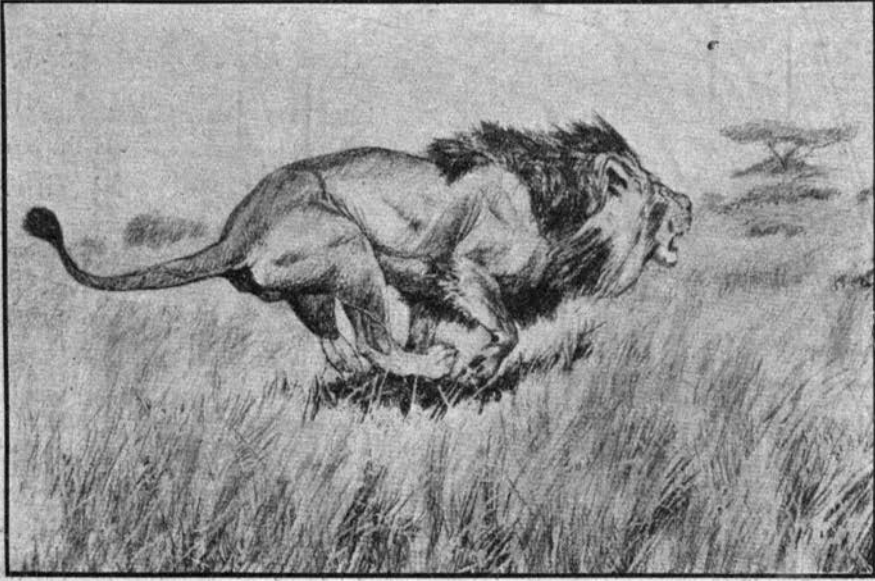
প্রকাণ্ড এক সিংহ পাওয়া গেল। তেমন সিংহ সচরাচর মেলে না। রুজ্ভেন্ট্ লিখেছেন, সিংহটাকে দেখে তাঁদের শিকার করবার লোভ জেগে উঠছিল, কিন্তু তা হ'লেত তাঁদের কথা রক্ষা হয় না, আর নান্দীদের শিকারটাও দেখা হয় না; তাই তাঁরা দলেবলে সিংহটাকে ঘিরে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। নান্দীরা একটু পিছনে পড়েছিল, দেখতে দেখতে তারা এসে হাজির হ'ল। এক হাতে বল্লম, আর এক হাতে ঢাল—বিশাল দেহটি যেন কালো পাথরের তৈরী, মুখে দয়ামায়া দ্বিধা ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। সিংহ পাওয়া গিয়েছে শুনে তাদের আনন্দ দেখে কে? তারা এক এক পা চলে আর এক একটি বিকট লাফ দেয়। দেখতে দেখতে সিংহের ঝোপটিকে তারা নিঃশব্দে ঘেরাও ক'রে ফেলল।

সিংহটাও এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল না। সে ঝোপের আড়ালে ব'সে ছিল, আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। দেখল কতগুলো মানুষ তার দিকে এগিয়ে আসছে। তারা সব ঢালের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বল্লম বাগিয়ে দাঁড়াচ্ছে। এক একটি ঢালের উপর দিয়ে এক এক জোড়া কালো চোখ যমের ঝকুটির মত তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে বেশ বুঝল যে তার জন্তুই এত সব আয়োজন, তার গর্জনে সারা জঙ্গল কেঁপে উঠতে লাগল। তার ঘাড়ের কেশর খাড়া হ'য়ে দাঁড়াল, তার মুখখানা ভীষণভাবে বিকৃত হ'য়ে গেল, তার ল্যাজের বাড়িতে সমস্ত ঝোপটি চঞ্চল হ'য়ে উঠল। সে একবার এপাশ ফিরল, একবার ওপাশ ফিরল, ডাইনে তাকাল বাঁয়ে তাকাল; কোন্দিকে লোক কম দেখে, তারপর তীরের মত সেই দিকে বাঁপিয়ে পড়ল।

একটি লোকও সে দিক থেকে সরল না। সব ঢাল বাগিয়ে বল্লম তুলে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। ছপাশ থেকে শিকারীরা বল্লম হাতে দৌড়ে এল, দলের যে নেতা সে লাফ দিয়ে দৌড়ে সকলের সামনে গিয়ে পড়ল। তার হাত থেকে বল্লমখানি বিদ্যুতের মত ছুটে গিয়ে সিংহের গায়ের মধ্যে বিঁধে গেল। সিংহটাও আঘাত লাগামাত্র তার সামনে যাকে পেল তাকেই আক্রমণ ক'রে ধরল। সে লোকটাও তার জন্তু প্রস্তুত ছিল, তার বল্লমের এক ঘায়ে সে চক্ষের নিমেষে সিংহটাকে একেবারে এপার ওপার ফুঁড়ে ফেলল—এক দিকের ঘাড়ের মধ্যে ঢুকে বল্লমের আগাটা অন্য দিকে পেটের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু তা'সত্ত্বেও সিংহটা তার ঢালের উপর দিয়ে প্রচণ্ড এক থাবা মেরে, তার ঘাড়ের মধ্যে নখ দাঁত বসিয়ে, মুহূর্তের মধ্যে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলল। আর অমনি চারদিক থেকে বল্লমের পর বল্লম আগুনের

ঝলকের মত ছুটে এসে সিংহটাকে একেবারে অস্ত্রে অস্ত্রে গেঁথে ফেলল। এর মধ্যেও কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে আরও একটি শিকারীকে জখম করতে ছাড়ে নি। মরবার সময়ে একটা বল্লমকে সে এমন জোরে কামড়িয়ে ধরেছিল, যে লোহার বল্লমটা উণ্টে মুচড়ে বঁড়শির মত বেকে গিয়েছিল। তারপর নান্দীদের উল্লাস দেখে কে! খানিকক্ষণ পর্যন্ত সিংহের চারিদিকে তাদের চীৎকার আর বিজয় নৃত্যের ঘটা চলল। স্থূথের বিষয়, আহত শিকারী দুজনেই বেঁচে উঠেছিল।

সিংহের তেড়ে-আসা থেকে, এত কাণ্ড শেষ হওয়া পর্যন্ত, দশ সেকেন্ডও সময়



লাগে নি। সিংহের আক্রমণ, শিকারীর অস্ত্রবৃষ্টি, আঁচড় কামড় ছড়াছড়ি আঘাত যন্ত্রণা ও মৃত্যু, ওর মধ্যেই সব এক ঝাপটায় শেষ! সিংহটা যখন পড়ল, তখন তার অবস্থাটি হয়েছিল, ঠিক ভীষ্মের শরশয্যার মত।

কাঁচ

এক ছিল সওদাগর। সে গেল বাণিজ্য করতে। প্যালেষ্টাইনের তীরের কাছে নদীর মুখে তার ছোট্ট জাহাজটি বেঁধে, সে তার লোকজন নিয়ে ডাঙ্গায় নামূল, আর সেইখানেই বালির উপর আগুণ জ্বেলে রান্না করতে বসূল। হাঁড়ি বসাবার জন্য পাথর পাওয়া গেল না, কাজেই তাদের সঙ্গে যে সোডা-স্কারের পাটালি ছিল (যে সোডা দিয়ে বাসন সাফ করে) তারই কয়েকটার উপর তারা হাঁড়ি চড়াল। রান্না খাওয়া সব এখন শেষ হ'য়েছে, তখন তাদের সোডা-পাথরের চাক্তিগুলো তুলতে গিয়ে দেখলে তার চিহ্ন মাত্র নেই—আছে কেবল স্বচ্ছ পাথরের মতন কি একটা জিনিষ, যা তারা আর কখনো চোখে দেখেনি। 'এমনি ক'রে নাকি কাঁচের আবিষ্কার হয়েছিল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত বালির সঙ্গে স্কার গলিয়ে লোকে কাঁচ তৈরী করে আসছে।

কলার 'বাসনা' পুড়িয়ে যে ছাই হয়, তার মধ্যে স্কার থাকে—তাকে বলে পটাশ-স্কার। সোডা পটাশ চূণ এই সমস্তই নানারকমের স্কার। চুল্লীর আঁচে শুধু বালি কখনও গলে না; কিন্তু তার সঙ্গে চূণ-পাথর আর স্কার মিশিয়ে জ্বাল দিলে সব গলে এক হ'য়ে যায়, আর ঠাণ্ডা হ'লে কাঁচ হ'য়ে জমে থাকে।

প্রথম প্রথম মানুষে যে কাঁচের ব্যবহার করত, সে কেবল সৌখিন জিনিষ হিসাবে। কাঁচ তৈরী করবার সময় তার সঙ্গে নানারকম ধাতুর মশলা মিশিয়ে তাকে নানারকম রং ফলান যায়। সেই সমস্ত রঙিন কাঁচের পুঁথিমুক্তো একসময়ে লোকে অসম্ভব দামে কিনে নিত। বহুমূল্য রত্ন ব'লে দেশ বিদেশে তার আদর হ'ত। সে সময়ে কাঁচ তৈরীর সঙ্গেই খুব অল্পলোকেই জানত; আর তারা কাউকে সে সব শেখাত না। কিন্তু তবু 'দুশ' পাঁচশ' বা হাজার বছরে সে সব গোপন কথাও অল্পে অল্পে ফাঁস হ'য়ে যেতে লাগল। ক্রমে এশিয়া থেকে ইউরোপের নানা স্থানে এ বিজ্ঞার চলন হ'তে লাগল। বুদ্ধিমান রোমানেরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কাঁচ তৈরীর এমন উন্নতি ক'রে ফেল্ল যে, কয়েক শ' বছরের মধ্যেই কাঁচের সারসি, বাসন, প্রদীপ-দান প্রভৃতি মানুষের—অন্তত ধনী লোকদের,—নিত্য-ব্যবহারের জিনিষ হ'য়ে দাঁড়াল।

এখন আমরা যে সমস্ত বাক্সকে পরিষ্কার কাঁচ সদাসর্বদা ব্যবহার করি, তিনশ' বছর আগে সেরকম কাঁচ তৈরীই হ'ত না। সে সময়কার কাঁচ হ'ত ময়লা গোছের

—তার মাঝে মাঝে ঘোলাটে দাগ থাকত। তার উপরেই রং ফলিয়ে, কৌশলে তার দাগের সঙ্গে দাগ মিলিয়ে, ওস্তাদ কারিকরেরা আশ্চর্য্য সুন্দর সব জিনিষ গড়ত। কিন্তু নিখুঁৎ সাদা কাঁচ যে কাকে বলে, সে তারা জানতই না। প্রায় তিনশ' বছর আগে ইংলণ্ডের কয়েকজন উৎসাহী লোকের চেষ্টায় একরকম চমৎকার কাঁচ তৈরী হয়, সেই থেকেই কাঁচের ব্যবসার চূড়ান্ত উন্নতির আরম্ভ। তার আগে কাঠের চুল্লীতে কাঁচ তৈরী হ'ত, এই ইংরাজেরাই সকলের আগে কয়লার চুল্লী ব্যবহার করলেন। এঁরা সমুদ্রের পানি পুড়িয়ে, তা' থেকে পটাশ্ বার ক'রে, সেই পটাশের মধ্যে খাঁটি চক্‌মকি পাথরের গুঁড়ো আর সীসা-ভস্ম মিশিয়ে জলের মত স্বচ্ছ নূতন রকমের কাঁচ তৈরী করলেন। তখন হ'তে সেই কাঁচের সারসি, সেই কাঁচের আরসি, সেই কাঁচের যন্ত্র বাসন চশমা, দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সৌখিন ধনীর সখের কাঁচ সাধারণ লোকের ঘরাও জিনিষ হয়ে উঠল।

লোহা না থাকলে মানুষের সভ্যতার শক্তি যেমন খোঁড়া হয়ে যায়, কাঁচ না থাকলে বিজ্ঞানের বৃদ্ধিও সেই রকম কাণা হ'য়ে পড়ে। এই তিনশ' বছরে মানুষ তার জ্ঞানের পথে যা কিছু উন্নতি ও আবিষ্কার করেছে, কাঁচ না থাকলে তার প্রায় বারো আনাই অসম্ভব হ'ত। কাঁচ ছিল তাই দূরবীণ হ'তে পেরেছে; কাঁচ ছিল তাই অণুবীক্ষণের জন্ম হ'য়েছে। আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের আশ্চর্য্য রহস্য, গাছপালা কীট পতঙ্গের গঠন কৌশল, অসংখ্য রোগবীজের সঙ্গে স্বাস্থ্যের নিত্য লড়াই, অতিবড় ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব আর অতিসূক্ষ্ম অণুপরমাণুর ইতিহাস—এ সমস্তই মানুষ জানতে পারছে কেবল কাঁচের কৃপায়। গ্রহ নক্ষত্রের আলোক দেখে, পণ্ডিতে তার মালমশলার বিচার করেন, তার ভূত ভবিষ্যৎ কত কি বলেন,—তার জন্তও কাঁচের বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র চাই। ফটোগ্রাফার ছবি তোলেন, তার জন্ত কাঁচের লেন্স চাই। বৈজ্ঞানিকের ঘরে ঘরে কাঁচের থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার, আরো নানারকম কত যন্ত্র আর কত “মিটার”। মোট কথা, কাঁচের ব্যবহার যদি মানুষে না জানত, তবে আজও তার সভ্যতার ইতিহাস অন্তত তিনশ' বছর পেছিয়ে থাকত।

নানারকম কাজের জন্ত নানারকম কাঁচ তৈরী হয়। তা থেকে কাজের জিনিষ গড়বার উপায়ও নানা রকম। সামান্য একটা গেলাস বোতল চিম্নি বা কাঁচের নল বানাবার জন্ত কত যে কায়দা কৌশলের দরকার হয়, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। একটি কারিকর একটা লোহার নলে ক'রে খানিকটা গলা কাঁচ নিয়ে, তার

মধ্যে ফুঁ দিয়ে, তাকে নেড়ে ঝেড়ে ছলিয়ে ঝুলিয়ে, চটপট কত যে আশ্চর্য্য জিনিষ গড়তে পারে, সে একটা দেখবার মত ব্যাপার। নলের মুখটা চুল্লীতে-চড়ান তরল কাঁচের মধ্যে ডুবিয়ে তুললে, নলের আগায় খানিকটা গলা কাঁচ উঠে আসে। তখন সেই নলের মধ্যে ফুঁ দিলে কাঁচটা গোল বুদ্ধদের মত ফাঁপা হ'য়ে ফুলে ওঠে। নরম থাকতে থাকতে সেই বুদ্ধদটাকে লোহার টেবিলের উপর ইচ্ছামতন চাপ দিয়ে চ্যাপ্টা করা যায়; অথবা গড়িয়ে ডিমের মতন বা হুঁকোর মালার মতন লম্বাটে করে দেওয়া যায়। কোন জিনিষ গড়তে গড়তে, তার খানিকটা জায়গা আগুনে ভাতিয়ে আবার যদি ফুঁ দেওয়া যায়, তা হ'লে সেই তাতান জায়গাটুকু গম্বুজের মত ফুলে উঠতে থাকে। কিম্বা যদি সেটাকে নরম অবস্থায় ঝুলিয়ে ধ'রে আস্তে আস্তে ঘোল-মউনির মতন পাক দেওয়া যায়, তাহ'লে যেখানটা নরম, সেটা চিম্নির ডাঁটা বা নলের মতন লম্বা হ'য়ে ঝুলে পড়ে। গোল জিনিষের গোড়ায় একটু নল বানিয়ে, তারপর আগার দিকটা গরম ক'রে, ফুঁয়ের জোরে ফাটিয়ে দিলে, খাসা একটি বোতলের মুখ বা কল্কে তৈরী হয়। এই সমস্ত নানারকম জিনিষের গায়ে আবার খানিক নরম কাঁচ লাগিয়ে ইচ্ছামত হাতল বা পায়া গ'ড়ে দেওয়া যায়। এসব লিখতে যা সময় লাগছে, গড়তে গেলে ওস্তাদ লোকের তার চাইতেও কম সময় লাগে।

এই রকম অনেক জিনিষই আজকাল কলে তৈরী হয়। তার কতক গড়ে ঢালাই ক'রে, কতক বানায় কল দিয়ে বাতাস ফুঁকে, আবার কতকগুলো তৈরী হয় নরম কাঁচের উপর অস্ত্র চালিয়ে। সাধারণ সারসির কাঁচ সমস্তই আগে অনেক হাঙ্গাম ক'রে হাতে গ'ড়ে তৈরী হ'ত। এখনও প্রতিদিন হাজার হাজার সারসি সেই রকমে তৈরী হয়। তার জন্ম প্রথমে ঘাড়-কাটা বোতলের মত মস্ত মস্ত চোঙা বানিয়ে, তারপর সেই-গুলোকে কেটে, চীরে, নরম ক'রে, চেপ্টিয়ে, ছোট বড় সারসি তৈরী হয়। কিন্তু খুব বড় বড় আরসি আর ভারি ভারি আস্বাবী আয়নাগুলি প্রায় সমস্তই হয় ঢালাই ক'রে। চুল্লীর তরল কাঁচ গামলার মত প্রকাণ্ড হাতায় ক'রে তুলে, একটা মস্ত টেবিলের উপর ঢেলে দিতে হয়। তারপর প্রকাণ্ড 'রোলার' দিয়ে সেই গরম কাঁচকে ক্রমাগত বেলে এবং দ'লে, শেষে পালিশ-কলে ঘ'ষে সমান করতে হয়।

সব চাইতে ভাল আর দামী যে কাঁচ, সেগুলো দরকার হয় বিজ্ঞানের কাজে। তা'দিয়ে দূরবীণ হয়, ফটো তুলবার 'লেন্স' হয়, হাজার রকম যন্ত্র তৈরী হয়। এই সব কাজের জন্ম যে কাঁচ লাগে, সে কাঁচ একেবারে নিখুঁৎ হওয়া দরকার। তার

আগা গোড়া সমান স্বচ্ছ হওয়া চাই। জলের মধ্যে নূন ফেললে সে নূন যেমন গলে গিয়ে সমস্তটা জলের মধ্যে সমানভাবে ছড়িয়ে থাকে, ঠিক তেমনি ক'রে কাঁচের সমস্ত মশলাগুলি সব জায়গায় ঠিক সমান ভাবে সমান ওজনে মিশে যাওয়া চাই। তা' যদি না হয়, কাঁচের মধ্যে কোথাও যদি অতি সামান্য একটু খানিও দাগী বা ঘোলা থেকে যায়, তাহ'লেই আর তা'দিয়ে কোন সূক্ষ্ম কাজ চলতে পারবে না। সুতরাং এই কাঁচ তৈরী করবার সময় খুব সাবধান হ'তে হয়। কয়লা বা গ্যাসের চুল্লীর উপর পাথুরে-মাটির বাসনের মধ্যে অল্প আঁচে একটু একটু ক'রে কাঁচের মশলা জ্বাল দিতে হয়। দশ বারো ঘণ্টা জ্বাল দেবার পর, চুল্লীর আঁচ বাড়িয়ে দিয়ে, খুব কড়া আঁচের তাপে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা রাখতে হয়। তারপর 'asbestos' বা রেশমী-পাথরের পোষাক-পরা মজুরেরা পাথরের ডাঙা দিয়ে সেই তরল গরম কাঁচটাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রমাগত ঘূঁটতে থাকে। একে আগুনের মত গরম, তার উপর এই ভীষণ পরিশ্রম—এক মিনিট থামবার যো নেই। মজুরের পর মজুর আসে, তারা ঘেমে হাঁপিয়ে হয়রান হ'য়ে পড়ে, তাদের ঘাড় পিঠে ব্যথা হ'য়ে যায়, আবার তাদের জায়গায় নতুন মজুর আসে। ক্রমে চুল্লীর আগুনও আস্তে আস্তে কমে আসতে থাকে—কাঁচটাও অল্পে অল্পে ঠাণ্ডা হ'য়ে জমে আসতে থাকে। এই সময়ে খুব সাবধান হওয়া দরকার। তাড়াতাড়ি জুড়িয়ে গেলে সবটা কাঁচ ঠিক সমান ভাবে জমতে পারে না—এলোমেলো ভাবে জমাট বেঁধে কাঁচের মধ্যে নানারকম 'টান' ধ'রে যায়; সে দোষ চোখে দেখা না গেলেও কাজের সময় ধরা পড়ে। সাধারণ কাঁচের জিনিষও তৈরী করার সময়ে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা ক'রে ফেললে ঠুনকো হ'য়ে যায়, নাড়তে চাড়তে সহজেই ভেঙ্গে যায়। তাই, কাঁচ যখন জমে আসতে থাকে, তখনই চুল্লীর চারদিকে ইটের দেওয়াল দিয়ে সব বুজিয়ে দিতে হয়; তার মধ্যে চুল্লীর আগুন আস্তে আস্তে নিভে যায়। কাঁচটাও পাঁচদিন দশদিন বা পনের দিন ধ'রে অল্পে অল্পে জমাট বেঁধে ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে। তারপর দেয়াল ভেঙ্গে পাথুরে বাসন ভেঙ্গে ভিতরকার কাঁচ বার ক'রে আনে। সে কাঁচ যদি আস্ত থাকে তাহ'লে কাঁচওয়ালার খুব ভাগ্য বলতে হবে। প্রায়ই সেগুলো আট দশ টুকরো হ'য়ে ভাঙ্গা অবস্থায় বেরোয়—তার মধ্যে ভাল ভাল টুকরোগুলো বেছে নিতে হয়।

বড় বড় দূরবীণের জন্ত দুহাত তিনহাত বা তার চাইতেও চওড়া নিখুঁৎ কাঁচের চাক্তির দরকার হয়। সে রকম কাঁচ করবার মত কারিকর পৃথিবীতে খুব কমই আছে।

পৃথিবীর যত বড় বড় দূরবীণ তার প্রায় সমস্তগুলিরই কাঁচ ঢালাই হয় ফ্রান্সের একটিমাত্র



কাঁচ ঢালাই

কারখানায়। সেখানে গরম পাত্রে গরম কাঁচ ঢেলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ আস্তে আস্তে চুল্লী জুড়িয়ে, নানারকম তোয়াজ ক'রে, তারপর কাঁচখানাকে বা'র করা হয়। তবু প্রায়ই দেখা যায় কাঁচ ফেটে চৌচির হ'য়ে আছে। এই রকমে বার বার ঢালাই করে, বারবার ভেঙে যায়। হয়ত বিশ ত্রিশ বার চেষ্টা ক'রে তারপর একখানি নিখুঁৎ কাঁচ বেরোয়। এই জন্তাই সেই কাঁচের এত দাম; এক একখানি কাঁচের জন্ত হয় ত দশ বিশ হাজার বা লাখ দুই লাখ টাকা দাম লেগে যায়! আমেরিকার একটি প্রকাণ্ড দূরবীণের জন্ত সাড়ে পাঁচ হাত চওড়া একখানি কাঁচের দরকার; তার জন্ত

যত টাকাই লাগুক, তারা তা দিতে প্রস্তুত। আজ তেরো বছর ধ'রে সেই কাঁচ ঢালাই করার চেষ্টা চলছে—কিন্তু এই এতদিন পরে সবে সেদিন মাত্র শোনা গেল যে, সে কাঁচ নাকি ঢালাই হ'য়ে আমেরিকায় আসছে। কাঁচখানির গুজন হবে একশ' কুড়ি মণ আর তার দাম নাকি প্রায় দশ লক্ষ টাকা!

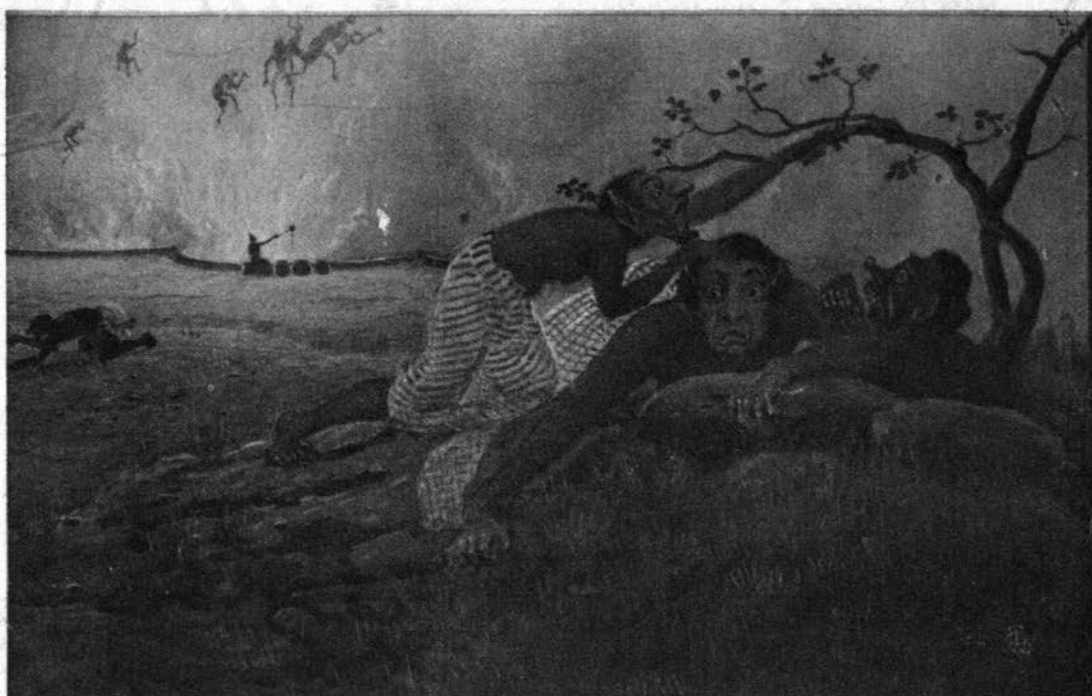
ডান্‌পিটে



বাপ্‌রে! কি ডান্‌পিটে ছেলে!
কোনদিন ফাঁসি যাবে, নয় যাবে জেলে।
একটা সে ভূত হ'য়ে আঠা মেখে মুখে,
ঠাই ঠাই শিশি ভাঙে সেটু দিয়ে ঠুকে।
অনুটা হামা দিয়ে আল্‌মারি চড়ে,
খাটু থেকে রাগ ক'রে ছুন্দাম্‌ পড়ে ॥

—বাপ্‌রে! কি ডান্‌পিটে ছেলে!
শিল্‌নোড়া খেতে চায় দুধভাত ফেলে।
একটার দাঁত নেই মোমবাতি চোষে,
কপ্‌ কপ্‌ মাছি খায় জিভ দিয়ে ঘ'ষে।
আরজন সৈকো-বিষে নীল কালি গুলে
ভাঙাকাঁচ কড়মড় মুখে দেয় তুলে ॥

—বাপ্‌রে! কি ডান্‌পিটে ছেলে!
খুন হ'ত টম্‌খুড়ো ঐ রুটি খেলে।
সন্দেহে শূঁকে খুড়ো মুখে নাহি তোলে,
রেগে তাই ছুই ভাই ফৌস্‌ ফৌস্‌ ফোলে।
নেড়াচুল খাড়া হ'য়ে রাঙা হয় রাগে
'বাপ্‌ বাপ্‌' ব'লে খুড়ো লাফ দিয়ে ভাগে ॥



পরশরের রাক্ষস-যজ্ঞ

(উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী অঙ্কিত চিত্র হইতে)



সপ্তম বর্ষ

আশ্বিন, ১৩২৬

৬ষ্ঠ সংখ্যা

দুই রকম

পড়াশুনায় মন
নাইকো জ্বালাতন
বগড়াঝাটি কান্নাকাটি নেই।

মিষ্টি হাসি খানি
মিষ্টি মুখের বাণী
শান্ত মেয়ে লক্ষ্মী মেয়ে সেই ॥



পড়ার নামে যার
মুখটি অন্ধকার
কথায় কথায় ভাই বোনের মারে।

‘মানবে না যে মানা
বায়না ঘোল আনা
ছুফু বলি দস্তি বলি তারে ॥

শ্রীমুখলতা রাও।

শ্রমন্তক মণি

(বিষ্ণুপুরাণ)

রাজা সত্রাজিতকে সূর্য্যদেব তাঁহার শ্রমন্তক নামক আশ্চর্য্য মণিটি দিয়াছিলেন। সত্রাজিতের ভাই প্রসেন একদিন সেই মণি গলায় পরিয়া বনে শিকার করিতে গেলে পর একটা সিংহ তাঁহাকে মারিয়া মণি লইয়া পলায়ন করে। সেই বনে জাশ্ববান থাকিত। সে সিংহকে মারিয়া মণিটি লইয়া গেল। এদিকে সত্রাজিত প্রচার করিলেন যে, কৃষ্ণই মণির লোভে প্রসেনকে মারিয়া মণি লইয়াছেন। কৃষ্ণ তখন সন্ধান করিতে করিতে জাশ্ববানের নিকট গিয়া মণি উদ্ধার করিলেন এবং তাহা সত্রাজিতকে আনিয়া দিলেন।

মণি পাইয়া সত্রাজিত ভাবিলেন, “তাই ত। আমি ত মিছামিছি কৃষ্ণের নামে দোষ দিয়াছি।” তাঁহার মনে ভারি ভয় হইল। তখন তিনি তাড়াতাড়ি তাঁহার কন্যা সত্যভামার সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ দিয়া তাঁহার সহিত ভাব করিলেন।

পূর্বে অক্রুর, কৃতবর্মা, শতধন্বা প্রভৃতি যাদবগণ এই সত্যভামাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সত্রাজিত তাঁহাদের কাহাকেও কন্যাদান করেন নাই। এখন সেই কন্যা কৃষ্ণকে দান করায়, তাঁহারা বড়ই অপমান বোধ করিলেন। অক্রুর, কৃতবর্মা ও শতধন্বা এই তিনের মধ্যে শতধন্বাই ছিলেন বেশী বলবান। কাজেই অক্রুর ও কৃতবর্মা তাঁহাকে বলিলেন—“সত্রাজিত ভারি ছুষ্ট। আপনাকে তুচ্ছ করিয়া কৃষ্ণকে কন্যাদান করিয়াছে। অতএব ইহাকে শাসন করিয়া শ্রমন্তক মণিটি কাড়িয়া লউন। প্রয়োজন হয় ত, আমরা সকলে আপনার সাহায্য করিব।” শতধন্বা এই কথায় রাজি হইলেন।

এই সময়ে দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে মারিবার জন্ত জতুগৃহ পোড়াইয়া দেয়। এই কথা জানিতে পারিয়া কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে দেখিবার জন্ত বারণাবতে গেলেন। এই সুযোগে শতধন্বা একদিন ঘুমন্ত সত্রাজিতকে মারিয়া মণি চুরি করিল।

এই দারুণ ঘটনার কথা জানিবামাত্র সত্যভামা রথে চড়িয়া বারণাবতে গেলেন এবং কৃষ্ণকে বলিলেন—“পিতা আমায় আপনার নিকট দান করিয়াছেন, তাই ছুষ্ট শতধন্বা তাঁহাকে মারিয়া শ্রমন্তক মণি লইয়া গিয়াছে।” কৃষ্ণ রাগিয়া আগুন

হইলেন এবং বলিলেন—“বটে ! তবেত শতধন্বা আমারই অপমান করিয়াছে ! যাও, তুমি দ্রুত করিও না, আমি এখনই গিয়া শতধন্বাকে সাজা দিতেছি।”

দ্বারকায় ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণ চুপি চুপি বলরামকে বলিলেন—“সিংহের হাতে প্রসেন পূর্ব্বই মারা গিয়াছে, এখন সত্রাজিতকেও শতধন্বা মারিল। কাজেই শ্রমন্তক মণির আর মালিক নাই, এখন সেটা আমাদেরই প্রাপ্য। শীঘ্র চলুন শতধন্বাকে মারিয়া মণিটি উদ্ধার করা যাউক।” বলরাম একথায় তখনই মত দিলেন।

এদিকে এই সংবাদ পাইয়া শতধন্বা কৃতবর্ম্মার নিকট গিয়া সাহায্য চাহিল। কিন্তু কৃষ্ণ ও বলরামের ভয়ে কৃতবর্ম্মা সাহায্য করিতে রাজি হইল না। শতধন্বা অক্রুরের নিকট গেল। অক্রুর বলিলেন—“বলেন কি ! কৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে ঝগড়া করিব ? সমস্ত শ্রুতিবীতে এমন লোক নাই যে তাঁহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে।”

শতধন্বা বিপদে পড়িলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি অক্রুরকে বলিলেন—“যদি সাহায্য করিতে না পারেন তবে একটি উপকার করুন—এই মণিটি আপনার কাছে রাখিয়া দিন।” অক্রুর বলিলেন—“আপনি যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে, মৃত্যুর পূর্ব্ব এই মণির কথা কাহাকেও বলিবেন না, তবেই মণি রাখিতে পারি।” শতধন্বা প্রতিজ্ঞা করিয়া মণিটি তাঁহাকে দিলেন।

শতধন্বার একটা ঘোড়া ছিল অত্যন্ত দ্রুতগামী। কিন্তু সে একশ যোজনের বেশী পথ এক সঙ্গে চলিতে পারিত না। এই ঘোড়ায় চড়িয়া শতধন্বা পলায়ন করিলেন। এদিকে কৃষ্ণ বলরামও চারি ঘোড়ার রথে চড়িয়া শতধন্বাকে তাড়া করিলেন। শতধন্বার ঘোড়া শত যোজন পথ চলিয়াই মথুরার নিকটে এক বনের ধারে মারা গেল ! তখন নিরুপায় শতধন্বা উদ্ধ্বাসে বনের মধ্য দিয়া ছুটিলেন।

ইহা দেখিয়া কৃষ্ণ বলরামকে বলিলেন—“দাদা ! আপনি রথ লইয়া এখানে অপেক্ষা করুন, আমি ঐ দৃষ্টকে মারিয়া এখনই ফিরিয়া আসিতেছি।” বলরাম “তাহাই হউক” বলিয়া রথে বসিয়া রহিলেন।

ক্রোশ দুই পথ ছুটিয়াই কৃষ্ণ শতধন্বাকে দেখিতে পাইলেন। তারপর সুদর্শন চক্র ছাড়িবামাত্র শতধন্বার মাথা কাটিয়া মাটিতে পড়িল ! কৃষ্ণ শতধন্বার শরীরে, কাপড়ের মধ্যে, কত যে খুঁজিলেন, কিন্তু কিছুতেই মণি পাওয়া গেল না। তখন মুখখানি বেজার করিয়া বলরামের নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিলেন—“দাদা ! মিছামিছি শতধন্বাকে মারিলাম, মণিটি তাহার নিকট নাই !”

কৃষ্ণের কথায় বলরাম রাগে গর্জিয়া উঠিলেন—“ধিক্ তোমাকে! তুমি ভারি লোভী—মিথ্যা বলিয়া আমাকে ঠকাইতেছ, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না। যাহা হউক, ভাই বলিয়া তোমাকে ক্ষমা করিলাম বটে, কিন্তু তোমার সঙ্গে আর কোন সংস্রব রাখিব না। এই পথ রহিয়াছে, যেখানে খুসী চলিয়া যাও।” এই বলিয়া রাগের মাথায় তিনি বিদেহপুরীতে জনক রাজার বাড়ী চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনার তিন বছর পরে বজ্র, উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবেরা জানিতে পারিলেন যে, কৃষ্ণ সত্যই সেই মণি নেন নাই। তখন তাঁহারা জনক রাজার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত। তাঁহাদের মুখে সব কথা শুনিয়া বলরামের বিশ্বাস হইল এবং তিনি দ্বারকায় ফিরিয়া আসিলেন।

অক্রুর সেই মণির নিকট হইতে প্রতিদিন রাশি রাশি সোণা পাইতেন। সেই সোণা দিয়া তিনি যাগ যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। বাষট্টি বৎসর পর্য্যন্ত তিনি একদিনও যজ্ঞ করা ছাড়িলেন না। অক্রুর জানিতেন যে, যজ্ঞের দীক্ষিত লোককে মারিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। সুতরাং সর্বদা যজ্ঞ করিয়া দীক্ষিত অবস্থায় থাকিলে কৃষ্ণ তাঁহাকে মারিয়া সেই মণি লইতে পারিবেন না। মণির আশ্চর্য্য গুণে দ্বারকায় দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কোন উৎপাতও হইত না।

একদিন অক্রুরের পক্ষের ভোজেরা বিবাদ করিয়া একজন লোককে মারিয়া ফেলিল। তখন ভয়ে অক্রুরও ভোজগণের সঙ্গে দ্বারকা ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। যেই অক্রুর চলিয়া গেলেন অমনি দ্বারকায় মহামারী, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দেখা দিল। সকলে আশ্চর্য্য হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন—“এক দিনেই এ সব উপদ্রব আরম্ভ হইল কেন? ইহার কারণ খুঁজিয়া দেখা উচিত।”

এ কথায় বৃদ্ধ যাদব অন্ধক বলিলেন—“অক্রুরের পিতা শ্বশুরকে যেখানে যেখানে থাকিতেন সেখানে কোন উপদ্রব থাকিত না। আমি জানি, একবার কাশীতে ভয়ানক অনাবৃষ্টি হয়। তখন কাশীর রাজা শ্বশুরকে তাঁহার রাজধানীতে লইয়া গেলে পর কি যে বৃষ্টি হইল তাহা আর কি বলিব! শ্বশুরের কল্যাণে বৃষ্টি হইয়া কাশীরাজ্য রক্ষা পাইল। তখন পুরস্কার স্বরূপ কাশীরাজ তাঁহার কন্যা গান্ধিনীর সহিত অক্রুরের বিবাহ দিলেন। সাধ্বী রাজকুমারী গান্ধিনী সারা জীবন কেবল ধর্ম্ম কৰ্ম্ম করিয়া কাটাইয়াছেন। এমন পিতা মাতার সন্তান অক্রুর। সুতরাং তিনি

চলিয়া গেলে দেশে ছুভিক্ষ, মড়ক প্রভৃতি উপদ্রব কেনই বা হইবে না? তাই বলি, অত্রুরকে শীঘ্র দেশে ফিরাইয়া আনুন।”

বৃদ্ধ অন্ধকের কথায় অত্রুরকে ফিরাইয়া আনা হইল। অমনি দেখা গেল, সমস্ত উৎপাত যেন মল্লবলে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া কৃষ্ণ ভাবিলেন—“অত্রুর গুণী পিতা মাতার সন্তান, এটা একটা কারণই হইতে পারে না। এই সব মড়ক, ছুভিক্ষ, অনাবৃষ্টি দূর হইবার নিশ্চয়ই অন্য কোন কারণ আছে। শুনিয়াছি, স্মমন্তক মনিরই এই সব গুণ। অত্রুর তেমন কিছু ধনী নয়, সে কি করিয়া প্রতিদিন যজ্ঞ করে? এত ধন সে পায় কোথায়? নিশ্চয় সেই মণিটি তাহার নিকটেই আছে।”

এই ভাবিয়া কৃষ্ণ একদিন যাদবদের ডাকিয়া একটা সভা করিলেন। সভায় সকলের সহিত নানারূপ কথা বার্তা বলিতে বলিতে হঠাৎ তিনি অত্রুরকে বলিলেন—“মহাশয়! আমরা সকলেই জানি, সেই অতি অদ্ভুত মণিটি শতধন্বা আপনার কাছেই রাখিয়াছেন। তা ভালইত, সেটি আপনার কাছেই থাকুক—আমরা সকলেইত তাহার ফলভোগ করিতেছি। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ এই যে, গুণের রত্নটি একবার বলরাম দেখান, তবে তাঁহার সন্দেহ একেবারে দূর হইয়া যাইবে”।

মণিটি জামার নীচে সোণার কোটায় অত্রুরের গলায়ই ছিল। তিনি ভাবিলেন—“এখন যদি ‘নাই’ বলি তবে ইহারা হয়ত খুঁজিয়া বাহির করিবে, সভায় সকলের সাক্ষাতে লজ্জা পাইব।” এই ভাবিয়া অত্রুর কোটাটি বাহির করিয়া মণিটি কৃষ্ণের হাতে দিয়া বলিলেন—“এই সেই স্মমন্তক মণি। শতধন্বা এটি আমার নিকট রাখিয়াছিলেন। এতদিন শুধু ভয়ে ভয়ে কাটাইয়াছি—কখন কে যেন মণিটি কাড়িয়া লয়। এখন আপনাকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।”

স্মমন্তক মণির আলোকে সমস্ত সভা যেন জ্বলিয়া উঠিল। সে আশ্চর্য্য মণি দেখিবামাত্র কৃষ্ণ ভাবিলেন আমি লইব। বলরামেরও ভারি লোভ হইল, তিনিও ভাবিলেন ‘আমি লইব’। আর সত্যভামারও লোভ হইবার কথাই, কারণ মণিটি তাঁহার পিতৃধন। সভাস্থল সকলেই মনে মনে ভাবিতে লাগিল, ‘আমি লইব’ ‘আমি লইব’। কৃষ্ণ দেখিলেন ভারি বিপদ—এই মণির জন্য আবার বুঝি রক্তারক্তি হয়। তখন তিনি বলিলেন—“রত্নের নিয়ম এই যে, সাধু ব্রহ্মচারী লোক

ইহা ধারণ করিলে রাজ্যের উপকার হয়। কিন্তু অশুচি হইয়া ধারণ করিলে যিনি ধারণ করিবেন তাঁহারই মরণ হইবে। সুতরাং দেখিতেছি, আমরা কেহই এই মণি ধারণ করিবার যোগ্য নহি। এই জন্ত, হে সাধু অক্লুর! আমি, বলরাম, সত্যভামা এবং সব যাদবেরা মিলিয়া অনুরোধ করিতেছি যে, আপনিই এই রত্নটি ধারণ করুন। ইহাকে ধারণ করিবার একমাত্র আপনিই সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এখন হইতে এই মহামূল্য স্মমন্তক মণি আপনারই ধন হইল।

শ্রীকুলদ্বারঞ্জন রায়।

মাল পোকা

ভাই সন্দেশ,

তোমার

তোমরা সেদিন যে পোকাটা ধরেছিলে, আর শ্রাবণের “সন্দেশ” যার গায়ের আশ্চর্য্য জোরের কথা লিখেছ, তার বাঙ্গলা নাম কি, আমি তা জানি না। পোকা মাকড়ের নাম বাঙ্গলা ভাষায় অল্পই আছে। চাষক্ষেতের ফসল, বাগানের গাছপালা ফল, আর ভাঁড়ার ঘর বা গুদাম ঘরের চাল ডালের যারা ক্ষতি করে, অথবা যারা আমাদের কানের কাছে ভন ভন করে গায়ে ব’সে বা কামড়িয়ে জ্বালাতন করে, যাদের পরিচয় সর্ব্বদাই রাখতে হয়, এমনধারা কয়েক রকমের কীটপতঙ্গেরই নাম দেওয়া হয়েছে। সে নামও আবার বাঙ্গলা দেশের সব যায়গায় এক নয়।

তোমার এই পোকাটা অনেককে দেখিয়েছিলাম। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এর নাম জানেন না। কেউ কেউ বললেন, ওটা “মাল্পোকা।” যখন নামই নাই তখন চিন্তার জন্ত একটা নামকরণ করে নিলেই হল। খুব ভারি মাল তুলতে পারে, অথবা মাল অর্থাৎ মল্ল বা কুস্তীগিরের মত গায়ে জোর ব’লে, এর নাম “মাল-পোকা” রাখা অসঙ্গত হবে না।

তোমার এই মাল পোকাটার ছটা পা আছে। গায়ে, মাথা বুক পেট, এই তিনটা পৃথক ভাগ আছে। সুতরাং এটা ষট্পদী বা পতঙ্গশ্রেণীর। এর গায়ের উপর সমস্ত পেট যুড়ে শক্ত খোলার মত এক যোড়া পাখা আছে। তার নীচে আর এক যোড়া খুব পাংলা, স্বচ্ছ বড় পাখা আছে। সুতরাং এটা একটা কেঠো পোকা (beetle), “দৃঢ়পত্রী” বর্গের অন্তর্গত।

কেঠো পোকা নানা রকমের হয়। কোন কোন জাতের কেঠো আকারে খুব ছোট হয়, কোন কোন জাতের আবার বেশ বড়ও হয়। কোন কোনটার স্পর্শনী বা শুঙ্গ বা গৌফযোড়া খুব লম্বা হয়, কোন কোনটার গৌফ খুব ছোট হয়। সকলের গৌফই গ্রন্থিল বা গাঁইটযুক্ত হয়। কোন কোন জাতের কেঠো গাছের কচি পাতা ডাঁটা ফল খায়, কোন কোনটা গাছের শক্ত কাঠ খায় ও কাঠে ছিদ্র ক'রে তাতেই কুমিজীবন কাটায়। কোন কোনটা গোবর বিষ্ঠা খায় আর তাতেই বাস করে। কোন কোনটা বীজে শস্তে ফুটো ক'রে শস্ত খায় ও তারই ভিতর কুমিজীবন কাটায়। কোন কোনটা পচা মাংস খায়। কেঠোদের শুঙ্গ বা গৌফের গড়ন, চরণ বা পদতলের গড়ন, ও খাড়াখাছের তফাৎ অনুসারে বংশ বিভাগ করা হয়।

মালপোকায় গৌফজোড়া খুব লম্বা, গা ছাড়িয়ে অনেক দূর যায়। এত লম্বা গৌফ আর কোন বংশের কেঠো পোকায় হয় না। লম্বা গৌফ দেখলেই এদের চেনা যায়। লম্বা গৌফই হচ্ছে এই বংশের কেঠোর বিশেষত্ব। তাই এই বংশের ইংরাজি নাম হয়েছে longicorn অর্থাৎ “লম্বশৃঙ্গ”। আসলে, ও দুটো কিন্তু শিং নয়। ও দুটো ওর স্পর্শ করবার অঙ্গ, স্পর্শনী—ওকে শুঙ্গ বলে। আমরা বলব “দীর্ঘশৃঙ্গী” অর্থাৎ “লম্বা গুঁফো”। এদের গৌফে এগারটা করে গাঁইট বা পাব্ থাকে। এদের পায়ের চরণে, অর্থাৎ উরু আর জংঘার পরের অংশটায়, তিনটা করে পাব্ থাকে। এর মাথাটা বেশ বড়। তার দুপাশে বড় বড় দুটো চোখ আছে, সে চোখ শুঙ্গের বা গৌফের গোড়াটাকে আংটির মত ঘিরে থাকে। এর চোখ অগ্ন্যাগ্ন পতঙ্গের চোখের মত অনেক চোখের সমষ্টি। অণুবীক্ষণ দিয়ে যদি এর চোখ দেখ, তবে মৌচাকের কোষ বা কোর্টারের মত অনেকগুলো ছয়-কোণা চোখ একত্রে রয়েছে দেখতে পাবে। অনেক চোখ একত্রে জোড়া এই রকম চোখকে “সংশ্লিষ্ট চক্ষু” বলে।

এই বংশের পোকা ছুদল আছে। এক দলের পোকায় মুখাগ্র সোজা, মাথার সামনের দিকেই থাকে। আর একদলের মুখটা বেঁকে মাথার নীচে চলে গিয়েছে, তাই উপর দিক থেকে মুখটা দেখতে পাওয়া যায় না। বোধ হয় যেন মুখটা কাটা, বা মাথাটা হঠাৎ শেষ হ'য়ে গিয়েছে। তোমার এই মালপোকাটা এই দলের। দুই দলের সকলেরই মুখে সাঁড়াশির মত বাঁকা শক্ত ছুঁচল ঠোঁট বা দংশনোষ্ঠ থাকে। এই শক্ত ধারাল ঠোঁট দিয়ে এরা খাড়া সামগ্রী কেটে বা কুরে নিয়ে খায়। তোমার এ পোকাটাকে যদি চিং করে ফেল তবে ওর মুখ

আর দংশনোষ্ঠ দেখতে পাবে। যে দলের মুখাগ্র সোজা থাকে তাদের দংশনোষ্ঠ সকল দিক থেকেই দেখা যায়। এই দলের কোন কোন মালপোকার শক্ত ঠোঁট খুব লম্বা আর দাঁতাল হয়। এর বৃকের প্রথম অংশটা, যাকে পুরোবক্ষ বলে, সেটা বেশ বড়, আর উপরের স্বক বা খোলাটা খুব শক্ত, আর তাতে উঁচু উঁচু ছুচল ঢিবলি আছে।

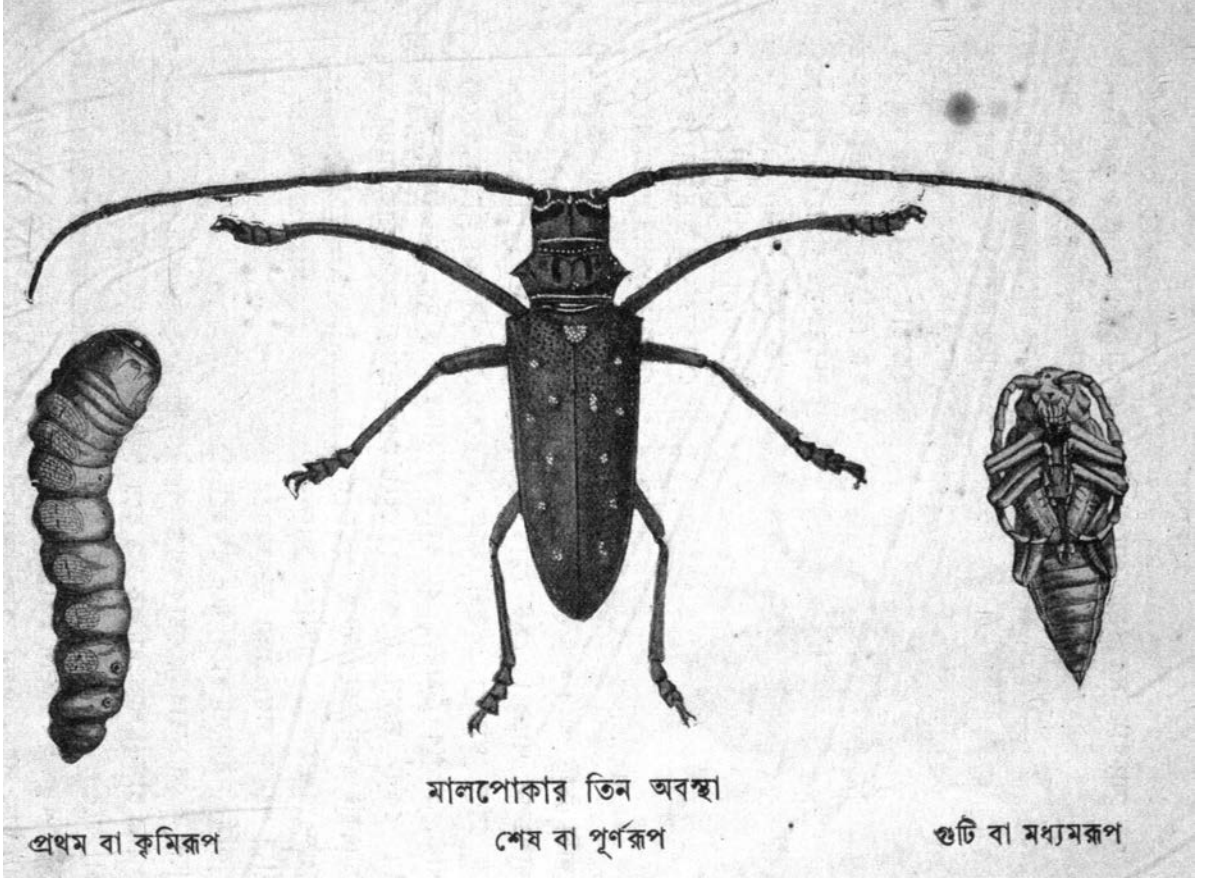
এর গৌফ ধরে ঝোলালে বা টানলে এক রকম কির্ কির্ বা চিঁচি শব্দ হয়। এ শব্দ পোকার মুখ দিয়ে বেরোয় না। কোন পোকাই আমাদের মত মুখ দিয়ে শব্দ করতে পারে না, মুখ দিয়ে নিশ্বাস টানতে বা ফেলতে পারে না। পোকারা কি ক'রে নিশ্বাস নেয় সে কথা আগেই ব'লেছি (শ্রাবণের “সন্দেশ”)।

তবে মালপোকারা শব্দ করে কি ক'রে? বৃকের যে প্রথম আর দ্বিতীয় ভাগ, পুরোবক্ষ আর মধ্যবক্ষ, এই দুটোতে কিনারায় কিনারায় ঘষা লেগে এই শব্দ বেরোয়। ঘাড় নাড়লে বা উঁচু নীচু করলে বৃকের প্রথম খোলাটার নীচের ধার মাঝের খোলাটার উপর ধারের সঙ্গে ঘষা লেগে তা হ'তে শব্দ হয়। তোমরা নখে নখে ঘ'ষে যেমন শব্দ কর এই পোকার ঐ কির্কির্ বা চিঁচি শব্দ সেই রকমে উৎপন্ন হয়।

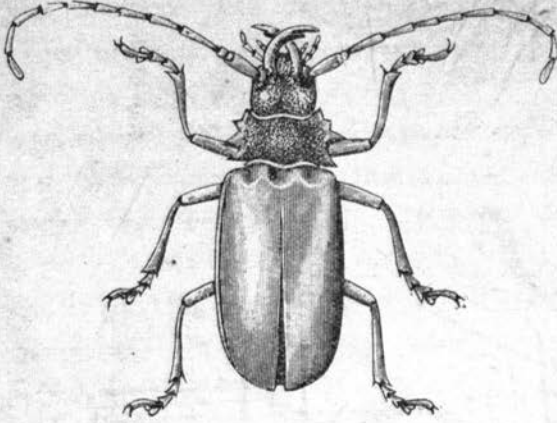
পণ্ডিতেরা শুদ্ধ ভাষায় এই বংশের নাম রেখেছেন “সেরাসিসিডি”। পৃথিবীর সব দেশের সব ভাষায় এই নাম চলে গিয়েছে।

সকল জাতের লম্বাগুঁফো কেঠো পোকার স্বভাব প্রকৃতি, জন্ম প্রকরণ বা রূপান্তর প্রায় একই রকমের। এরা সকলেই নিরামিষাশী, উদ্ভিদভোজী। এদের অনেক জাতি আছে। কোন কোন জাতি খুব ছোট হয়, তারা ছোট ছোট গাছের ছাল ও কচি ডাঁটা বা নরম কাঠ খেয়ে বাঁচে। কোন কোন জাতি খুব বড় বড় হয়, তারা আম বাবলা, শাল, বট অশ্বথ প্রভৃতি বড় বড় গাছের শক্ত কাঠ খেয়ে বাঁচে। এরা বনে জঙ্গলেই বেশী থাকে, কৃষকের চাষক্ষেতের বড় একটা অনিষ্ট করে না। কখন কখন ফলবাগানের কমলা লেবুর গাছ, আম গাছ, ডালিম গাছ, তুঁত গাছের ডাল ফুঁটো করে বাঁঝরা করে দেয়।

এই পোকা যখন পাখা ধরে তখন ডিম পাড়বার জন্ত সুবিধামত গাছের ডাল খুঁজে বেড়ায়। এক এক জাতির কেঠো এক এক জাতের গাছ পছন্দ করে। যে-সে গাছে ডিম পাড়ে না। গাছের শুকনো ছালের ফাটলে বা বাঁশে ডিম

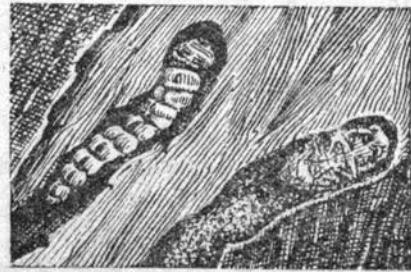


পাড়ে। এক যায়গায় সব ডিম পাড়ে না। একটা পোকা এক গাছে নানা



যায়গায় ডিম পাড়ে, অথবা এক গাছে কতগুলি অন্য গাছে কতগুলি, এই ভাবে ডিম পাড়ে। তোমার ওই জাতের কেঠোর ডিম মটরের মত বড় হয়, ডিমের আকারটা হাঁসের ডিমের মত লম্বাটে। সে ডিম শক্ত নয়, নরম। কিছু দিন পরে সে ডিম ফুটে শুঁয়ো পোকাকার মত কুমি বাহির হয়। সে কুমির গায়ে শুঁয়ো বা রোম হয় না। তার পা ও থাকে

না। মাথাটা ছোট আর শক্ত হয় আর মুখে শাঁড়াসির মত বাঁকা শক্ত আর ধারাল ঠোঁট বা দংশনোষ্ঠ থাকে। সেই ঠোঁট দাঁতের কাজ করে, তা দিয়ে কুমিটা কাঠ কুরে কুরে খেতে থাকে। বুকটা ফোলা, উদরের অংশটা লম্বা আর আগাগোড়া সমান মোটা, গা খুব কোমল, রং হলুদে বা সাদা। কুমিরা চলে ফিরে বেড়াতে পারে না। কেবল সম্মুখ দিকে কাঠ খেয়ে খেয়ে সুড়ঙ্গ করে, আর গায়ের চাড় দিয়ে দিয়ে একটু একটু করে সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে এগুতে থাকে। এইরূপে গাছের ডালের কাঠে অনেক লম্বা লম্বা সুড়ঙ্গ করে ফেলে। কুমির নরম গা কাঠে ঘষে ঘা হয়ে যেতে পারে ব'লে, তার প্রত্যেক খণ্ড বা পর্বের উপরের চামড়া শক্ত ঢালের মত হয়ে শরীর রক্ষা করে। ছোট কুমি খেয়ে খেয়ে যখন একটু বড় হয় তখন তার গায়ের চামড়ায় খুব টান পড়ে, তখন কুমি খোলস বদলায়। এই রূপে কয়েকবার খোলস বদলাবার পর, তার কুমি অবস্থার শেষ



কাঠের মধ্যে মালপোকাকার কুমি ও কোষ।

হয়ে আসে। তখন সে কাঠের ভিতরের সুড়ঙ্গটাকে কেটে কেটে গাছের ছাল পর্যন্ত নিয়ে আসে। তার পর সেই সুড়ঙ্গের মাথার আর লেজের দিকটার পথ বন্ধ করে দেয়। আর কাঠের গুঁড়ো কুচি আর নিজের লাল। আর বিষ্ঠা দিয়ে গায়ের চারিদিকে একটা কোষ বা খোল করে নিজেকে তার মধ্যে বন্দী করে ফেলে।



পতঙ্গের মুখ।—১। ঝাঁঝপোকা, ফুঁটো ক'রে খায়। ২। মালপোকা, কেটে বা কুরে খায়। ৩। প্রজাপতি, চুষে খায়।

সেই কোষের মধ্যে জড়পিণ্ডের মত নিশ্চল পড়ে থাকে। এই গুটি বা কোষ অবস্থায় তিন চার মাস বা তার বেশীও কেটে যায়। এই সময়ের মধ্যে তার ভবিষ্যৎ রূপের সমস্ত অবয়ব, ছ'টা পা, পাখা, লম্বা গৌফ প্রভৃতি তৈরী হয়। শেষ পতঙ্গ রূপ পূর্ণ হলে পর সেই কোষটা কেটে কেঠো পোকা বেরিয়ে আসে। এদের জীবনে আহারের কার্যটা কৃমি

অবস্থাতেই ভাল রকম হয়। এই অবস্থাতেই গাছের ক্ষতি করে। পতঙ্গ-রূপ পেলে পর আর গাছ কেটে সুড়ঙ্গ করে না।

পতঙ্গ অবস্থায় এরা বেশী দিন বাঁচে না। কেবল কোথায় কি ভাবে ডিম পাড়লে তার সন্তানেরা ভাল খেতে পাবে আর নিরাপদে থাকবে, সেই সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। তারপর সুযোগ বুঝে সুবিধামত যায়গায় ডিম পাড়া হয়ে গেলে পর অল্প কালেই পতঙ্গটা মরে যায়। তার কপালে নিজের সন্তানদের চোখে দেখাও ঘটে না, লালন পালন ত দূরের কথা।

কেঠো পোকাদের শক্ত পাখাযোড়া উড়বার সময়ে কাজে লাগে না। তারা ওড়ে নীচের পাংলা পাখা নেড়ে। উড়বার সময়ে উপরের খোলার মত পাখাযোড়া পিঠ থেকে একটু আলগা করে তুলে ধ'রে নীচের পাংলা পাখা ছুটো বের ক'রে মেলে দেয়, আর সেই ছুটো নেড়ে উড়ে যায়। উপরের পাখা যোড়া নিশ্চল থাকে। মালপোকার পাগুলি বেশ বড় বড় আর জোরাল। এরা হেঁটে চলতে বেশ পারে। অল্প দূর যেতে হলে কি গাছের ডালে চড়তে হলে পা দিয়ে চলে। সহজে উড়তে চায় না। কিন্তু দরকার হলে উড়ে যায়। ইতি

তোমাদের মেজদাদামশাই।

ঐদ্বিজেননাথ বসু।

পাকা ফলার

পুরাতন লেখা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত



ড়াগাঁয়ে এক ফলারে বামুন ছিল। তাহাকে যাহারা নিমন্ত্রণ করিত, তাহারা সকলেই খুব গরীব; দৈ চিড়ের বেশী কিছু খাইতে দিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না।

ব্রাহ্মণ শুনিয়াছিল যে, দৈ চিড়ের ফলারের চাইতে পাকা ফলারটা ঢের ভাল। সুতরাং এর পর যে ফলারের নিমন্ত্রণ করিতে আসিল, তাহাকে সে বলিল যে, “পাকা ফলার খাওয়াতে হবে।” সে বেচারার গরীব লোক, পাকা ফলার সে কোথা হইতে দিবে? তাই সে বিনয় করিয়া বলিল, “মশাই, পাকা ফলার দেওয়া কি যার তার কাজ? রাজা রাজ্জড়া হ’লে তবে পাকা ফলার দিতে পারে।” এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিল, “তবে, রাজা যেখানে থাকে, সেইখানে গিয়ে আমি পাকা ফলার খাব।”

ব্রাহ্মণ পাকা ফলার খাইবার জন্ত রাজার বাড়ী চলিয়াছে। পথে যাহাকে দেখে, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করে, “হ্যাঁগা, রাজার বাড়ীতে কোন্ খান্টায়?” একজন তাহাকে রাজার বাড়ী দেখাইয়া বলিল, “ঐ যে পাকা বাড়ী দেখ্‌চো, ঐটে রাজার বাড়ী।”

ব্রাহ্মণ “পাকা ফলার” যেমন খাইয়াছে, “পাকা বাড়ীও” তেমনি দেখিয়াছে। সুতরাং “পাকা বাড়ীর” কথা শুনিয়া সে ভারি

আশ্চর্য্য হইয়া রাজার বাড়ীর দিকে তাকাইল। সে দেশের সব লোকেরই কুঁড়ে



ঘর; খালি রাজার একটি সুন্দর পাকা বাড়ী ছিল। রাজার বাড়ী দেখিয়া ব্রাহ্মণের মুখে লাল পড়িতে লাগিল। সে গদগদ স্বরে বলিল, “পাকা বাড়ী! আহা! পাকা বাড়ীই বটে! না হবে কেন? সে যে রাজা, তাই সে অমন বাড়ীতে থাকে। ওটা তয়ের করতে না জানি কত ক্ষীর, ছানা আর চিনি লেগেছিল!”

এই মনে করিয়া ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি গিয়া রাজার বাড়ীর একটা কোণে কামড়াইয়া ধরিল; আবার তখনই “উঃ--হঃ--হঃ” করিয়া কামড় ছাড়িয়া দিল।

তারপর সে ভাবিতে লাগিল, “তাইত, এই পাকা ফলারের এত নাম!” আর খানিক

ভাবিয়া সে বলিল, “ওঃহো! বুঝেছি। নারকেলের মতন আর কি! ওটা

ওর খোলা ; আসল জিনিষটা ভিতরে আছে !” এই বলিয়া সে আগের চাইতে দ্বিগুণ উৎসাহে কামড়াইতে আরম্ভ করিল। তাহার দুইটা দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল, তাহাতেও গ্রাহ্য নাই। কামড়াইতে কামড়াইতে সে সেই কোণের অনেকখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, আর মনে করিতেছে যে, “আর বেশী দেবী নাই ; এর পরই পাকা ফলার আসবে !” এমন সময় কোথা হইতে মস্ত পাগড়ীওয়ালা এক দরোয়ান আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। “আরে ঠাকুর, ক্যা কর্তে হো ? মহারাজকে ইমারৎ খা ডালতে হো ? চলো তুম্ হমারে সাথ !” এই বলিয়া দরোয়ান তাহাকে রাজার নিকট লইয়া চলিল।

দারোয়ানের কাছে সকল কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, “কি ঠাকুর, ওখানে কি কর্ছিলে ?” ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, “মহারাজ ! আমি পাকা ফলার খাচ্ছিলুম। খোলাটা না ভাঙ্তে ভাঙ্তেই এই বেটা দরোয়ান আমাকে ধরে এনেছে !”

এই কথা শুনিয়া রাজা মহাশয় হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন, আর বেশ বুদ্ধিতে পারিলেন যে, ঠাকুরের পেটে অনেক বুদ্ধি ! যাহা হউক, তাহার সাদাসিদে কথাগুলি রাজার বেশ ভাল লাগিল। সুতরাং তিনি হুকুম দিলেন যে,—“এই ব্রাহ্মণকে পেট ভরিয়া পাকা ফলার খাইবার মত ময়দা, ঘী আর মিঠাই দাও।”

ব্রাহ্মণ মনের সুখে রাজাকে আশীর্বাদ করিতে করিতে ময়দা, ঘী আর মিঠাই লইয়া ঘরে ফিরিল। আসিবার সময় বলিয়া আসিল যে, পাকা ফলার খাইয়া আবার রাজা মহাশয়কে আশীর্বাদ করিতে আসিব।

পরদিন সকালে রাজা মহাশয়, মুখ হাত ধুইয়া সভায় আসিয়াই সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি ঠাকুর, কাল পাকা ফলার খেলে কেমন ?” ব্রাহ্মণ বলিল, “মহারাজ, অতি চমৎকার খেয়েছি ! পাকা ফলার কি আর মন্দ হ’তে পারে ? গুঁড়োগুলো আগে গলায় বড্ড আটকাছিল। জল দিয়ে গুলে নিতে শেষে তরল হ’ল ; কিন্তু অর্ধেক খেতে না খেতেই বমি হ’য়ে গেল !”

ময়দা আর ঘী দিয়া যে লুচি তয়ের করিতে হয়, ব্রাহ্মণ বেচারী তাহা জানিত না। কাজেই সে ঐ কাঁচা ময়দাগুলিকেই ঘী আর মেঠাই দিয়া মাখিয়া খাইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছে। সহজে তরল হয় না দেখিয়া, আবার তাহার সঙ্গে জল মিশাইয়াছে। খাইতে তাহার খুব ভালই লাগিয়াছিল ; তবে, পেটে রহিল না, এই যা দুঃখ !

রাজা দেখিলেন, লুচি নিজে তয়ের করিয়া খাইতে হইলে আর ব্রাহ্মণের ভাগ্যে পাকা ফলার ঘটিতেছে না। সুতরাং তিনি তাহার রসুয়ে বামনদের একজনকে ডাকাইয়া বলিলেন, “এখান থেকে ময়দা, ঘী নিয়ে, তোমার বাড়ীতে লুচি তয়ের ক’রে, এই ঠাকুরকে পেট ভ’রে পাকা ফলার খাইয়ে দাও।”

রসুয়ে বামন ফলারে বামনকে তাহার বাড়ী দেখাইয়া বলিল যে, “আমি খাবার তয়ের ক’রে রাখবো, বিকালে আপনি এসে খাবেন। আমি বাড়ী থাকব না, আমার ছেলে আপনাকে খেতে দেবে এখন।” ব্রাহ্মণ রাজি হইয়া বাড়ী গিয়া বিকাল বেলার জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল।

রসুয়ে বামনের সেই ছেলেটা ভাল লোক ছিল না; একটা চোরের সঙ্গে তাহার বন্ধুতা ছিল। রসুয়ে বামন ফলারে বামনের জন্ত লুচি, সন্দেশ ইত্যাদি তয়ের করিয়া তাহার ছেলেকে বলিল, “সেই লোকটি এলে তাকে বেশ করে’ খাওয়াস্!” তাহার ছেলে বলিল, “তার জন্তে কিছু চিন্তা ক’র না, আমি তাকে খুব যত্ন ক’রে খাওয়াব এখন।” রসুয়ে বামন রাজবাড়ীতে রান্না করিতে চলিয়া গেল, আর তাহার ছেলে ফলারে বামনের খাবারের আয়োজনে মন দিল। ছু-সেরের বেশী লুচি আর তাহার মত তরকারী মিঠাই ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়াছিল। খান চারেক লুচি আর খানিকটা তরকারী ফলারে বামনের জন্ত রাখিয়া, আর সমস্ত সেই হতভাগা তাহার সেই বন্ধু আর নিজের জন্ত রাখিয়া দিল। ফলারে বামন আসিলে পর সে সেই চারখানা লুচি তাহাকে খাইতে দিল। সে বেচারা জন্মেও লুচি খায় নাই, তাহাতে আবার এমন চমৎকার লুচি—রাজার বামন ঠাকুর যাহা তয়ের করিয়াছে! এমন জিনিস ছ’চারখানি মাত্র খাইয়া তাহার পেট ত ভরিলই না, বরং তাহার ক্ষুধা বাড়িয়া গেল। সে খালি দুঃখ করিতে লাগিল, “আহা! আর যদি খানকতক দিত!”

রসুয়ে বামনের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ফলারে বামন রাস্তা দিয়া চলিল। তাহার মনের দুঃখ রাখিবার আর জায়গা দেখিতেছে না! চলে, আর খালি বলে, “আহা! আর যদি খান কতক দিত!”

এমন সময় হইয়াছে কি, রাজার প্রধান ভাণ্ডারী সেই রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। সে নিজের হাতে সেদিন সকাল বেলায় ঐ ফলারে বামনের জন্ত পুরো ছ’সের ময়দা আর তাহার মতন অল্প সব জিনিস মাপিয়া দিয়াছে। ফলারে বামনের মুখে ঐ কথা শুনিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, “কি ঠাকুর মশাই! কি যদি আর খান কতক দিত?”

ফলারে বামুন বলিল, “বাবা, আমি পাকা ফলারের কথা বলছি। রাজা মশাই চিরজীবী হউন, আমাকে এমন জিনিস খাইয়েছেন! খালি... যদি আর খান কতক হ’ত!”

ভাণ্ডারী জিজ্ঞাসা করিল, “আপনাকে ক’খানা দিয়েছিল?” ফলারে বামুন বলিল, “চারিখানি পাকা ফলার আমাকে দিয়েছিল।” ভাণ্ডারী সবই বুঝিতে পারিয়া বলিল—“সে কি ঠাকুর মশাই! ছ’সের ময়দা দিয়েছি, তা’তে কি মোটে চারখানা লুচি হয়?” ব্রাহ্মণ বলিল,—“হাঁ বাপু, চারখানাই ছিল, আর তা খেতে খুব চমৎকার লেগেছিল।” ভাণ্ডারী বলিল,—“ছ’সের ময়দায় তার চাইতে ঢের বেশী লুচি হয়। আমার বোধ হচ্ছে, ঐ রসুয়ে বামুনের ছেলেটা বাকি লুচিগুলো মাচায় তুলে রেখেছে। আপনি আবার যান। এবারে গিয়ে একেবারে মাচায় উঠবেন; দেখবেন আপনার লুচি সেখানে আছে।” ব্রাহ্মণ বলিল,—“তাই না কি? বাপু, তুমি বেঁচে থাক। হতভাগা বে্লিক, বাঁদর, সয়তান, পাজি—” বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ সেই রসুয়ে বামুনের বাড়ীর পানে ছুটিল। গালি গুলি অবশ্য ভাণ্ডারীকে দেয় নাই— রসুয়ে বামুনের ছেলেকেই দিয়াছিল।

রসুয়ে বামুনের ছেলে ফলারে বামুনকে চারিখানি লুচি খাওয়াইয়া বিদায় করিয়াই, তাহার সেই চোর বন্ধুর কাছে গিয়াছিল। সেখানে গিয়া সে চোরকে বলিল,—“বন্ধু, ঢের লুচি তয়ের ক’রে মাচার উপর রেখে এসেছি। তুমি শীঘ্রি যাপ; আমিও এই বাজার থেকে একটা জিনিস নিয়ে এখনি আসছি।”

চোর, রসুয়ে বামুনের মাচার উপর উঠিয়া, সবে লুচির ঢাকনা খুলিতে যাইবে, এমন সময় ফলারে বামুন আসিয়া উপস্থিত। এবারে আর কথাবার্তা নাই, একেবারে মাচায় গিয়া উঠিল। চোর মুন্সিলে পড়িল। লুকাইবারও স্থান নাই, পলাইবারও পথ নাই, এখন সে যায় কোথায়? শেষটা আর কি করে, মাচার কোণে একটা কাঠের থাম জড়াইয়া কোন রকমে বেমালুম্ হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। একে সন্ধ্যাকাল, তাহাতে আবার ফলারে বামুন নিতান্তই সাদা সিঁধে লোক, লুচি খাইবার জন্ত তাহার মনটা যারপরনাই ব্যস্ত রহিয়াছে। সুতরাং চোরকে সে দেখিতে পাইল না। ফলারে বামুন সামনে লুচি, সন্দেশ, তরকারি, মিঠাই সাজান দেখিয়াই খাইতে বসিয়া গেল। পেটে যত ধরিল, তত সে খাইল; আর একটি হজ্জিমগুলির স্থানও নাই।

এমন সময়ে ভারি একটা মজা হইল। রসুয়ে বামুনের ছেলেও বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, আর ঠিক সেই সময় রসুয়ে বামুনও আসিয়াছে। অল্প দিন সে প্রায় ছপুৰ রাত্ৰের পূৰ্বে ফিরে না, কিন্তু সেদিন সে ছুলিয়া একটা ঝাঁজরা ফেলিয়া গিয়াছিল, সেটার ভারি দরকার। ছেলে আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“বাবা, তুমি এখনি ফিরে এলে যে?” রসুয়ে বামুন বলিল,—“ঝাঁজরা ফেলে গি'ছলুম, তাই নিতে এসেছি।”

এতক্ষণে ফলারে বামুনের পেট এত বোঝাই হইয়াছে যে, আর একটু হইলেই তাহার দম আটকায়। পিপাসায় গলা শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেখানে জল নাই। সে “জল, জল” বলিয়া চাঁচাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ভাল করিয়া কথা ফুটিল না।

রসুয়ে বামুন তাহার ছেলেকে বলিল,—“ওটা কি রে?” ছেলে দেখিল ভারি মুগ্ধিল। সে ফলারে বামুনের কথা ত আর জানিত না; কাজেই সে মনে করিয়াছে যে ওটা তাহার বন্ধু, গলায় সন্দেশ আটকাইয়া অমন বিস্ত্রী স্বরে জল চাহিতেছে। বন্ধুর খবরটা বাপকে দিলে সে আর বন্ধুর হাড় আস্ত রাখবে না; আর কিছু না বলিলেও হয়ত এখনই মাচায় উঠিয়া দেখিবে। এমন সময় হঠাৎ তাহার বুদ্ধি যোগাইল—সে বলিল, “বাবা ওটা নিশ্চয় ভূত। তা নইলে মাচার উপর থেকে অমন বিস্ত্রী আওয়াজ দেবে কেন?”

ভূতের কথা শুনিয়া রসুয়ে বামুন কাঁপিতে লাগিল। আরও মুগ্ধিলের কথা এই যে, ভূতটা জল চাহিতেছে। তাহার কাছে জল লইয়া যাইতে কিছুতেই ভরসা হইতেছে না, অথচ জল না পাইলে সে নিশ্চয় ভয়ানক চটিয়া যাইবে। তারপর সে কি করে তাহার ঠিক কি? ছেলের ভারি ইচ্ছা, সে ভূতকে জল দিয়া আসে। কিন্তু রসুয়ে বামুন বলিল,—“তা হবে না; যদি তোর ঘাড় ভেঙ্গে দেয়!” এই সময়ে তাহার মনে হইল যে, মাচার উপর কয়েকটা নার্কেল ছাড়ান আছে; সুতরাং সে ভূতকে বলিল,—“মাচায় নার্কেল আছে; থামে আছড়ে ভেঙ্গে খাও।”

ফলারে বামুনের হাতের কাছেই নার্কেল গুলি ছিল; সে তাহার একটা হাতে লইয়া থামে আছড়াইয়া ভাঙিতে গেল। সেই থাম জড়াইয়া চোর দাঁড়াইয়াছিল; ব্রাহ্মণ পিপাসার চোটে থাম মনে করিয়া সেই চোরের মাথাতেই নার্কেল আছড়াইয়া বসিয়াছে—একেবারে মাথা ফাটাইয়া ফেলিবার যোগাড় আর কি!

এর পর একটা মস্ত গোলমাল হইল। নার্কেলের বাড়ি খাইয়া চোর ভয়ানক চাঁচাইয়া উঠিল; আর তাহাতে ভয়ানক চম্কাইয়া গিয়া ব্রাহ্মণও হাউ মাউ করিতে লাগিল। গোলমাল শুনিয়া পাড়ার সমস্ত লোক সেখানে আসিয়া জড় হইল। আসল কথাটা জানিতে এর পর আর বেশী দেরী হইল না। চোর ধরা পড়িল; আর রশ্ময়ে বামুন তাহার ছেলেকে সেই বাঁজরা দিয়া এমনি ঠেঙ্গান ঠেঙ্গাইল যে, কি বলিব!

তুরসুম বাহাদুর

(রাজপুত কাহিনী)

মণ্ডরায়লের হিন্দু কেল্লার সম্মুখেই মুসলমানদের মসজিদ। কেল্লার মধ্যে এক সমাধি আছে, লোকে বলে তাহা “তুরসুম বাহাদুরের” সমাধি। মসজিদের মধ্যে কবর, তাহাও নাকি “তুরসুম বাহাদুরের”ই কবর। একই লোকের দুই স্থানে এই দুই রকম দেহরক্ষা সম্বন্ধে একটি কাহিনী সেখানে প্রচলিত আছে।—

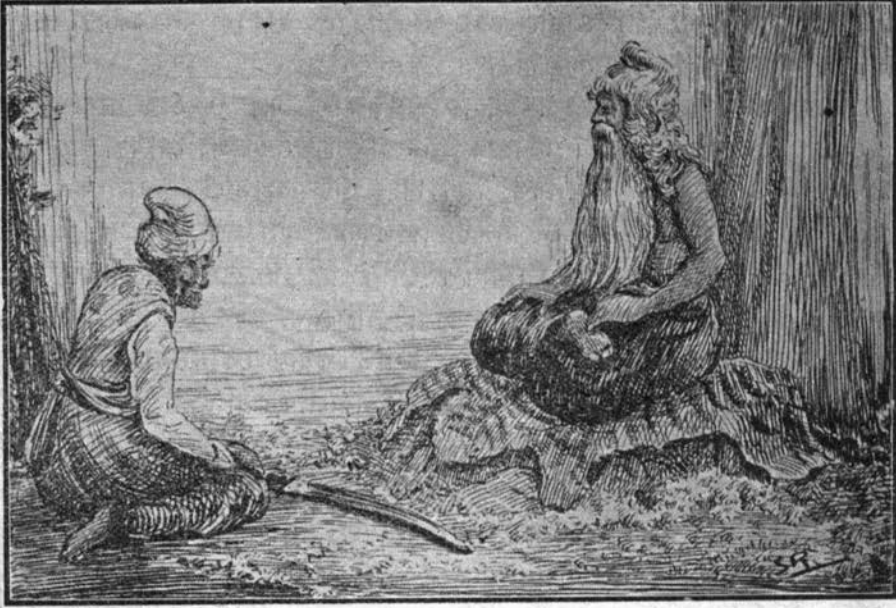
যহু বংশীয় মহারাজা চন্দ্রসেন ঋষিভুল্য লোক ছিলেন। উটগিরের অরণ্যে বসিয়া তিনি সর্বদা ঈশ্বর ভজনায় রত থাকিতেন। লোকে বলিত তিনি বাক্‌সিদ্ধ— তাঁহার কথার কোন অশ্রুতা হয় না। তাঁহার পৌত্র তুরসম সিংহ যেমন বীর, তেমনি ধার্মিক ছিলেন।

দিল্লীর বাদসাহ দেওগিরি দৌলতাবাদ লইয়া মহা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। দৌলতাবাদের রাজা কয়েক বৎসর ধরিয়া বাদসাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছেন। বাদসাহ দিল্লী হইতে যত সৈন্য পাঠাইতেছেন দৌলতাবাদের রাজা তাদের মারিয়া শেষ করিতেছেন। দেওগিরির নামে এখন বাদসাহ সৈন্য ভয় পায়।

হুশিচিন্তায় ও অপমানে বাদসাহের আহার নিদ্রা প্রায় বন্ধ হইয়াছে। তিনি ভাবিতেছেন, “হায়! আর ত লজ্জায় কোথাও মুখ দেখাইতে পারি না।” এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কখন তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যেন এক জটাজুট-ধারী সাধু পুরুষ তাঁহাকে বলিতেছেন “উটগিরের জঙ্গলে চন্দ্রসেনকে গিয়া ধর; তিনি নিজ পৌত্র তুরসম সিংহকে পাঠাইয়া দিলেই তোর জয় হইবে।”

বাদসাহের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি আর বিলম্ব না করিয়া হুচারজন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত গোপনে উটগিরেব জঙ্গলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন

এক অতি দীর্ঘকায় পুরুষ ধ্যানে মগ্ন। শরীরের রং যেন ঠিক সোণার মত উজ্জ্বল।



সাদা চুল জটা বাঁধিয়া নামিতেছে। সাদা দাড়িতে বুক ঢাকিয়া গিয়াছে। সাদা
জু চোখের পাতা পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বয়স এক শতেরও অধিক হইবে,
কিন্তু শরীর কোথাও ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। সমস্ত্রমে বাদসাহ নিস্তব্ধ ভাবে তথায়
বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে চন্দ্রসেনের ধ্যানভঙ্গ হইল। বাদসাহ তখন
নিজ পরিচয় দিয়া তাঁহার আসিবার কারণ বলিলেন। বাদসাহকে বিপন্ন ও
শরণাগত দেখিয়া চন্দ্রসেনের মনে দয়া হইল। তিনি উটগিরের কেল্লা হইতে পৌত্র
তুরসুম সিংহকে আনাইয়া বাদসাহের সঙ্গে দিয়া দিলেন।

বাদসাহ মহানন্দে তুরসুম সিংহকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী আসিলেন এবং পঞ্চাশ
হাজার সৈন্যের সেনাপতি করিয়া তাঁহাকে দেওগিরের দিকে পাঠাইয়া দিলেন।
তুরসুম সিংহের সাহস ও বীরত্ব দেখিয়া বাদসাহী সৈন্য উৎসাহিত হইল এবং দ্বিগুণ
তেজে যুদ্ধ করিতে লাগিল। এক সপ্তাহের মধ্যে দেওগিরের কেল্লা দখল করিয়া

বিজয়োল্লাসে তাহারা তুরসুম সিংহের ও বাদসাহের জয়ধ্বনি করিতে করিতে দিল্লীতে ফিরিয়া চলিল। বাদসাহ মহাসমারোহে এক বৃহৎ দরবার করিয়া তুরসুম সিংহকে “বাহাদুর” উপাধি দান করিলেন, এবং তাঁহাকে পাঁচ-হাজারী মনসব দিয়া দিল্লীর ওমরাহ বলিয়া স্বীকার করিলেন।

তুরসুম বাহাদুর বাদসাহের অনুরোধে কিছুকাল দিল্লী নগরেই বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পদোন্নতি ও তাঁহার উপর বাদসাহের অনুগ্রহ দেখিয়া অনেকের গাত্রদাহ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ তাঁহার প্রতি বাদসাহের শ্রালকের মহা কোপ। তিনি তাঁহার বিপক্ষে এক দল বাঁধিয়া ফেলিলেন।

একদিন বাদসাহের দরবারে নানারূপ খোস গল্প হইতেছে এমন সময় শ্রালক মহাশয় তুরসুম বাহাদুরের উপর কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, “একটা যুদ্ধে জয় পরাজয় কেবল অদৃষ্টের কথা। আসলে উহাতে জয়লাভ করায় কোন বাহাদুরী নাই। বাহাদুরী বুঝা যায় কেবল দ্বন্দ্ব যুদ্ধে।” কাহার উপর শ্লেষ করা হইল বাদসাহ তাহা বুঝিতে পারিয়া তুরসুমকে বলিলেন—“বীর বাহাদুর! দ্বন্দ্ব যুদ্ধে একবার নিজ বাহাদুরী দেখাইতে পার?” তুরসুম কর জোড়ে বলিলেন “জাঁহাপনা! হুকুম হইলে তুরসুম তাহাতে সর্বদাই প্রস্তুত।” বাদসাহ বলিলেন, “তুমিই বল, দ্বন্দ্ব যুদ্ধে কিরূপে বিক্রম দেখাইতে চাও?”

তুরসুম বলিল, “একটা ছমুখো বর্ষা প্রস্তুত করান হউক। একজন লোক সেই বর্ষাটার মাঝখানে ধরিয়া রাখুক। আমি এবং আমার সহিত যিনি বল পরীক্ষা করিতে চাহেন তিনি, দুই জনে বর্ষার দুই দিকে দাঁড়াইয়া নিজ পেটের মধ্যে বর্ষার ফলা ঠেকাইয়া অগ্রসর হইতে থাকিব। অগ্রসর হইতে গেলেই পেটের মধ্যে বর্ষার ফলা চুকিয়া যাইবে। তাহা অগ্রাহ্য করিয়া যে আগে অপরের লাগাল পাইয়া তাহার মাথা কাটিতে পারিবে সেই প্রকৃত বাহাদুর।” বাদসাহ বলিলেন “বেশ কথা। তাহা হইলে কালই তোমার সহিত আমার শ্রালকের বাহাদুরী পরীক্ষা করা হইবে।” শুনিয়া শ্রালকের মুখ শুখাইয়া গেল। তিনি কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া সম্মতি দিলেন।

পর দিন যথা সময়ে তুরসুম বাহাদুর একটি মলমলের পিরান পরিয়া একখানি তলোয়ার হস্তে দরবারে আসিয়া বসিলেন। কিয়ৎকাল পরে শ্রালক মহাশয়ও বর্ণে চর্মে আবৃত হইয়া দরবারে উপস্থিত। পরিচ্ছদ দেখিয়াই বাদসাহ উচ্চহাস্য

করিয়া বলিলেন, “আর বীরত্ব ও বাহাদুরী দেখাইতে হইবে না। কে কত বাহাদুর পোষাকেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।”

শ্যালক মহাশয় লজ্জায় ও অপमानে মস্তক অবনত করিয়া দরবার হইতে সরিয়া পড়িলেন। ইহার পর তুরসুমের প্রতি বাদসাহের স্নেহ ও অনুগ্রহ আরও বাড়িয়া গেল, অন্তরমহল পর্য্যন্ত তুরসুমের অবাধ যাতায়াত হইল। শ্যালক মহাশয়ের দলের গাত্রদাহও আরও বাড়িয়া গেল।

কিছুকাল এইরূপে গেল। একদিন একজন ওমরাহ বাদসাহকে শুনাইয়া বলিল “তুরসুমের প্রতি বাদসাহের এত স্নেহ ও অনুগ্রহ, কিন্তু শুনিতে পাই তুরসুম বাদসাহকে মুসলমান বলিয়া মনে মনে অবজ্ঞা করে। একদিন সে বাদসাহের সহিত একত্র ভোজন করুক, তাহা হইলে বুঝি সে যথার্থই বাদসাহের বন্ধু।”

তারপর, এক দিন বাদসাহ তুরসুমকে বলিলেন, “এস আজ আমরা দুই জনে একত্র ভোজন করি।”

তুরসুম বলিলেন—“জাঁহাপনা আপনি সসাগরা পৃথিবীর বাদসাহ, আমার অনুদাতা পিতা। আপনার সহিত আহার করাতে আমার ধর্ম্ম কখনই স্নান হইতে পারে না।” এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বাদসাহের সহিত আহার করিতে বসিলেন। মুখে গ্রাস দিবার জন্ত তিনি হাত তুলিয়াছেন, এমন সময়ে বাদসাহ তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—“যথেষ্ট হইয়াছে। আর তোমায় পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই।”

এই কথা নানা আকারে রাষ্ট্র হইল। শ্যালকের দল বলিয়া বেড়াইল যে তুরসুম বাদসাহের সহিত আহার করিয়া মুসলমান হইয়াছে।

তাহার পর তুরসুম এক দিন বাদসাহের নিকট গিয়া বলিলেন, “পিতামহ মহারাজ চন্দ্রসেনকে দেখিবার জন্ত স্বদেশে যাইবার অনুমতি ভিক্ষা করি।” এবার বাদসাহ সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দিলেন এবং বিদায়কালে তাঁহাকে নানারূপে সম্মানিত করিয়া মণ্ডরায়ল নামক লক্ষ টাকার পরগনা জায়গীর স্বরূপ দান করিলেন।

দেশে ফিরিয়া তুরসুম মণ্ডরায়লের কেল্লায় বাস করিতে লাগিলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই, সারা জীবন সন্তাসীর মত কাটাইলেন। কি হিন্দু কি মুসলমান, সকলেই তাঁহাকে সমভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। তারপর তাঁহার মৃত্যু হইল।

মৃত্যুর পর মৃতদেহ লইয়া চতুর্দিকস্থ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঘোর বিবাদ হইবার

উপক্রম হইল। হিন্দুরা তাঁহাকে আপনাদের রাজা বলিয়া দাহ করিতে প্রস্তুত, ইতি মধ্যে সশস্ত্র এক দল মুসলমান তাঁহাকে মুসলমানদের ‘সন্ত’ বলিয়া মৃত দেহ কবর দিবার জন্ত কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইল। দুই দল সমান, কেহ হটিবার নহে। এমন সময় হটাৎ এক ফকির আসিয়া দেখা দিলেন। তিনি এই ব্যাপার দেখিয়া বলিলেন “আমি তোমাদের মীমাংসা করিয়া দিতেছি।” এই বলিয়া তিনি শরীরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “হে তুরসুম বাহাদুর! তোমার জন্ত এতগুলি লোক মারামারি করিয়া মরিতে চায়। তোমার নিষ্কলঙ্ক জীবন—কিন্তু ইহাতে তোমার নামে কলঙ্ক স্পর্শিবে। যদি তুমি মুসলমান হও, তাহা হইলে যথাস্থানে তোমার দেহ পড়িয়া থাকুক আর যদি তুমি বাদসাহের আহারের সময় গ্রাস মাত্র উঠাইয়া থাক তাহা হইলে তোমার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি পৃথক করিয়া দেও।” তিনবার এইরূপে চাঁৎকার করার পর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি পৃথক হইয়া পড়িল। বিবাদ নিষ্পত্তি হইয়া গেল। মুসলমানেরা অঙ্গুলি লইয়া কবর দিল। হিন্দুরা শবদাহ করিয়া চিতা ভস্মের সমাধি দিল।

শ্রী — চট্টোপাধ্যায়।

পঞ্চুলাল

পরদিন পঞ্চু সব বন্ধুদের নিজে নিমন্ত্রণ করতে চলল, বনশ্রী বলেন “দেখ বাছা সময় মত ফিরে এস।” পঞ্চু তাঁর চারিদিকে নাচতে নাচতে বললে, “যাব আর আসব—কোথাও একটু দেরী যদি করি, তখন বলো।”

একে একে অনেক বন্ধুরি নিমন্ত্রণ হল, কিন্তু যে তার প্রাণবন্ধু, একেবারে যার সঙ্গে হরিহর আত্মা, যাকে ছেড়ে তার ছুদণ্ড চলে না, সেই বন্ধুর বাড়ী বার বার তিন বার গিয়েও তার দেখা পেলে না। এই ছেলেটির নাম ব্যোমনাথ, কিন্তু তার ডাকনাম হয়েছিল “মোমবাতি”—সে রোগা ডিগ্‌ডিগে, লম্বা সোজা, মুখে রক্ত কম, পাঙাশ রং—দেখলে মনে হয় নিতান্ত নিরীহ গো বেচারী! কিন্তু ছুঁমুঁতে তার মতন এ কলিযুগে আর একটি জন্মায়নি।

পঞ্চু হতাশ হয়ে ফিরছে এমন সময় একটা ঝড়ীর গাড়ী-বারান্দার কোণে দেখলে তার প্রাণের “মোমবাতি” জ্বলছে। পঞ্চু ত ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে,

“এখানে লুকিয়ে লুকিয়ে কি করছিস?” মোমবাতি বলে, “আজ রাত ছপরে আমি দূরে, বহু দূরে অনেক দূরে যাব”—“বা! কাল যে আমার নতুন জন্মদিন, আমি মানুষ হব। আমাদের বাড়ী তোর মধ্যাহ্ন-ভোজন।” “এই যে শুনলি আমি রাত ছপরে চলে যাচ্ছি—আবার বলে দিন ছপরে ওদের বাড়ী খাব—ক্ষিপ্ত নাকি?”—“কোথায় যাবি শুনি?”—“আমি যাব রাসভ-রাজত্ব। সে বড় চমৎকার দেশ—না আছে পুঁথি পান্ডাডি, না আছে পণ্ডিত আর পাঠশালা। সে দেশে বেপ্পতিবারে স্কুল বসে না,—আর এগ্নি মজা হওয়ায় সেখানে ছ’টা বিয়ুৎবার আর একটা রবিবার। সেখানে পূজোর ছুটি আরম্ভ হয় ১লা বৈশাখে আর শেষ হয় চৈত্র সংক্রান্তিতে। তা হলে সে দেশে সময় কাটায় কেমন করে?”

“কেন? আমোদ, আহ্লাদ, গান আর গল্প, হাসি আর খেলা, এতেই দিনগুলো দেখতে দেখতে উড়ে পালায়! তুই চল না।” “না, না, না,—আমি কিছুতেই যাব না। বাড়ীতে বলে এসেছি সন্ধ্যার আগেই ফিরব। দেৱী হলে মা যে বক্বে”। “তা বকে বক্বে”—“তুই কি ভাই একা যাচ্ছিস?” “একা কেন? একশ জনা এক সাথে যাচ্ছি—মস্ত জুড়ি গাড়ী আসবে তাতেই চড়ে গান গাইতে গাইতে আমরা সেই ‘সুখস্থানে’ যাব”। পঞ্চ চূপ করে থেকে থেকে, হঠাৎ বলে উঠল—“আচ্ছা সে দেশে স্কুল নেই?”—“স্কুল কিরে! তার ছায়া পর্যন্ত সেখানে নেই, মাষ্টার মশায়ের নাম কি গন্ধ কেউ জানে না, পড়ার বই সে দেশে কখনো জন্মাইনি, আর আজ পর্যন্ত আমদানী হয়নি। রাজার লুকুম, বই কেউ নিয়ে যায় যদি, তার তখন ফাঁসি হয়, বইয়ের গলায় পাথর বেঁধে জলে ডুবিয়ে দিতে হবে।” “তবে কেউ পড়ে না!” “ভুলেও না, স্বপ্নেও না”। “আহা কি সুখের দেশ!—কিন্তু আমার বনশ্রী মাকে বলেছি—আর কখনো প্রতিজ্ঞা ভাঙব না—মানুষ হয়ে বুড়ো বাপের হুংথু ঘোচাব।” পঞ্চ এই কথা বলে ছু পা গিয়ে, আবার একবার থামল, তারপর ফিরে জিজ্ঞাসা করল, “হ্যাঁরে, তোরা কখন ছাড়বি বলতে পারিস?”—এই কথা বলতে বলতেই অন্ধকার নেমে এল তারা দূরে দেখতে পেলে একটি ছোট্ট মিট মিটে আলো ক্রমে এগিয়ে আসছে—কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে—আর থেকে থেকে শিঙা বেজে উঠছে। কিন্তু সে শিঙার শব্দে কোন ফুঁটি নেই মনে হচ্ছে যেন সে শুধু মশার ডাক।

মোমবাতি লাফিয়ে উঠে বলে—“এই যে”—“এই যে কি রে?”—বলতে না বলতে গাড়ী এসে পৌঁছল, গাড়ীতে বারো জোড়া গাধা সারি সারি জুড়ে দিয়েছে;

কোনটা সাদা, কোনটা ছেয়ে, কোনটার গায়ে ডোরা কাটা, আবার কারো গায়ের চামড়ায় চকরা-বকরা ছিট-আঁটা। চব্বিশটি গাধার প্রত্যেকের পায়ে সুন্দর সাদা চামড়ার বুট জুতো—অন্য গাধাদের মত নালবন্দী করা নয়। কোচম্যান যিনি, তিনি যেন একটি আফ্লাদে পুতুল,—ননী দিয়ে গড়া, পেটটি মোটা, গাল দুটি গোল আর লাল, মুখে হাসি লেগেই আছে, শরীর খানি লম্বার চেয়ে চওড়ায় বেশী। গাড়ী খানাতে ছেলেগুলোকে পুরেছে যেন চালের বস্তার মত, একেবারে একটা আর একটার ঘাড়ের উপরে; কিন্তু তবু কেউ উচ্চ আহা করছে না। সবাই চোখ মুখ বুজে স্থখের ধ্যান করছে। কোচম্যান বাবু বলেন, “তবে তোমার যাওয়াই স্থির?” মোমবাতি ফুটিতে উজ্জ্বল হয়ে বলে “আমি ত যাবই।” এই বলেই সে বাঁপিয়ে উঠে গাড়ী পাদানে দাঁড়াল। পঞ্চকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলে—“না আমি যাব না, বাড়ী থাকব, পড়াশোনা করব।” কিন্তু চারিদিকে ছেলেদের আনন্দ ধ্বনি শুনে পঞ্চর মন ঘড়ির পেড়ুলামের মত তুলতে লাগল,—থাকি—না যাই? কোচম্যান বলেন, “তুমি নিতান্তই যদি যেতে চাও আমার জায়গা তোমাকে দিয়ে আমি হেঁটে যাব।” পঞ্চ বলে “সে হতেই পারে না—আমি বরং এই একটা গাধার পিঠে চড়ে যাব।” যেমনি গাধায় চড়া, অমনি এক লাথিতে সে পঞ্চকে ধুলায় গড়াগড়ি পাড়ালে। গাড়োয়ান গম্ভীর হয়ে বলেন—“এবারে উঠে পড় আর কিছু গোল হবে না।” পঞ্চ গাধার পিঠে চড়ল। গাড়ী ছাড়ল কিন্তু পঞ্চ শুনতে পেলে কে যেন মিহি সুরে চুপি চুপি বলছে—“না শুনিয়ে গুরুর বচন ভোগ কর্ণের ফল—চোখের জলে পথ দেখতে পাবে না গো—পাবে না।” পঞ্চর মনে মনে ভয় হল, কিন্তু কে যে কথাটা বলে বুঝতে পারলে না। মোমবাতি তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছে, ছেলেরা সব ঢুলে ঢুলে এ ওর গায়ে পড়ছে—জেগে আছে শুধু আফ্লাদে কোচম্যান—সেও গুণ্গুণিয়ে গান ধরেছে—

রাতের বেলায় সবাই ঘুমায়—

আমি শুধু জাগি গো।

আরও মাইল খানেক পথ যাবার পর পঞ্চ আবার শুনলে, “পালাচ্ছ আজ হাস্তে হাস্তে,—কিন্তু, কঁাদতে হবে ভাই, কঁাদতে হবে”। পঞ্চ দেখলে যে গাধার পিঠে সে সওয়ার, সেই একথা বলছে, আর মানুষের মত কঁাদছে! ভোর বেলায় তারা সুখস্থান রাস্তা রাজহা এসে পৌঁছল। সে এক অদ্ভুত দেশ, খালিছোট্ট ছেলে দিয়ে

ঠাসা। সবারই বয়েস আট হতে চোদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত। রাস্তায় ঘাটে সবখানে শুধু হাসি আর গান, হুড়াহুড়ি, লাফালাফি, নৃত্য আর চীৎকার। লুকোচুরি, কাণামাছি, আর ডু ডু খেলবার ধুম পড়ে গেছে। পথের মোড়ে মোড়ে যেখানেই একটু ফাঁকা জায়গা সেইখানেই কানাৎ খাটান, তাঁবু পড়েছে, যাত্রা, কন্সার্ট, বায়স্কোপ, পুতুল নাচ, আর ভেক্টরবাজি। ভোর হতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হতে ভোর, কেবলি আমোদ। পথেঘাটে যেখানে সেখানে বড় বড় কাঠের তক্তায় প্রকাণ্ড অঙ্করে চারিদিকে লেখা,—

নাই পাঠ, নাই পাঠশালা, নাইকো মাষ্টারের জালা,

আছে সুখ, শুধু একঢালা—

এ দেশের তুলনা কোথায়?

আমাদের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পঞ্চুর দিন যেন ছুটে চলেছে। আনন্দে অধীর পঞ্চুলাল মোমবাতির গলা জড়িয়ে ধরে বলে, “সত্যি ভাই! তোর মত বন্ধু ভাগ্যে পেয়েছিলাম, তাই আজ এই এমন দেশে আসতে পেরেছি। আর মাষ্টার মশায় কিনা বলত, ‘খবরদার মোমবাতির সঙ্গে কখনো মিশোনা’।”

হঠাৎ একদিন ঘুম ভেঙে উঠে মাথা চুলকতে গিয়ে পঞ্চু দেখে কি, তার কাণটা বেজায় লম্বা হয়ে পড়েছে—ঠিক ঐ ওপাড়ার হীরে ধোপার গাধাটার মত। জন্মাবধি পঞ্চুর কাণ ছিল না বলেই হয়, তার বাপ গুপী ছুতোর এক রকম কাণের কথা ভুলেই গিয়েছিল। আয়নার সামনে যেতেই পঞ্চু নতুন কাণের শোভা দেখে, ডাক ছেড়ে কান্না শুরু করে দিলে। যতই কাঁদে, কাণ দুটি ততই বেড়ে চলে। ক্রমে তাতে আবার রোঁয়া গজিয়ে উঠল। পঞ্চুর রোদন ধ্বনিতে সেই ঘরের বাসিন্দা একটি নেংটি ইঁদুর জিজ্ঞাসা করলে “হ্যাঁগা বাবুমশায়, অমন করে কাঁদছ কেন?” পঞ্চু বলে, “নেংটি ভাই! আমার বড্ড অসুখ করেছে তাই কাঁদছি।” “ওমা, তাইত! বড্ড শক্ত রোগ তোমায় ধরেছে। এ যে একেবারে “ডক্কি ফিভার,” আর ঘণ্টা দুয়েক বাদেই তোমার মানুষের দেহ বেঁকে চুরে চার-পেয়ে গাধায় গিয়ে দাঁড়াবে।”

পঞ্চু কিছুক্ষণ থ' হয়ে থেকে তারপর একটা কাণটাকা টুপি মাথায় দিয়ে মোমবাতির বাড়ী গেল। গিয়ে দেখে তারও ঐ দশা। দুই বন্ধুতে দুমিনিট কথা কইতে না কইতেই দুজনাই হাত পা, চারখানা পা হয়ে দাঁড়াল, মাথা হয়ে পড়ল—আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। কথা আর বেরোয় না, যা বলতে চায় গাধার ডাকে পরিণত হয়।

হতবুদ্ধি ছুজনে যে হা ছতাশ করবে তারও পথ বন্ধ। অতঃপর যখন ছুজনের ছুটি



লেজ ধীরে ধীরে দেখা দিলে তখন কথাও দূর হয়ে গেল, ছুটো কেবল আস্ত গাধার মত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এমন সময় সেই জুড়ি গাড়ীর কোচম্যান এসে বললে, “বাহবা! এমন ছুটি গাধা এর আগে আর আমার ভাগ্যে জোটেনি, দাম মিলবে ভাল।” এই না বলে খররা বুরুষ দিয়ে তাদের খুব করে ঝাড়পৌঁছ করে, হেট হেট করে খেদিয়ে হাটে নিয়ে চলল।

খরিদার জুটতে দেরী হল না। মোমবাতিকে নিল এক চাষা আর পঞ্চু বিক্রী হ’ল এক বাজীওয়ালার কাছে—সে ‘ভানমতীর খেলা’ করে। পঞ্চুকেও নানান কসরৎ শেখাতে লাগল কিন্তু পঞ্চুর কপাল মন্দ, কসরৎ শিখতে গিয়ে তার পা খোঁড়া হল। বাজীওয়ালো দেখলে খোঁড়া গাধা রাখা নিছক লোকসান, একে যে দামে হয় বেচে ফেলাই ভাল। বাজারে কেউ দাম জিজ্ঞেস করলে সে বলে “কুড়ি টাকা”। শুনে সবাই হেসে বলে “কুড়ি আনা পাওত ঢের”। কিছুতে দাম চড়ল না, তখন সেই বাজীওয়ালো পাঁচ সিকেতেই পঞ্চুকে বেচে দিল।

পঞ্চুকে যে:কিনলে সে ভাবলে, একে মেরে চামড়াখানা নিতে পারলে কাজ দেখবে। মস্ত একটা ঢাক তৈরি করতে পারব। এই মনে করে সে পঞ্চুর গলায় গোটাকত পাথর আর দড়ি বেঁধে তাকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিলে, আর নিজে

দড়ি ধরে ডাঙায় বসে রইল। পঞ্চ তলিয়ে গেল। তারপর যখন দড়ি ধরে টেনে তুলল, তখন মরা গাধা না উঠে উঠল সেই কাঠের পুতুল পঞ্চলাল। খরিদদার তো অবাক! তাকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে পঞ্চ ফিক্ করে হেসে বললে “মশায় আমার চামড়াখানার জন্যে সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরেছিলেন, কিন্তু ধর্ম কি অত সয়? ডুবে তলিয়ে যাবামাত্রই রাজ্যের মাছ এসে আমার উপরে পড়ল, সবাই মিলে আমার গাধার মাস চামড়া সব খেয়ে ফেললে! কিন্তু যখন হাড়ে পৌঁছল, সে টনক জিনিস সিন্ধু কাঠের তৈরী, তাতে কি আর মাছের দাঁত বসে! ছএক খাবল দিতে গিয়েই যখন তাদের চোয়াল মড় মড় করে উঠল, তখন সবাই পালাল। আমি ত আর সত্যিকার গাধা নই আমি; আমি পঞ্চলাল; গুপী ছুতোরের হাতে গড়া পুতুল!” খরিদদার বললে, “আমার সে পাঁচ সিকে পয়সা বুঝি অগ্নি যাবে? তোমায় আমি চুলোয় পূরে জালাব!” কথা শেষ না হতে পঞ্চ জলে পড়ে সাঁতার দিয়ে পালাল, আর তাকে ধরে কে? বেশী দূর যেতে হল না, কিন্তু মস্ত একটা মাছ এসে তাকে গিলে ফেললে। এ আর কেউ নয়, সেই বোয়াল, যে তার বাবাকেও গিলেছিল। পঞ্চ কেঁদে উঠল “বাঁচাও বাঁচাও!” সে অকূলে কে আর বাঁচায়? চারিদিকের আলো সব নিবে গেল; কে তাকে রক্ষা করবে? কে তাকে আর বাঁচাতে পারে? কে জানে? কে বলতে পারে?

[আগামী বারে সমাপ্য]

শ্রীপ্রিয়দা দেবী।

ভোজের মত ভোজ

প্রাণীদের মধ্যে যদি বাস্তবিক ‘খানে-ওয়ালা’ কেউ থাকে, তবে সে হচ্ছে মানুষ। জানোয়ারদের মধ্যে দেখি এক একজনের খাওয়া এক একটা নির্দিষ্ট রকমের। কোনটা হয়ত শুধু আমিষই খায়, যেমন বাঘ সিংহ; কোনটা আমিষ খেতেই পারে না, যেমন গরু ভেড়া। কত জন্তু আছে যারা খালি কীট পতঙ্গ খায়, অথবা শুধু ফলই খায়। পাখীদের মধ্যেও দেখি মাছখোর পাখী, মরাখেকো পাখী—যারা শুধু মাছ বা শুধু মরা জন্তুর মাংস খায়। কত পতঙ্গ আছে, তারা কেবল একটা বিশেষ রকম গাছের ফল মূল ফুল পাতা বা কাঠ খেয়ে থাকে, অথবা বিশেষ কোন জন্তুর গায়ে চড়াও করে তার শরীরের রক্ত মাংস বা রস খায়। অবশ্য, আমিষ নিরামিষ দুই খায়

এমন জন্তুও অনেক আছে, কিন্তু মানুষের মত এত রকমের খাওয়া বোধ হয় আর কোন জন্তুই খায় না।

মানুষের খাওয়া এত রকমের যে, তার একটা তালিকা করতে গেলে, সে এক বিরাট ব্যাপার হ'য়ে পড়ে। ইংরাজিতে বলে, “একের খাওয়া, অপরের বিষ”; বাস্তবিক, যেসব জিনিষকে অখাদ্য মনে ক'রে আমরা খাবার জিনিষের হিসাবেই ধরি না, এমন কত যে জিনিষ কত লোকে প্রতিদিনই খাচ্ছে, তার ফর্দ শুনলে সহজে বিশ্বাসই হয় না। গাছপালা ফলমূলের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, বড় বড় জন্তুর কথাই ধরা যাক। সাধারণতঃ, আমরা স্থাপদ জন্তুর, যেমন বাঘ বা সিংহের, মাংস খাই না—কিন্তু তা ব'লে বাঘ বা সিংহ যে অখাদ্য, একথা কে বলবে? শান্‌দেশের লোকেরা বাঘের মাংস খুব উৎসাহ ক'রেই খায়—বলে, “ওরা আমাদের মাংস খায়, আমরা কেন ওদের মাংস খাব না”? বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিৎ ওয়ালেস্ সাহেব আমেরিকার চিত্তে বাঘ বা জাণ্ডয়ারের মাংস খেয়ে বলেছেন, “জাণ্ডয়ারের চপ্ অতি উপাদেয় জিনিষ।” শোনা যায়, ইউরোপের অনেক জায়গায় বেড়ালের মাংস, অনেক সময়ে খরগোস ব'লে বা আর কোন নাম দিয়ে চালিয়ে দেওয়া হয়।

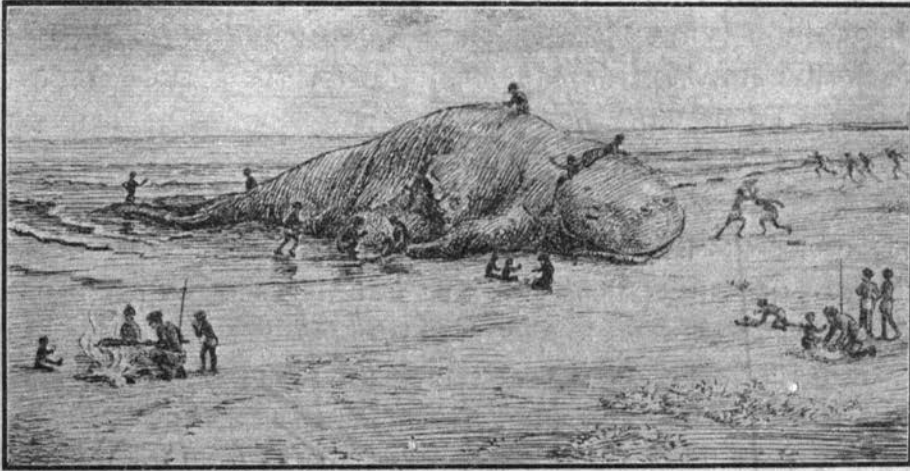
সিংহের মাংস হটেন্টট্‌ নিগ্রোরা খায়, অনেক আরব মুসলমানেরাও খায়। সাহেবেরাও অনেকে সিংহের মাংস খেয়ে তার খুব সুখ্যাতি করেছেন। একবার আলজিরিয়ার একটা সিংহ একটা মানুষ খেয়েছিল। তার তিন দিন পরে সেখানকার এক বড় সাহেব সিংহটাকে মেরে তার মাংস রন্ধে বন্ধু বান্ধবদের ভোজ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে একজন মেমসাহেব ছিলেন, তিনি লিখেছেন যে ভোজ খেয়ে সবাই খুব খুসী হ'য়েছিল। কয়েক বছর আগে পারিসের এক বড় হোটেলে একটা সিংহ রান্না করা হ'য়েছিল, উনিশজন লোকে তাই খেয়ে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা ক'রেছিলেন। আফ্রিকায় অনেক জায়গায় নিয়ম আছে, সিংহ মারা হ'লে পর, মাংস ভাগাভাগির সময়ে মায়েরা এসে তাঁদের ছেলেদের জন্তু তার কল্‌জের এক একটা টুকরো নিয়ে যান। তাঁদের বিশ্বাস, সিংহের কল্‌জে খেলে পর ছেলেদের শক্তি আর সাহস হবে ঠিক সিংহের মত!

হ্যান্সেন্‌ যখন উত্তর মেরুদেশে যান, তখন অনেক দিন তাঁকে মাদা-ভাল্লকের কাঁচা মাংস খেয়ে থাকতে হ'য়েছিল। সে মাংস তিনি এত খেয়েছিলেন যে, মাসের পর মাস কেবল এই খেয়ে খেয়ে শেষটায় তাঁর অরুচি ধ'রে গিয়েছিল। কিন্তু তবু তিনি বলেছেন যে জিনিষটা খেতে বাস্তবিকই চমৎকার। কল্‌বে ব'লে আফ্রিকার

একজন সাহেব শিকারীর কথা পড়েছি, তাঁর অতি প্রিয় খাণ্ড ছিল গণ্ডারের মেটুলি। কেবল এই খাণ্ডের লোভেই তিনি কত যে গণ্ডার মেরেছিলেন, তার আর অন্ত নাই। শেষটায় একদিন অতিরিক্ত লোভ কর্তে গিয়ে এক বুড়ো গণ্ডারের কাছে তিনি প্রাণ হারান।

আমাদের দেশে হাতীর মাংসটা লোকে তত পছন্দ করেনা। কিন্তু আফ্রিকার অনেক স্থানেই দেখা যায় কোথাও হাতী মরলে চারিদিকের গ্রামেহুলস্থূল পড়িয়া যায়—লোকে ঘটা ক'রে বড় রকম ভোজের জন্ত প্রস্তুত হয়। হাতীটা সে দেশের খুব একটা উচু দরের শিকার। হাতীর হাড় মাস্ চামড়া কিছুই তারা নষ্ট হতে দেয় না। দাঁত-গুলি ত খুব বেশী দামেই সাহেব-ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রী হয়, চামড়াটা দিয়ে চমৎকার ঢাল তৈরী হয়। মাংসটা খাবার পরেও, যে চর্কিটা বাকী থাকে, সেটা গরম জলে সিদ্ধ করলে চমৎকার সুরুয়া তৈরী হয়। এক সাহেবের একবার হাতীর মাংস খাবার সখ হয়েছিল। তিনি মাংস খানিকটা সংগ্রহ ক'রে খাবার চেষ্টাও ক'রে ছিলেন কিন্তু অনেক টানাটানি আর কামড়া কামড়ি ক'রেও সে মাংস দাঁত দিয়ে ছেঁড়া গেল না! চিবিয়ে খাওয়া ত দূরের কথা।

অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্যেরা, যারা সমুদ্রের ধারে থাকে, তাদের ভোজটা খুব ভাল



রকমের জমে কোন্ সময়ে জান? যখন তারা সমুদ্রের ধারে গিয়ে দেখে তিমিমাছ

ডাঙ্গায় ভেসে উঠেছে। দু'দশ বছরে হয়ত এক আধটা তিমি এই রকমে পাওয়া যায়—আর তাই নিয়ে তাদের উৎসবের ধুম পড়ে যায়। শুভ খবরটা সবাইকে জানাবার জন্য আগে সমুদ্রের ধারে আগুন জ্বালান হয়, তারপর ছেলে বুড়ো স্ত্রী পুরুষ সবাই মিলে তিমি মাছের চামড়া কেটে তার চর্বি বা'র ক'রে সারা গায়ে সেই চর্বি মাখে—নিজেরা মাখে আর অপরকে মাখায়। তারপর ভোজের পালা আরম্ভ হয়। দিনের পর দিন সে ভোজ চলতে থাকে, তিমির মাংস প'চে দুর্গন্ধ হ'য়ে পড়ে—তবু ভোজের আর বিরাম নেই। কেউ কাঁচা মাংস খায়, কেউ আগুনে পুড়িয়ে খায়। খেতে খেতে তারা একেবারে তিমির ভিতর ঢুকে যায়। তিমির মেটলি, যকৃত, কল্জে, যার যেটা ভাল লাগে তারা সেইগুলো কেটে কেটে আনে—তাই নিয়ে মারামারি ঝগড়াঝাটি হয়। পাত পাড়বার দরকার নাই, পরিবেষণের হাঙ্গাম নাই, ইচ্ছা হয়ত তিমির পেটের মধ্যে ব'সে ব'সেই ভোজ চলে। যে কয়দিন তিমির মাংস খাওয়া চলে, সে কয়দিন তারা সাধ্যমত প্রাণপণে খায়। যখন তিমির মাংস জোটে না তখন তারা কি খায়? তখন খায় ফলমূল, ডিম, মধু, পোকামাকড় প্রজাপতি, শামুক ঝিনুক, সাপ ব্যাং, মাছ কচ্ছপ, কুকুর, কান্দারু ইত্যাদি। তারা চাষবাস জানে না, ডাল ভাত দুধ ঘী ময়দার কোন খবরই রাখে না।

আমাদের দেশে, আর অন্যান্য দেশেও, এমন অনেক লোক আছে যারা খাঁটি নিরামিষভোজী। মাংসত দূরের কথা, ঘী দুধ পর্যন্ত তারা খায় না। কিন্তু উত্তর মেরুর কাছে ঠাণ্ডা দেশে যদি যাও, সেখানে দেখবে ঠিক উল্টো। এক্ষিমোরা সারাবছর কেবল মাছ মাংসই খেয়ে থাকে। সে দেশে ফলমূল পর্যন্ত পাবার যো নেই—মাঝে মাঝে এক রকম জংলি গুটিফল পাওয়া যায়, তাই কচিং কখন খায়। ক্রাজ্ সাহেব তাঁর “গ্রীনলণ্ডের ইতিহাসে” এক্ষিমো ভোজের একটি নমুনা দিয়েছেন। তার মধ্যে প্রত্যেকটি পদ ছিল হয় মাছ নয় মাংস। যেমন শুকনো চিংড়ি, শুকনো মাছ শুকনো সিদ্ধ বা পচা সীলের মাংস, আধপোড়া পাখীর মাংস, আর দুর্গন্ধবাসি তিমির লেজ। এই শেষেরটি তাদের বিশেষ পছন্দ।

দক্ষিণ আমেরিকার টেরা-ডেল-ফুয়েগোর অসভ্যেরা বলতে গেলে কেবল শামুক ঝিনুক খেয়েই বেঁচে থাকে। মাঝে মাঝে ছ একটা মাছ বা বনের ফল বা অন্য কিছু খাবার যে না পায় তা নয়, কিন্তু সারা বছর মোটের উপর তারা শামুক ঝিনুক খেয়েই থাকে। এক এক জায়গায় যায়, আর সেখানকার শামুক ঝিনুক সব খুঁজে খেয়ে উজাড় করে।

আবার দল বেঁধে যায় আর এক জায়গায় খাবার খুঁজতে। এমনি ক'রে তারা সমুদ্রের তীরে তীরে ঘুরে বেড়ায়।

যতরকম জন্তু আছে, তার মধ্যে কোন্ কোন্টা মানুষে খায়, বলতে গেলে এত নাম করতে হয় যে তার চাইতে কোন্ কোন্টা খায় না, তার তালিকা দেওয়াই হয়ত সহজ। শুনেছি, কাকের মাংস আর শকুনের মাংস এমন বিশ্বাস যে কোন দেশের মানুষেই তা খায় না। কুকুর বেড়াল ইঁদুর সাপ ব্যাং গোসাপ টিক্‌টিকি কুমীর হাঙ্গর এ সব ত অনেক দেশেই খায়, কেঁচো কেন্নো ফড়িং আরসুলা ঝিঁঝিপোকা পর্যন্ত মানুষের খাওয়ার হিসাবে ধরা হ'য়ে থাকে। ফিজি দ্বীপের লোকেরা একরকম জলের পোকাকার বড়া খুব পছন্দ করে, তার নাম 'স্বালোলো'। সেখানে বড় বড় ব্যাপারে তত্ত্ব পাঠাবার সময় পাতায়-মোড়া স্বালোলো পাঠাবার নিয়ম আছে। শরৎ কালের ছোটো মাস এই পোকা খুব পাওয়া যায়, তাই তাদের ভাবায় এই ছোটো মাসের নাম ছোট 'স্বালোলো' আর বড় 'স্বালোলো'।

বিজ্ঞান-পাঠ

আয় তোর মুণ্ডটা দেখি, আয় দেখি 'ফুঁটোস্কোপ্' দিয়ে—
দেখি কত ভেজালের মেকি, আছে তোর মগজের ঘায়ে।
কোন দিকে বুদ্ধিটা খোলে, কোন দিকে থেকে যায় চাপা,
কতখানি ভস্‌ভস্‌ ঘীলু, কতখানি ঠক্‌ঠকে ফাঁপা।
মন তোর কোন দেশে থাকে, কেন তুই ভুলে যাস্‌ কথা—
আয় দেখি কোন ফাঁক দিয়ে মগজেতে ফুঁটো তোর কোথা।
টোল-খাওয়া ছাতাপড়া মাথা, ফাটা-মত মনে হয় যেন,
আয় দেখি বিশ্লেষ ক'রে—চোপ্‌ রঙ, ভয় পাস্‌ কেন?

কাৎ হ'য়ে কাণ ধ'রে দাঁড়া, জিভখানা উল্টিয়ে দেখা,
ভাল ক'রে বুঝে শুনে দেখি, বিজ্ঞানে যে রকম লেখা।



মুণ্ডতে 'ম্যাগনেট' ফেলে, বাঁশ দিয়ে 'রিফ্লেক্ট' ক'রে
ইট দিয়ে 'ভেলসিটি' ক'য়ে, দেখি মাথা ঘোরে কি না ঘোরে।



৩পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ।



সপ্তম বর্ষ

কার্তিক, ১৩২৬

৭ম সংখ্যা

মুক্ত

সংসার সরসী মাঝে আমি যেন পানা
মূল নাহি বাঁধা নহি,
সর্বদা স্বাধীন রহি,
যথা ইচ্ছা ভেসে যাই নাহিক ঠিকানা।
প্রভুর যে দিন ইচ্ছা লবে মোরে তুলে,
বাধা নাহি, নাহি টান,
ছিঁড়িতে হবে না প্রাণ,
তঁারি আছি তঁারি রব একূলে ওকূলে।

শিবনাথ শাস্ত্রী।



সোণার বারণা

(তিব্বতী গল্প)

ছোট ভাই, আর তাদের এক বুড়ি মা। বড় ভাই খুব চালাক চতুর কিন্তু ভারি হিংস্রটে, কেবল আপনারটিই বোঝে ভাল। ছোট ভাই বোকা হাবা কিন্তু ভারি সরল, কারুর মন্দে নেই; পরের দুঃখে তার মন কাঁদে। বড় ভাই বুদ্ধিমান, তাই রোজগার করে, সংসার চালায়। ছোট ভাই কেবল বুড়ি মায়ের সেবা করে। তাই দেখে দাদার হল রাগ। সে ভাবলে আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা রোজগার করব আর ভায়া বসে-বসে খাবেন, তা হবে না। সে ছোট ভাইকে দিলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে। বুড়ি মা বললে—“তাহলে আমিও ওর সঙ্গে যাই। ও গেলে আমার দেখবে কে?” এই বলে সে ছোট ছেলের হাত ধরে পথে এসে দাঁড়াল।

ছোট ভাই মাকে নিয়ে কোথায় যাবে, কি করবে, কিছুই ঠিক করতে পারলে না। কি করে? বুড়ি মায়ের হাত ধরে ঠুকঠুক করে পথ চলতে লাগল। চলতে-চলতে ছুটিতে গ্রাম ছাড়িয়ে এক পাহাড়ের তলায় এসে হাজির। তখন সন্ধ্যা হয়েছে, আর পথ চলা যায় না। এইখানেই রাত কাটাতে ব'লে তারা দুজনে এক গাছতলায় বসতে যাচ্ছে, এমন সময় দেখলে, একটু দূরে গাছের ফাঁকে একখানা কুঁড়ে ঘর। তারা আস্তে আস্তে সেইখানে এগিয়ে গিয়ে দেখে, ঘর ফাঁকা—কেউ কোথাও নেই; বোধ হল, যার বাড়ী, সে ভিটে ছেড়ে উঠে গেছে। ছোট ছেলে মাকে সেই কুঁড়ে-ঘরে শুইয়ে দিয়ে নিজেও তার পাশটিতে শুয়ে পড়ল। এই ভাবে সে-রাত কেটে গেল।

পর দিন ভোরবেলা ঘুম ভেঙে উঠে ছেলেটি পাহাড়ে কাঠ ভাঙতে চলল। সমস্ত দিন কাঠ ভেঙে বিকেল বেলা কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে বাজারে বিক্রি করে কিছু পয়সা পেলে, তাই দিয়ে চাল-দাল কিনলে। বুড়ি মা উঠুন জ্বলে রান্না করে ছেলেকে খাওয়ালে, নিজেও খেলে। সেই ভাত তাদের অমৃত বলে বোধ হল। ভয় ছিল, বুঝিবা না খেয়ে মরতে হয়, গাছ-তলায় রাত কাটাতে হয়; সে ভয় ঘুচে গিয়ে, আজ তারা মায়ে-পোয়ে আরামে ঘুম দিতে লাগল।

এমনি করে কিছু দিন যায়, কাটতে কাটতে সে বনের গাছগুলো যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ছেলেটি তখন কাঠের খোঁজে পাহাড়ের চড়াই ভেঙে উপরে উঠতে লাগল। যেতে-যেতে হঠাৎ দেখে, একেবারে সামনে থাবা-গেড়ে ব'সে প্রকাণ্ড এক

সিংহ—যেন একটা আস্ত পাহাড় কুঁদে তৈরি! এই প্রকাণ্ড গম্ভীর সিংহ-মূর্তি দেখে ছেলেটির মনে ভয় হল, ভক্তিও হল। সে ভাবলে, এই সিংহই নিশ্চয় এই পাহাড়ের



হর্তা-কর্তা, চার খাবা দিয়ে যেন পাহাড়ের চারদিক আগলে বসেছেন, এঁরই পাহাড়ের কাঠ ভেঙে আমার দিন চলছে। এই ভেবে ছেলেটি সিংহের পায়ের তলায় একটি গড় করলে; আর মনে-মনে বলল, সিংহঠাকুরের পূজো দিতে হবে।

সেই দিন কাঠ বিক্রি করে সে কিছু ধূপধুনো ফুলফল কিনলে। পরদিন তাই নিয়ে সে সিংহের কাছে হাজির হল। তারপর ধূপ ধুনো জ্বালিয়ে, ফল ফুলের নৈবেদ্য সাজিয়ে, সিংহের পায়ের তলায় প্রণাম করে বলল—“সিংহ ঠাকুর, আমার অপরাধ নিয়োনা। আমি যেন তোমার পাহাড়ে কাঠ ভেঙে এমনি সুখে দিন কাটাতে পারি।” বলতেই তার মাথার উপর এমন এক বিকট গর্জন উঠল যে মনে হল যেন অত বড় বন শুদ্ধ পাহাড়খানা কাঁপছে। সে ভয়ে-ভয়ে চোখ তুলে দেখে পাথরের সিংহের নাটা-চোখ ঘুরচে, পাকানো কেশরগুলো ঝেঁউয়ের মতো ফুলে উঠেছে—প্রকাণ্ড মুখখানা খুলে হাঁ হয়ে আছে। সিংহ হৃদ্বার দিয়ে বলে উঠল—“কে তুই?” সে কাঁপতে

কাঁপতে বল্লে—“আমি তোমার গরীব প্রজা, তোমার বনে কাঠ কুড়িয়ে খাট।” বলে সে তার সমস্ত দুঃখের কথা সিংহের কাছে বলতে লাগল—দাদার কথা, মায়ের কথা, ভাঙা কুঁড়ের কথা, কিছুই বাদ দিলে না। সিংহ খানিক গৌঁ হয়ে রইল, তারপর বল্লে—“আচ্ছা এখন যা, কাল ঠিক এই সময়ে আবার আসিস্—সঙ্গে একটা বড় দেখে ঘড়া আনিস্, ভুলিস্‌নি; তাহলে আর তোর কোন দুঃখ থাকবে না।” ছেলেটি অবাক হয়ে ভাবতে-ভাবতে চলে গেল। কিছুই বুঝতে পারলে না।

সিংহের কথামত পরদিন সকাল বেলা ঘড়া নিয়ে সে আবার সেই জায়গায় গিয়ে সিংহের পায়ের কাছে প্রণাম করতেই সিংহ জেগে উঠল। একটা গৌঁ-গৌঁ শব্দ করে বন কাঁপিয়ে বল্লে—“শিল্লির তোর ঐ ঘড়াটা আমার মুখের সামনে ধর, আমার মুখ থেকে সোণার ঝরণা ঝরবে। কিন্তু খবরদার এক কৌটাও যেন মাটিতে না পড়ে।” ছেলেটা তার মুখের সামনে ঘড়া ধরল; সিংহ অমনি হলুদবর্ণ কাঁচা সোণা মুখ থেকে গড় গড় করে ঘড়ার মধ্যে ঢেলে দিলে। যখন প্রায় ঘড়া ভর্তি হয়ে এসেছে, আর একটু হলেই উপচে পড়ে, তখন ছেলেটি বলে উঠল—“থাক থাক, আর নয়।” অমনি সিংহ মুখ বন্ধ করলেন, সোণা পড়াও বন্ধ হয়ে গেল। আবার যেমন পাথরের মূর্তি তেমনি হয়ে গেল—নড়ে না চড়ে না—ডাকে না হাঁকে না। ছেলেটি সিংহকে প্রণাম করে সোণা-ভরা ঘড়া নিয়ে মায়ের কাছে হাজির হল। দেখে বুড়ির ভয় হল। এত সোণা ছেলে কোথায় পেলে? ডাশ্‌তাতি করে নিয়ে এল না কি? তারপর ছেলে যখন সব কথা খুলে বল্লে, তখন তার আর আহ্লাদ ধরে না। এই সোণা বিক্রি করে যে টাকা পেলে, তাই থেকে মস্ত বড় বাড়ী হল, দাসদাসী এল, গাই গরু, আসবাব পত্র, জাঁকজমক—আরো কত কি হল। তাদের আর কোনো দুঃখ রইল না।

তাদের এই সুখের খবর হিংসুটে দাদার কাণে গিয়ে পৌঁছল। হিংসেয় তার গা জ্বলতে লাগল। ভাবলে বোকা ভাই এত টাকা পেলে কি করে, খোঁজ নিতে হচ্ছে। এই ভেবে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ভাইয়ের সন্ধানে বেরল। গাঁ ছেড়ে সহরে গিয়ে বেশি খোঁজ নিতে হল না, যাকে জিজ্ঞাসা করে সেই তার ভাইয়ের বাড়ী দেখিয়ে দেয়। দাদা দেখলে ভাইয়ের মস্ত কোটা বাড়ী, দেউড়িতে দরোয়ান, চাকর-দাসী গিস্ গিস্ করছে। এত দেখেও তার বিস্ময় হল না। সে দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলে, দরোয়ান বল্লে—“হাঁ এই বাড়ী।” সে তখন স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ীর ভিতর

টুকে গেল। যেতেই তার ছোট ভাই, আহ্লাদে ছুটে এসে, দাদা আর বৌঠাকরুণের পায়ের ধূলা নিয়ে প্রণাম করলে। বুড়ি মা ফোকলা মুখে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে তাদের হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেল। খুব আদর যত্ন করে বসালে; খুব ধূমধামে রান্না করে মস্ত এক ভোজ্য দিলে। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে দাদা ভাইকে চুপি চুপি ডেকে জিজ্ঞাসা করলে “এত টাকা কোথায় পেলিরে?” ভাই তখন সব কথা দাদার কাছে গড় গড় করে বলে গেল। দাদা ভাবলে এত সহজে যখন সোণা পাওয়া যায়, তখন ছাড়া নয়! সে তখুনি বাজারে খুঁজে খুঁজে যত বড় পাওয়া যায় একটা ঘড়া কিনলে। তবু তার মন খুঁৎ-খুঁৎ করতে লাগল—আরও বড় ঘড়া পেলে ঠিক হত।

পরদিন সকালে দাদা সেই মস্ত-বড় ঘড়া আর চারটিখানি ফল-মূল ধূপ-ধূনো একখানা ছোট্ট মাটির সরায় করে নিয়ে, যে-পাহাড়ে তার ভাই কাঠ কাটতে যায়, সেই পাহাড়ের দিকে চলল। যেতে যেতে সেই প্রকাণ্ড পাথরের সিংহের সামনে এসে সে হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তার গা ছম্-ছম্ করতে লাগল। তার বিশ্বাস হ’ল না যে এই সিংহের পেটে সোণা থাকতে পারে, তবু সে মনে-মনে বলল “দেখি না কি হয়!” এই বলে সে ধূপ-ধূনো জ্বালিয়ে নমো-নমো করে দুটো প্রণাম ঠুকলে। ধূনোর ধোঁয়া সিংহের নাকে লাগতেই সিংহ গর্জন করে বলে উঠল—“কে তুই? কি চাস?” দাদা বলল—“সে দিন যে ছেলেটা তোমার কাছ থেকে সোণা নিয়ে গেছে, আমি তার বড় ভাই; আমিও সোণা নিতে এসেছি।” সিংহ বলল—“আচ্ছা, তবে ঘড়াটা আমার মুখের সামনে ধর। কিন্তু খবরদার, এক ফোঁটাও যেন মাটিতে না পড়ে।”

দাদা তাড়াতাড়ি সেই ঘড়াটা সিংহের মুখের সামনে তুলে ধরলে; অমনি সিংহের মুখ থেকে ঝির্-ঝির্ করে জলের মত টলটলে সোণা কলসীর ভিতর পড়তে লাগল। দাদা ভাবতে লাগল, ঘড়াটা তো এখনি ভর্তি হয়ে যাবে—হায়-হায় একটা জালা আনলুম না কেন? ঘড়া যতই ভর্তি হচ্ছে তার লোভও ততই বাড়ছে। এমন কর্তে-কর্তে ঘড়া পূরে এল, কিন্তু তবু সে প্রাণ থাকতে বলতে পারলে না “আর চাই না, থামো।” ঘড়া উপচে সোণা মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। যেমন পড়া অমনি শ্রোত বন্ধ—সিংহের গলা শুকিয়ে গেল! দাদা চমকে বলে উঠল—“এ কি!”

সিংহ গলা ঘড় ঘড় করে বলল—“আমার গলায় এক-তাল কাঁচা সোণা এসে আটকেছে, তুমি হাত দিয়ে বার করে নাও।” দাদা ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি

সোণার তালটা নেবার জন্তে সিংহের গলার মধ্যে হাত চালিয়ে দিলে। অমনি সিংহ টপ্ করে মুখ বুজলেন—দাদার হাতশুদ্ধ কামড় দিয়ে। দাদা বললে, “মুখ খোল আমি হাত বার করে নি।” কিন্তু পাথরের সিংহ নড়েও না চড়েও না, কথাও কয় না। অনেক টানাটানি করলে তবুও হাত বেরল না। সিংহের পায়ে ধরে কত কাঁদলে, কত মিনতি জানালে, কত মানিত করলে, তবু সিংহের গা একটু হেললও না ছুললও না। আর হল কি, দেখতে-দেখতে ঘড়ার সমস্ত সোণাও কালো পাথর হয়ে গেল।

এদিকে তার স্ত্রী বাড়ী বসে ভাবছিল কখন তার স্বামী সোণাভরা ঘড়া মাথায় নিয়ে বাড়ী আসবে। সকাল গিয়ে ছপুর হল তবু এল না। ছপুর গিয়ে যখন সন্ধ্যা হয়-হয়, তখন তার মহা ভাবনা হল। সে তখন স্বামীর খোঁজে বেরল। খুঁজে-খুঁজে সে পাহাড়ে এসে হাজির। দেখলে তার স্বামী এক হাত উপর দিকে তুলে মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে। সে স্ত্রীকে দেখে ভেউ-ভেউ করে কেঁদে উঠল, তাই দেখে স্ত্রীর চোখেও জল এল; সে সিংহের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে বলতে লাগল—“ওগো, সিংহঠাকুর, আমার স্বামীকে বাঁচাও”। কিন্তু পাথরের সিংহ পাথরের মতই দাঁড়িয়ে রইল।

ক্ষিদেয় তেষ্ঠায় স্বামী ছটফট করছে দেখে স্ত্রী বাড়ী থেকে কিছু খাবার আর ঘটিতে করে কিছু জল নিয়ে এল। তারপর দুটিতে বসে সেইখানে রাত কাটাল।

এমনি করে দিন যায়, রাত যায়, মাস যায়, বছর যায়, দুঃখের আর শেষ হয় না। সিংহের মুখ খোলে না। স্ত্রী রোজ বাড়ী থেকে কিছু কিছু খাবার এনে স্বামীকে খাওয়ায় আর দুজনে বসে বসে চোখের জলে বুক ভাসায়, তবু পাথরের সিংহের দয়া হয় না। স্বামী পড়ে আছে, রোজগার কে করবে, কাজেই ক্রমে ক্রমে গহনা-পত্র ঘটি-বাটি বিক্রি করতে হল। শেষে বাড়ীও বাঁধা পড়ল। যখন আর খাবার জোটে না, তখন স্ত্রী সিংহের কাছে কেঁদে বললে—“ওরে পাষণ, দেখ তোর কাছে সোণা নিতে এসে আমাদের কি সর্বনাশ হল। না খেয়ে মরতে বসেছি!”

এই কথা শুনে সিংহের ভারি মজা লাগল। সে আর থাকতে পারলে না; হো-হো করে হেসে উঠল। হাসতে গিয়ে যেই মুখ ফাঁকি হওয়া, অমনি সেই দুফুটা তাড়াতাড়ি তার হাত বার করে নিলে। আঁঠু সেখানে তিলমাত্র দাঁড়ানো নয়, তখুনি স্ত্রীকে নিয়ে সেখান থেকে ছুট দিলে।

বাড়ী নেই, ঘর নেই, কোথায় যায়, কাজেই স্ত্রীকে নিয়ে ছোট ভাইয়ের কাছে আসতে হল। দাদার দুঃখ শুনে ছোট-ভাইয়ের চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়তে লাগল। সে দাদাকে নিজের বাড়ীতে রেখে দিয়ে বললে—“আর তোমায় ছাড়ব না।” দাদা আর কি করে? যে ভাইকে সে একদিন বাড়ী থেকে দূর করে দিয়েছিল, শেষে তারই আশ্রয়ে তাকে থাকতে হল।

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

বৃহস্পতির অভিমান

মহর্ষি অঙ্গিরার দুই পুত্র—বৃহস্পতি ও সংবর্ত। শিশুকাল হইতেই বৃহস্পতি ছোট ভাই সংবর্তকে দুইচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। শেষে বৃহস্পতির উৎপাত সহ্য করিতে না পারিয়া সংবর্ত মনের দুঃখে বনে চলিয়া গেলেন। বৃহস্পতি ছিলেন ভারি বুদ্ধিমান, তাই দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে দেবতাদিগের গুরু করিলেন।

পূর্বে বৃহস্পতির পিতা মহর্ষি অঙ্গিরা ছিলেন রাজা করন্ধমের কুলপুরোহিত। রাজা করন্ধমের পৌত্র ছিলেন সেই মরুত্ত, যাঁহার কথা তোমরা পূর্বে “সন্দেশে” পড়িয়াছ। তিনি এমনই ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন যে তাঁহার ক্ষমতা দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের মনে হিংসা হইল। ইন্দ্র রাতদিন কেবলই ভাবেন—কি করিয়া রাজা মরুত্তকে জব্দ করা যায়।

একদিন ইন্দ্র বৃহস্পতিকে বলিলেন—“গুরুদেব! আপনি যেমন মরুত্তের কুলগুরু তেমনি দেবতাদেরও ত কুলগুরু? আপনি স্বর্গবাসী অমরদিগের গুরু হইয়া কিরূপে আবার মৃত্যুর অধীন সামান্য মানুষের যজ্ঞে পুরোহিত হইবেন? এখন হইতে আপনি হয় মরুত্তকে ছাড়িয়া আমাদের, না হয় আমাদের ছাড়িয়া মরুত্তের পুরোহিত হউন। বলুন কোনটি আপনার ইচ্ছা।”

ইন্দ্রের কথায় বৃহস্পতি মহা ভাবনায় পড়িয়া গেলেন অনেক চিন্তার পর তিনি বলিলেন—“দেবরাজ! তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ—প্রতিজ্ঞা করিলাম, এখন হইতে মরুত্তের যজ্ঞে আর পুরোহিত হইব না।” শুনিয়া ইন্দ্র যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন।

মহারাজ মরুভূ, এই সংবাদ পাইয়া, তৎক্ষণাৎ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করিয়া বৃহস্পতিকৈ বলিলেন—“ভগবন্! পূর্বে আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন, খুব বড় একটা যজ্ঞ কর। আমি আয়োজন করিয়াছি; এখন যজ্ঞটি সুসম্পন্ন করুন।”

বৃহস্পতি বলিলেন—“বৎস মরুভূ! আমি যে ইন্দ্রের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, মানুষের যজ্ঞ আর কাজ করিব না, তোমার অনুরোধ কি করিয়া রাখি?”

মরুভূ কহিলেন—“প্রভু! আপনি আমাদের কুলগুরু, আপনি না করিলে আমার যজ্ঞ হইবে কিরূপে?” বৃহস্পতি বলিলেন—“আমি যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তখন কিছুতেই এ কাজ করিব না। তুমি অশ্রু যাহাকে খুসী পুরোহিত কর।”

ভারি লজ্জা পাইয়া মহারাজ মরুভূ বৃহস্পতির নিকট হইতে ফিরিয়া চলিলেন। পথে মহর্ষি নারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—“মহারাজ! তোমার মুখখানি এমন মলিন কেন?” মরুভূ বলিলেন—“ঠাকুর! যজ্ঞের আয়োজন করিয়া গুরু বৃহস্পতিকৈ ডাকিতে গিয়াছিলাম, তিনি আসিলেন না। যখন গুরুই আমাকে ছাড়িলেন, তখন আর বাঁচিয়া থাকিয়া কি হইবে?”

নারদ বলিলেন—“মহারাজ! তুমি দুঃখ করিও না। মহর্ষি অঙ্গিরার দ্বিতীয় পুত্র পরম ধার্মিক সংবর্তকে সম্ভষ্ট কর, তিনিই তোমার যজ্ঞ শেষ করিয়া দিবেন।”

মরুভূ বলিলেন—“সংবর্ত এখন কোথায় আছেন? কিরূপে তাঁহার দেখা পাইব? আর কি করিলেই বা তিনি সম্ভষ্ট হইয়া আমার পুরোহিত হইবেন?”

তখন নারদ বলিলেন—“সংবর্ত এখন পাগলের বেশে বারণসীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তুমি বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দরজায় একটা শব রাখিয়া সেখানে অপেক্ষা কর। যিনি মন্দিরের দরজায় আসিয়া এই শব দেখিয়াই ফিরিয়া চলিবেন, নিশ্চয় জানিও তিনিই মহাত্মা সংবর্ত। তুমি তাঁহার পিছন পিছন যাইবে। তারপর কোন নির্জন স্থানে উপস্থিত হইলে, তাঁহার সম্মুখে গিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইবে। সংবর্ত যদি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কাহার নিকট আমার খোঁজ পাইলে? তখন বলিও—মহর্ষি নারদের নিকট।”

মহারাজ মরুভূ নারদের উপদেশে কাশীতে গিয়া, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দরজায় একটা শব রাখিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে এক ব্যক্তি আসিয়া মন্দিরের দরজায় শব দেখিয়াই ফিরিয়া চলিলেন। মরুভূ তখনই যোড় হস্তে তাঁহার পিছন পিছন চলিলেন। কিছু কাল পরে নির্জন জায়গায় গিয়া, যাই তিনি সংবর্তের

সম্মুখে গিয়াছেন, অমনি সংবর্ত তাঁহার গায়ে কাদা ছুড়িয়া মারিলেন, থুথু দিতে লাগিলেন ! মরুত তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া আবার তাঁহার পিছন পিছন চলিলেন । শেষে ক্লান্ত হইয়া সংবর্ত প্রকাণ্ড এক বটগাছের ছায়ায় বসিলে পর, মরুতও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে ঘোড়হস্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন ।

তখন মহাত্মা সংবর্ত মরুতকে বলিলেন—“মহারাজ ! সত্য করিয়া বল, কাহার নিকট তুমি আমার কথা জানিয়াছ । যদি মিথ্যা বল তবে তোমার মাথাটি ফাটিয়া এখনই শত খণ্ড হইয়া যাইবে !” মরুত বলিলেন—“প্রভু ! আমি পথে মহর্ষি নারদের নিকট আপনার কথা জানিতে পারিয়াছি । আপনি আমার গুরুপুত্র, আপনাকে আমার যজ্ঞের পুরোহিত করিতে চাই ।”

মরুতের কথায় সংবর্ত হঠাৎ রাগিয়া গালাগালি দিতে দিতে বলিলেন—“মহারাজ ! তোমার পুরোহিত হইবার ক্ষমতা আমার আছে, কিন্তু দেখিতেছ, আমার মাথার ঠিক নাই—কেমন করিয়া তোমার যজ্ঞ করিব ? বৃহস্পতি আমার বড় ভাই, আগে তাঁহার অনুমতি আন, তারপর তোমার যজ্ঞ করিব ।”

তখন মরুত তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন । বৃহস্পতির প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া সংবর্ত বলিলেন—“আচ্ছা, আমি যখন যেরূপ বলিব, তুমি যদি সেইরূপ করিতে রাজি হও, তবেই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিব । আমি তোমার যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, ইন্দ্র ও বৃহস্পতি রাগিয়া আমার কাছে বাধা দিতে আসিবেন । তখন হয়ত আমার প্রতি তোমার আস্থা নাও থাকিতে পারে । অতএব তুমি আগে প্রতিজ্ঞা কর । নতুবা পরে যদি তোমার ব্যবহারে আমার রাগ হয়, তবে কিন্তু তোমাকে সপরিবারে ভস্ম করিয়া ফেলিব ।” মরুত তখন প্রতিজ্ঞা করিয়া মহাত্মা সংবর্তকে সন্তুষ্ট করিলে, তিনি যজ্ঞের জন্ত প্রস্তুত হইলেন ।

এই সংবাদ পাইয়া বৃহস্পতির হৃৎকের সীমা রহিল না । তাঁহার হৃৎক দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র সবিষ্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—“গুরুদেব ! আপনি দেবগণের গুরু, আপনি অমর । আপনার কিসের হৃৎক ?”

বৃহস্পতি বলিলেন—“সংবর্ত আমার প্রধান শত্রু ; তাই তাহার ক্ষমতা দেখিয়া আমার মনে হৃৎক হইয়াছে । সংবর্ত যদি এই যজ্ঞ নিৰ্ব্বিলম্বে শেষ করিতে পারে তবে তাহার গৌরবের আর সীমা থাকিবে না—আমার পক্ষে তাহা অসহ্য হইবে । এখন তুমি যেরূপে পার ইহার একটা উপায় করিয়া দাও ।”

তখন দেবরাজের পরামর্শে অগ্নি মরুভূমিকে গিয়া বলিলেন—“মহারাজ ! ইন্দ্র আদেশ করিয়াছেন, তুমি সংবর্তকে ছাড়িয়া বৃহস্পতিকে তোমার পুরোহিত কর।”

মরুভূমি বলিলেন—“বৃহস্পতি অমররাজ ইন্দ্রের গুরু—আমার মত সামান্য মানুষের যজ্ঞে পুরোহিত হওয়া কি তাঁহার শোভা পায় ?”

তখন অগ্নি মরুভূমিকে লোভ দেখাইতে লাগিলেন—“বৃহস্পতিকে পুরোহিত করিলে তাঁহার অনুগ্রহে তুমি অমর হইয়া স্বর্গে যাইবে। সেখানে ইন্দ্রের প্রসাদে তোমার স্মৃতির সীমা থাকিবে না।” সংবর্ত তখন রাগিয়া বলিলেন—“ওহে অগ্নি ! ভাল চাও ত এখান হইতে প্রস্থান কর। নতুবা নিশ্চয়ই তোমাকে ভস্মসাৎ করিব।” সংবর্তের ক্রোধমূর্ত্তি দেখিয়া অগ্নিদেব ছুটিয়া একেবারে ইন্দ্রের নিকট গিয়া উপস্থিত।

অগ্নির নিকট সব কথা শুনিয়া ইন্দ্রের রাগ হইল। তিনি বলিলেন—“অগ্নি ! তুমি আবার যাও। মরুভূমিকে বল, সে যদি আমার কথা না শুনে, তবে বজ্র দিয়া তাহাকে বধ করিব।” ভীত হইয়া অগ্নি বলিলেন—“আমার দ্বারা একাজ হইবে না। “আপনি গন্ধর্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে পাঠাইয়া দিন।”

ইন্দ্রের আদেশে গন্ধর্বরাজ মরুভূমির নিকট গিয়া বলিলেন—“মহারাজ ! ইন্দ্র বলিয়াছেন, আপনি যদি সংবর্তকে ছাড়িয়া বৃহস্পতিকে পুরোহিত না করেন, তবে তিনি বজ্র দিয়া আপনাকে বধ করিবেন।” মরুভূমি বলিলেন—“গন্ধর্বরাজ ! দেবগুরু বৃহস্পতি যেন বজ্রধর ইন্দ্রের যজ্ঞেই পুরোহিত হন। আমার যজ্ঞ মহর্ষি সংবর্তই করিবেন—ইহার কখন অশুখা হইবে না।”

বলিবামাত্র আকাশ হইতে ইন্দ্রও বজ্রহাতে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, বিদ্যুতের আলোকে আকাশ জ্বলিয়া উঠিল।

তখন মরুভূমিকে ভীত দেখিয়া সংবর্ত বলিলেন, “ভয় নাই—ইন্দ্রের শক্তিকে আমি এখনই অবশ্য করিয়া দিতেছি। বজ্র পড়ুক, আকাশ বিচলিত হউক, পৃথিবী প্লাবিত হউক, তবু তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না। এই দেখ আমি বায়ুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বজ্রকে শাস্ত করিতেছি।” মুহূর্ত্তের মধ্যে সকলকে স্তম্ভিত করিয়া, সংবর্ত আবার বলিলেন—“মহারাজ ! তোমার আর কি চাহিবার আছে বল, এখনই তাহা করিয়া দিব।”

মরুভূমি বলিলেন—“প্রভু ! মন্ত্রবলে ইন্দ্র ও অশ্ব সব দেবতাদের ডাকুন, তাঁহারা স্বশরীরে আসিয়া যেন যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করেন।”

তখন মহর্ষি সংবর্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণকে আহ্বান করিতেই তাঁহারা যজ্ঞস্থলে আসিয়া উপস্থিত। মরুত্ত ইন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—“দেবরাজ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনার প্রসাদে আমার যজ্ঞ আজ সার্থক হউক।”

ইন্দ্র বলিলেন—“মহারাজ! এই মহাতেজস্বী সংবর্তমুনির মন্ত্রের আহ্বান অগ্রাহ্য করিবার সাধ্য কাহারও নাই। তোমার প্রতি আমার যে বিরূপ ভাব ছিল তাহা ভুলিয়া, আজ আনন্দচিত্তে তোমার যজ্ঞে আসিয়াছি।”

এইরূপে দেবগণের সহিত স্বয়ং দেবরাজ মরুত্ত রাজার যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিলেন। বৃহস্পতির অভিমান চূর্ণ হইল।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।



পুরাতন লেখা

(৩০পেত্রিকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত)

ধূমকেতু

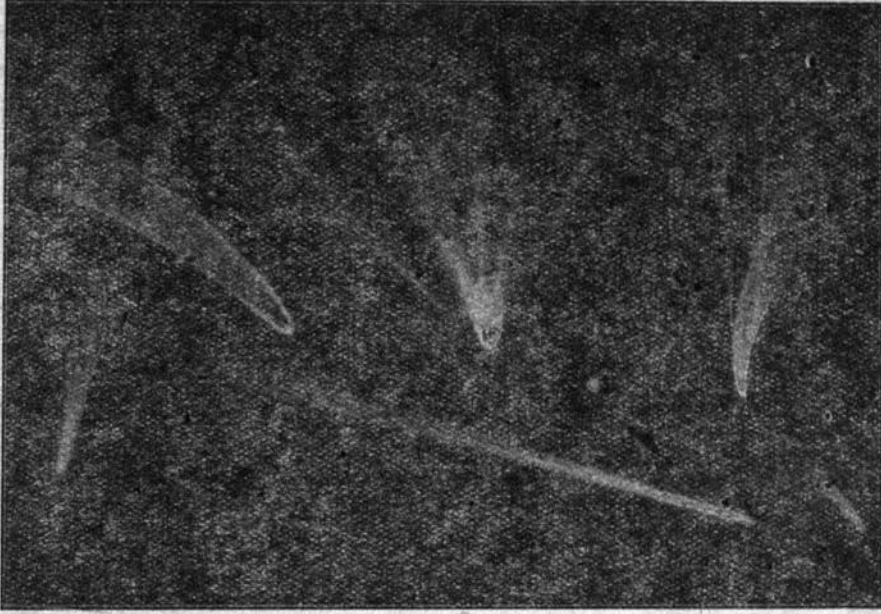
যাত্রায় যেমন সং, আকাশে তেমনি ধূমকেতু। আকাশের গ্রহ নক্ষত্রগুলির সকলেরই এক একটা নিয়মিত কাজ আছে ; কিন্তু ধূমকেতুগুলিকে দেখিলে হঠাৎ মনে হইতে পারে, যে ইহাদের কোন বাঁধা কাজ নাই। কোথায় যায় কোথায় থাকে তাহার ঠিক নাই, খালি মাঝে মাঝে এক একবার লেজ পরিয়া আসিয়া, দিন কয়েক তামাসা দেখাইয়া যায়।

আমি দেখিয়াছি, সং আসিলে, কোন কোন ছোট ছেলে ভঁা করিয়া কাঁদিয়া ফেলে। ধূমকেতুকে দেখিলে কেহ কাঁদে কি না জানি না। কিন্তু সেকালে অনেক লোকেরই বিশ্বাস ছিল, যে ধূমকেতু উঠিলে বড়ই ভয়ের কারণ হয়। হয় ভয়ানক মারীভয় হইবে, না হয় ছুঁভিক্ষ হইবে ; আর কিছু না হইলেও অন্ততঃ একটা রাজা টাজা কেহ মরিবে। ক্রমে ইহাদের সম্বন্ধে লোকে যতই বেশী জানিয়াছে, এ বিষয়ে ভয়ও ততই কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহা খুব অল্প দিনে হয় নাই।

ধূমকেতু যে কি জিনিস, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। তবে ইহাতে জিনিস যে খুব সামান্য, আর যাহা আছে তাহাও যে ধোঁয়ার মতন, তাহা অনেক দিন আগেই বুঝা গিয়াছিল। একটু শক্ত ভারি জিনিসের অমন খামখেয়ালী চাল চলন হয় না।

খামখেয়ালী নয় ? আচ্ছা অত বড় একটা লেজের তার কি দরকার বল দেখি ! কোন কোনটির আবার একটা লেজে মন উঠে না। দুটি, তিনটি, একটার আবার ছটি লেজ দেখা গিয়েছিল। আর একটা প্রথমে ভাল মানুষের মতন আসিয়াছিল। তার পর দু দিনের ভিতরে কোথা হইতে ছয় কোটি মাইল লম্বা এক লেজ বাহির করিল। কেহ কেহ আবার একলাটি আসেন, তারপর দুটি তিনটি হইয়া যান। এক একটা ধূমকেতু এত মোটা, তাহার লেজটা লক্ষ মাইল পুরু, তথাপি তাহার ভিতর দিয়া পিছনের তারাগুলিকে পরিষ্কার দেখা যায়। এ সকল দেখিলে এই কথাই বলিতে হয়, যে শক্ত জিনিসের ওরূপ হওয়া সম্ভবে না। ৬ নেহাৎ হাঙ্কা ধোঁয়ার মত কিছু হইলে তবে এ সব সম্ভব হয়।

এমন যন্ত্র আছে, যে তাহার ভিতর দিয়া কোন জ্বলন্ত জিনিসের আলোক পরীক্ষা করিলে, সেই জ্বলন্ত জিনিসটা কি, তাহা বলিয়া দেওয়া যায়। এই যন্ত্রের নাম



১৮৮২

১৮১১

১৮৬১

১৮৪৩

১৮৫৮

১৯১০

কতগুলি ধূমকেতুর ছবি - গোল বিন্দুটি চাঁদ।

বর্ণবীক্ষণ (Spectroscope)। এই যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, যে ধূমকেতুতে অঙ্গার, লোহা, 'হাইড্রোজেন' ইত্যাদির জ্বলন্ত বাষ্প আছে। এই বাষ্প এত পাতলা অবস্থায় আছে, যে মোটের উপরে তাহাদের পরিমাণ অতি সামান্য। এমন কি, কোন উপায়ে যদি একটা ধূমকেতুকে ধরিয়া ঘন করা যাইত, তাহা হইলে হয় ত তোমরা তাহার লেজটাকে পকেটে পুরিতে পারিতে। বেশ বড় একটা ধূমকেতুর লেজের গুজন হয়ত কয়েক সেরের বেশী হইবে না।

ডাক্তার হেলী নামক এক জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পুরাতন পুস্তকাদি পড়িয়া দেখিলেন, যে ১৫৩১, ১৬০৭, ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে এক একটা ধূমকেতু উঠিয়াছে। মোটামুটি প্রায় একই সময় অন্তর এক একটা ধূমকেতুর উদয় দেখিয়া, ডাক্তার হেলী

মনে করিলেন, যে হয় ত একই ধূমকেতু ঐরূপ ৭৫।৭৬ বৎসর অন্তর এক একবার ফিরিয়া আসিয়াছে। হয় ত গ্রহগুলির মতন ইহারও একটা নির্দিষ্ট পথ আছে, এবং সেই পথ একবার ঘুরিয়া আসিতে তাহার ঐরূপ সময় লাগে। একথা যদি সত্য হয়, তবে ১৭৫৯ সালে ঐ ধূমকেতুর আবার ফিরিয়া আসিবার কথা। বাস্তবিক ১৭৫৯ সালে ঐরূপ একটা ধূমকেতু আসিয়া উপস্থিত হইল। এর পর আর বৃষ্টিতে বাকি রহিল না, যে ঐ ধূমকেতুটি এক নির্দিষ্ট পথে চলে, এবং একবার সেই পথ ঘুরিয়া আসিতে তাহার ৭৫।৭৬ বৎসর লাগে। ডাক্তার হেলী এই কথা প্রথম প্রমাণ করিলেন, সুতরাং এই ধূমকেতুর নাম “হেলীর ধূমকেতু” রাখা হইল। *

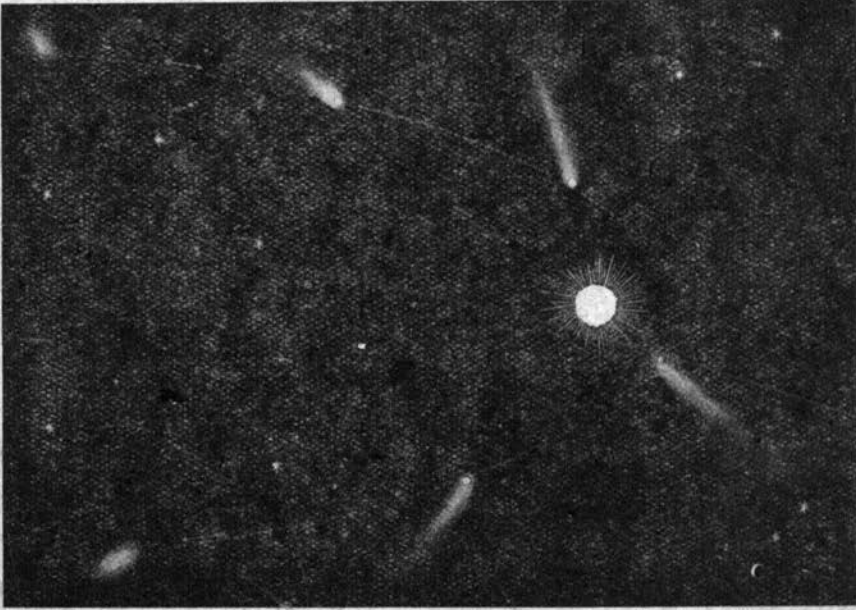
ইহার পর হইতে এ পর্যন্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনেক উন্নতি হইয়াছে, আর খুব ভাল ভাল দূরবীক্ষণ-প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার সাহায্যে এখন প্রতিবৎসরই ছোট বড় বিস্তর ধূমকেতু দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষে ইহার সবগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না, তাই আমরা বৃষ্টিতে পারি না, যে ধূমকেতু এমন সচরাচর দেখা সম্ভব। এখন আর পুরাতন পুথি খুঁজিয়া ধূমকেতু উঠিবার সময় স্থির করিতে হয় না। দিন কতক একটা ধূমকেতুকে দেখিলেই এখন জ্যোতির্বিদেরা তাহার নানী নক্ষত্র সমস্ত বলিয়া দিতে পারেন। সে কোন্ পথে চলে, কয় দিনে ফিরিয়া আসিবে, ঘণ্টায় ক’ মাইল যায়—ইত্যাদি, সকল কথাই এখন স্থির করা যায়।

এমন ধূমকেতু আছে, যে তাহা সওয়া তিন বৎসর পর পর একবার ফিরিয়া আসে। আবার একলক্ষ বৎসর পর একবার আসে এমন ধূমকেতুও আছে। আবার ধূমকেতুর পথ বাহির করিতে গিয়া এমন ধূমকেতুও পাওয়া গিয়াছে, যে তাহারা আর কদাপি ফিরিয়া আসিবে না।

ধূমকেতুগুলি এত বড় বলিয়া তাহাদিগকে দেখিলে সহজে বিশ্বাস হয় না, যে তাহারা এত হাল্কা। আগেকার লোকেরা অনেক সময় এই মনে করিয়া ভয় পাইত, যে এই ধূমকেতুগুলির যখন এত বুনো মেজাজ, তখন একটা পাগলা ধূমকেতু যদি ছুটিয়া আসিয়া পৃথিবীতে ঢুঁ মারে, তবে কি ভয়ানক কাণ্ডই হয়! কিন্তু ঐরূপ হাল্কা জিনিসের দ্বারা পৃথিবীর কোন অনিষ্ট হওয়ার বিশেষ আশঙ্কা দেখা যায় না। ১৮৬১ সালে একটা অতি প্রস্রাণ ধূমকেতু উঠিয়াছিল। অনেকে বলেন, যে সেই সময়ে

* ইহার পর এই ধূমকেতুটি আরও দুইবার আসিয়া দেখা দিয়াছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে শেখবার আসিয়াছিল এবং পৃথিবীকে লেগের বাড়ি মারিয়াছিল। তাহাতে পৃথিবীর কোন অনিষ্ট হয় নাই, কিন্তু ধূমকেতুর লেজটি ছিঁড়িয়া ছুঁইয়া পুঁকরা হইয়া যায়।

পৃথিবী সেই ধূমকেতুর লেজের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কাহারও বিশেষ কিছু হয় নাই। আর একবার একটা ধূমকেতু বৃহস্পতিকে ঘেসিয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে বৃহস্পতির কিছুই হয় নাই বটে, কিন্তু ধূমকেতু বেচারী কেমন খতমত খাইয়া পথ ভুলিয়া গেল। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, জগতের সকল জিনিসই সেইরূপ পরস্পরকে টানে। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদি সকলেই পরস্পরকে টানে। ধূমকেতু বৃহস্পতির কাছে দিয়া যাইবার সময় বৃহস্পতিও তাহাকে ঐরূপ টানিয়াছিল। ধূমকেতু তখন সূর্য্যের কাছে যাইবার জন্য গৌঁ করিয়া ছুটিতেছিল, তাই সে যাত্রা সে বৃহস্পতির হাত এড়াইয়া গেল—কিন্তু সেই টানাটানিতে আর তাহার পথ ঠিক রহিল না। আগে এই ধূমকেতু ৫১০ বৎসর অন্তর এক একবার আসিত। কিন্তু ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বৃহস্পতির কাছে তাড়া খাইয়া সেই যে সে পালাইয়াছে, এ পর্য্যন্ত আর ফিরে নাই।



ধূমকেতু সূর্য্যের কাছে আসিলে খুব ছুটে। বাস্তবিক ইহার চরিত্র অতি অদ্ভুত।

সূর্যের নিকটে আসিলেই যেন ইহার মাথায় গোল লাগিয়া যায়। তখন ইহাকে দেখিলে মনে হয়, যেন কুকুরের সামনে বিড়াল পড়িয়াছে। দূরে থাকিতে, ধীরে ধীরে চলিয়াছিল, তখন তাহার তেমন ভয়ানক লেজও ছিল না তেজও ছিল না; দূরবীন দিয়া তাহাকে একটা ঝাপসা তুলার ডেলার মতন দেখা যাইত। ক্রমে যতই সূর্যের কাছে আসিতে লাগিল ততই উজ্জ্বল আর গরম হইতে লাগিল। ক্রমে লেজটি দেখা দিল, আর সেই লেজটিকে অতি সাবধানে সূর্যের দিক হইতে ফিরাইয়া রাখিতে লাগিল। বেগ প্রায় লক্ষগুণ বাড়িয়া গেল। আবার সূর্যের নিকট হইতে চলিয়া যাইবার সময় ক্রমেই শান্ত্যাব ধারণ করিল।

একবার একটা ধূমকেতু হঠাৎ দুইভাগ হইয়া যায়। সেই দুইভাগ স্বতন্ত্র দুইটা ধূমকেতুর মতন একই পথে চলিতে থাকে। এই ধূমকেতুর নাম “বিয়েলার ধূমকেতু”— অর্থাৎ বিয়েলা নামক একজন পণ্ডিত ইহার আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বিয়েলার ধূমকেতু ৬১০ বৎসর পর পর ফিরিয়া আসিত। ১৮৪৫ সালে এই ধূমকেতু দুভাগ হইয়া গেল; আবার ১৮৫২ সালে সেই দুইভাগ একসঙ্গে ফিরিয়া আসিল। ইহার পর আর এ পর্যন্ত তাহাদিগকে দেখা যায় না। কিন্তু এই ধূমকেতু আকাশে যে পথে চলিত, পৃথিবী সেই পথের কাছ দিয়া যাইবার সময় ক্রমাগত তিনবার খুব উজ্জ্বল হইয়াছে। পণ্ডিতেরা বলেন, যে বিয়েলার ধূমকেতু হইতেই এই উজ্জ্বলতার উৎপত্তি।

১৮৮২ সালে খুব বড় একটা ধূমকেতু উঠিয়াছিল। ইহার পর আর এত বড় ধূমকেতু দেখা যায় নাই। এই ধূমকেতুর লেজ দশ কোটি মাইল লম্বা ছিল।

পঞ্চুলাল

পঞ্চু তো মাছের পেটে বন্দী, কে তাকে উদ্ধার করবে? প্রথমে অন্ধকারে পঞ্চু কিছুতে দেখতে পায়নি, তারপরে খানিক বাদে হঠাৎ দেখলে, যেন আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলে, দেলকোর উপরে ছোট্ট একটি প্রদীপ জ্বলছে, তারি পার্শে বসে একজন বুড়ো মানুষ কি যেন খাচ্ছে। বুদ্ধটিকে দেখে পঞ্চু নাচবে কি গাইবে, কাঁদবে কি হাসবে, কিছুই বুঝতে পারল না—খানিকটে হাঁ করে থেকে তারপর একেবারে দৌড়ে গিয়ে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

লোকটি আর কেউ নয়, পঞ্চুর বাপ গুপী—নৌকাশুদ্ধ বোয়ালের পেটে এতদিন বাস করছে। গুপী পঞ্চুকে জড়িয়ে ধরে হেসে কঁদে বলে “তুই কি সত্যি পঞ্চুই বটিস—আমি ভাবছি পঞ্চু বাপই এসেছে, আবার পেতায়ও হচ্ছে না।” পঞ্চু এক নিশ্বাসে তার সব বৃত্তান্ত বলে, তারপর একটু দম নিয়ে, বলে “আর এখানে থাকা চলবে না, এবার ফিরতে হবে।” গুপী বলে “কি উপায়ে ফেরা যায়?” পঞ্চু বলে “কুছ পরোয়া নেহি। চল দেখি পথ পাওয়া যায় কি না।” পঞ্চু এক হাতে গীদিম নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল। চলতে চলতে একবারে মাছের মুখের কাছটিতে এসে পড়ল। এখন, বোয়াল মাছটার ছিল হাঁপানী রোগ, মুখ বুজে ঘুমতে পারে না—সে হাঁ করেই ছিল। সেইখানটিতে দাঁড়িয়ে পঞ্চু দেখতে পেল, সাগরের নীল জল স্থির, আকাশের নীলে মেঘ নেই, কত যে তারার প্রদীপ জ্বলছে তার গোণা গাঁথা নেই। চারিদিক শান্ত নিস্তব্ধ। ঢেউরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। পঞ্চু বলে—“এবার আমায় জড়িয়ে ধর, আমি জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, সাতরে কূলে যাব।” গুপী ছেলের পিঠে এঁটে বসল—পঞ্চু ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। কিছু দূর যেতে না যেতে গুপী কাঁপতে লাগল—বুড়ো শরীর, রাতের বেলা, ঠাণ্ডা জল, তার উপর ভয়ে রক্ত জল হয়ে আসছে।

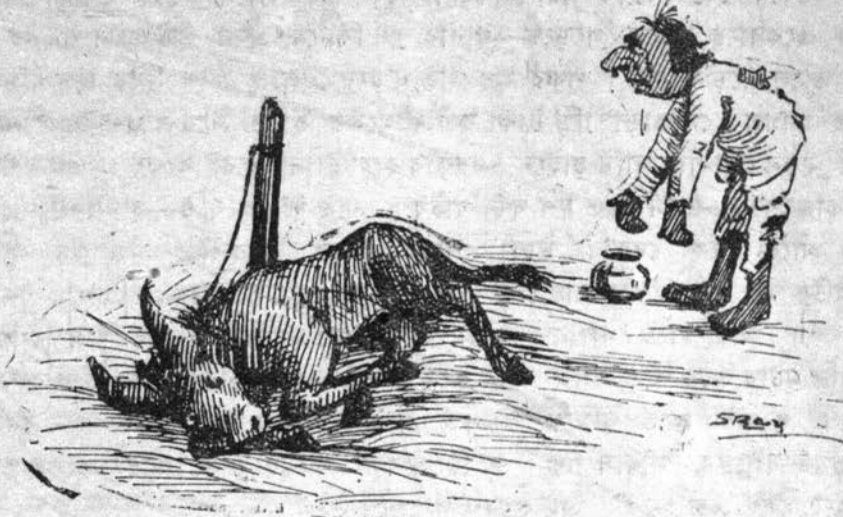
গুপী কাঁপতে কাঁপতে ভাঙা ভাঙা গলায় বলে “শেষকালে দেখছি মাঝ দরিয়ায় ডুবে মরাই কপালে লেখা ছিল।” পঞ্চু বলে “ভয় কি? এ যে কিনারা, এখনি পৌঁছে যাব।” কিন্তু বাপকে ভরসা দিলেও তার প্রাণের মধ্যে ভয় ঢুকেছিল; প্রাণ-পণে সাতরে চলতে চলতে হঠাৎ সেও চীৎকার করে উঠল, “বাঁচাও, বাঁচাও, গেলাম গেলাম।” বলতেই অন্ধকারে কে যেন চৈঁচিয়ে বললে “ভয় নেই, আমি আছি।” গলার স্বরে পঞ্চু বুঝলে এ সেই কুকুরটা—সে যার প্রাণ বাঁচিয়ে ছিল।

কুকুরটা বাঁপিয়ে পড়ে ছজনকেই টেনে তীরে তুললে। পঞ্চু তাকে কত ধন্যবাদ দিলে ও আদর করলে, তার ঠিক নেই। বেচারী কুকুরের ভাগ্যে চিরকাল লাঠি বাঁটা, কিল চাপড় লাখী, এই ছিল বরাদ্দ—তাই পঞ্চুর সদয় ব্যবহারে তার ছুটি চোখ জলে ভরে উঠল। ততক্ষণে ভোর হয়েছে, গুপী এগ্নি কাহিল হয়ে পড়েছে যে পঞ্চু তাকে ধরে ধরে অতি আস্তে আস্তে চলেছে। কয়েক পা যায় আর বিশ্রাম করে। এমন সময় দেখে কি, একটা বেড়াল আর একটা শেয়াল—“দয়া কর গো ভিক্ষা দাও” বলে এসে দাঁড়াল। তারা আর কেউ নয় সেই পঞ্চুর চোর সঙ্গী ছজন, দেবদেবের

জুয়াচোর পাণ্ডা ! বেড়ালটা ভাণ করতে করতে এতদিনে সত্যি, অন্ধ হয়ে গেছে— আর শেয়ালটা ও খোঁড়া—তার লেজটি পর্যন্ত নেই, পেটের দায়ে বেচে ফেলেচে। পঞ্চু তাদের চিন্তে পেরে দূর করে দিলে। আরো কিছু দূরে একটি ছোট্ট পরিষ্কার ঝরঝরে, খোঁড়ো কুঁড়ে দেখে পঞ্চু আর গুপী তার ছুয়োর ঠেলা দিলে। যার ঘর সে ছুয়োর খুলে দিলে—জিজ্ঞাসা করলে—“কে ওখানে ?” সে কথা বলছে অথচ তাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না, পঞ্চু তাই জিজ্ঞাসা করলে, “হ্যাঁগা বাড়ীর কর্তা, তুমি কোথা ?” কর্তা বললেন “এই যে এখানে।” পঞ্চু চেয়ে দেখে কি, কর্তা চালের মটকায় বসে ! তিনি আর কেউ নন, সেই ঝিল্লী চক্রবর্তী। পঞ্চু ত অবাক ! সে বললে “দোহাই তোমার, ঝিল্লী গৌসাই, দয়ার শরীর তোমার, আমাদের কিছু খেতে দাও !”

ঝিল্লী বললে “আজ তো আমার দয়ার শরীর হল, কিন্তু হাতুড়ির ঘায়ে আমার মাথা খেঁৎলে দিয়েছিলে মনে আছে ? যাক, তোমরা অতিথি, তোমাদের কিছু বলতে নেই, খালি একটিবার মনে করিয়ে দিলাম।” ঝিল্লীর পরিষ্কার ঝরঝরে সুন্দর ঘরখানি দেখে পঞ্চু বললে “আহা ! সুন্দর ঘরখানি কোথা পেলে ঝিল্লী গৌসাই !” “একটি নীলগাই আমায় দিয়েছে। তার মাথার লোমগুলি আকাশের মত নীল রঙের। সে কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছিল আর বলছিল, ‘পঞ্চু আর ফিরে আসবে না’।” “তাই নাকি ? কাঁদছিল ? আমার জন্তু কে আর কাঁদবে ? সে নিশ্চয় আমার বনশ্রী মা।” পঞ্চুও বসে বসে অনেকক্ষণ কাঁদলে, তারপর বললে “গৌসাই ঠাকুর বলতে পার কোথায় পোয়াটেক ছুধ পাওয়া যায় ?” ঝিল্লী বললে—“ঐ যে মাঠের পারে কুঁড়ে ঘর দেখছ, সেখানে থাকে গঙ্গা ঘোষ—সে ছুধ দিতে পারবে।” পঞ্চু গঙ্গা ঘোষের ছুয়ারে গিয়ে বললে—“ঘোষের পো—ছটাক পাঁচেক ছুধ দিতে পার ?”—“তা আর পারিনে ? পাঁচটি পয়সা চাই কিন্তু !” পঞ্চু বললে “তবেই হয়েছে ! পাঁচ পয়সা ছেড়ে পাঁচ কড়াও নেই যে।” ঘোষ বললে, “আচ্ছা আমার একটা কাজ যদি কর তবে আর পয়সা দিতে হয় না।”—সেই সকালের সয়তান পঞ্চু আজ আর দ্বিকল্পনা না করে তার কথামত ঘড়া আর দড়ি নিয়ে কুয়োয় জল তুলতে লেগে গেল। দর্শ ঘড়া জল তুলে দিয়ে তবে তার ছুটি। গঙ্গা ঘোষ বললে, “যে গাধাটা আমার কপিকল ঘুরিয়ে জল তুলত, সে আজ দু'দিন থেকে পড়ে আছে—বাঁচবে না বোধ হয়।” পঞ্চু গোয়াল ঘরে উঁকি মেরে দেখলে একটা গাধা বিচালীর উপর

পড়ে খাবি খাচ্ছে। পঞ্চ তার কাণের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে “তুমি কে?” ক্ষীণ স্বরে উত্তর এল “মোমবাতি”। বন্ধুর দশা দেখে চোখের জলে পঞ্চর বুক ভেসে



যেতে লাগল—কিন্তু তখন আর উপায় কিছুই নেই। পঞ্চ ছুধের ঘটিটি নিয়ে ফিরে আসতে ঝিল্লী চক্রবর্তী দয়া করে তাদের থাকবার জায়গা দিল।

আশ্চর্য্য! যে পঞ্চ নড়ে বসত না, নবাবী করাই ছিল যার কাজ, সে রোজ ভোরে কাক কোকিল ডাকবার আগেই, উঠে গঙ্গা ঘোষের জল তুলে দিয়ে তার কাছ হতে ছুটুকু এনে বাপকে খাওয়াত। তারপর অবসর সময়ে বেত দিয়ে ধামা বুনে, তাই বেচে যে পয়সা পেত, তাতেই কোনরূপে ছুজনার দিন চালাত। এই রকম মেহনত করে সে কিছু টাকাও জমিয়ে ফেললে। একদিন সে গুপীকে বললে “কাপড় চোপড় তো কিছু নেই, আজ হাট-বার, গিয়ে কিনে আনি। যখন নতুন কাপড় পরে ফুল বাবুটি সেজে এসে দাঁড়াব, তুমি আমায় চিন্তে পারবে না”।

পথে মনের আনন্দে তাইরে নাইরে বলে গাইতে গাইতে চলেছে, এমন সময় শুন্লে ক্ষীণ গলায় কে যেন তাকে ডাকছে। ফিরে দেখে শ্রীমা বনশ্রীর দাসী সেই শামুক। যেমন দেখা আর অমনি আনন্দ, তারপর নৃত্য গীত। পঞ্চ নাচতে নাচতে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে “ওমা শামুক দিদি! তাইত বলি, কে আমায়

ডাকে। আমার বনশ্রী মা কোথায়, কেমন আছে, কি করছে? তুমি এখানে কি করছ? কত দূরে তার বাড়ী?” এত প্রশ্নের উত্তর একদমে দেওয়া কারো সাধ্য নয়। শামুক থেমে থেমে বললে “পরী-দিদিমণির যে বড্ড ব্যামো—হুঃখু পেয়ে পেয়ে শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে—খাবার যে কিন্বে, এমন ছুটি পয়সাও নেই—হাস্পাতালে পড়ে আছে”! পঞ্চুর মুখ পাণ্ডাস হয়ে গেল, ছু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল; সে তাড়াতাড়ি টাকা কটি শামুকের হাতে দিয়ে বললে—“এই নিয়ে যাও। নতুন পোষাক আমি চাইনে—দরকার হলে ট্যানা পরেই থাকব। এখন পাঁচ ঘণ্টা কাজ করি—এখন হতে দশ ঘণ্টা খাটব। যাও শীঘ্রির যাও—দুদিন পরে এস, আমি আরো টাকা দেব”। টাকা পেয়েই শামুক একেবারে গড় গড় করে গিরগিটির মত দৌড় দিলে তার সেই চিমা তেতালা চাল কোথায় যে গেল, বোঝাই দায়! পঞ্চু আর হাটে গেল না—বাড়ী ফিরে ধামা বুনতে সুরু করে দিলে। অল্প দিন রাত নটায় শুয়ে পড়ে, আজ যখন শুতে গেল তখন ঘড়ীতে ঢং ঢং করে বারটা বাজল। শুতে না শুতে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল—যেন বনশ্রী এসেছেন—বলছেন, “সাবাস পঞ্চু! যে ছেলে বাপ মায়ের সেবা করে—হুঃখীর হুঃখ দূর করে, সেই ধন্য হয়।” এই শুনে পঞ্চু জেগে উঠল।

জেগে উঠে সে ত অবাক! খোড়ো কুঁড়ের বদলে দিব্যি সুন্দর তক্তকে ঝক্-ঝকে সাদা পাথরের নতুন ঘর। আসবাব পত্র নতুন—বিছানার পাশে ছোট একটি হাতীর দাঁতের কোটো—কোটোর ডালায় লেখা রয়েছে “স্নেহের পঞ্চকে বনশ্রীদিদির উপহার”। কোটো খুলে দেখে ৪০টা নতুন মোহর ঝক্ ঝক্ করছে, যেন তখনি টাকশাল হতে গরম গরম তৈরি হয়ে এসেছে। ঘরে একখানি আয়নাও ছিল, মুখ দেখতে গিয়ে পঞ্চু নিজেকে চিনতেই পারে না! এতো সে কেঠো মুখ নয়—এষে একেবারে মানুষের মত হাসিতে আনন্দে উজ্জল মুখ। যে দিকে তাকায় সবই নতুন, সবই সুন্দর, সবই জীবন্ত। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখে, গুপী আবার ছুতোরের কাজে লেগে গেছে—তার সুস্থ শরীর সেই আগেকার পাকা আমটির মত। পঞ্চু অবাক হ’য়ে জিজ্ঞেস করলে—“কেমন করে এসব হ’ল”? গুপী বললে—“হুঃখু মন বদলে যখন ভাল হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীটাও বদলে গিয়ে নতুন হয়”। পঞ্চু গম্ভীর হয়ে বললে—“আমি যখন কাঠের পুতুল ছিলাম তখন সবই কেমন বিগড়ে যেত, আজ মানুষ হ’য়ে দেখছি মানুষ হ’তে না পারলে সুখ নেই।

পরের হাতের পুতুল হওয়াটা কোন কাজের কথা নয়। মানুষ হয়েছি মানুষই থাকব—আর কখনো পুতুল হচ্চিনে।”

ঘরে ঘরে পঞ্চুলাল জন্মে আর বাড়ে,
তাহাদের ছুঁ শনি যদি কভু ছাড়ে
এ কাহিনী লেখা হল, সেই ভরসায়—
হরি হরি বল সবে, পালা হ'ল সায়।

সমাপ্ত।

শ্রীপ্রিয়দর্শনা দেবী।

সুবুদ্ধি গোয়াল

এক গোয়াল হাটে গিয়া একদিন সাত টাকায় তাহার এক ঐড়ে গরু বিক্রয় করিল। বাড়ী আসিতে বেলা দ্বিপ্রহর হইল, তৃষ্ণা পাইল—তাই পথে একটা পুষ্করিণী দেখিয়া সে তাহাতে হাত মুখ ধুইতে গেল। মানুষের সাড়া পাইয়া সেই পুষ্করিণীর যত ব্যাং সমস্ত যঁয়াক যঁয়াক শব্দে ডাকিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সেই যঁয়াক যঁয়াক শব্দ শুনিয়া গোয়াল মনে করিল, ব্যাংগুলি ‘এঁক্’ ‘এঁক্’ বলিতেছে কেন? তাহারা হয়ত জানে না যে আমি সাত টাকায় গরু বেচিয়াছি। তাই এঁক্ এঁক্ বলিতেছে। তখন গোয়াল বলিল “ওরে বোকা এক নয়—সাত। আমি সাত টাকায় গরু বেচিয়াছি”। সে এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

গোয়ালার চীৎকারে ব্যাংগুলির দৃকপাত নাই। গোয়াল যত বলে “আমার কাছে এক টাকা নয়, সাত টাকা,” ব্যাংগুলি তাহার চীৎকারে ভয় পাইয়া ততই বলে ‘যঁয়াক যঁয়াক’। গোয়াল একেবারে রাগিয়া আশুন, অবশেষে পরাজিত হইয়া বলিল “যদি বিশ্বাস না হয়, এই গুলিতেছি দেখ”। এক বলিয়া ক্রমে সে সাত অবধি গণনা করিল। ব্যাংগুলি তথাপি শুনিল না, তাহাদের ডাকও থামিল না। গোয়াল তখন কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল “যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তোরা আপনারাই না হয় গণিয়া দেখ”। এই বলিয়া সাতটা টাকাই সে জলে ফেলিয়া দিল। গোয়াল পুষ্করিণীর তীরে বসিয়াই আছে, ভাবিতেছে কখন ব্যাংগুলি টাকা গণিয়া দেখিয়া ফিরাইয়া দিবে। বেচারি বসিয়া বসিয়া ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল, সন্ধ্যাকালে তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। চারিদিক চাহিয়া দেখিল

ব্যাঙেরা তখনও টাকা ফিরাইয়া দেয় নাই। গোয়াল গালি দিতে আরম্ভ করিল—



“ব্যাটারা সাত-
পুরুষে পাঠ-
শালা-মুখো হয়
নাই, সাতটা
টাকা গণিতে
গুণিতকের সমস্ত
দিন গেল।
ভাল চাস্ ত
টাকা গণিয়া
গাঁথিয়া আমার
বাড়ী দিয়া
আসিস্। তো-
দের জন্ত কি
সারারাত এখানে
বসিয়া থাকিব ?
এই আমি বাড়ী
চলিলাম”। এই

বলিয়া গোয়াল বাড়ী চলিয়া গেল। সুবুদ্ধি গোয়ালার গরু বেচা সাতটা টাকাই
জলে রহিল।

পুঁজির মধ্যে গোয়ালার একমাত্র গরু ছিল, তাহাও বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। সংসার
অচল, খাইতে না পাইয়া গোয়ালিনীর ভাড়ায় গোয়াল চুরি করিতে মনস্থ করিল।
একদিন রাত্রিকালে ঘোর অন্ধকারে গোয়াল এক গৃহস্থের বাড়ী ঢুকিল। গৃহস্থের
গোলা বোঝাই ধান। গোয়াল কাঁধের গামছা গোলার তলায় পাতিয়া ধান পাড়িতে
উঠিল, আর পাহাড় প্রমাণ ধান পাড়িয়া গামছার উপর ঢালিল। এত ধান ঢালিল
যে, ধানের তলায় চাপা পড়িয়া গামছা একেবারে ঢাকা পড়িয়া গেল। গোলার
ভিতরেই ধামা ছিল, ধামায় করিয়া ধান লইয়া দৌলেই পারিত, কিন্তু গোয়াল মনে মনে
ভাবিল, “ধামা লইয়া গেলে গৃহস্থের অসুবিধা হইবে, সে ধান পাড়িবে কি করিয়া ?”

ধান ঢালিয়া গোয়ালা গামছা বাঁধিবে, গামছার খুঁট খুঁজিয়া পায় না। মনে করিল উঠানেই গামছার খুঁট হারাইয়া গিয়াছে। সকল উঠান খুঁজিয়া হয়রান হইয়া শেষে গোয়ালা ভাবিল গৃহস্থকে ডাকিয়া একটু আলো ধরিতে বলি। বিনা আলোকে খুঁট পাওয়া যাইবে না। চীৎকার করিয়া ছয়ার ঠেলিয়া গোয়ালা গৃহস্থকে বাহির করিল। গৃহস্থ ঘর হইতে আসিয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিল। স্তব্ধ গোয়ালার আর কি সাজা দিবে, কিছু ধান আর খুব খানিক উত্তম মধ্যম প্রহার দিয়া তাহাকে বিদায় করিল।

শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলো-ছায়া

একদেশে দুটি খুব সুন্দর মেয়ে থাকত। একটির নাম উষা, আর একটির নাম সন্ধ্যা। উষার চোখ ছিল শরৎকালের আকাশের মত নীল, গাল দুটি ছিল গোলাপী, আর কোঁকড়া কোঁকড়া সোণালি চুলের গোছা তার টুকটুকে মুখখানির চারদিকে খেলা করত। তার বাড়ী ছিল দেশের পূর্বদিকে, প্রথম সূর্য্য ওঠার আলো এসে তারই ঘরে পড়ত, সেই আলোর ছোঁয়া চোখে লাগতেই উষা হেসে উঠে বসত। তার সারাদিনটা কেটে যেত আলোর খেলা দেখে, আর পাখীর গান শুনে।

সন্ধ্যার মুখখানি ছিল অশ্রু রকমের। তার আঁধার কালো চুলের রাশ গোড়ালি অবধি লুটিয়ে পড়ত। তার চোখদুটি ছিল যমুনার জলের মত গভীর কালো, গায়ে রং ছিল শ্যামবর্ণ। তার মুখে হাসি প্রায় দেখা যেত না, সে নিজের বনের ধারের নির্জন ঘরে জানলার কাছে সারাদিন বসে থাকত। সূর্য্য ডুববার সময়, তার শেষ আলোর রেখাটা এসে একবার উঁকি মেরে সন্ধ্যার মুখ দেখে চলে যেত, বনের মধ্যে আঁধার ক্রমেই ঘনিয়ে আসত, সন্ধ্যা তেমনই জানলার ধারে বসে থাকত।

হটাৎ দেশে ভয়ানক একটা রোগ দেখা দিল। লোকের ঘোড়াশালে ঘোড়া মরতে লাগল, হাতীশালে হাতী মরতে লাগল, নগরের মানুষ রাস্তায় হেঁটে চলে বেড়াতে বেড়াতে গড়িয়ে পড়ে মরতে লাগল। উষা আর সন্ধ্যা, দুজনেরই স্বামীরা তখন বিদেশে ছিলেন, তাদের দেখবার শোভাবার লোক কেউ ছিল না। চারিদিকে যত মানুষ মরতে লাগল, ততই ভয়ে মেয়ে দুটির বৃকের রক্ত হিম হয়ে যেতে লাগল।

শেষে আর দেশে থাকতে না পেরে, তারা দুজনেই একদিন বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল, আর সমস্ত দিনরাত হাঁটতে হাঁটতে, পাহাড় পর্বত বন জঙ্গল পার হয়ে, তারা ভোরের বেলা একেবারে অজানা এক রাজ্যে এসে হাজির হল। সে দেশের লোকেরা দয়া করে তাদের ডেকে নিয়ে তাদের রাণীর বাড়ীতে পৌঁছে দিল।

সে দেশের রাণী ছিলেন এক অদ্ভুত মানুষ। এমনি তিনি বেশ থাকতেন, প্রজাদের বেশ ভাল বাসতেন, তাদের কোনো অনিষ্ট করতেন না। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর কি একরকম রোগ হত, তখন তিনি পাগলের মত হয়ে উঠে, সামনে যাকে পেতেন তাকেই যেন নখে করে ছিঁড়ে ফেলতে চাইতেন। যখন ভাল থাকতেন, তখনও কিন্তু রাণীর সামনে যার তার যাবার ছকুম ছিল না। তাঁর লতা বলে এক দাসী আর ভীম বলে এক শিকারী চাকর ছিল, তারাই কেবল সদাসর্বদা তাঁর কাছে যাওয়া আসা করত, তাঁর সব কাজকর্ম করে দিত।

রাজ্যের লোকেরা যখন উষা আর সন্ধ্যাকে নিয়ে এসে রাজপ্রাসাদের বাইরে দাঁড়িয়ে চাঁচামেচি করতে লাগল, তখন লতা বেরিয়ে এসে, সব কথা শুনে, মেয়ে ছুটিকে রাণীর কাছে ডেকে নিয়ে গেল।

রাণীর সেদিন মেজাজ তেমন ভাল ছিল না, তবে খুব খারাপও নয়। তিনি প্রথমে বললেন “কি আপদ, ওদের দূর করে দাও এখুনি।” কিন্তু তার পরেই তাদের দুজনের চেহারা ভাল করে দেখে রাণীর মাথায় কি এক খেয়াল এল, তিনি আবার বলে উঠলেন “না, না, ওরা থাক, ওদের আমার দরকার আছে।” প্রজারা ভীমের মুখে রাণীর দ্বিতীয় ছকুম শুনে, মহা খুসি হয়ে, দশমুখে রাণীমার দয়ার সুখ্যাতি করতে করতে যে যার বাড়ী চলে গেল।

রাজপ্রাসাদটা ছিল প্রকাণ্ড এক পাহাড়ের ধারে, সেই প্রাসাদের তেতলায় লতা উষাকে নিয়ে গিয়ে রেখে এল। তেতলার ঘর গুলোর মুখ দক্ষিণ দিকে, জান্না খুলে নীচে তাকালেই রাণীর বাগান দেখা যায়, তারপর মাঠের পর মাঠ, তার মাঝ দিয়ে রূপোর হারের মত এঁকে বেঁকে একটি ছোট নদী গান গেয়ে চলেছে, আরও দূরে, অনেক দূরে একটা পাহাড় দেখা যায়, তার চূড়াটা ঠিক যেন হীরের তৈরী, ভোরের আলো লেগেই ঝলমল করে ওঠে। উষা তেতলা ছেড়ে কখনো কোথাও যেতনা। সেখানে যেমন হাওয়া তেমনি আলো, নীল আকাশটাও যেন উষার সঙ্গে ভাব করে কাছে নেমে এসেছে। ঘরে ঘরে সুন্দর রঙচঙে ছবি, কত রকম গান

বাজনার আয়োজন, কত সুন্দর সুন্দর কাপড় গয়না। সকাল সন্ধ্যা লতা সোণার থালায় তার খাবার নিয়ে আসে, রূপোর গেলাশে করে গলানো মুক্তোর মত টল্টলে সরবৎ নিয়ে আসে। মাঝে মাঝে রাণী নিজের এসে কত রকম গল্প করে যান। উষার দিন ত খুবই ভাল কাটতে লাগল, তার মুখের হাসি লেগেই রইল।

সন্ধ্যার কপালে কিন্তু সুখ ছিল না, তাকে রাণী একেবারে অস্থির রকমের জায়গায় রেখে দিলেন। প্রাসাদের একটা দিক একেবারে পাহাড়ের গায়ে লাগানো ছিল, এমন কি সেই দিকের ঘরের দরজা দিয়ে পাহাড়ের ভিতরেও ঢোকা যেত। কালো পাহাড়ের বুকের মধ্যে শক্ত পাথর কেটে কেটে রাণীর কোন এক পূর্বপুরুষ অনেক গুলো ঘর করে রেখেছিলেন। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্তে, না নিজের ধনরত্ন রাখবার জন্তে, না কিসের জন্তে যে ঘর করেছিলেন, তা কেউই জানত না। ঘরগুলোর দেয়ালের গায়ে যত সব অদ্ভুত অদ্ভুত ছবি আঁকা ছিল। ঘরের ভিতর কাল রঙের গালিচা আর কালো বাঘের ছাল পাতা। এই ঘরে রাণীর হুকুমে লতা সন্ধ্যাকে এনে রেখে গেল, সে আর সূর্য্যের আলো দেখতে পেলেনা, যদিকে চায় কেবলি ছায়া আর আঁধার। সন্ধ্যাকে যা খাবার দেওয়া হত, তাও কালো পাথরের থালায় সাজিয়ে, পরতে দেওয়া হত গাঢ় নীল কি কালো রঙের রেশমের শাড়ী। তার আশেপাশের ঘর থেকে কেবলি কোন্ বাঁশীর করুণ বিষাদমাখা সুর শোনা যেত, পাহাড়ের কোন্ লুকনো পথ দিয়ে মাঝে মাঝে হু হু করে বাতাস ছুটে আসত, এসে চারিদিকে যেন কেঁদে কেঁদে বেড়াত। রাণী যখন বা আসতেন, তখনও কেবল অনেককাল আগেকার সব দুঃখ কাহিনীরই গল্প করে যেতেন। এমনি করে ছায়ার মধ্যে চারধারে দুঃখের সুর শুনে শুনে সন্ধ্যার দিন যেতে লাগল; দেখতে দেখতে বাইরের পৃথিবীকে সে প্রায় ভুলেই গেল।

কিছুদিনের মধ্যেই রাণীর মনের ইচ্ছা পূর্ণ হল। একদিন ভোরের বেলা, সূর্য্যদেব যেই পূর্বদিকে নিজের লাল মুখখানি নিয়ে দেখা দিয়েছেন, সেই সময় উষার একটি টুকটুকে সুন্দর খোকা হল। রাণী তখন তাকে প্রাসাদের অনেক দূরের এক ঘরে নিয়ে চলে গেলেন। উষার জ্ঞান হতে সবাই তাকে বুঝিয়ে দিলে যে তার একটি মরা ছেলে হয়েছিল, তাকে তখন পুঁতে ফেলা হয়েছে। বেচারী শুনে মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে দেশ ছেড়ে চলে গেল, রাণী তাকে থাকতেও বললেন না।

জন্মাবার পর থেকেই খোকাকে রাণী এমন করে মানুষ করতে লাগলেন যে সে কখনো আঁধার দেখতে পেলেন না। সন্ধ্যা হবামাত্রই তাকে যেমন করে হোক ঘুম পাড়িয়ে ফেলা হত, ভোর হবার আগে সে চোখ খুলতও না। তার সামনে কক্ষনো কোন কাল কি বিস্ত্রী জিনিষ আনা হত না। তার মা যে সুন্দর ঘরগুলিতে ছিলেন, খোকাও সেইখানে থাকত, রাণী তাকে দিন রাতই সূর্যের আলোয় শুইয়ে রাখতেন, খোকারও রোদ বাতাস ক্রমে এমন সয়ে গেল যে ছপুর রোদে তপ্ত শানে শুইয়ে দিলেও তার কিছু হত না। তার গায়ের জোর বাড়বার জন্তে আর হাত পা শক্ত করবার জন্তে রাণী সারাদিনই ব্যস্ত হয়ে থাকতেন। ছেলেটির চুল ছিল ঠিক সোণার মত, চোখ দুটি ছিল সাগরের জলের মত নীল। সে সমস্তক্ষণই হাত পা ছুঁড়ে খেলা করত, আর খিলখিল করে হাসত। তার মুখ কেউ কখনো আঁধার দেখেনি, তাই রাণী তার নাম রাখলেন আলোককুমার।

আলোককুমার জন্মাবার পাঁচ ছ মাস পরে সন্ধ্যার একটি মেয়ে হল। আঁধার রাত্রি, পাহাড়ের বৃকের ঘরের মধ্যে, ছুঁখিনী মায়ের কোলে ফুলের কুঁড়ির মত ছোট্ট একটি মেয়ে এসে জুটল। মেয়েটির মা আঁধারে তার মুখ একবার দেখবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু খুকীর মুখ দেখবার আগেই তাঁর দেখবার শক্তি চিরদিনের মত হারিয়ে গেল। রাণী ঘরে এসে মা-হারী মেয়েটিকে কুড়িয়ে নিলেন।

খুকীর নাম হল ছায়া। সে দেখতে হল ঠিক তার মায়ের মত, তেমনি ঢেউ খেলানো এক রাশ চুল, তেমনি গভীর কালো চোখ, তেমনি শ্যামবর্ণ রঙ। রাণী লতার উপর তাকে মানুষ করবার ভার দিলেন, তাকে হুকুম দিয়ে রাখলেন যে খুকী বাতির আলো ছাড়া আর যেন কোনোরকম আলো কখনো না দেখতে পায়। এই রকম অল্প আলোয় থেকে থেকে ছায়ার চোখ অন্ধকারেই দেখতে শিখল। তার কালো চুলের রাশের মধ্যে থেকে উজ্জল চোখ দুটি ঠিক মেঘের ফাঁকে ফেটে পড়া চাঁদের আলোর মত সুন্দর দেখাত। লতা তাকে সারাদিন ঘুম পাড়িয়ে রাখত, সূর্য্য ডুববার পর ছায়া নিজেই উঠে বসত। রাণী তাকে খুব ভাল করে গানবাজনা শেখালেন, কালো গুহার মধ্যে বসে বসে গান গেয়েই মেয়েটির সময় কাটতে লাগল।

রাণীর প্রাসাদের এক দিকে ছিল পাহাড়, আর তিন দিকে ছিল খোলা মাঠ। সেই মাঠ শেষ হতেই গহন বন, সে বন এমন গভীর যে মানুষ তাতে সহজে ঢুকতে

পারে না। বন থেকে দলে দলে বুনো জানোয়ার বেরিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াত, আর রাজ্যের যত শিকারী, তাঁর ধনুক বর্ষা নিয়ে তাদের শিকার করে ফিরত। রাণীর চাকর ভীম ছিল রাজ্যের প্রধান শিকারী। আলোককুমার একটু বড় হতেই রাণী তাঁকে ভীমের হাতে সঁপে দিলেন, ভীমও খুব যত্ন করে তাকে নিজের বিছা শেখাতে লাগল। প্রথমে তাকে ছোট টাটু ঘোড়ায় চড়িয়ে ভীম সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াত, কিন্তু আলোককুমারের সাহস আর গায়ের জোর এমন তাঁড়াতাড়ি বেড়ে চলতে লাগল যে কিছু দিনের মধ্যেই সে মস্ত মস্ত বুনো ঘোড়ায় চড়ে মাঠের উপর দিয়ে একলাই হাওয়ার মত ছুটে চলতে লাগল। তাঁর হোঁড়া, বর্ষা চালানো, এ সবও তার অল্প দিনেই শেখা হয়ে গেল। রাজ্যে তার সমান শিকারী আর কেউ রইল না। চোদ্দ বৎসর বয়সেই আলোককুমার যেদিন নিজের হাতে মস্ত একটা বুনো মহিষ মেরে আনল, সেদিন রাজ্যে আনন্দ উৎসব লেগে গেল। সকাল হতেই সে ঘোড়ায় চড়ে শিকারে বেরত, সারাদিন আর ঘোড়ার পিঠ থেকে নামত না। কিন্তু রাণী ভীমকে কড়া হুকুম করে রেখেছিলেন যে আলোককুমার যেন কখনো সূর্য্য ডুববার পর বাইরে না থাকে, কিছুতেই না, সে যত বড় কারণই হোক না কেন। ভীম প্রাণপণে রাণীর হুকুম মেনে চলত,—যে মানুষকে একসঙ্গে পাঁচটা বুনো মহিষ তেড়ে এসে ভয় পাওয়াতে পারত না, সেই কিন্তু রাণীর চোখের এক চাউনিতেই ভয়ে কাবু হয়ে যেত। কাজেই প্রতিদিন সূর্য্য পশ্চিমে হেলতে আরম্ভ কর্তেই ভীম, যেমন করে হোক, আলোককুমারকে নিয়ে বাড়ী ফিরে আসত। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, ততই বেচারী ভীমের কাজ শক্ত হয়ে উঠতে লাগল। আলোককুমারকে আর ধরে রাখা যায় না। সে ছেলে ভয় কাকে বলে জানেনা; মাঠের উপর দিয়ে যখন ঘোড়া ছুটিয়ে চলে, তখন মনে হয় না যে মানুষ,—ঠিক যেন মাঠের বুকে বিছাৎ খেলে যাচ্ছে। বুনো জানোয়ার যখন তার ঘাড়ে এসে পড়ে তখনও তার মুখে ভয়ের লেশ মাত্র নেই। জন্মে অবধি সে আলোতে মানুষ, বাইরেও কখনো ছায়া দেখেনি, মনেও তার ভয়ের ছায়া ছিল না। ভীম দেখলে যে বেশী দিন সে এ ছেলেকে বশে রাখতে পারবে না, সে তখন রাণীর কাছে গিয়ে জোড় হাত করে বললে, “রাণী মা, আমাকে আপনি রেহাই দিন, কুমারকে আপনি নিজে বলুন, আমার আর ঠুঁকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াবার মুরোদ নেই। সিংহের বাচ্চা কি কার রোখ মানে?”

রাণী আলোককুমারকে ডেকে পাঠালেন, তাকে খুব ভাল করে বারণ করে দিলেন যে সূর্য্য ডুববার পর যেন বাইরে কিছুতেই না থাকে। থাকলে যে তার কি ভয়ানক বিপদ হবে সে কথাও অনেক বললেন, কিন্তু আলোককুমার ভয় আর বিপদ যে কি জিনিষ তা বুঝতেই না পেরে খানিকক্ষণ হাঁ করে থেকে চলে গেল।

ছায়াকে লেখাপড়া শেখাবার মতলব রাণীর মোটেই ছিল না, লতা একবার ছায়ার পড়ার কথা বলাতে রাণী বললেন “এখানে এত অল্প আলোতে পড়বে কি

করে?” ছায়া কিন্তু ঐ আলোতেই বেশ দেখতে পেত। সে লতাকে অনেক সাধাসাধি করে তার কাছে পড়তে শিখে নিল। লতা যখন দেখলে যে মেয়েটি বেশ পড়তে পারছে, তখন একখানা ছুখানা করে বই তাকে এনে দিতে লাগল। কিন্তু ছায়া সব চেয়ে ভালবাস্ত গান বাজনা, প্রায়ই নিজের বীণাটি নিয়ে সে আঁধার ঘর তার সুরে ভরে তুলত। এই আঁধার ঘর ছাড়া সে পৃথিবীর আর কিছু দেখেনি, কিন্তু আরও যে জায়গা আছে তা সে জানত। রাণী কিম্বা লতা যখন তার ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যেত, তখন তার ভারি ইচ্ছা করত যে সেও তাদের পিছনে ছুটে চলে যায়। কিন্তু বেচারীর কোথাও যাবার ছকুম ছিল না, সে হয় উপকথা পড়ে নয় গান গেয়ে সময় কাটাত, যখন তা ভাল



না লাগত, তখন দেয়ালের গায়ে আঁকা অদ্ভুত ছবিগুলো দেখে বেড়াত।

ঘরের মধ্যে একটা জিনিষ ছিল, যেটাকে ছায়া সব চেয়ে ভালবাসত। সেটা একটা ঘসা কাঁচের তৈরি ঝোলানো আলো। ছায়া দেখত সেটা সারাক্ষণই আলো দেয়, কিন্তু কোথা থেকে যে আলোটা আসে তা সে মোটেই ভেবে পেত না। সে প্রায়ই আলোটার নীচে বসে, বড় বড় চোখ তুলে সেটার দিকে চেয়ে থাকত। সেই ঝকঝকে জিনিষটা তাকে এমন বশ করে ফেলেছিল যে তাকে ছেড়ে ছায়ার নাইতে খেতে যেতেও ইচ্ছা করত না।

রাণী লতাকে বলে রেখেছিলেন যে সে যেন সারারাত ছায়ার সঙ্গে থাকে। লতার কিন্তু সারারাত জেগে বসে থাকটা মোটেই পোষাত না, কাজেই সে ছায়াকে একলা রেখে অনেক সময়ই নিজের ঘরে ঘুমতে চলে যেত। একলা বসে বসে ছায়ার মনে হত ঝোলানো আলোটা যেন এক দৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে। ছায়া যতক্ষণ জেগে থাকত ততক্ষণ আলোটা কক্ষনো নেবানো হত না, কাজেই একেবারে অন্ধকার যে কিরকম জিনিষ, তা ছায়া কোনোদিন দেখেনি। কেবল দুই চোখ জোর করে বুজে রাখলে যে আলো দেখা যায় না, এইটুকু সে জানত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসীতা দেবী।

আরসলা

ভাই সন্দেহ,

কাল আমার একটা পুরাণ কাঠের সিন্দুক খুলেছিলাম। তাতে কতকগুলো পুরাণ কাগজ পত্র ও ছেঁড়া কাপড় চোপড় ছিল। সিন্দুকটা খুলতেই দেখলাম, ছোট বড়, পাখায়ুক্ত, পাখাহীন, সাদাটে, কালোটে, নানা জাতের নানা রকমের আরসলা আর তাদের ডিমে সিন্দুকটা ভরে রয়েছে। তাড়াতাড়ি যে কয়টাকে ধরতে পারলাম সে কয়টাকে একটা কাচের বোতলে পুরে ফেললাম।

আরসলাকে আমাদের দেশের কোন কোন জেলায় তেলাপোকা তেলাচোরা বা তেলচটাও বলে। সংস্কৃতে তৈলপায়ী, তৈলচৌরিকা এবং পরোক্ষী বলে। বোধ হয় তৈলপায়ী শব্দ থেকে তেলপক বা তেলাপোকা, আর তৈলচৌরিকা হইতে তেলাচোরা হয়েছে। আর বোধ হয় পরোক্ষী শব্দ ক্রমে বিগড়ে গিয়ে অরোক্ষী পরে অরষড়া বা আরসলা হয়েছে।

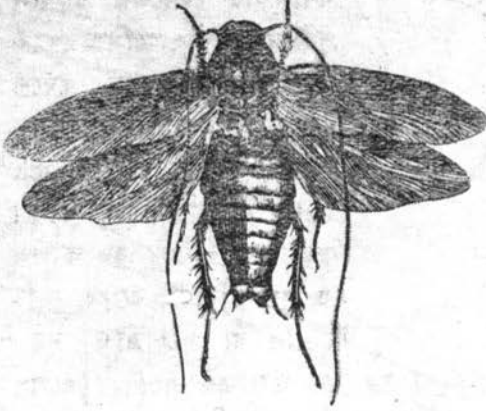
আমাদের ঘরের মধ্যে শেল্ফের বইএর কঁাকে, ভাঁড়ার ঘরের চাল ডাল মসলার হাঁড়িতে, চিনি আর ময়দার বস্তার ভিতরে, অন্ধকার ঘরের দরজার আড়ালে সাধারণতঃ বড় বড় আরসলাই দেখতে পাই। তা ছাড়া এর চেয়ে ছোট রকমের তিন চার জাতের ঘোরো আরসলা খোঁজ কলে, ঘরের ভিতরে পাওয়া যায়। মাঠে ঘাটে, গাছ তলায়, গাছের ডালে, ঝোপ ঝাড়ে, লতাপাতার মধ্যে, বাইরের মেঠো আরসলাও অনেক জাতির দেখতে পাওয়া যায়।

পৃথিবীর সকল দেশেই আরসলা দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির আরসলা। কোন কোন জাতির আরসলা খুব বড় হয়, কোন কোন জাতির খুব ছোট ছোট হয়। কোন কোন জাতির স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই পাখা গজায়। কোন কোন জাতির কেবল পুরুষদেরই পাখা গজায়, স্ত্রীদের পাখা হয় না। আবার কোন কোন জাতির স্ত্রী পুরুষ কাহারও মোটেই পাখা হয় না। এক ভারতবর্ষেই ১২৩ জাতির আরসলার খোঁজ পাওয়া গিয়াছে।

বিজ্ঞানের ভাষায় আরসলাকে ব্লাটা (Blattadæ) বংশ বলে। এই বংশের ভিন্ন ভিন্ন দল বা “গণ” আছে, তাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। আবার প্রত্যেক “গণে” অনেক “জাতি” আছে, তাদেরও ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়েছে। কোন একটা প্রাণীকে চেনাতে হলে তার গণ-নাম আর জাতি-নাম দুই বলতে হয়। ইংরাজিতে সাধারণ চলিত কথায় সব আরসলাকে (cockroach) কক্‌রোচ বলে, আমরা যেমন সকল জাতির আরসলাকেই আরসলা বলি।

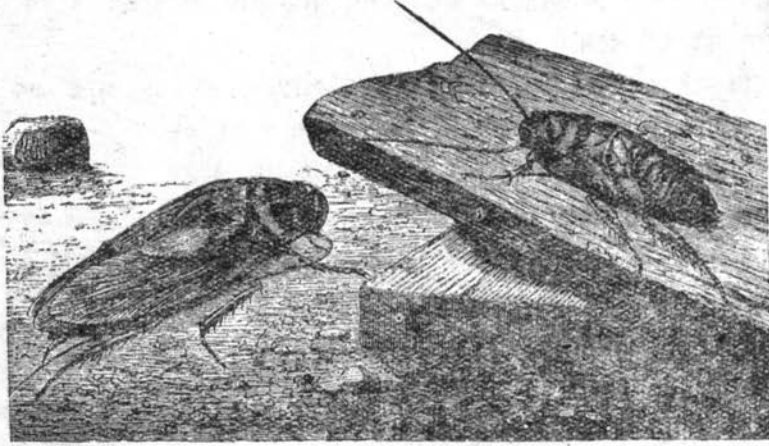
আমাদের ঘরে যে বড় বড় রকমের, প্রায় দুই ইঞ্চি লম্বা, পাখাওয়ালা গাঢ় খয়েরী রঙ্গের আরসলা দেখি তার বৈজ্ঞানিক নাম পেরিপ্লানাটা আমেরিকানা (Periplanata Americana) প্রথমটা গণের নাম, দ্বিতীয়টা জাতির নাম। পূর্বে ইউরোপে এই জাতির আরসলা ছিল না। আমেরিকা দেশ হতে বাণিজ্য জাহাজে করে মালপত্রের বস্তা বাস্তুর সঙ্গে এই আরসলা ইউরোপে গিয়ে পড়েছিল। আজ কাল পৃথিবীর সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়িয়েছে। এই রকম এক দেশের অনেক জীবজন্তু গাছপালা মানুষের সাহায্যে অল্প দেশে হাজির হয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস ও বংশবৃদ্ধি করে। যে সব দেশে পূর্বে ইন্দুর, খরগোস, ছাগল, ভেড়া, গরু ঘোড়া ছিল না, আজ কাল সে সব দেশে এই সব জন্তু অনেক হয়েছে। নানা প্রকারের পোকা মাকড়ের ত কথাই নাই। অনেক

বিদেশী গাছপালা এই রকমে আমাদের দেশে আর আমাদের দেশের গাছ পলা বিদেশে গিয়ে পড়েছে।



পূর্বে যে বড় আরসলার কথা বললাম, তাহা অপেক্ষা কিছু ছোট, প্রায় দেড় ইঞ্চ লম্বা, ঐ রকমের ও ঐ গণের অন্য এক জাতির আরসলাও আমাদের ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়। তাদের বলে পেরিপ্লানাটা অষ্ট্রেলিসি (*Periplaneta australasica*)। এই দুই জাতিরই স্ত্রী পুরুষ উভয়ের বেশ বড় বড় পাখা হয়।

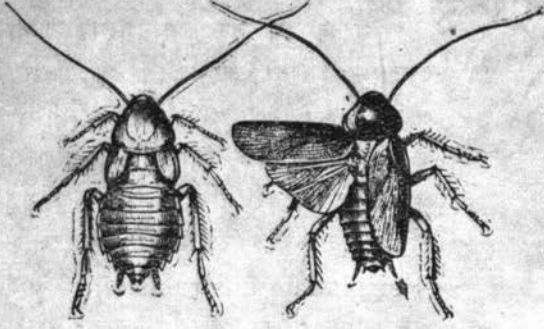
এদের চেয়েও ছোট অন্য গণের



পেরিপ্লানাটা আমেরিকানা, সাধারণ বড় আরসলা। পাখাহীন বাচ্চা অবস্থা ও পূর্ণাবস্থা

এক রকম আরসলা আমাদের ঘরে দেখা যায়, তাদের স্ত্রীদের পাখা হয় না, পুরুষদেরই পাখা হয়। সে পাখাও ছোট, পেটের সমস্তটা ঢাকে না, শরীরের প্রায় সিকি অংশ বেরিয়ে থাকে। এগুলি প্রায় এক ইঞ্চ লম্বা হয়। বিলাতে এই জাতির আরসলা ঘরে ঘরে অনেক দেখতে পাওয়া যায়। এদের বৈজ্ঞানিক

নাম ষ্টাইলোপাইগা ওরিয়ান্টালিস্ (*Stylopyga orientalis*)। পূর্বে এই জাতির



বিলাতের “ব্ল্যাকবীটল্”। স্ত্রী ও পুরুষ।

আরসলা বিলাতে ছিল না। সেখানকার লোকের বিশ্বাস পূর্বদেশ অর্থাৎ এসিয়া থেকে এই আরসলা সে দেশে গিয়েছে। ইংরাজিতে চলিত কথায় ইহাকে (Black beetle) ব্ল্যাকবীটল্ বলে। কিন্তু এরা black বা কালও নয়, গাঢ় বাদামী রঙ্গের, আর beetle বা দৃঢ়পত্রীও নয়।

যে সব পতঙ্গের উপরের পাখা খুব শক্ত খোলের মত তাদেরই beetle বলে। আরসলার পাখা শক্ত খোলের মত নয়। সব আরসলাই ফড়িংএর বর্গের পতঙ্গ। এই বর্গকে ঋজুপত্রী বলে।

আমার ঘরে এই তিন জাতির আরসলা ত আছেই, তা ছাড়া আর এক জাতির বড় আরসলাও আছে তাদের স্ত্রী পুরুষ কারও পাখা হয় না। এদের গায়ের রং কাল খয়েরী তাতে হলুদে রঙ্গের চিত্র আছে। এরা এক ইঞ্চির উপর লম্বা হয়। এদের বৈজ্ঞানিক নাম ষ্টাইলোপাইগা রম্বিফোলিয়া (*Stylopyga rhombifolia*)।



ষ্টাইলোপাইগা রম্বিফোলিয়া

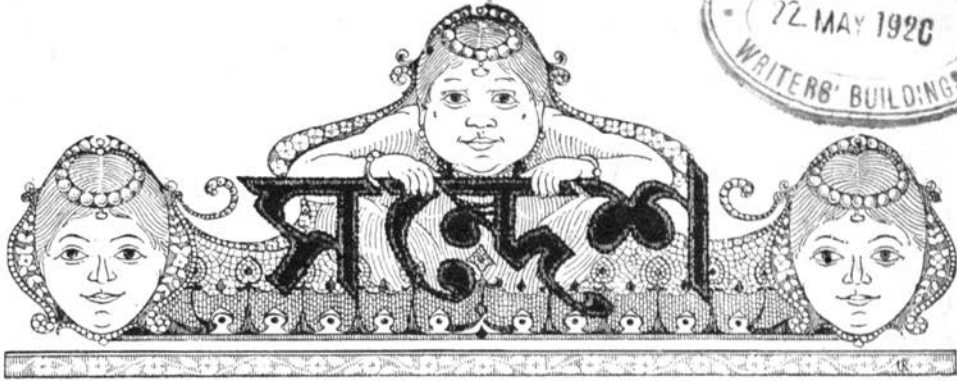
খুব ক্ষুদ্রে ক্ষুদ্রে এক জাতির আরসলা আমার সেই সিন্দুক থেকে, আর বাড়ীর হাঁড়ির ভিতর থেকে আর কাপড়ের বাস্কে থেকে, বের করেছি। এরা পোঁণে এক ইঞ্চ লম্বা। এদের স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পাখা হয়, রং বাদামী, মাথার উপরে ঘাড়ের চাকতিটায় দুটা কাল দাগ থাকে। এদের বৈজ্ঞানিক নাম ফাইলোড্রোমিয়া জারমানিকা (*Phyllodromia Germanica*)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবীজেন্দ্রনাথ বসু।



জ্যাংলারতে ময়ূরের মেলা
(উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী অঙ্কিত চিত্র হইতে।)



সপ্তম বর্ষ

অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩২৬

৮ম ও ৯ম সংখ্যা

আশ্চর্য্য !

নিরীহ কলম, নিরীহ কালি,
“বান্দর বেকুব আজব হাঁদা
আবার লিখিল কলম ধরি’
“শাস্ত্র মাণিক শিষ্ট সাধু—
মনের কথাটি ছিল যে মনে,
আঁচড়ে আঁকিতে আখর ক’টি
রকম রকম কালির, টানে
মারে না, ধরে না, হাঁকে না বুলি
সাদায় কালোয় কি খেলা জানে ?

নিরীহ কাগজে লিখিল গালি—
বকাট ফাজিল অকাট গাথা ॥”
বচন মিষ্টি, যতন করি’—
বাছারে, ধনরে, লক্ষ্মীষাছ ।”
রটিয়া উঠিল খাতার কোণে,
কেহ খুসী, কেহ উঠিল চটি !
কারো হাসি কারো অশ্রু আনে,
লোকে হাসে কাঁদে কি দেখি ভুলি ?
ভাবিয়া ভাবিয়া না পাই মানে ॥

পুরাতন লেখা

(উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী লিখিত)

অ্যান্সেন্

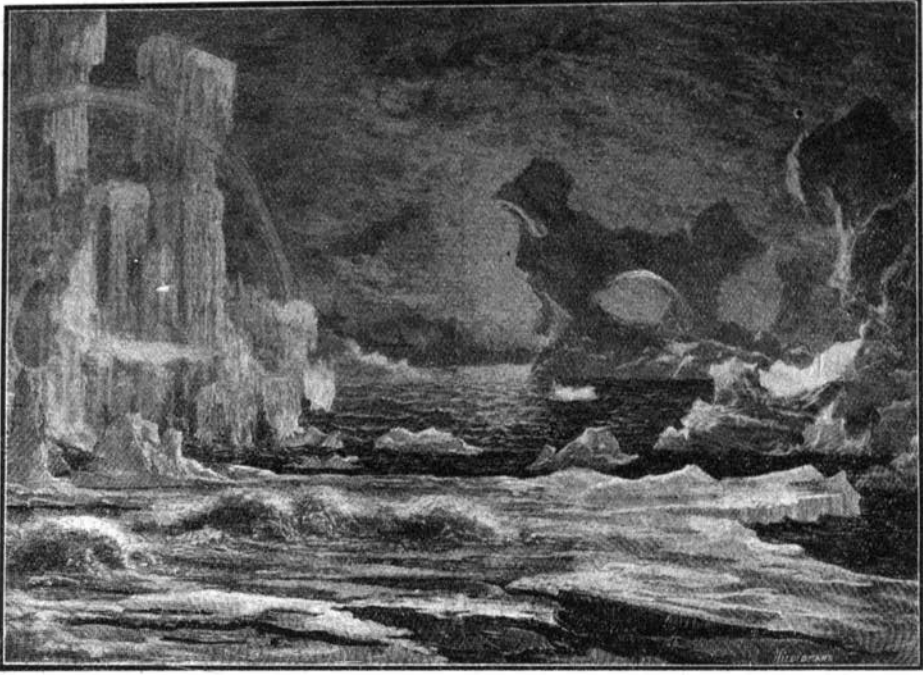
পৃথিবীর মধ্যে সকলের চাইতে উত্তর, আর সকলের চাইতে দক্ষিণে যে দুটি স্থান, তাহাদের নাম মেরু—উত্তরেরটি সূর্যমেরু, দক্ষিণেরটি কুমেরু। পৃথিবীর মাঝ-খানটা খুব গরম। সেখান হইতে যত উত্তরে বা দক্ষিণে যাও, ক্রমেই ঠাণ্ডা। মেরুর কাছে এত ঠাণ্ডা, যে আমাদের দেশের লোক সেখানে গেলে মরিয়াই যাইবে। বৎসরের মধ্যে ছয় মাস সেখানে সূর্য উঠেই না। তার পর যখন উঠে, তখন ছ মাসের জন্য উঠে, কিন্তু তাহাও এক রকম না উঠারই মধ্যে। আমাদের এখানে সূর্য যেমন ভোরে গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া, দুপুর বেলায় মাথার উপরে আসে, শেষে সন্ধ্যার সময় আবার গাছের আড়ালে ডুবিয়া যায়, সে দেশে তেমন হয় না। সেখানে সূর্যকে চব্বিশ ঘণ্টায় খালি আকাশের চারিটি ধারই ঘুরিয়া আসিতে হয়, তাহার উপরে উঠিবার লুকুম নাই।

এত ঠাণ্ডা যে দেশ, সেখানেও নাকি মানুষ যাইতে চায়! যাওয়াও কি সহজ যাওয়া? রেল নয়, যে টিকিট কিনিয়া উঠিয়া বসিলাম আর সব চুকিয়া গেল। ভাল রাস্তা থাকিলে, না হয় একবার হাঁটিয়াই দেখা যাইত। সেখানে যাইতে হইলে জাহাজে চড়িতে হয়। জাহাজও আবার বেশী দূর যাইতে পারে না, বরফে আটকায়।

পানা পুকুরের পানার মতন সমুদ্রের উপরে বরফ ভাসে। ছোট ছোট বরফের টুকরা হইতে আরম্ভ করিয়া মাঠের মতন চওড়া বরফ, পাহাড়ের মতন উঁচু বরফ, সবই সেখানে আছে। শ্রোতে আর হাওয়ায় তাহাদিগকে যে দিকে নেয়, সেই দিক পানে তাহারা দল বাঁধিয়া চলে, কিছুতেই তাহাদিগকে আটকাইতে পারে না! সামনে বাধা পাইলে ভয়ানক ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়। পিছনের বরফের ধাক্কায় সামনের বরফগুলি কোণ ঠেসা হইয়া, তাল পাকাইয়া, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত করে। বাজ-পড়ার মতন ভয়ানক শব্দে বরফ ভাঙ্গিতে থাকে। সেই শব্দ আর বরফে বরফে ঘষার কাঁকাকাঁ শব্দ অনেক দূর হইতে শুনা যায়।

এই চাপাচাপির ভিতরে জাহাজ পড়িলে, তাহার কি দশা হয়, সহজেই বুঝা

যায়—পাকাটিকে হামামদিস্তায় ফেলিয়া কুটিলে যেমন হয়, কতকটা তেমনি । এরূপ



জায়গা দিয়া চলিতে গিয়া অনেক জাহাজ মারা পড়িয়াছে । জাহাজের লোকগুলিও অনেক সময়েই মারা গিয়াছে, দৈবাৎ দু'এক জন ফিরিয়া আসিয়াছে ।

খালি বরফের জগ্জই যে ভয়, তাহা নহে । শীত সেখানে এত ভয়ানক, যে তাহাতে পারা জমিয়া যায়,—মদ পর্য্যন্ত জমিয়া যায় । লোমস্কন্ধ চামড়ার পোষাকে পায়ের নখ হইতে মাথার চুল অবধি ঢাকিয়া রাখিতে হয় । তবে, দেখাশুনা, নিশ্বাস ফেলা, খাওয়া, কথা বলা, এগুলি না করিলে ত আর চলে না ; তাই মুখখানি খোলা রাখা দরকার । কিন্তু ইহাতে অবার ঠাণ্ডায় রক্ত জমিয়া হটাৎ নাক মুখ পচিয়া উঠিতে আটক নাই । জিনিস পত্র স্ককলই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হয় । খাবার জিনিসের মধ্যে ভাল্লুক, সিদ্ধুঘোটক, এইরূপ কয়েকটা জানোয়ার । বেশী উত্তরে

গেলে তাহাও মিলে না। অনেক দিন ধরিয়া তাজা শাক সবজী না খাইতে পাওয়ার দরুণ আবার রক্ত খারাপ হইয়া, স্কাভি নামক এক প্রকার ব্যারাম হয়; অনেকেই তাহাতে মারা পড়ে।

এ পর্য্যন্ত ঠিক মেরুতে* কেহ পৌছাতে পারে নাই। সুতরাং সেটা মাঠ কি পাহাড় কি সমুদ্র তাহা কেহ চক্ষে দেখে নাই। যতদূর গিয়াছে, খালি বরফই দেখিয়াছে। মেরুতে গেলেও যে আর বেশী কিছু দেখিতে পাইবে, তাহার ভরসা কম। তথাপি লোক মেরুতে যাইতে ছাড়িবে না। কেহ খানিক দূর গিয়াই মারা পড়িয়াছে; কেহ বা তাহার চাইতে আর একটু বেশী গিয়া, মরিতে মরিতে বাঁচিয়া আসিয়াছে। সকলেরই চেষ্টা, যতদূর লোক গিয়াছে, তাহার চাইতে বেশী যাইতে হইবে। ইহাতে যে প্রাণটা যাইতে পারে তাহার জন্ত চিন্তা নাই; কিন্তু মেরুটা কেমন জিনিস একবার দেখা চাই।

মেরুতে যাইবার জন্ত এত চেষ্টা করিয়াও এ পর্য্যন্ত* কেহ সেখানে যাইতে পারে নাই বটে, কিন্তু ইহাতে একটা উপকার হইয়াছে। সেখানে যাইতে হইলে কিরূপ জিনিস সঙ্গে লওয়া দরকার, সেখানে কেমন করিয়া চলিতে হয়, কিরূপ বিপদের ভয় আছে, এ সব কথা ক্রমেই লোকে পরিষ্কার বুঝিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্বে এমন একটা ঘটনা হইয়াছিল, যে তাহাতে ঐ সকল স্থান সম্বন্ধে একটা নূতন কথা জানিতে পারা যায়। ঘটনাটা এই—

জীনেট নামক একখানি জাহাজ বেরিং প্রণালীর খানিকটা উত্তর পশ্চিম দিকে বরফে আটকা পড়িয়া মারা যায়। অনেকদিন পরে একদল লোক গ্রীণলণ্ড দেশের কাছে সেই জাহাজের কতকগুলি জিনিস কুড়াইয়া পাইল। যেখানে জীনেট মারা গিয়াছিল, সেখান হইতে গ্রীণলণ্ডে আসিতে হইলে, আগাগোড়া মেরুর বরফ ভাঙ্গিয়া মেরুর উপর দিয়া আসিতে হয়। এখন কথা এই যে, এ সব জিনিসের ত আর হাত পা নাই, এরা পথ চিনিয়াও চলিতে পারে না, তবে এ সব জিনিস এতদূর কি করিয়া আসিল? কথটা আর কিছু নহে,—এই সকল জিনিস বরফে চড়িয়া সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে এতদূর আসিয়াছে। ইহা ছাড়া আর কোন উত্তর নাই।

নরওয়ে দেশবাসী পণ্ডিত গ্রান্সেন এই সকল জিনিসের সংবাদ পাইয়াই স্থির করিয়াছিলেন, যে নিশ্চয় বেরিং প্রণালী হইতে গ্রীণলণ্ড পর্য্যন্ত সমুদ্রে স্রোত বয়।

* ইহা বাইশ বৎসরের আগেকার কথা।

তিনি দেখিলেন, যে গ্রীণলণ্ডের কাছে এমন অনেক কাঠ বরফের সঙ্গে ভাসিয়া আসে, যাহা সাইবেরিয়া ছাড়া অন্য কোন স্থানে জন্মায় না। এইরূপ কতকগুলি কারণে তাঁহার মনে এই স্রোতের সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই রহিল না। তখন তিনি বড় বড় পণ্ডিতদের একটা সভায় এই সকল কথা বলিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, “এমন একখানা জাহাজ যদি তয়ের করা যায়, যে তাহার তলাটা খুব ঢালু, তবে সে জাহাজকে বরফে কিছু করিতে পারিবে না। দু' দিক্ হইতে বরফের চাপ পড়িলে সে পিছুলাইয়া খালি উপর বাগে উঠিবে, কিন্তু ভাঙ্গিবে না। এমন একখানা জাহাজ পাইলে আমি তাহাতে চড়িয়া সাইবিরিয়ার উত্তরে যাইতে প্রস্তুত আছি। সেখানে গিয়া তাহাকে বরফের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব। কয়েক মাস পরে সে বরফের সঙ্গে সঙ্গে মেরু পার হইয়া গ্রীণলণ্ডে গিয়া উপস্থিত হইবে।”

এই কথা শুনিয়া, অনেকেই স্থান্সেনকে পাগল বলিয়া উপহাস করিল। কিন্তু স্থান্সেন্ যেমন তেমন লোক নহেন। আর একবার তাঁহার একটা প্রস্তাব শুনিয়া সকলে তাঁহাকে পাগল বলিয়াছিল। কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কাজে করিয়া দেখাইলেন, কে পাগল।——

গ্রীণলণ্ডদেশ মেরুর খুব কাছে; সেখানে প্রায় মেরুর মতন শীত। এই গ্রীণলণ্ডের পশ্চিমধারে সমুদ্রের কিনারায় কয়েকটি নগর আছে। কিন্তু পূর্বধারে আর ভিতরে সেরূপ কিছুই নাই। সেখানে কেহ কোন দিন যায়ও নাই। অনেকেই পশ্চিমধার হইতে হাঁটিয়া গ্রীণলণ্ড পার হইতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কেহই পারে নাই। স্থান্সেন্ বলিলেন, যে “পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে না আসিয়া যদি পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে যাওয়া যায়, তবে বোধ হয় গ্রীণলণ্ড পার হওয়া যায়। পশ্চিম হইতে যাহারা যায়, না পারিলে তাহারা আবার পশ্চিমে ফিরিয়া আসে। এই যাওয়া আসাতে যে পরিশ্রম, ক্রমাগত চলিয়া একেবারে পার হইয়া আসিতেও সেই পরিশ্রম। তবে তাহারা যে ক্রমাগত চলিয়া পূর্বধারে আসে না, তাহার কারণ এই যে, তাহারা ভয় পায়। পূর্বধারে কোথায় কি আছে কিছুই জানে না, সেখানে যাইবার পথও জানে না। পশ্চিমধারটাকে তাহারা বেশ জানে, সেখানে যাইবার পথও জানে। সুতরাং যখন বরফের উপর দিয়া চলিতে চলিতে ভয়ানক কষ্ট হয়, আর চলিতে সাহস হয় না, তখন তাহারা চেনা পথে চেনা জায়গায় ফিরিয়া যাইতেই ভাল বাসে। পূর্বধার হইতে আরম্ভ করিলে অচেনা জায়গা হইতে চেনা জায়গায় আসিতে হয়, সুতরাং

তখন পূর্বধারে ফিরিয়া না গিয়া ক্রমাগত পশ্চিমধারে চলিয়া আসিতেই ইচ্ছা হইবে।” এই কথা শুনিয়া সকলে গ্ৰান্সেন্কে ঠাট্টা করিয়াছিল। কিন্তু গ্ৰান্সেন্ তাহাতে ভয় না পাইয়া আর পাঁচজন লোক সঙ্গে লইয়া গ্রীণলণ্ডের পূর্বদিকের সমুদ্রে যাহারা সীল ধরিতে যায়, এমন একটা জাহাজে চড়িলেন। সেই জাহাজের লোকেরা তাঁহাদিগকে গ্রীণলণ্ডের পূর্বধারে নামাইয়া দিল, আর তাঁহারা দিন কুড়ি হাঁটিয়া পশ্চিমধারে গট্‌হাব নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

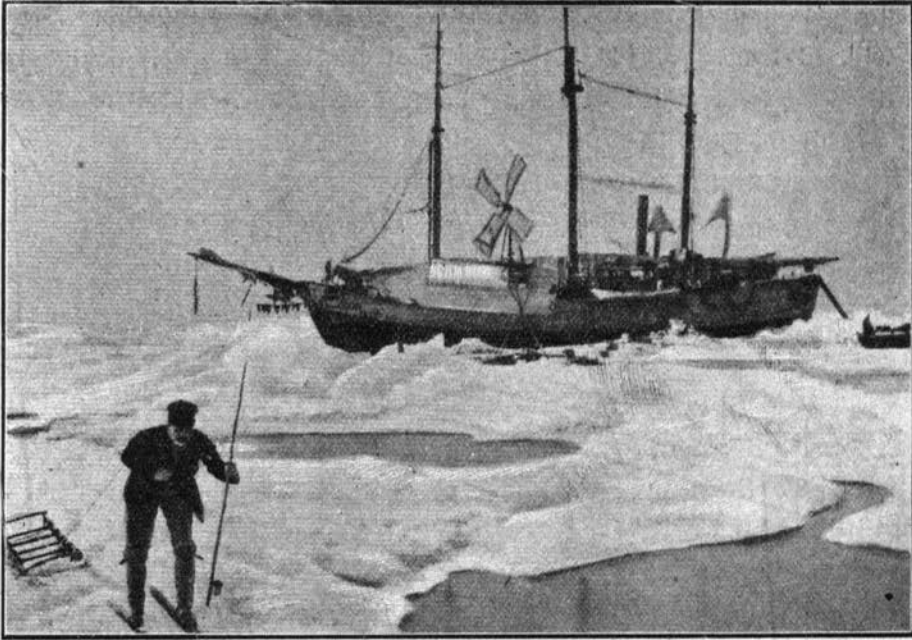
ইহাতে সকলেই বুঝিয়াছিল, যে গ্ৰান্সেন্ সহজ লোক নহেন। সুতরাং তাঁহার নতুন রকমের জাহাজে চড়িয়া বরফের সঙ্গে মেরু পার হওয়ার প্রস্তাব শুনিয়া একদিকে যেমন অনেকে হাসিল, তেমনি অনেকে আবার তাঁহার কথায় বিশ্বাসও করিল। গ্ৰান্সেনের প্রস্তাবের মতন কাজ করিতে হইলে অনেক টাকার দরকার। কিন্তু টাকা উঠিতে বেশী দেরী হইল না। গবর্ণমেন্ট সাহায্য করিলেন, রাজা নিজের পকেট হইতে টাকা দিলেন, দেশ বিদেশের অনেকে চাঁদা দিল, এইরূপ করিয়া অনেক টাকা হইল। গ্ৰান্সেন্ও উৎসাহের সহিত যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

গ্ৰান্সেন্ যেরূপ জাহাজের কথা বলিয়াছিলেন আগে সেইরূপ একখানা জাহাজ প্রস্তুত হইল। তাহার নাম হইল “ফ্রাম”—অর্থাৎ “অগ্রসর”। তার পর বাছা বাছা ১২ জন লোক, ও বৎসর পাঁচকের মতন আবশ্যকীয় সকল রকমের জিনিস লইয়া গ্ৰান্সেন্ সেই জাহাজে উঠিলেন। সঙ্গে লোকগুলি এমন দেখিয়া লইয়াছিলেন, যে তাহারা এইরূপ কাজ বেশ বুঝে; আর এমন কোন কাজ নাই, যাহা তাহারা না করিতে পারে—মাঝি মাঝা, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, বাবুরচি, ধোপা, নাপিত, ছুতোর, কামার যখন যাহার দরকার, তাহারই কাজ ইহারা চালাইতে পারে। সঙ্গে জিনিস পত্রও এই হিসাবেই লওয়া হইল। খাওয়া পরার জিনিস হইতে আরম্ভ করিয়া নৌকা, তাঁবু, ‘গাড়ী ঘোড়া’ (অর্থাৎ, সেখানে যেরূপ গাড়ী ঘোড়ার দরকার হইতে পারে। সে গাড়ীর নাম স্লিজে, তাহার চাকা নাই আর তাহা কুকুরে * টানে।) কিছুই বাকি রহিল না ১৮৯৩ সালের ২৪এ জুন তারিখে গ্ৰান্সেন্ জাহাজ ছাড়িলেন।

গ্ৰান্সেন্ কি করিতে যাইতেছেন, তাহা পরিষ্কার বুঝা দরকার। মেরুতে যাওয়াটা কিন্তু তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য নহে। তিনি ইহাই প্রমাণ করিতে যাইতেছেন, যে বেরিং প্রণালী হইতে গ্রীণলণ্ড পর্য্যন্ত সমুদ্রে একটা স্রোত বয়। সেই স্রোতে জাহাজ রাখিতে পারিলে, সে জাহাজ আপনা হইতেই গ্রীণলণ্ডে গিয়া উপস্থিত হইবে। এই

পথে বরফের ভয় আছে, পূর্বে এই বরফের চাপে অনেক জাহাজ মারা পড়িয়াছে। কিন্তু 'ফ্রাম'কে যেমন করিয়া গড়া হইয়াছে, তাহাতে বরফে তাহার কোন ক্ষতি হইবে না। এই কয়েকটি কথা প্রমাণ করা তাঁহার উদ্দেশ্য; তবে তাঁহার আশা আছে, যে ঐ স্রোতে জাহাজখানিকে মেরুর উপর দিয়া, না হয় তাহার খুব কাছে দিয়া, লইয়া যাইবে। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন, যে সাইবিরিয়ার উত্তরে এক স্থানে গিয়া বরফের মাঝখানে জাহাজ রাখিয়া দিবেন; এবং কাজেও তিনি তাহাই করিলেন।

ভাল করিয়া একবার বরফের ভিতরে প্রবেশ করিলে, জাহাজকে আর ইচ্ছামত



বরফের মধ্যে নৌদ্রব বাধা 'ফ্রাম' জাহাজ

চালান সম্ভব হয় না; আর স্থানসেনের সেরূপ ইচ্ছাও নহে। যতদূর পর্য্যন্ত সুবিধা মতন জাহাজ নিতে পারিলেন, ততদূর গিয়া তিনি জাহাজ খানিকে বরফের সঙ্গে

নঙ্গর করিয়া রাখিলেন। বরফ যে দিকে যায়, জাহাজও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই দিকে চলিতে লাগিল।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বরফের সঙ্গে সঙ্গেই জাহাজ চলিতে লাগিল। কখন খুব ধীরে, কখন তাহার চাইতে একটু তাড়াতাড়ি। কখন সামনের দিকে, কখন পিছনের দিকে, কখন ডাইনে, কখন বামে, এইরূপ করিয়া জাহাজ যায়। জাহাজের লোকেদের আর কোন কাজ নাই। তাহারা দিন রাত খালি গণিয়া দেখিতেছে, কতদূর আসা হইল। বরফের ভিতরে একটু ফাঁক পাইলেই দড়ি ফেলিয়া সমুদ্রের জল মাপে। তাহা ছাড়া, কোন দিন কিরূপ হাওয়া বয়, বরফের অবস্থা কিরূপ, শীত কতখানি, অথবা কি ঘটনা হইল, এই সব মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করে। যখন যাহা দেখিতেছে, প্রত্যেকটি কথা লিখিয়া রাখিতেছে। সম্ভব হইলেই, যাহা দেখে তাহার ফটোগ্রাফ তোলা হয়; কখন কখন আঁকিয়াও রাখা হয়। ইহার উপরে জাহাজ দেখা, কুকুর গুলিকে দেখা ইত্যাদি অনেক কাজ ছিল। কুকুর চৌত্রিশটা ছিল; তাহাদিগকে দেখা খুব সহজ কথা নহে। চব্বিশ ঘণ্টা মারামারি ছেঁড়াছিঁড়ি সোরগোল ছাড়া আর তাহারা কিছুই করিতে জানে না। মাঝে মাঝে এক একটা বরফের উপরে বেড়াইতে গিয়া পথ ভুলিয়া যায়। সন্ধ্যাবেলা ঘরে না ফিরিলেই লণ্ঠন লইয়া তাহাকে খুঁজিয়া আনিতে হয়। মাঝে মাঝে ৬৭ টা মিলিয়া লড়াই জুড়িয়া দেয়; তাহাতে দুই একটা যে মারা না যায় এমনও নহে। কোনটার ছানা হইলে আবার তাহাকে একটু বেশী সাবধানে রাখিতে হয়। ছানাগুলির চোখ ফুটিলেই তাহারা এদিক ওদিক বেড়াইয়া দেখিতে আরম্ভ করে। কোন জিনিস নূতন বোধ হইলেই তাহাকে শূঁকিয়া দেখে; সুবিধা পাইলে একটু চাটিয়াও দেখে, খাইতে কেমন লাগে। মাঝে মাঝে হয়ত সেখানকার ভয়ানক শীতে এক একটা জিনিস এমন ঠাণ্ডা হইয়া থাকে যে তাহা চাটিতে গেলেই জিবে লাল জমিয়া বরফ হইয়া যায়। আর সাধ্য কি, সে জিনিস হইতে জিভ খানিকে ছাড়াইয়া লয়। তাহার চীৎকারে কেহ আসিয়া, সেই বরফ গলাইবার বন্দোবস্ত করিলে তবেই রক্ষা, নচেৎ খালি টানাটানিই সার।

প্রত্যেক দিনের আহারের জন্তও অল্প পরিশ্রম করিতে হইত না। সঙ্গে খালি শুক্কনো খাবার জিনিসের বন্দোবস্ত। সঙ্গে তাজা জিনিস কিছু না থাকিলে, খালি শুক্কনো জিনিস খাইতে ভাল লাগে না, আর তাহাতে অসুখও করে। সুতরাং রোজই

শিকারের চেষ্টা দেখিতে হয়। পাখী, মাছ, ভাল্লুক, শীল, সিঙ্কুঘোটক, যখন যাহা মিলে, শিকার করিয়া আনা চাই। ভাল্লুকটাই বেশী পাওয়া যায়। মাছ, শীল, সিঙ্কুঘোটক, এ গুলি জল ছাড়া থাকে না। পাখীরা শীতকালে চলিয়া যায়। সুতরাং ভাল্লুক যত পাওয়া যায়, অল্প জন্তু তত নহে। ভাল্লুক খুঁজিয়া আনিবারও সকল সময় দরকার হয় না। নিজেই খাবারের সন্ধানে জাহাজের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়। কাহাকেও হঠাৎ একা বরফের উপরে পাইলে, আক্রমণ করিতেও ছাড়ে না। কিন্তু প্রায়ই জাহাজের লোকেরা দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পায়। অনেক সময় কুকুরগুলির ব্যস্তসমস্ত হইয়া ল্যাজগুটানি, উঁকি ঝুঁকি মারা, আর গোঙানিতেই টের পাওয়া যায়, যে ভাল্লুক আসিয়াছে।

ভাল্লুকের সন্ধান পাইলেই বন্দুক লইয়া তাহাকে তাড়া করা হয়; আর প্রায়ই তাহাকে না লইয়া জাহাজে ফিরা হয় না। এইরূপ করিয়া বরফের উপরে ছুটাছুটি করা সহজ কাজ নহে। বরফের উপর দিয়া আবার শুধু পায় চলার যো নাই—



ঠাণ্ডায় পা পচিয়া যাইবে। এই কাজের জন্য বিশেষ রকমের জুতা, খড়ম-ব্যবহার করিতে হয়; এবং তাহা পায় দিয়া চলিবার কায়দাও অনেক চেষ্টা করিয়া শিখিতে হয়। ইহা ছাড়া বরফের উপর দিয়া চলিবার সময় অল্প রকমের বিপদেরও

সম্ভাবনা আছে। পরের পৃষ্ঠায় ছবিতে ইহার নমুনা দেখ। বেচারার হাতে লাঠি না থাকিলে, আজ মুন্সিলই ছিল আর কি!

খাটুনিটা যে খুবই ছিল, তাহা বুঝা যাইতেছে। আর এরূপ খাটুনির দরকারও ছিল। স্কাভি বেয়ারাম অলসদিগকেই সহজে ধরে। খাটা চাই, খাওয়া চাই, আর



মনে খুব ক্ষুধা রাখা চাই। গ্লান্সেন্ ইহার সব কয়টিরই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক ফ্রামের একটি লোকেরও স্কাভি অথবা অন্য কোন শক্ত অশুখ হয় নাই। দেশে ইহারা যেমন ছিল, মেরুর দেশে গিয়া কোথায় তাহার চাইতে রোগা হইবে, না সকলেই আরো মোটা হইতে চলিল।

এইরূপ করিয়া দিন যায়। গ্রীষ্মকালে দেশছাড়া হইয়াছিল, ক্রমে শীত আসিল, শীত গেল, আবার গ্রীষ্ম আসিল। ছয় মাস দিন, ছয় মাস রাত। গ্রীষ্মকালে সূর্য উঠে, শীতকালে অস্ত যায়। সমস্তটা শীতকাল এক রাত্রি। রাত্রি বটে, কিন্তু আমাদের

হাতে লাঠি না থাকিলে, মুন্ডিলই ছিল আর কি।

এখানকার অন্ধকার রাত্রির মতন অন্ধকার নহে। সাদা বরফের দরুণ তেমন অন্ধকার হইতে পায় না। তাহা ছাড়া অরোরার আলো আছে। অরোরাটা যে কি রকম ব্যাপার, তাহা চক্ষে দেখি নাই, সুতরাং তাহার বর্ণনা করিতে পারিতেছি না। শুনিয়াছি সেটা বড় সুন্দর জিনিস; যে দেখে সে জীবনে আর ভুলিতে পারে না। সাবানের জলের বুড়ুড়িতে কেমন সুন্দর রং খেলে, দেখিয়াছ? আকাশটাকে

যদি একটা প্রকাণ্ড সাবানের জলের বুড়বুড়ি মনে করা যায়, তবে মনে কর, অরোরাটা যেন সেই বুড়বুড়ির গায়ের রঙের ঝিকমিকিটুকু। কিন্তু অরোরার আলো খুব উজ্জ্বল, তাহার রং অনেক সুন্দর। শীতকালে অরোরার খেলা, আর বরফের দোরাখ্যাটা খুব বেশী করিয়া হয়। এই বরফের ভিতরে পড়িয়া, এ পর্য্যন্ত কোন জাহাজই রক্ষা পায় নাই। কিন্তু ফ্রামের গঠন এমনি ছিল, যে বরফের চাপ তাহাতে ভাল করিয়া লাগিত না। কাজেই বরফে ফ্রামের কিছুই করিতে পারে নাই। খোলাশুদ্ধ খুব শক্ত বাদাম মুখে দিলে, তোমাদের যেমন হয়, ফ্রামকে চিবাইতে গিয়া বরফেরও তেমনি হইয়াছিল।

যাহা হউক, বরফের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রাম যতটা উত্তরে আসিবে মনে করা গিয়াছিল, ততটা উত্তরে সে আসিল না। অবশ্য যতটা আসিয়াছে, পূর্ব্বে কোন জাহাজই ততখানি আসিতে পারে নাই। কিন্তু গ্ৰান্সেন্ মনে করিলেন, যে আরো উত্তরে কি আছে দেখিতে হইবে। এই মনে করিয়া তিনি আর জোহানসেন্ নামক অপর এক ব্যক্তি ফ্রাম ছাড়িয়া, উত্তর মুখে রওয়ানা হইলেন। তিনখানি শ্লেজে করিয়া আবশ্যকীয় জিনিস পত্র লওয়া হইল। ইহার ভিতরে দুটা ক্যানবিসের নৌকাও ছিল। শুকনো ডাঙ্গায় শ্লেজ চলিবে; জল পার হইতে হইলে নৌকা ব্যবহার হইবে। শ্লেজ টানিবার জন্য ২৮টি কুকুর লওয়া হইল।

জাহাজের ভার স্ভারড্রপ্ নামে এক ব্যক্তির হাতে দিয়া ১৮৯৫ সালের ১৪ই মার্চ তারিখে গ্ৰান্সেন্ আর জোহানসেন্ যাত্রা করিলেন। ফ্রাম যত দূর আসিয়াছে, তাহাতে গ্ৰান্সেনের কথিত সেই শ্রোতের বিষয় যথেষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং এখন সুযোগ পাইলে সকলকে দেশে ফিরিয়া যাইতে বলিয়া গেলেন।

গ্ৰান্সেন্ আর জোহানসেন্ ক্রমাগত উত্তরমুখে চলিয়াছেন। সমস্ত দিন বরফের উপরে চলিয়া রাত্রিতে তাঁবু খাটাইয়া বিশ্রাম করেন। বিছানাপত্র কিছু নাই। বল্গা হরিণের চামড়ার একটা প্রকাণ্ড থলে সঙ্গে আছে; সেইটার ভিতরে দুজনে ঢুকিয়া নিদ্রা যান। খাবার জিনিস সবই সঙ্গে আছে। কেরোসিনের ষ্টোভে একটু গরম করিয়া লইলেই তাহা খাইবার উপযুক্ত হয়। আর, মেরুতে যাহারা যায়, তাহাদের খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে অত্যন্ত কড়াকড়ি করিলে চলে না। রান্নাবান্নার অবসর কি সকল সময় হয়? সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরে যদি একটা ভাল্লুক টাল্লুক কিছু মিলে তবেই ঢের। রান্না হইল আর নাই বা হইল, তাজা মাংস ত বটে। সঙ্গে

শুকনো জিনিসের চাইতে তাজা মাংস কাঁচাও ভাল। সেই ভয়ানক জনপ্রাণীহীন স্থানে কত দিন ধরিয়া চলিতে হইবে, তাহার ঠিক কি? সুতরাং জন্তু মারিয়া খাইবার সুবিধা থাকিতে সঙ্গের জিনিস খরচ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যখন জন্তু মিলিবে না, তখন সঙ্গের জিনিস খাওয়া যাইবে। তোমাদের হয়ত কাঁচা মাংসের কথা শুনিয়া ঘৃণা হইতেছে। তাহা হইতে পারে। নিজের ঘরে দিব্যি আরামে বসিয়া আছ কি না! মেরুতে যাইতে হইলে টের পাইতে! অবশ্য স্থান্সেন্ আর জোহান্সেন্ ভাল্লুক মারিয়া খান না। তাহার কারণ এই যে, এত উত্তরে ভাল্লুক কেন, কোন জানোয়ারই নাই। সুতরাং ইহাদিগকে সঙ্গের জিনিস খাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। যখন এ সকল জন্তু মিলিবে, তখন ইহারাও ছাড়িবেন না। কুকুরগুলি কি খায়? তাহাদের খাবার জিনিসও কতক সঙ্গে আছে। কিন্তু ২৮টা কুকুরের বেশী দিনের খাওয়া সঙ্গে লইয়া যাওয়া ত সহজ কথা নহে। সুতরাং মাঝে মাঝে এক একটা কুকুর মারিয়া অস্ত্রগুলিকে খাইতে দেওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। প্রথমে কুকুরগুলি তাহা খাইতে রাজি হয় নাই। মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল; সে মাংস ছুঁইলও না। কিন্তু ক্ষুধা এমনি জিনিস, শেষটা ঐ মাংসের জন্তাই ব্যস্ত। প্রথমে চামড়া ছাড়াইয়া দিবার দরকার হইত, শেষে চামড়া শুদ্ধই চলিত।

এইরূপ করিয়া প্রায় ২৫ দিন গেল। প্রথমে মাঠের মতন সমান বরফ ছিল, তাহা পার হইতে কষ্ট হয় নাই। কিন্তু তারপর ক্রমেই বরফ উঁচু নীচু হইতে লাগিল। শেষটা এমন হইল যে, সমস্ত দিনে ৪।৫ মাইলের বেশী পথ যাওয়া যায় না। ইহার উপরে আবার এক নূতন মুঞ্চিল। স্থান্সেন্ আর জোহান্সেন্ প্রাণপণ করিয়া বরফ ভাঙ্গিয়া যা' একটু উত্তরে যান, বরফ ক্রমাগত দক্ষিণে সরিয়া সেটুকুও মাটি করিয়া দেয়। স্থান্সেন্ বুঝিলেন, যে এরূপ করিয়া মেরুতে পৌঁছান অসম্ভব, সুতরাং এখন দেশে ফিরাই ভাল।

যেখান হইতে স্থান্সেন্ এবং জোহান্সেন্ ফিরিলেন, পূর্বের আর কেহ ততদূর যাইতে পারে নাই। দুজনমাত্র লোকের এরূপ ভয়ানক স্থানে সাহস করিয়া যাওয়াটা খুব আশ্চর্যের বিষয় বলিতে হইবে। তাঁহারা যে কিরূপ ভয়ানক ক্রেশ সহ্য করিয়াছিলেন তাহা আমরা ভাবিতেও পারি না। যে কাপড় পরিয়া ফ্রাম ছাড়িয়াছিলেন একদিনের জন্তও তাহা পরিবর্তন করিতে পারেন নাই। সে কাপড় ময়লা হইয়া তাহাতে দুর্গন্ধ হইল, তবু তাহা ছাড়িবার যো নাই। কতবার তাহা

ভিজিয়া গিয়াছে, সেই ভিজা অবস্থায়ই ঠাণ্ডা লাগিয়া আবার তাহার ভিতরের জল জমিয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় সে কাপড় পায় রাখা যে কি কষ্ট, তাহা অস্ত্রে বুঝিতে পারে না। তখন তাহা আর কাপড়ের মতন থাকে না, কচ্ছপের খোলার মতন শক্ত হয়—তাহার ঘর্ষণে চামড়া কাটিয়া যায়। এইরূপ করিয়া গ্ৰান্সেনের কলুইয়ের কাছে এমন ভয়ানক ঘা হইয়াছিল যে, তাহার ভিতর দিয়া হাড় দেখা যাইত।

তাহারা যত দিনের খোরাক লইয়া গিয়াছিলেন, বরফ পার হইতে তাহার চাইতে বেশী দিন লাগিল। ক্রমে খাবার জিনিস যত কমিয়া আসিল, গ্ৰান্সেন্ ততই চিন্তিত হইলেন। শেষটা ভয়ে আর পেট ভরিয়া খাইতেন না—পাছে বরফ পার হইবার পূর্বেই খাবার জিনিস ফুরাইয়া যায়। প্রায় এক মাস যাবৎ ক্রমাগত দক্ষিণমুখী আসিতেছেন; ইহার মধ্যে একটিও জন্তু দেখিতে পান নাই। কুকুরগুলিও না খাইতে পাইয়া রোগা হইয়া যাইতেছে, আর তাহাদের সংখ্যাও ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। শেষটা মোটে দুটিতে আসিয়া দাঁড়াইল।

যাহা হউক, খাবার কষ্ট বেশী দিন রহিল না। ক্রমে একটি দুটি করিয়া শিকার মিলিতে লাগিল, আর খাবার জিনিসের চিন্তাও কমিয়া আসিতে লাগিল। পাখী, ভাল্লুক, শীল, সিঙ্গুঘোটক যখন যাহা পান, শিকার করেন। সে দেশে মাংস শীঘ্র পচে না; সুতরাং একটা বড় জন্তু মারিলে অনেক দিন কাজ চলিয়া যায়। ভাল্লুকই বেশী পাওয়া যায়। একদিন একটা ভাল্লুক তাহাদের তাঁবুর কাছে আসিয়া একটা কুকুরকে শূঁকিতেছিল। গ্ৰান্সেন্ সেটাকে গুলি করিলেন; গুলি খাইয়া সেটা ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। গ্ৰান্সেন্ তাহার পিছু পিছু খানিক দূর গিয়া দেখিলেন, তাহার দুইটা বাচ্ছা আছে। বাচ্ছাগুলি যেন ভারি ব্যস্ত হইয়াছে। ভাল্লুকটা ভাল করিয়া চলিতে পারে না; আর বাচ্ছাগুলি ক্রমাগত তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া তাহাকে তাড়াতাড়ি লইয়া যাইতে চাহে। গ্ৰান্সেন্ আর এক গুলিতে ভাল্লুকটাকে মারিয়া ফেলিলেন। তখন বাচ্ছাগুলি তাহার কাছে আসিয়া ক্রমাগত তাহাকে ঠেলিতে লাগিল। আর একগুলিতে একটা বাচ্ছাকে মারিলেন; অবশিষ্ট বাচ্ছাটা তাহার ভাইয়ের কাছে আসিয়া অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। সে যেন একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছে। এমন কি, তাহাকেও যখন গ্ৰান্সেন্ মারিতে গেলেন, তখন সে পলাইতে একটুও চেষ্টা করিল না।

তঁাহারা যেমন খাইবার জন্ত ভাল্লুক খুঁজিতেন, তেমনি মাঝে মাঝে এক একটা ভাল্লুকও তঁাহাদিগকে খাইতে আসিত। একটা এমনি চালাক ছিল, যে চুপি চুপি কোন্‌খান দিয়া একেবারে তঁাহাদের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, তবুও তঁাহারা টের পান নাই। সেটা জোহান্সেনের পিছনে আসিয়া তঁাহাকে সটান এক চড়। চড় খাইয়া জোহান্সেন চিত হইয়া পড়িয়া গেলেন, আর অমনি ভাল্লুকটা একেবারে তঁাহার উপরে আসিয়া পড়িল। তিনিও এক হাতে ভাল্লুকের গলা টিপিয়া ধরিয়া, স্থান্সেনকে



ভাল্লুকের মুখে জোহান্সেন স্থান্সেন নৌকা হইতে বন্দুক তুলিতেছেন।

ডাকিতে লাগিলেন। স্থান্সেন আসিয়া সেটাকে মারিতে মারিতে, সে দুইটা কুকুরকে দুই চড় লাগাইল। তার পর হাঁ করিয়া জোহান্সেনের মাথাটা কামড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল। স্থান্সেন আর একটু দেরীতে

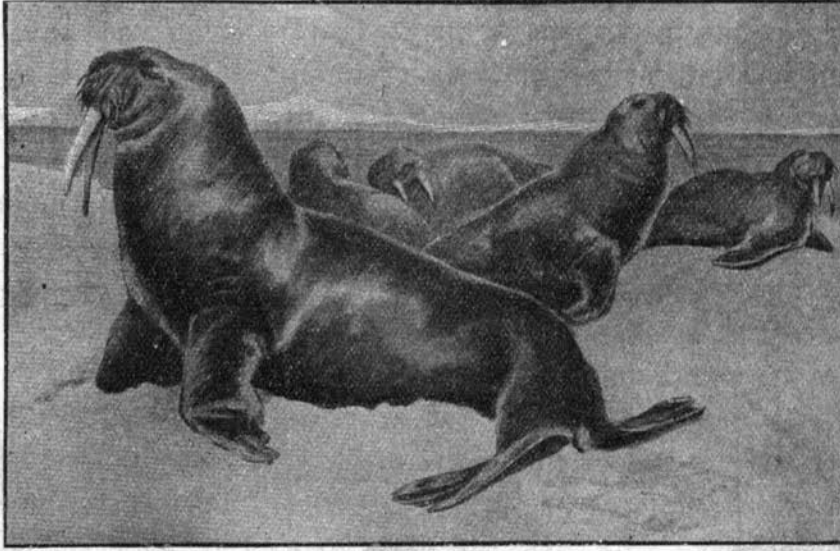
আসিলে কি করিত কে জানে?

বরফের উপরে অনেক দিন হাঁটিয়া শেষে তঁাহারা পরিষ্কার জল দেখিতে পাইলেন। সেই পরিষ্কার জলের পরে খানিকটা বরফে ঢাকা উচু ডাঙ্গা দেখা গেল। এত দিনে বুঝি বরফ ভাঙ্গার কষ্ট ফুরাইবে ভাবিয়া তঁাহারা যার পর নাই আনন্দিত হইলেন! তেমন আনন্দের বিষয় হইলে তোমরা বন্ধুদের ডাকিয়া নিমন্ত্রণ খাওয়াও। ইহারাও যথাসাধ্য করিলেন। স্থান্সেন আগে ছিলেন, তিনি টুপি ঘুরাইতে লাগিলেন। জোহান্সেন পিছন হইতে বলিলেন, “হু—রে—!” তার পর দুজনে দুখানি চকোলেটের লজনচুস্ বাহির করিয়া খাইলেন।

এই সুখের ভিতরে একটা ভারি দুঃখের কারণ উপস্থিত হইল। এখন সমুদ্র পার হইতে হইবে; সঙ্গে দুখানি ছোট ছোট কাপড়ের নৌকা, তাহাতে নিজেদের

যাওয়াই প্রাণ হাতে করিয়া ; ইহার উপরে অবশিষ্ট কুকুর ছটীকে সঙ্গে লওয়া একেবারেই অসম্ভব। উহাদিগকে ফেলিয়া গেলে ভাল্লুকে খাইবে। তাহা যদি না হয়, তবে ক্ষুধায় ভয়ানক কষ্ট পাইয়া উহারা মরিবে। তাহার চাইতে একেবারে গুলি করিয়া উহাদিগকে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলাতে বরং কম কষ্ট। তাহাই স্থির হইল, কিন্তু নিজের কুকুরটিকে নিজে মারিতে হাত উঠিল না। শেষটা জোহান্সেন্‌ জ়ান্সেনের কুকুরকে আর জ়ান্সেন্‌ জ়োহান্সেনের কুকুরকে গুলি করিলেন।

এখানে সমুদ্র বেশী চওড়া ছিল না ; সুতরাং সহজেই পার হইলেন। মাঝে মাঝে এক একটা সিদ্ধঘোটক আসিয়া একটু ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল ; তাহা ছাড়া অন্য কোন উৎপাত হয় নাই। সিদ্ধঘোটকগুলি ভারি বেখাপ্লা জানোয়ার।



সিদ্ধঘোটক।

জ়ান্সেন্‌ বলিয়াছেন, যে তাহাদের চেহারা দেখিলেই ভূত মামদোর কথা মনে হইত। বুদ্ধিটা একটু বেশী রকম মোটা ; মেজাজটি আবার বড় বেজায় চটা। কোঁতুহল এত, যে কোন নূতন জিনিস পাইলে তাঁহাকে একবার দেখিয়া সন্তুষ্ট হয় না। সামনের দিক হইতে একবার দেখিয়া যাইবে ; খানিক পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া পিছনের

দিক হইতে দেখিবে। ইহার উপর আর একবার হয়ত পাশের দিক হইতে দেখিতে আসিবে। খালি সোজাশুজি দেখিয়া তাহার মনের খুঁৎখুঁতি মিটে না; তাহাকে আবার যথাসাধ্য উচু হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দেখা চাই। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ফৌস ফৌস ঘোঁৎ ঘোঁৎ কত করিবে, তাহার অন্ত নাই।

আনসেন আর জোহানসেনকে নৌকার উপর দেখিতে পাইলে, ইহাদের এক একটা যার পর নাই ব্যস্ত হইত। চারি দিক ঘুরিয়া তাঁহাদিগকে দেখিত; আর উহাদের ভাষায় যত আসে, তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিত। ইহার উপর আবার তাহার সেই প্রকাণ্ড দাঁত ছুটা দিয়া, নৌকাখানিকে ফুটা করিয়া দিবার চেষ্টা। গুলি করিয়া বেশী রকম ভয় জন্মাইয়া না দিলে ইহারা কিছুতেই যাইত না। একবার তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে নৌকা বাহিয়া যাইতেছেন—কথা নাই বার্তা নাই, কোন্‌খান হইতে একটা সিঙ্ক্‌ঘোটক আসিয়া জোহানসেনের নৌকার তলায় এমনি ঢুঁ মারিয়াছে, যে প্রায় নৌকা শুদ্ধ তাঁহাকে উড়াইয়া দিবার যোগাড়।

যাহা হউক শেষটা তাঁহারা ডাঙ্গায় (একটি দ্বীপে) উঠিলেন। বরফ ভাঙ্গার কষ্ট শেষ হইল বটে, কিন্তু অতি শীঘ্রই শীতকাল আসিয়া পড়িল। শীতকালে সে দেশে পথ চলা কিছুতেই সম্ভব নয়। চলিলে নিশ্চয় মৃত্যু। সুতরাং সেই দ্বীপে একটা কুঁড়ে তয়ের করিয়া, তাহাতেই দুজনায় শীত কাটাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। কয়েক মাসের (সেপ্টেম্বর হইতে মে) খাবার সংগ্রহ করা সকলের আগে দরকার হইল। কারণ শীতের সময় শিকার মিলে না, আর তেমন ঠাণ্ডায় শিকার করা সম্ভবও নহে। কয়েকদিন ক্রমাগত ভাল্লুক আর সিঙ্ক্‌ঘোটক মারিয়া তাহাদের মাংস আর তেল একটা জায়গায় সঞ্চয় করা হইল। এই সকল জন্তুর রক্ত, চর্বি ইত্যাদি লাগিয়া, তাঁহাদের পোষাক আর শরীরের না জানি কি রকম দশাই হইয়াছিল। সে ময়লা ধুইলে যায় না, ঘসিলে উঠে না,—ছুরি দিয়া চাঁচিলে খানিকটা পাতলা হয় মাত্র। স্নান করা, কাপড় ছাড়া, কোনটাই সম্ভব নয়, সুতরাং ঐ সব লইয়াই থাকিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের সাদা চামড়া কাল হইয়া গিয়াছিল, চুল, দাড়ি, গোঁফ সব জটা পাকাইয়া গিয়াছিল। তথাপি আনসেন বলেন, যে তাঁহারা বেশ সুখেই ছিলেন।

যাহা হউক শেষটা আবার গরম কাল আসিল, তাঁহারাও সেই দ্বীপ ছাড়িবার আয়োজন করিলেন। ১৮১৬ সালের ১৯এ মে তারিখে তাঁহারা সেখান হইতে যাত্রা

করিলেন। অনেকটা দূর সমুদ্রের ধারে ধারে যাইতে হইল। মাঝে মাঝে নৌকা বাহিয়া যান, মাঝে মাঝে বরফে উঠিয়া নৌকা টানিয়া লইয়া চলেন। বিশ্রামের সময় বরফের উপরে উঠিয়া বিশ্রাম করেন।

এইরূপে একদিন নৌকা ছুথানিকে একটা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দুজনে বরফের উপরে বিশ্রাম করিতে উঠিয়াছেন, এমন সময় জোহান্সেন বলিলেন, “ঐ ষা! নৌকা ত ভেসে গেল।” কি সর্বনাশ! নৌকা গেলে যে সবই যায়। দুজনে ছুটিয়া চলিলেন, কিন্তু নৌকা ততক্ষণে বেশ একটু দূরে চলিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি জোহান্সেনের হাতে ঘড়িটা দিয়া, কোট



ছাড়িয়া স্থান্সেন জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। তিনি খুব সাঁতরাইতে পারেন, কিন্তু জল বরফের চাইতেও ঠাণ্ডা, হাত পা অবশ করিয়া দেয়। এদিকে হাওয়াতে নৌকা ছটিকে ঠেলিয়া ক্রমেই দূরে লইয়া চলিয়াছে। স্থান্সেন প্রাণপণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর অবশ হইয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু নৌকাগুলিও ক্রমেই কাছে আসিতে লাগিল। শেষটা যখন আর পারেন না, এর পরে ডুবিয়া যাইতে হইবে, তখন হাত বাড়াইয়া একটা নৌকা ধরিতে পারিলেন। কিন্তু তখন আর নৌকায় উঠিয়া বসিবার শক্তি নাই। • খানিকক্ষণ এই রূপেই ঝুলিয়া রহিলেন, তার

পর অনেক কষ্টে একখানা পা নৌকায় তুলিয়া কোন মতে হামাগুড়ি দিয়া নিজেও উঠিলেন। শীতে সমস্ত শরীর অবশ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপি জলের উপর

ছটি সুখাচ্ছ পাখী দেখিয়া, তাহা শিকার করিবার লোভ ছাড়িতে পারিলেন না। জোহান্সেন্ এতক্ষণ ডাঙ্গায় থাকিয়া মনে নিতান্তই কষ্ট পাইতেছিলেন, হঠাৎ বন্দুকের শব্দ শুনিয়া মনে করিলেন, যে স্থান্সেন্ বৃষ্টি পাগল হইয়াছেন। অনেক কষ্টে নৌকা বাহিয়া তীরে আনা হইল। জোহান্সেন্ তাড়াতাড়ি তাঁহার ভিজা কাপড় ছাড়াইয়া দিলেন। তারপর ছ একখানা শুকনো কাপড় যাহা ছিল, তাহা দিয়া আর নৌকার পাল দিয়া ঢাকিয়া তাঁহাকে সেই চামড়ার থলের ভিতরে শোয়াইয়া রাখিলেন। সেখানে শুইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে শেষটা তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন! তাঁহাকে ঘুমাইতে দেখিয়া জোহান্সেন্ রান্না চড়াইলেন। স্থান্সেন্ ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিলেন, খাবার প্রস্তুত। গরম গরম পাখীর ঝোল খাইয়া তাঁহার সকল কষ্ট দূর হইয়া গেল। পরদিন আবার সমুদ্রের ধারে ধারে নৌকা বাহিয়া চলিলেন।

১৭ই জুন দুপুরবেলা তাঁহারা নৌকা তীরে বাঁধিয়া একটু ডাঙ্গায় উঠিলেন। ইচ্ছা, যে চারিদিক চাহিয়া একবার দেখিবেন কিরূপ স্থান। একটু উঁচু জায়গায় উঠিয়া চারিদিকের পাহাড় আর বরফ দেখিতেছেন, এমন সময় কুকুরের ডাকের মতন ছটা কেঁউ কেঁউ শব্দ তাঁহাদের কাণে আসিল। তাঁহারা চমকিয়া মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিলেন। খানিক পরে আবার সেইরূপ শব্দ। এবারে আর ভুল নাই—কুকুরের ডাক।

তাড়াতাড়ি রান্না খাওয়া শেষ করিয়া জোহান্সেন্কে নৌকা আর জিনিসপত্রের খবরদারি করিতে বলিয়া, স্থান্সেন্ কুকুরের ডাকের কারণ খুঁজিতে বাহির হইলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে আবার সেই শব্দ এবং একটু পরেই যেন মানুষের গলার আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। সেই শব্দ শুনিয়া তিনি চ্যাচাইতে চ্যাচাইতে তাহার দিকে ছুটিলেন, এবং খানিক দূর গিয়া একজন লোক এবং একটা কুকুর দেখিতে পাইলেন। আরো কাছে গিয়া দেখিলেন, যে লোকটি তাঁহার পরিচিত একটি ইংরাজ, নাম জ্যাক্সন।

স্থান্সেন্ আর জোহান্সেন্ জ্যাক্সনের অতিথি হইয়া কিছুদিন সেইখানে রহিলেন। তারপর উইগ্‌ওয়ার্ড নামক একখানা জাহাজ জ্যাক্সনের জন্ত কিছু জিনিস লইয়া সেখানে আসিল। সেই জাহাজে চড়িয়া স্থান্সেন্ আর জোহান্সেন্ দেশে ফিরিলেন। ১৩ই আগষ্ট জাহাজ ভার্দো নগরের বন্দরে নঙ্গর ফেলিল। ডাঙ্গায়

উঠিয়াই স্থান্সেন্ দেশের পরিচিত লোকদিগকে টেলিগ্রাফ করিবার জন্ত টেলিগ্রাফ আফিসে গেলেন। টেলিগ্রাফ মাষ্টার এত বড় টেলিগ্রাফের তাড়া আর কখনও পায় নাই। সে প্রথমে ভারি আশ্চর্য্য হইল; কিন্তু যখন টেলিগ্রাফে সহিত “ফিড্‌ট্যক স্থান্সেন্” নাম দেখিল, তখন তাহার আনন্দ দেখে কে! দেশের লোকে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল যে, স্থান্সেন্ মরিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া সকলে যার পর নাই আনন্দিত হইল। স্থান্সেনের একটি বন্ধু তখন সেই সহরে ছিলেন, তিনিও এত দিনে তাঁহাকে আবার দেখিতে পাইবার আশা ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। তিনি স্থান্সেনকে দেখিয়া খানিকক্ষণ অবাক হইয়া রহিলেন। তার পর তাঁহারা গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

স্থান্সেনের টেলিগ্রাফ পাইয়া তাঁহার স্ত্রী সেই নগরেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

২০এ আগষ্ট সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই স্থান্সেন্ একখানা টেলিগ্রাম পাইলেন, তাহাতে এইরূপ খবর লেখা ছিল;—

“ফ্রাম নির্বিল্লে দেশে আসিয়াছে। আমরা সকলেই ভাল আছি।—

অটো স্ভার্ড্‌প্‌।”

সুজাতার পুণ্যলাভ

(জাতকের গল্প)

বহুকাল আগে বোধিসত্ত্ব মগধরাজ্যে মচল নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিয়াছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল “মঘকুমার”। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বোধিসত্ত্ব পরম ধার্মিক হইয়া উঠিলেন। পরের উপকার করা এবং দুঃখীর দুঃখ দূর করাই তাঁহার জীবনের ব্রত হইল। গ্রামের লোকের সুবিধার জন্ত তিনি একটি ধর্মশালা প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

ক্রমে গ্রামের সকলে তাঁহার একান্ত বাধ্য ও ভক্ত হইয়া পড়িল। সমস্ত সাধু কাজে সকলে তাঁহার সহায় হইল। গ্রামের দুঃখেরা শান্ত শিষ্ট হইল, অসাধু সাধু হইল, মাতাল মদ ছাড়িল—মচল গ্রামে অত্যাচার উপদ্রবের চিহ্নও রহিল না।

গ্রামের মোড়ল ভাবিল—“ভাইত ! গ্রামের লোকেরা সাধু হইয়াছে, এখন আর ঝগড়া বিবাদ করে না। আগে সকলকে শাসন করিয়া আমার বেশ ছুপয়সা রোজগার ছিল, এখন দেখিতেছি এই হতভাগা ব্রাহ্মণের জন্ত সব মাটি হইয়াছে। আচ্ছা, আমি বেটাদের সাধুগিরি বাহির করিতেছি।”

এই ভাবিয়া একদিন মোড়ল রাজার নিকট গিয়া মিথ্যা নালিশ করিল—“মহারাজ ! গ্রামে একদল ডাকাত জুটিয়াছে, তাহাদের অত্যাচারে গ্রামটিত যায় যায়।” রাজা তখনই হুকুম দিলেন—“বেটাদের বাঁধিয়া আন।” রাজার হুকুম পাইয়া মোড়ল তখনই লোকজন লইয়া গিয়া বোধিসত্ত্ব ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে বাঁধিয়া আনিল। রাজা একটু সন্ধানও করিলেন না, তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন—“ইহাদিগকে হাতী দিয়া মাড়াইয়া বধ কর।”

রাজার লোকেরা বন্দীদিগকে মাটিতে ফেলিয়া রাখিল। তারপর হুকুম হইল—হাতী আন ! বোধিসত্ত্ব সঙ্গীদিগকে বলিলেন—“ভাই সকল ! ধর্ম্য ভুলিও না। মনে রাখিও—রাজা, তাঁহার ছুঁ চরেরা, এবং এই হাতীগুলি, ইহার সকলেই দয়ার পাত্র।”

এদিকে হাতী আসিলে পর মাহুত শত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বন্দীদিগের কাছে নিতে পারিল না। বন্দীদিগকে দেখিবামাত্র বিকট চীৎকার করিতে করিতে হাতী উর্দ্ধ্বাশ্রমে ছুটিয়া পলায়ন করিল। তারপর একটা একটা করিয়া আরো কত হাতী আনা হইল কিন্তু সবগুলিই বন্দীদিগকে দেখিয়াই উর্দ্ধ্বাশ্রমে দৌড় দিল।

রাজা ভাবিলেন—হয়ত বন্দীদিগের নিকট কোন উৎকট গন্ধের ঔষধ আছে, যাহার জন্ত হাতী নিকটে যায় না। তখন খুঁজিয়া দেখা হইল, তাহাদিগের নিকট কিছুই পাওয়া গেল না। ইহাতে রাজামহাশয় ভাবিলেন—তবে নিশ্চয় ইহারা কোন মন্ত্র জানে। বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন—“মহারাজ ! আমরা মন্ত্র জানি বৈ কি ! আমরা প্রাণিহত্যা করি না, কেহ ইচ্ছা করিয়া কোন জিনিস না দিলে লই না, কুপথে চলি না, মিথ্যা কথা বলি না, আমরা মাছ মাংস খাই না, সকলকে দয়া করি, সকলকে ভালবাসি এবং সকলের উপকারের জন্ত ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করিয়া দেই। ইহাই আমাদের মন্ত্র, ইহাই আমাদের বল।”

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তখন সেই ছুঁ মোড়লের সমস্ত সম্পত্তি রাজার আদেশে বোধিসত্ত্বকে দেওয়া হইল, আর সেই

মোড়লকে বোধিসত্ত্বের চাকর করা হইল। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া, রাজা মচল গ্রামখানি এবং যে হাতীটা তাঁহাদিগকে মাড়াইবার জন্ত আনা হইয়াছিল সেটাও তাঁহাদিগকে দান করিলেন।

তখন বোধিসত্ত্বের দল স্থির করিলেন, গ্রামের চৌরাস্তার মোড়ে খুব বড় একটা ধর্মশালা প্রস্তুত করিতে হইবে। সকলে উৎসাহ করিয়া পুণ্য কাজে লাগিলেন, কিন্তু গ্রামের কোন জ্ঞানীলোককে কেহ সে কাজে ডাকিলেন না। তাঁহাদের প্রতি অশ্রদ্ধা করিয়া সকলে এই পুণ্য কাজ হইতে তাঁহাদের দূরে রাখিলেন। বোধিসত্ত্বের বাড়ীতে সুধর্ম্মা, চিত্রা, নন্দা ও সুজাতা—এই চারিজন জ্ঞানীলোক ছিলেন। একদিন সুধর্ম্মা, সেই ধর্ম্মশালার ছুতারকে গোপনে কিছু পয়সা দিয়া বলিলেন—“ভাই, এই ধর্ম্মশালা প্রস্তুত সম্বন্ধে পুণ্যের খুব বেশী ভাগটা যাহাতে আমি পাই, তাহার একটা উপায় করিয়া দাও।”

একথায় সুত্রেধর রাজি হইল এবং ভাল শুকনা কাঠ দিয়া অতি সুন্দর একটি চূড়া বানাইয়া সেটিতে কাপড় জড়াইয়া সুধর্ম্মার ঘরে রাখিয়া দিল। তারপর ধর্ম্মশালার অন্ত সব কাজ শেষ করিয়া সে বলিল—“তাইত! আসল কাজটাই যে এখনও করা হয় নাই?” গ্রামবাসীরা জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি কাজ করা হয় নাই?” ছুতার বলিল—“একটা সুন্দর চূড়া না হইলে কি ধর্ম্মশালার শোভা হয়? কাঁচা কাঠের ত আর চূড়া হয় না, সেটা আগেই করিয়া রাখা উচিত ছিল।” গ্রামের লোকেরা বলিলেন—“তবে এখন উপায় কি? ধর্ম্মশালার দেরি হইলে ত চলিবে না।” সুত্রেধর বলিল—“এখন খুঁজিয়া দেখিতে হইবে, কাহারও বাড়ীতে তৈয়ারী চূড়া কিনিতে পাওয়া যায় কি না।”

সকলেই তখন খুঁজিতে বাহির হইলেন এবং অনেক খুঁজিয়া শেষে সুধর্ম্মার ঘরে সুন্দর একটি চূড়া দেখিতে পাইলেন। সুধর্ম্মা বলিলেন—“যদি তোমরা আমাকে তোমাদের এই পুণ্যের ভাগী বলিয়া স্বীকার কর, তবেই চূড়া পাইবে, নহিলে আমি ইহা বিক্রয় করিব না।” অগত্যা গ্রামবাসীরা সুধর্ম্মার কথায় রাজি হইয়া চূড়া লইয়া গেলেন।

ধর্ম্মশালা শেষ হইলে তাহার চারিধারে পাঁচিল দেওয়া হইল। তখন সুধর্ম্মার দেখাদেখি চিত্রা দেয়ালের বাহিরে একটি সুন্দর বাগান করিয়া পুণ্যলাভের ব্যবস্থা করিলেন। নন্দাও সেখানে একটি খুব বড় পুকুর কাটাইয়া দিলেন। সুজাতা ভাল

মানুষ, কিছুই জানেন না, তিনি কিছুই করিলেন না। কেহ তাহাকে কিছু বলাও আবশ্যক বোধ করিলেন না।

ইহার পর বোধিসত্ত্ব দীর্ঘকাল ধর্ম ও পুণ্যকাজে দিন কাটাইয়া মৃত্যুর পর স্বর্গে জন্মিয়া ইন্দ্র হইলেন। তাঁহার সঙ্গীরাও মৃত্যুর পর সকলে দেবতা হইলেন।

তখন অশুরেরাও স্বর্গে থাকিত। ইন্দ্র ভাবিলেন ইহাদিগকে না তাড়াইতে পারিলে সবই মিথ্যা। এই ভাবিয়া একদিন তিনি অশুরদিগকে দেবসুরা পান



করাইলেন, এবং যখন তাহারা ঘোর মাতাল হইল, তখন এক এক জনকে ধরিয়া সুরমের পর্বতের নীচে ফেলিয়া দিলেন। সুরমের নীচে ছিল অশুরদেশ, সেটা স্বর্গের মতই বড়। স্বর্গে যেমন পারিজাত গাছ, অশুর দেশে তেমনি চিত্রপাটলি গাছ আছে। অশুরেরা চিত্রপাটলির ফুল দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে তাহারা আর দেবলোকে দাই; এবং ইহাও বুঝিল যে ইন্দ্র তাহাদিগকে মাতাল বানাইয়া রসাতলে

ফেলিয়া দিয়া, দেবলোক অধিকার করিয়াছেন। তখন তাহারা রাগিয়া ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য সকলে সুমেরু পর্বতে চড়িতে লাগিল।

এই সংবাদ পাইয়া ইন্দ্র, অশুরেরা সুমেরু পর্বতে চড়িবার পূর্বেই, তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু হায়, যুদ্ধে হারিয়া গিয়া তাঁহাকে পলায়ন করিতে হইল। তাঁহার পঞ্চাশ যোজন লম্বা বৈজয়ন্ত রথ তাঁহাকে লইয়া দক্ষিণ সমুদ্রের তেউয়ের উপর দিয়া বেগে ছুটিল। এইরূপে সমুদ্রের উপর দিয়া চলিতে চলিতে শেষে দেবতারা শাল্মলি বন দেখিতে পাইলেন। রথের বেগে শাল্মলি গাছগুলি উপড়িয়া সমুদ্রে পড়িতে লাগিল। সেই সব গাছে গরুড়বংশীয় পাখীদের বাসা ছিল। পাখীর ছানাগুলি সমুদ্রের জলে পড়িয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলে, ইন্দ্র মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“মাতলি! এ কিসের শব্দ? কাহারা যেন কষ্টে পড়িয়া আর্তনাদ করিতেছে!” মাতালি বলিল—“আপনার রথের বেগে শিমূল গাছ উপড়িয়া জলে পড়িতেছে। সেই গাছে সুর্পণশিঙদের বাসা ছিল—এ চীৎকার তাহাদেরই।” ইহা শুনিয়া ইন্দ্র বলিল—“রথ শীঘ্র ফিরাও। অশুরদের হাতে মরি সেও ভাল, কিন্তু এই সকল নিরীহ প্রাণীকে মিছামিছি কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।”

তখন মাতলি রথ ফিরাইয়া অন্য পথে দেবপুরীর দিকে চলিলেন। রথ ফিরিল দেখিয়া মূর্খ অশুরেরা ভাবিল—নিশ্চয় অন্য ব্রহ্মাণ্ডের ইন্দ্রেরা আসিয়া এই ইন্দ্রের পক্ষে যোগ দিয়াছেন তাই তাঁহার রথ ফিরিয়াছে! তখন তাহারা ভয়ে পলায়ন করিয়া অশুর পুরীতে আশ্রয় লইল, ইন্দ্রও দেবপুরীতে ফিরিলেন। সেই সময়ে হঠাৎ পৃথিবী ফুটা করিয়া হাজার যোজন উচু এক আশ্চর্য্য প্রাসাদ উঠিল। দেবতারা তাহার নাম রাখিলেন “বৈজয়ন্ত।” এই বৈজয়ন্ত প্রাসাদে ইন্দ্র নিশ্চিন্ত মনে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে পৃথিবীতে সুধর্ম্মার মৃত্যু হইলে পর তিনি স্বর্গে ইন্দ্রের দাসী হইয়া আবার জন্মিলেন। ধর্ম্মশালার জন্য চূড়া দানের পুণ্যে তাঁহার জন্য উচু মণিমুক্তার কাজ-করা একটি সুন্দর সভাগৃহ হইল, তাহাতে বসিয়া ইন্দ্র স্বর্গ ও পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে চিত্রাও মৃত্যুর পর দেবলোকে ইন্দ্রের দাসী হইয়া জন্মিলেন। তিনি ধর্ম্মশালার বাগান করিয়া দিয়াছিলেন, তাই তাঁহার জন্য “চিত্রলতাবন” নামে অতি সুন্দর একটি বাগানের সৃষ্টি হইল। ইহার পর নন্দাও মরিয়া স্বর্গে ইন্দ্রের সেবিকা হইলেন এবং তিনি “নন্দা সরোবর” নামে একটি সুন্দর পুষ্করিণী পাইলেন।

কিন্তু সুজাতা বেচারী কোনরূপ পুণ্যকাজ করেন নাই বলিয়া, মৃত্যুর পর তিনি এক বনে বক হইয়া জন্মিলেন। এদিকে ইন্দ্র বিষন্নমনে কেবল ভাবিতেছেন—সুজাতা এখন কোথায়? কি ভাবে আছেন? আমরা তাঁহাকে পুণ্যসঞ্চয়ের সুযোগ দেই নাই—হায়! না জানি তিনি এখন কত দুঃখে জীবন কাটাইতেছেন। এই ভাবিয়া ইন্দ্র বকরূপিণী সুজাতার সন্ধান করিয়া তাঁহাকে দেবপুরীতে লইয়া আসিলেন। সেখানে তাঁহাকে সুধৰ্ম্মা-সভা, চিত্রলতাবন ও নন্দা-সরোবর দেখাইয়া বলিলেন—“দেখ সুজাতা! সুধৰ্ম্মা, চিত্রা আর নন্দা পুণ্যকাজ করিয়াছিল, তাই মৃত্যুর পর তাহারা স্বর্গে আমার সেবিকা হইয়াছে। তুমি তখন কোন পুণ্য কর নাই, সেজন্য এখন হইতে পৃথিবীতে গিয়া পুণ্যসঞ্চয় কর।” এই বলিয়া তিনি সুজাতাকে আবার সেই বনে রাখিয়া আসিলেন।

কিছুকাল পরে একদিন ইন্দ্র তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্ত মাছের রূপ ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া রহিলেন। মরা মাছ ভাবিয়া সুজাতা যেই ঠোঁট দিয়া সেটাকে ধরিলেন অমনি সেটা নড়িয়া উঠিল। তখন সেই বক তাহাকে জীবিত দেখিয়া ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া ছিলেন। ইন্দ্রও তখনই নিজের রূপ ধরিয়া বলিলেন, “সুজাতা, সাধু সাধু! তুমি পুণ্যবতী, তুমি স্বর্গলাভ করিবে।” এই বলিয়া ইন্দ্র শূন্যে মিশিয়া গেলেন।

বকজন্মের পর সুজাতা বারাণসী নগরে এক কুমারের ঘরে জন্মিলেন। ঐজন্মেও পুণ্যসঞ্চয় করিয়া তিনি মৃত্যুর পর অশুররাজ বিপ্রচিন্তের কন্যা হইয়া আবার জন্মিলেন। পূর্বজন্মের পুণ্যের বলে তিনি অপরূপ সুন্দরী হইলেন, তাঁহার রূপের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তারপর ক্রমে তিনি বড় হইলে, অশুররাজ তাঁহার স্বয়ংবরের আয়োজন করিয়া অশুরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ইন্দ্রও সে সংবাদ জানিতে পারিয়া অশুরের বেশে সেই স্বয়ংবর সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

এদিকে যথা সময়ে সাজাইয়া গুজাইয়া সুজাতাকে সভায় আনা হইল। তাঁহার পিতা এবং অগ্র গুরুজনেরা বলিলেন—“মা! তুমি তোমার ইচ্ছামত এক জনের গলায় মালা দিয়া তাঁহাকে বরণ কর।” সুজাতা চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, সভার এককোণে স্বয়ং ইন্দ্র অশুর সাজিয়া বসিয়া আছেন। তখন আর দ্বিধামাত্র না করিয়া সুজাতা ইন্দ্রের গলায়ই মালা পরাইলেন। ইহার পর খুব ধুমধাম করিয়া ইন্দ্রের সহিত পুণ্যবতী সুজাতার বিবাহ হইয়া গেল, ইন্দ্র তাঁহাকে লইয়া স্বর্গে চলিয়া আসিলেন।

শ্রীকুলদারজন রায়।



কাঁটাফুটেছে, হাত কেটেছে, চোখে মেমেছে জল
ফুঁ দিয়েছি, চুমুখেয়েছি, সেরে গিয়েছে বল।

আলো ছায়া

[উষার ছেলে আলোককুমার, সন্ধ্যার মেয়ে ছায়া। কখনও তারা বাপ মায়ের মুখ দেখেনি। আলোককুমার রাণীর তেতল মহালে থাকে, সন্ধ্যা না হ'তেই সে ঘুমোয়, আর ভোরের আগে চোখ মেলে না—জন্মে অবধি সে অন্ধকারের মুখ দেখেনি। ছায়া থাকে পাহাড়ের বৃকে রাণীর আঁধারঘরে বদ্ধ হয়ে। কোন দিন বাইরের আলো তার চোখে লাগেনি।

আলোককুমার ভীম সর্দারের সঙ্গে সঙ্গে সারাটি দিন শিকার ক'রে ফেরে। রাণীর কড়া হুকুম, রোদ পড়বার আগেই তাকে ফিরতে হবে। ছায়া তার একলা ঘরে বই পড়ে, গান গায় আর বীণা বাজায়। রাণীর দাসী লতা আর ঘরের ছাতে ঝোলানো ঝকঝকে গোল বাতিটি তার সারা দিনের সাথী।]

একদিন ছায়া ঘরে ছবি দেখে বেড়াচ্ছে, এমন সময় উপরে হুড়মুড় করে একটা শব্দ হল, ছায়ার পায়ের তলার মাটি যেন একবার ঢুলে উঠল! তারপরই বন্বন্ব শব্দ করে ঝোলানো আলোটা ভেঙ্গে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

ছায়া ভারি অবাক হয়ে গেল। এ কি কাণ্ড? সে ত দুই চোখ খুলে রয়েছে, তবু কেন কিছু দেখা যায় না? বইয়ে যে আঁধারের কথা থাকে, সেই আঁধারটা বুঝি ঘরে এসে ঢুকেছে? সেই বুঝি অমন শব্দ করে, ঘর ছুলিয়ে আলোটাকে মেরে ফেললো? এখন কি করা যায়? ছায়া বসে বসে ভাবতে লাগল।

ছায়া অনেকবার শুনেছিল যে লতা আলো নিভে যাওয়ার কথা বলে। নিভে যাওয়া যখন, তখন আলোটা নিশ্চয়ই কোথাও চলে যায়। কোথায় যায়? যেখানে রাণী যান লতা যায়, সেইখানেই কি তার সুন্দর আলোটাও চলে গেল? ছায়া ঠিক করলে সেও আলোর পিছন পিছন বেরিয়ে গিয়ে তাকে আবার কোনোরকম করে ফিরিয়ে আনবে, আলো না হলে এমন আঁধার ঘরে সে থাকবে কি করে?

রাণী কিহা লতা ঘরে ঢুকবার সময় ছায়া সর্বদাই দেখত যে একটা কালো মোটা পরদার আড়াল থেকে তাঁরা এসে ঘরে ঢোকেন। বাইরে যেতে হলে তাহলে ঐ দিক দিয়েই যেতে হয় নিশ্চয়। ছায়া আঁধারে হাতড়াতে হাতড়াতে সেই দিকে চলতে লাগল। হটাৎ কি একটা জিনিষ বোলতার হলের মত তার পায়ে ফুটে গেল, সে চীৎকার করে সেইখানে বসে পড়ল। পায়ের কাছে হাত দিতেই সে বুঝতে পারল যে সেই সুন্দর ঝোলানো আলোটা টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে রয়েছে। কিন্তু তার

ভিতরের সেই চমৎকার ঝক্‌ঝকে জিনিষটা ত নেই, সে কখন চুপি চুপি ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে, ছায়া দেখতে পায়নি। কিন্তু তাকে ফিরিয়ে আনতেই হবে; ছায়া আবার উঠে চলতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে তার হাতটা গিয়ে সেই পরদায় ঠেকল। কিন্তু বেরবার জায়গা কই? সব জায়গায়ই ত নিরেট কালো পাথরের দেয়াল। ছায়া দেয়ালের গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ঘুরতে লাগল। আবার তার পায়ে কি ফুটে গেল। এবার আর যত্ননা সহিতে না পেরে ছায়া দেয়ালের গায়ে ঢলে পড়ল। পড়বামাত্রই তার মনে হল দেয়ালটা যেন গড়িয়ে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেও বাইরে এসে পড়ল।

কিন্তু বাইরেও যে কিছু দেখা যায় না, ছায়া যতই বড় করে চোখ চাক্‌ না কেন, কিছু দেখা যায় না। হটাৎ সে আনন্দে দুই হাত বাড়িয়ে সামনে ছুটে গেল, ঐ যে তার আলো! দুই আঁধার তার ঝক্‌ঝকে আলোকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সে এখন আবার আঁধারের বুকের উপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে ছায়ার কাছে ফিরে আসছে।

ছায়া যার দিকে অত খুসি হয়ে ছুটে চলেছিল, সেটা আসলে একটা জোনাকী। জোনাকী বেচারী কি করে এই পাহাড়ের সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, সে এখন কোনোরকমে বেরবার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ছায়া তাকে ধরবার জন্তে তার পিছন পিছন ছুটে চলল। হটাৎ একজায়গায় একটা ফুটো পেয়ে ছোট্ট জোনাকী তার ভিতর দিয়ে উড়ে বেরিয়ে গেল। আঁধার সুড়ঙ্গের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছায়ার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, এত কাছে এসে আবার তার আলো হারিয়ে গেল? কিন্তু দাঁড়িয়ে থেকেই বা কি লাভ? সে আবার চলতে লাগল। হটাৎ তার দুই পাশের আঁধার দেয়াল কোথায় মিলিয়ে গেল, সে এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল যার কোনোদিকে কোনো দেয়াল নেই। চার ধারে কেমন আলো, আঁধার কোথাও নেই। আশে পাশে কত রকম কত কি জিনিষ দেখা যাচ্ছে, তার একটাকেও ছায়া চেনে না। কিন্তু এত আলো কোথা থেকে আসে? ছায়া একবার উপরের দিকে চেয়ে দেখল। ওমা একি আশ্চর্য্য সুন্দর! কেমন প্রকাণ্ড নীল ছাদ, তার শেষ আর কোনো দিকে দেখা যায় না, তার থেকে হাজার হাজার ঝিক্‌মিকে আলো বুলছে। আর মাঝখানে কি প্রকাণ্ড একটা আলো, তার গা বেয়ে যেন আলো ঝরে পড়ছে, সে হাসিভরা মুখে ছায়ার দিকে চেয়ে আছে।

ছায়া চীৎকার করে বলে উঠল “ঐ যে আমার আলো!” কিন্তু তার আলোর চেয়ে এ যে ঢের ঢের বড়। এ তবে কি? ছায়া অনেকক্ষণ চাঁদের দিকে চেয়ে রইল, তারপর বললে “এইবার বুঝতে পেরেছি, ও যত ছোট আলো আছে, সকলের মা।”

ছায়া সেইখানে বসে পড়ে হুহাত বাড়িয়ে চাঁদকে ডাকতে লাগল। রাত্রির বাতাস তার মুখে গায়ে, চুলের রাশে খেলা করে বেড়াচ্ছে, আর ছায়া অবাক হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে যে কে তাকে অমন আদর করে গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কাউকেত দেখা যায় না? ছায়া বেচারী জন্মে অবধি গুহার বন্ধ বাতাসেই নিশ্বাস নিয়েছে, বাতাস যে আবার এমন করে ঢেউ তুলে বয়ে বেড়ায়, তা সে মোটেই জানতনা।

অনেকক্ষণ বাইরে বসে থেকে ছায়ার ভয় হল, লতা পাছে ঘরের মধ্যে এসে তাকে দেখতে না পেয়ে গোলমাল করে। তা হলেই ত রাগী সারাদিন তার কাছে লোক বসিয়ে রাখবেন, আর কখনও তার বাইরে আসা হবে না। কিন্তু একবার যখন ছায়া বাইরে এসে পড়েছে, তখন আর আসতে না পেল তার প্রাণ বাঁচবেনা। এখানে কি সুন্দর আলো, কত সব চমৎকার জিনিষ! ছায়া যে পথে এসেছিল, সেইপথে আবার ফিরে চলল, একটু পরেই গুহার আঁধার মুখ দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকে পড়ল।

ঠিক তক্ষুনি লতা এসে ঘরে ঢুকে অন্ধকার দেখে চীৎকার করে উঠল। ছায়া তাকে চীৎকার করতে বারণ করে আলো কি করে ভেঙ্গে গেল সব বললে। লতা তখন আবার বেরিয়ে গেল, খানিক পরেই আবার একটা বুলনো আলো এসে পৌঁছল। এটাকে কিন্তু ছায়ার তত সুন্দর লাগল না, এর চেয়ে ঢের সুন্দর আলো যে সে দেখে এসেছে। কিন্তু সে কথা সে লতাকে কিছু বললে না, নিজের আনন্দ নিজের মনেই চেপে রেখে দিল; যদিও তার এমন আনন্দ হয়েছিল যে ইচ্ছা করছিল যে গান গেয়ে ঘরময় নেচে বেড়ায়। ঘুমিয়ে পড়েও সে কেবলি যত আলোর আর অচেনা সব সুন্দর জিনিষের স্বপ্ন দেখতে লাগল।

ছায়া বইয়ে দিনের কথা আর সূর্য্যের কথা অনেক পড়েছিল। তার বিশ্বাস হল যে বাইরে গিয়ে যে আলো সে দেখে এসেছে সেইটাই হচ্ছে দিনের আলো, আর সেই মস্ত বড় বুলনো আলোটাই সূর্য্য। আর রাত্রি হচ্ছে তার এই আঁধার ঘরের মধ্যে, চাঁদ বোধ হয় ঐ ছাদ থেকে বুলনো গোল আলোটা।

আলো ভেঙ্গে যাবার পর থেকে লতা বেজায় সাবধান হয়ে উঠেছিল, সে আর ছায়াকে ছেড়ে যেতেই চায় না। ছায়া এদিকে অস্থির হয়ে উঠল, তার যে আর একবার গুহার থেকে বেরবার জন্তে প্রাণ ছটফট করে। শেষে একদিন ছায়ার বেজায় মাথা ধরে উঠল, সে চোখ বুজে খাটের উপর গিয়ে শুয়ে রইল। লতা খানিকক্ষণ তাকে একমনে দেখে যখন বুঝতে পারল যে সে ঘুমচ্ছে, তখন আস্তে আস্তে পা টিপে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সে যাবামাত্র ছায়ার ঘুম আর মাথা ধরা কোথায় যে উড়ে গেল তার ঠিক নেই, সে তক্ষুনি উঠে পড়ে বাইরে বেরবার জন্তে ছুটে চলল। কিন্তু বাইরে এসে দেখে ওমা একি! এ যে তার ঘরের ভিতরের চেয়েও অন্ধকার, আর সেই মস্ত বড় আলোটাও ত নেই! সে কোথায় গেল? তাকেও কি তুণ্ড অন্ধকার মেরে ফেলেছে? ছায়া মাটিতে হাতড়ে বেড়াতে লাগল যদিই আলোটার ভাঙ্গা টুকরো হাতে ঠেকে। কিন্তু কোথাও ত কিছু নেই। ছোট আলোগুলির ত কৈ কিছু হয়নি, তারা বরং আরো বেশী করে জ্বলছে। তা হলে বোধ হয় বড় আলোটা বুড়ো হয়ে মরে গিয়েছে, এই ছোট আলোরাই বাড়তে বাড়তে ক্রমে তত বড় হয়ে উঠবে।

কিন্তু বড় আলোটি ছাড়া আর সবাই রয়েছে। এই ত সেই, যাকে চোখে দেখা যায় না, অথচ যে গায়ে অমন নরম হাত বুলিয়ে, চুলে দোলা দিয়ে, ছায়ার সঙ্গে খেলা করে। ছায়া জল দেখেছে বটে, কিন্তু গুহার ভিতরে কলসীতে, গামলাতে যে জল থাকে সে ত মরা জল। বাইরের জল কি সুন্দর! সে কেমন গান করতে করতে, নাচতে নাচতে চলেছে, তাকে দেখতে ঠিক একগাছি রূপোর হারের মত। আর পায়ের তলায় এ সব কি সুন্দর সুন্দর জিনিষ, তাদের গায়ে কত রঙের ছোপ, আর কি সুন্দর গন্ধ! কিন্তু বড় আলোটির অভাবে ছায়ার অণু কিছু ভাল লাগল না, সে বেশী দেরি না করে নিজের আঁধার ঘরে ফিরে চলে গেল।

তার পরের বার সে বেরিয়েই দেখে বড় আলোটা ফিরে এসেছে, কিন্তু তত সুন্দর আর নেই। কে যেন তার খানিকটা ভেঙ্গে দিয়েছে। সেদিন সে খুব খুসি হয়ে যত গাছ পাতা ফুল ফল দেখে দেখে বেড়াতে লাগল। যা দেখে, তাতেই সে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে যায়, তার কাছে যে সবই নূতন।

আর একদিন ছায়া বেরিয়ে দেখে বাইরে ভয়ানক আঁধার, উপরের গোল ছাতে কোনো আলোর চিহ্নও নেই, কারা যেন ভয়ানক রেগে সাঁ সাঁ গাঁ গাঁ করে চাঁৎকার

করছে। ফুলের গন্ধ পাওয়া যায় না, নদীর গান শোনা যায় না, সেই যে মস্ত মস্ত গাছগুলি সবুজ রঙের ঘোমটায় মাথা ঢেকে বসে থাকত, তারা আজ ডালপালা নেড়ে কার সঙ্গে মহা যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়েছে। হটাৎ উপরের কালো পরদা ছিঁড়ে প্রকাণ্ড একটা আগুনের সাপ লাফিয়ে বেরিয়ে এল, তার পরেই সে কি ভয়ানক গর্জন! ছায়া ভয়ে প্রায় মরার মত হয়ে কোন রকমে ছুটে নিজের খরের মধ্যে পালিয়ে এল।

এমনি করে বারবার বেরিয়ে বেরিয়ে সব জিনিষ তার চেনা হয়ে গেল। বড় আলোটা কখনো থাকত কখনো বা থাকত না, একবার ঠিক গোল হয়ে ঝুলত, আর একবার হয়ত ভাঙ্গাচোরা হয়ে একটা ছোট টুকরো শুধু ঝুলে থাকত। ছায়া ঠিক করে নিল যে তার মত আলোটাকেও কেউ ঘরে বন্ধ করে রাখে, সেও ছায়ার মত সুরিধা পেলেই পালিয়ে আসে। তাতে রাগ করে তার চোঁকিদারেরা বোধ হয় তাকে মেরে ধরে টুকরো টুকরো করে দেয়, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সে আবার জোড়া লেগে ঠিক হয়ে যায়। মাঝে মাঝে যারা ঘোর কালো রঙের পোষাক পরে ভয়ানক চীৎকার করতে করতে আগুনের সাপ নিয়ে খেলে, তারাই বোধ হয় আলোকে ধরতে আসে। তারা আলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে একেবারে ঢেকে ফেলে টেনে নিয়ে আঁধার গুহায় চলে যায়, আলোর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ে। ছায়া একদিন বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়েছিল, তার গায়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়েছিল, তাকেই সে চাঁদের চোখের জল ভেবেছিল।

এদিকে আলোককুমার নিজের সাদা ঘোড়ায় চড়ে মাঠে বনে শিকার করে বেড়িয়ে দিন কাটিয়ে দেয়, সে রাত্রির কি চাঁদ, কি আঁধার কিছুই ধার ধারে না। একদিন ভোরবেলা আলোককুমার প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল, তার দলের লোকেরা কে কোথায় পড়ে রইল তার ঠিক ঠিকানা নেই। সে একটা অজানা জানোয়ার দেখতে পেয়েছিল, সেটাকে যেমন করে হোক মারতে হবেই। কিন্তু আলোককুমারের আরবী ঘোড়া হাওয়ার মত ছুটেও সেটাকে ধরতে পারল না, সে হুড়হুড় করে গুঁড়ি মেরে ঝোপেঝাপে লুকতে লুকতে কখন যে গহন বনে মিলিয়ে গেল, আলোককুমার তা জানতেও পারল না। নিরাশ হয়ে ফিরে আসতে আসতে পথে তার ভীমের সঙ্গে দেখা। আলোককুমার ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে “ভীম, সে জানোয়ারটা কি বলত? কি জোরেই দৌড়ে পালাল!”

ভীম বললে “কে জানে কুমার, বুড়ো হয়েছি এখন কি আর অত দূর থেকে ঠাহর হয়? চিতাবাঘ হতে পারে, সিংহের বাচ্চাও হতে পারে।”

আলোককুমার নাক সিঁটকিয়ে বললে “যাই হোক, বেজায় ভীত কিন্তু। আমাকে দেখেই যা ছুটটা দিলে!”

ভীম বললে “কুমার, তুমি ওদের ধরণ জান না, তাই ওকথা বললে। রোদের বাঁখে ওদের বড় অসোয়াস্তি লাগে, তাই ঝোপে ঝোপে লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা করে। কিন্তু একবার সূর্য্য ডুবুক দেখি, তখন ওদের সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্য?” কথাটা বলে ফেলেই ভীমের মনে একটু খটকা লাগল, পাছে তার কথা শুনে কুমার সূর্য্য ডুববার পরে সেই জানোয়ারটাকে শিকার করতে বেরয়। কিন্তু আলোককুমার তখন আর কোন কথাই বললে না, কাজেই ভীম নিশ্চিন্ত হয়ে সে কথা ভুলেই গেল।

আলোককুমার সারাদিন শিকার করে বেড়াতে লাগল, কিন্তু মনটা তার সেই অজানা জন্তুটার দিকেই পড়ে রইল। অজ্ঞানকার মত তীরের বেগে ঘোড়াও ছুটল না, কুমারের তীরে বিদ্ধ হয়ে বড় বড় বরা মহিষও লুটিয়ে পড়ল না। ভীম দেখল যে যতই সূর্য্য ডুববার সময় এগিয়ে আসছে, আলোককুমারও ততই বনের দিকে ঘেঁষে চলেছে। কিন্তু সূর্য্যটা যেই পশ্চিম আকাশে আগুণের বান ডাকিয়ে তার মধ্যে তলিয়ে যাবার যোগাড় করল অমনি হটাৎ যেন আলোককুমারের মত বদলে গেল। সে হাওয়ার মত ঘোড়া ছুটিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে চলল, অথরা রইল পিছনে পড়ে। ভীম বাড়ী ফিরে দেখে কুমারের ঘোড়া আস্তাবলে বাঁধা রয়েছে। সে তখন নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের কাজে চলে গেল। এদিকে কুমার যে সামনের দরজা দিয়ে চুকে, আস্তাবলে ঘোড়া রেখে আবার পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন, তার খোঁজ রাখে কে?

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাঠের মাঝের ছোট নদীটা পার হয়ে আলোককুমার ঠিক সূর্য্য ডুববার মুখে বনের সামনে গিয়ে হাজির। বড় বড় গাছগুলোর কাল গুঁড়ির আর পাতায় ভরা ডালের ফাঁকে ফাঁকে তখন আকাশের লাল আলো আবীরের ঝরণার মত বনের বুকে লুটিয়ে পড়ছে। আলোক কুমার খুসি হয়ে বললে “এইবার বাছাকে আর পালাতে হবে না, তাঁকে দেখাচ্ছি মজা।” ঠিক সেই মুহূর্তেই সূর্য্যদেব টুপ করে পশ্চিম সাগরে ডুব দিয়ে একেবারে তলিয়ে গেলেন।

হঠাৎ আলোক কুমারের মনে একটা ভয়ের ঝাপটা এসে লাগল। এরকম



ব্যাপার তার জীবনে আর কখনও হয়নি বলে সে আরও ভড়কে গেল। ভয় জিনিষটা কি তা সে বুঝতেই পারল না, অথচ ভয়ে তার সারা অঙ্গ ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। আকাশের গা থেকে সূর্যাস্তের আলোর ছোপ যতই মুছে যেতে লাগল, তার ভয়ও ততই বাড়তে লাগল। এ কি! চারিদিক দিয়ে কালো এসব কি তাকে ঘিরে ধরছে? চোখেও যে আর কিছু দেখা যায় না, এ কি কাণ্ড! জন্মে অবধি আলোক-কুমার নিজেকে যেরকম মনে করত,

আজ এক নিমেষেই যেন সব বদলে গেল। কোথায় গেল তার সাহস, কোথায় গেল তার তেজ? ভয়ে পাগলের মত হয়ে সে অঁধার বনে দিশে হারার মত ছুটে বেড়াতে লাগল।

ঐ রে! সেই জানোয়ার বুঝি তার পিছনে গুঁড়ি মেরে আসছে? আলোক কুমার ফিরে তাকায়, কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি একেবারে বন ছেয়ে রয়েছে, কোথাও কিছু দেখা যায় না। কিন্তু আলোক কুমার ভয়ে জ্ঞান বুদ্ধি সবই হারিয়েছিল, সে দেখতে লাগল যেন আঁধারের বুকে জোড়া জোড়া সবুজ চোখ জল্জল্ করে জল্তে জল্তে তার দিকে আসছে। হাত তুলে যে তীর ছুঁড়বে সে শক্তিটুকুও যেন নেই। কোনো রকমে দৌড়ে বাড়ী পালাতে পারলেই যেন সে বাঁচে, কিন্তু পা এমন কাঁপছে যে এক পা এগোনো অসাধ্য।

বনের মধ্যে কি একটা জন্তু গৌঁ গৌঁ করে উঠল। মহা ভয়ে আলোক কুমারের পায়ের কাঁপুনিও থেমে গেল, সে উর্দ্ধশ্বাসে বন ভেঙ্গে দৌড়ে চলল। তারার আলোয় বনের পথ ঝাপসা মতন একটু একটু দেখা যাচ্ছে, সেই পথ দিয়ে সে দৌড়তে লাগল। হায়রে! কোথায় গেল তার দিনের বেলার অত সাহস। একবার দৌড়তে আরম্ভ করে আর যে থামা যায় না, সারা বনটা যে তার পিছন পিছন তাড়া করে আসছে। রাতের হাওয়া বনের মধ্যে কেঁদে কেঁদে আছড়ে বেড়াচ্ছে, ঠিক যেন ভূতের কান্না।

রাত্রি বেড়ে চলল, আলোককুমার তখনও বনের মধ্যে ছুটে চলেছে। ছুটে ছুটে সারাবন ঘুরে কখন যে সে আবার রাজপ্রাসাদের পিছনের সেই পাহাড়ের গায়ে এসে পড়েছে, তা সে টেরও পায়নি। কিন্তু দাঁড়াবার সাধ্য নেই, তাহলেই পিছনের সব ভয় তাকে এক সঙ্গে চেপে ধরবে। সে ছুটে পাহাড়ে উঠতে লাগল, তারপর আবার উদ্ধার মতন বেগে, এ পারের উপত্যকায় নেমে এল।

রাত তখন তৃতীয় প্রহর। কৃষ্ণ পক্ষের হলুদ বরণ ভাঙ্গা চাঁদ এইবার আস্তে আস্তে মাথা তুলে গাছের সারের উপর দিয়ে উকি মারতে লাগল। আলোককুমারের দৃষ্টি সে দিকে পড়বামাত্রই সে একেবারে চৈতন্যে কেঁদে উঠল। ওটা কি? ওটা নিশ্চয়ই এই কালো আঁধারের রাক্ষস, তাকে গিলতে আসছে? ছোট পাহাড়ে নদীটি এখানেও বয়ে চলেছে; কোনো রকমে সেটা পার হয়েই, রাগীর ফুলবাগানের ঘাসের উপর আলোক কুমার অজ্ঞান হয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল। এদিকে সে কখনও আসেনি, কাজেই বুঝলনা যে সে বাড়ী ফিরে এসেছে।

রাগীর সেই যে অদ্ভুত অসুখের কথা গোড়াতেই বলেছি, কিছুদিন হ'ল তাঁকে সেই অসুখে ধরেছিল। তিনি রাতদিন এমন হৈ চৈ করতেন যে রাজ বাড়ীর যে যেখানে ছিল সবাই সারাক্ষণ তাঁকে নিয়েই ব্যস্ত থাকত। লতাকেও আর ছায়ার

ঘরে প্রায়ই দেখা যেতনা, কাজেই ছায়া প্রতিরাত্রেই বেরিয়ে পড়ে মনের আনন্দে বাগানময় ঘুরে বেড়াত। ছোট নদীটির সঙ্গে তার বেজায় ভাব হয়ে গিয়েছিল, সময় গেলেই গিয়ে তারই জলে রাঙা পা ছুখানি ডুবিয়ে সে বসে থাকত। নদী গান গেয়ে যেত কুল কুল কুল, ছায়া একেবারে মুগ্ধ হয়ে শুনত। বাগানের মধ্যে একটা ফোয়ারা ছিল, তার জল রাতদিন আকাশের দিকে ছুটে যেতে চাইত, কিন্তু একটু উঠেই আবার হতাশ হয়ে মাটির বুকে ফিরে আসত। সেটিও ছায়ার খুব বন্ধু ছিল।

আলোককুমার যে রাত্রে প্রথম আঁধার দেখে ভয়ে পাগল হয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল, সে রাতেও ছায়া বেরিয়ে বাগানে ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছিল। খানিক পরে সে ফোয়ারার ধারে এসে বসল, জলটা কেমন আনন্দে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে, সে তারি মধ্যে হাত দিয়ে খেলা করতে লাগল।

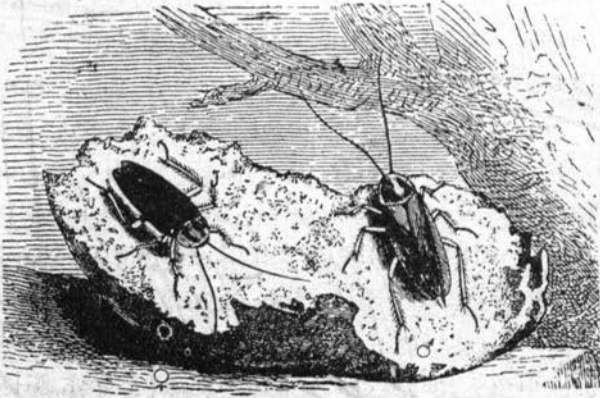
মস্ত বড় রঙীন একটা প্রজাপতি হঠাৎ তার মুখে নিজের কোমল ডানা জোড়া বুলিয়ে দিয়ে চলে গেল। ছায়া অমনি উঠে তার পিছনে ছুটল, দেখতে হবে ত সেটা কি ?

(ক্রমশঃ)

শ্রীমীতা দেবী।

আরসলা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)



কাইলোডোমিয়া জারমানিকা।

দিয়েছেন ‘রুশিয়ার আরসলা’। আজ কাল এরা প্রায় সব দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

ইংলণ্ডে আগে এই জাতির আরসলা ছিল না। সেদেশের লোকের বিশ্বাস, এরা জার্মানি দেশ হতে সেখানে গিয়াছে, তাই তাঁরা এর নাম দিয়েছেন ‘জার্মান আরসলা’। অষ্ট্রিয়ার লোকের বিশ্বাস যে রুশিয়া দেশ থেকে তাঁদের দেশে গিয়েছে, তাই তাঁরা এর নাম

এই গণেরই আর এক জাতির পাখায়ুক্ত আরসলা আমাদের দেশে আছে, তারা মাঠে ঘাটে, গাছতলায় পাতার নীচে থাকে। গাছের পাতায় অথবা ছালের উপর ডিম পাড়ে। তাদের পাখাহীন বাচ্চাগুলোকে মাটির উপর চলা ফেরা করতে দেখা যায়।



অনেক আরসলা দেখতে সুন্দর। দক্ষিণ ভারতবর্ষে সোয়া ইঞ্চ লম্বা এক রকম আরসলা আছে তাদের দেহটা প্রায় গোল, গায়ের রং কাল কুচুকুচে, পাখার উপর ৭টা হলুদে ফোঁটা থাকে, বেশ সুন্দর দেখায়।

আরসলার গায়ে ভারি দুর্গন্ধ। তার লাদিতে, তার ডিমে, সবটাতেই দুর্গন্ধ—যে জিনিসের উপর দিয়ে হেঁটে যায় তাতেও গন্ধ হয়। ধরলে মুখ থেকে এক রকম রস বেরোয় তাতে আরও বেশী দুর্গন্ধ থাকে।

আরসলার গাটা বেশ তেলা। আরসলা আপন শরীরটাকে সর্বদা পরিষ্কার রাখে। সর্বদা ধূলা ময়লা লাগে, তাই প্রায়ই শূঁয়াটাকে পরিষ্কার করে। শূঁয়াকে বাঁকিয়ে মুখের ঠোঁটে চেপে ধরে, তারপর মুখের ভিতর দিয়ে টেনে নেয়। তাতেই শূঁয়ার যত ধূলা ময়লা ঠোঁটে লেগে গিয়ে শূঁয়া পরিষ্কার হয়ে যায়। পাগুলোও সর্বদা পরিষ্কার করে।

আরসলারা সকলেই রাত্রিচর। দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে, রাত্রি হ'লে অন্ধকারে খাবার খুঁজতে বেরোয়। সব জাতির আরসলাই পচা শাক পাতা, নানা প্রকার মিষ্ট রস, ছোট ছোট মরা পোকা প্রভৃতি খায়। আমাদের ঘরের বড় আরসলাগুলো না খায় এমন জিনিস নাই। ভাত ডাল, রাঁধা তরকারি, মেঠাই সন্দেশ, ক্ষীর ছানা ত খায়ই, তা ছাড়া চাল ডাল ময়দা চিনি তেল ঘি খায়। মসলার হাঁড়িতে ঢুকে মসলা খায়। বাজারে দোকানে দারচিনির বস্তায় অনেক আরসলা থাকে। দারচিনি কিনলে তার মধ্যে আরসলার পাখা, ঠ্যাং, লাদি, ডিম সবই পাওয়া যায়। চামড়া-বাঁধান কাপড়-বাঁধান সুন্দর রং-করা নূতন বইগুলির মলাট কুরে কুরে খেয়ে দাগ্ড়া দাগ্ড়ি ক'রে দেয়। চামড়ার নূতন জুতা, ব্যাগ প্রভৃতি ঐ রকমে উপর উপর খেয়ে দেয়। আমি আমার তক্তাপোষের তলায় আরসলাকে ছারপোকার ডিম, খোসা, এমন কি জীয়াস্ত ছারপোকা খেতে দেখেছি।

এরা নিজেদের ডিমের খোলা খায়, অথবা মরা আরসলাও খায়। তা ছাড়া ছোট ছোট পোকাও খায়। রাত্রিতে অন্ধকার ঘরে ঘুমন্ত মানুষের হাতের ও পায়ের আঙ্গুলের আগার চামড়া খায়। কেবল বড় জাতির আরসলাই এই রকমে মানুষকে কামড়ায়। এই পাখাওয়ালা বড় জাতির আরসলাকে, গ্রীষ্মের পর যখন বর্ষা হবার সম্ভাবনা হয়, তখন দলে দলে ঘরের মধ্যে উড়ে বেড়াতে দেখা যায়।

বাজার থেকে সোহাগা কিনে তার সঙ্গে দ্বিগুণ পরিমাণ ঝোলা গুড় মিশিয়ে, কাগজ বা পাতায় মাখিয়ে, যেখানে আরসলা থাকে সেই জায়গায় রেখে দিলে, আরসলা গুড়ের লোভে খেয়ে মরে। সোহাগা এদের পক্ষে বিষ।

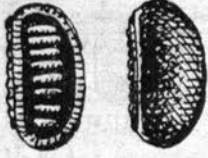
আমরা অনেক সময়ে বিযাক্ত ওষুধ দিয়ে বা বাঁটার বাড়ি মেরে, দলে দলে আরসলা মেরে ঘর আরসলাশূন্য করেছি। মনে করেছি যে আরসলার উৎপাত হতে রক্ষা পেলাম। মাস ছ'তিন বেশ নিরুপদ্রবে কাটালাম, তারপর আবার ঘর আরসলায় ভরে গেল। কেন এমন হয়? আবার এরা কোথা থেকে আসে? বিষ দিয়ে আর বাঁটার বাড়ি মেরে আরসলাই মারি, তাদের ডিম ত ঘরের যেখানে সেখানে থেকে যায়, সেগুলি ত নষ্ট হয় না। সেই সব ডিম ফুটে আবার আরসলা বেরোয়, তাতেই আবার ঘর ভরে যায়।

মানুষ ছাড়া আরসলার আরও অনেক শত্রু আছে। কুকুর, বিড়াল, বানর, ইন্দুর ছুঁচো, আরসলা ধরে খায়। হাঁস ও মুরগী আরসলা খায়। অনেক টিকটিকি ও গিরগিটি, বড় বড় মাকড়সা ও কাকড়া বিছে তেঁতুলে বিছে প্রভৃতি, আরসলা খায়। অনেক জাতীয় কাঁচপোকা আরসলার গায়ে হুল ফুটিয়ে অজ্ঞান করে বাচ্চাদের জন্য নিজেদের বাসায় পুরে রাখে। ঐ রকমের অনেক জাতের পোকা আরসলার গায়ে হুল ফুটিয়ে তার ভিতর ডিম পেড়ে দেয়, সেই ডিম ফুটে যে ছোট ছোট শুয়াপোকা (maggots) বাহির হয় তারা আরসলার গায়ের রস ও মাংস খেয়ে বড় হয়, আর আরসলা মরে যায়। কোন কোন জাতির পোকা আরসলার ডিমের ভিতর হুল ফুটিয়ে তার মধ্যে নিজের ডিম পেড়ে দেয়, সেই সব ডিম ফুটে যে শুয়াপোকা বেরোয় তারা সেই ডিমের সার ভাগ খেয়ে ফেলে। সে ডিম হতে আর আরসলার বাচ্চা হয় না। কিন্তু এত শত্রু থাকতেও আরসলার বংশ ধ্বংস হয় না।

আরসলার ডিম তোমরা দেখেছ? সে ডিম দেখিতে বরবটীর বীজের মত, অথবা ছোট মনিব্যাগের মত। অনেক সময়ে দেখা যায় যে আরসলার পিছন দিকে

অর্ধেকটা ডিম বের হয়ে আছে, আরসলাটা সেই ডিম নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ডিম পেটের ভিতর হতে একেবারে শীঘ্র বাহির হয় না, সমস্ত ডিমটা বেরোতে সাত দিন থেকে পনের দিন সময় লাগে। ডিমটা বেরিয়ে আসলে পর আরসলাটা বাজ পেরটা আলমারির গায়ে, কপাটের পিছনে, তক্তাপোষের তলায় বা বইএর গায়ে, যেখানে বেশী নাড়া চাড়া হবার সম্ভাবনা নাই, সেই সব জায়গায় আটকিয়ে দেয়। সে সময়ে ডিমের গায়ে আঠা থাকে, যেখানে ডিম লাগে সেখানে আটকে থাকে। আরসলা এক একবারে এই রকম এক একটি ডিম পাড়ে।

এই যে শক্ত খোলাযুক্ত বরবটির মত ডিম, সেটা প্রকৃত ডিম নয়, সেটা ডিমের কোঁটা। এই শক্ত কোঁটার মধ্যে জাতি ভেদে দুই সারিতে ১৬টা হইতে ৩২টা ছোট



ডিমের কোঁটা ও তাহার
ভিতরে ডিম।

লম্বা লম্বা ডিম সাজান থাকে। আমি পাখাওয়ালা বড় আরসলার অনেক ডিমের কোঁটা ভেঙ্গে দেখেছি। তাহার অনেকগুলিতেই ১৬টা ডিম পেয়েছি। ডিমের কোঁটায় মটরশুঁটির মত ছুটা ডালা বা খোল আছে। প্রত্যেক ডালায় ৮টা করিয়া, দুই সারিতে ১৬টা ডিম থাকে। দু'একটা কোঁটায় প্রতি সারিতে ১২টা ডিমও পেয়েছি। বড় জাতির আরসলার

ডিমের কোঁটা আধ ইঞ্চি অপেক্ষা বড় হয়, ছোট জাতির ডিমের কোঁটা আরও ছোট হয়।

কত দিনে ডিম ফুটে বাচ্চা হয়? আমাদের ঘরের বড় জাতির পাখাওয়ালা আরসলা ২রা জুলাই ডিম পেড়েছিল, ২৭শে জুলাই কোঁটা ফেটে খুদে খুদে আরসলার বাচ্চা বেরল, তারপর নয় মাস পরে এপ্রেল মাসে সেই সব বাচ্চা বেশ বড় হল। তখনও অর্ধপূর্ণ অবস্থা। তারপর আরও তিনমাস পরে পূর্ণ বয়স্ক ও পাখাধারী হয়েছিল। এই জাতির ডিম ফুটে পূর্ণ অবস্থা পেতে এক বৎসর সময় লাগে। কোন কোন জাতি তিন চারি বৎসরে, কোন জাতি ছয় মাসেই পূর্ণ অবস্থা পায়।

কোঁটার ভিতর ডিমগুলি যখন ফুটে তখন কোঁটার উপরের ধারের ঘোড়টা ফেটে যায়, সেই ফাঁক দিয়ে বাচ্চারা বাহির হয়ে পড়ে। পরে কোঁটার মুখ আবার যুড়ে যায়। ডিমের কোঁটা দেখে তার ভিতর ডিম আছে কিনা বুঝা যায় না।

ডিম ফুটে যখন বাচ্চা বাহির হয় তখন তার চেহারা পূর্ণ বয়স্ক আরসলার মতই হয়, কেবল খুব ছোট হয় আর তার পাখা থাকে না। রংটাও সাদাটে থাকে। তারপর খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে, আর বার বার খোলস বদলে, ক্রমে ক্রমে বড় হয়।

বাচ্চা আরসলা যখন খোলস বদলায় তখন তার পিঠের দিকে পুরাণ চামড়াটা লম্বা-



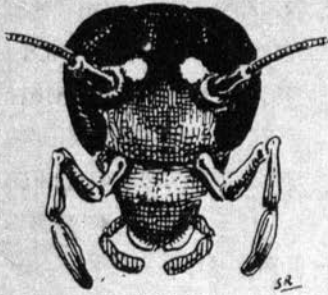
কুদে আরসলার বাচ্চা—আগে পাখা ছিল না, পরে পাখা বেরিয়েছে।

লম্বি ফেটে যায়, আর ভিতর হতে নূতন চামড়াওয়ালা আরসলা, পা মাথা শুঁয়া সবশুদ্ধ বাহির হয়ে আসে। পুরাণ ফাঁপা খোসাটার ফাটলের মুখ আবার এমন সুন্দর যুড়ে যায় যে তা দেখে

বুঝা যায় না যে আরসলাটা তার ভিতর হতে কি করে বাহির হল। আরসলার আকারের পুরাণ খোসাটা গা, পা, মাথা শুঁয়া সব সমেত পড়ে থাকে। এই সময়ে নূতন আরসলার রং সাদাটে থাকে, তার গায়ের চামড়াও নরম থাকে। ক্রমে বাতাস লেগে দিনকয়েকের মধ্যে রংটা গাঢ় হয় আর চামড়াও শক্ত হয়। পাখা গজালে বা পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে আর খোলস বদলায় না। অস্থায়ী পতঙ্গের মত আরসলার শরীরও তিন ভাগে বিভক্ত—মাথা, বুক ও পেট। বুকটা তিন খণ্ডে আর পেটটা অনেক খণ্ডে বিভক্ত।

আরসলার দেহের সামনের দিকের উপরে, যে গোল চাকুতিটাকে মাথা বলে ভ্রম হয়, সেটা মাথা নয়, বুকের প্রথম খণ্ডের উপর দিকে, অর্থাৎ ‘ঘাড়ের’ দিকে একটা শক্ত চাকুতি হয়, এটা তাই। এই চাকুতিটার তলে মাথাটা ঢাকা পড়ে, তাই উপর দিক থেকে মাথাটা দেখা যায় না। একটা আরসলাকে চিৎ করে ফেললে তার মাথা ও মুখ দেখতে পাওয়া যায়। মুখটা মাথার সম্মুখ দিকে না থেকে তলার দিকে বেঁকে থাকে। মাথার দুই পাশে, দুটা বড় বড় বহুপার্শ্বযুক্ত চোখ আছে। ঠিক যেন, এক একটা চোখের গায়ে অনেকগুলো ধার কাটা (faceted), অথবা অনেকগুলো চোখ বোলতার চাকের মত একসঙ্গে বসান (Compound eyes.) প্রত্যেক চোখের ভিতর পাশ থেকে একটা করে খুব লম্বা সরু অনেক-গাঁইট-যুক্ত শুঁয়া বাহির হয়। শুঁয়া দুটা খুব লম্বা—সমস্ত দেহ অপেক্ষা লম্বা। আরসলা এই শুঁয়ার প্রত্যেকটাকে পৃথকভাবে, বা দুটাকে একসঙ্গে, ডাইনে বাঁয়ে, সামনে পিছনে চারিদিকে ঘুরাতে পারে। শুঁয়া দিয়ে সব জিনিস স্পর্শ করে দেখে।

মুখে প্রথমে ওষ্ঠ, তার পরে ছ পাশে খুব শক্ত ধারাল সাঁড়াশির মত এক যোড়া ঠোট থাকে, তাকে দংশনোষ্ঠ (Mandible) বলে। তা দিয়ে আরসলা খাবার কুরে বা কেটে নেয়। তার পর এক যোড়া চর্বনোষ্ঠ আছে। তাই দিয়ে খাবার চিবায়।



(ক)



(খ)

আরসলার মাথা (ক) সামনের দিক (খ) চিং করিয়া পিছনের দিক দেখান হইয়াছে।

আসল মাথার চাইতে ছবিটা প্রায় পঁচিশ গুণ বড়।

এগুলি দেখা যায়। আমাদের চোয়াল উপর ও নীচে বসান বলিয়া আমরা চোয়াল উপর নীচে নাড়ি। পশু পক্ষী সরীসৃপ সকলেরই চোয়াল আমাদের মত উপর নীচে খেলে। কীট পতঙ্গের চোয়াল পাশাপাশি বসান, তাই তাদের চোয়াল পাশাপাশি ডাইনে বাঁয়ে খেলে।

আরসলার বুকের তিন খণ্ডের প্রত্যেক খণ্ডের তলা থেকে অগ্ন্যস্ত্র পতঙ্গের মত এক যোড়া করে পা বা ঠ্যাং বাহির হয়েছে। আরসলারও ছয়টা পা। পাগুলি খুব লম্বা, তা দিয়ে আরসলা খুব দ্রুত চলতে পারে। প্রতি পায়ে পাঁচটা গাঁইট আছে। প্রথম পর্ব গায়ের সঙ্গে লাগা, তার পর একটা ছোট পর্ব, তৃতীয় পর্বটা উরু, চতুর্থ পর্বটা জংঘা, পঞ্চম পর্বটা চরণ, বা পায়ের পাতা। চরণটা আবার ছোট ছোট ছয়টা পর্বের সমষ্টি। চরণের আগায় ছটা সরু বাঁকা নখ থাকে। উরু ও জংঘায় অনেকগুলি ছোট ছোট কঁটা থাকে।

আরসলার ছয়োড়া করে পাখা থাকে। বুকের দ্বিতীয় খণ্ডের দুপাশ হইতে ছটা পাখা বাহির হইয়াছে। এই প্রথম পার্থাযোড়া একটু মোটা ও চিম্‌সে। এর নীচে বুকের তৃতীয় খণ্ড হতে দ্বিতীয় যোড়া পাখা বাহির হয়েছে। এই

এই চর্বনোষ্ঠের গায়ে প্রতি পাশে তিনটা গাঁইটযুক্ত ছোট গুঁয়ার মত একটা জিনিষ বাহির হইয়াছে। সে ছটাকে স্পর্শনি বলে (Palpi)। তার পর অধর বা নিয়োষ্ঠ। মাথাটা কাটিয়া চিং করিয়া ফেলিলে

পাখা যোড়া খুব পাংলা এবং সেটা লম্বালম্বি ভাঁজ হয়ে উপরের পাখা যোড়ার তলে ঢাকা পড়ে থাকে। পাখায় অনেক শিরা থাকে।

অস্ট্রা পতঙ্গের মত, এদেরও উদরের ভাগে পা বা পাখা কিছুই গজায় না। পেটের শেষে ছপাশে অনেক গাঁইটযুক্ত ছুঁটা মোটা গৌজ বাহির হয়। পুরুষদের এই ছুঁ গৌজের মাঝে গাঁইটশৃঙ্খ ছুঁচের মত ছুঁটা ছোট্ট সরু গৌজ থাকে। স্ত্রীদের এই গৌজ ছুঁটা থাকে না, তা দেখে অনেক সময় স্ত্রী পুরুষ চেনা যায়। (গত বারের 'ব্ল্যাকবীটলের' ছবি দেখ)।

ত্রিবিজ্ঞেনাথ বসু।

এক হাত মড়লী

ভোলানাথ পাড়ার ডানপিটে ছেলে। পাড়ায় একটি কৃপণ বৃদ্ধ আছে, সে যেমন ভীতু তেমনি রাগী। সংসারে তাহার কেহ ছিল না, সম্বলের মধ্যে কেবল একটি কুঁড়ে ঘর এবং ছোট্ট একটি আমের বাগান। কিন্তু সে এমন কৃপণ যে কাহাকেও আম খাইতে দেওয়া ত দূরের কথা, বাগানের ধারে কাছে কেহ আসিলেই লাঠি লইয়া তাড়া করিত। কত আম পচিয়া নষ্ট হয় তবু কেহ খাইতে পায় না। তাই তাহার উপর সকলেরই অত্যন্ত রাগ ছিল।

একদিন শীতকালে সন্ধ্যার সময় সন্ন্যাসীর মতন কে একজন বুড়ার দরজায় আসিয়া হাজির। গেরুয়া রঙ্গের কাপড়, মাথায় জটা, হাতে চিমটা, আর মুখে লম্বা লম্বা গোঁপ দাড়ি। সন্ন্যাসী ঠাকুর গম্ভীর গলায় “বোম্ বোম্ মহাদেব” বলিয়া চিমটা নাড়িতে লাগিলেন। বুড়া সবে ভাত খাইয়া শুইয়াছে, সে এই শব্দ শুনিয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

সেই একবার যখন হারুবাবুদের বাড়ী সন্ন্যাসী আসিয়াছিল, তখন হইতেই সন্ন্যাসীর কৃপায় হারুবাবুদের কপাল খুলিয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসীর মস্তুর জোরে ছেলেটার ব্যারাম ত সারিলই, তার উপর ঠাকুর কি যে আশ্চর্য্য ঔষধ দিয়া গেলেন, তাহার জোরে হারাণচন্দ্র আজও দু-পয়সা করিয়া খাইতেছে। বৃদ্ধ সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে তাড়াতাড়ি কপাট খুলিয়া দিল এবং সন্ন্যাসী ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। ঠাকুর দুই একটি কটমটে শ্লোক আওড়াইয়া বুড়াকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বুড়া ত ভক্তিতে আর আহ্লাদে একেবারে গদগদ। সে সন্ন্যাসীকে

পা ধুইবার জল দিল আর বাগান হইতে পাঁচ সাতটা বড় বড় আম আনিয়া খাইতে দিল। সন্ন্যাসীঠাকুর আমগুলি চটপট উদরসাৎ করিয়া হাত মুখ ধুইয়া খাটের উপরে বসিলেন।

তখন বুড়া নীচে বসিয়া বলিল, “ঠাকুর! আপনি ত ভূত ভবিষ্যৎ সবই জানেন, আমার হাত টাত দেখে কিছু বলতে পারেন কি?” সন্ন্যাসী অতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “হঁ। আচ্ছা, তোমার হাতখানা দেখি?” বুড়া তাড়াতাড়ি হাতটা বাড়াইয়া দিল। সন্ন্যাসীঠাকুর বুড়ার জীবনের বড় বড় ঘটনা সব আশ্চর্য-রকম ঠিক-ঠাক্ বলিয়া দিতে লাগিলেন। তারপর অবশেষে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, “আর সব ত মন্দ নয়, কিন্তু আয়ু বড় কম, তুমি আর বেশী দিন বাঁচিবে না, বড় জোর আর দশ দিন কি পনের দিন।” শুনিয়া বুড়ার মুখ একেবারে আম্‌সির মতন শুকাইয়া গেল। সে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, “তাহলে এখন উপায়?” সন্ন্যাসী তখন খানিকক্ষণ ধ্যানস্থ ভাবে চোখ বুজিয়া, তারপর বলিলেন—“এক হাত মাছলী”। বুড়া সভয়ে বলিল, “সে আবার কি?” সন্ন্যাসী কি একটা শিকড় দিয়া বলিলেন, “এই শিকড়টি দিলাম, এটাকে এক হাত লম্বা একটা মাছলীর মধ্যে পুরিয়া, কাল অমাবস্তার রাত্রিতে কোন গরুর দড়ি চুরি করিয়া তাহা দিয়া মাছলীটি বাঁধিয়া পঞ্চমী পর্য্যন্ত পাঁচ দিন গলায় পরিবে এবং সে কদিন কোথাও না যাইয়া ঘরের মধ্যে বসিয়া কেবল “রক্ষাহরি ধ্বস্তরী” এই মন্ত্র জপ করিবে। যাও, তুমি এখন ঘুমাও, আমি আবার চার দিন পরে আসিব।”

এই বলিয়া সন্ন্যাসীঠাকুর অন্ধকারে বাহির হইয়াই দাড়ি গোঁফ খুলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আর আমরাও এই পাঁচ দিন তোমার আমগুলি ধ্বংস করিব”। ঠিক যেন ভোলানাথের গলা! কিন্তু বুড়া তাহা শুনিতে পাইল না।

পরের দিন ভোর না হইতেই বুড়া কামারের বাড়ী চলিল এবং অনেক পয়সা খরচ করিয়া একটি এক হাত মাছলী তৈয়ারি করাইল। মাছলীটি বাড়ীতে আনিয়া তাহার ভিতর শিকড় পুরিয়া, সে ভাবিতে লাগিল যে কি করিয়া রাত্রিতে গরুর দড়ি চুরি করিবে। প্রাণের দায়ে সবই করিতে হয়, কাজে কাজেই সে রাত্রে আস্তে আস্তে একটি গোয়াল ঘরে ঢুকিল। অন্ধকারে হাতড়াইয়া একটা দড়ি খুলিয়া লইয়া যেমন সে পলাইয়া আসিবে, অমন গরুটি ছাড়া পাইয়া পিছন হইতে এমন এক গুঁতা লাগাইল, যে বুড়া অন্ধকারে খানার মধ্যে ছুঁড়মুঁড় করিয়া পড়িয়া গেল।

সেই সঙ্গে কোথা হইতে খানিকটা কাদা-গোলা ঠাণ্ডা জল বুড়ার গায়ে মাথায় ছড়মুড় করিয়া পড়িল। বোধ হইল যেন অন্ধকারে চাপা হাসির মত একটা শব্দও শোনা গেল।

বুড়া অন্ধকারে অনেকবার হৌচট্ আর আছাড় খাইয়া শীতে আর ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরে ফিরিল এবং পরদিন সকাল বেলায় সেই ঢোলকের মত মাছলীতে গরুর দড়ি পরাইয়া গলায় ঝুলাইয়া সন্ন্যাসীর কথামত বসিয়া বসিয়া মন্ত্র জপ করিতে লাগিল।

বেলা হইলে পাড়া পড়শি সকলে বুড়ার ঘর বন্ধ দেখিয়া খোঁজ লইতে আসিল। কিন্তু তাহারা ডাকিয়াও বুড়ার কোন সাড়া পাইল না। দাওয়ায় কাণ পাতিয়া শুনিল, ঘরের মধ্যে বিড় বিড় করিয়া কে যেন কি বকিতেছে। তখন সকলে জানালা ফাঁক করিয়া উকি মারিয়া দেখিতে লাগিল এবং বুড়ার কাণ দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। সকলে মনে করিল যে বুড়া পাগল হইয়াছে। তাহারা ডাকাডাকি আর চীৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু বুড়া কিছুই জবাব দেয় না। এমনি করিয়া দুই দিন কাটিয়া গেল।



তখন পাড়ার একটি ছেলে বুড়ার কষ্ট দেখিয়া, ভোলানাথের সন্ন্যাসী সাজিবার কথা বুড়ার প্রতিবেশী



একটি লোককে বলিয়া দিল। সে বুড়ার জানালা

হন্ হন্ করিয়া আসিতেছে।

দিয়া চীৎকার করিয়া অনেক কষ্টে তাহাকে বুঝাইয়া বলিল যে সন্ন্যাসীর ব্যাপারটো আগাগোড়াই ভোলানাথের ফাঁকি।

ভোলানাথ তখন নিশ্চিন্তমনে বুড়ার বাগানে ঢুকিয়া আম সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ সে চাহিয়া দেখে বুড়া একেবারে অগ্নিমূর্তি হইয়া

একটি লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহার দিকে হন্ হন্ করিয়া আসিতেছে। কাজেই ভোলানাথের আর আম খাওয়া হইল না। এখন বুড়াকে সকলে ‘এক হাত মাছলৌ’ বলিয়া খেপায় আর ভোলানাথও সেই দিন হইতে আর কখনও সে দিকে ঘেঁষিবার সাহস পায় নাই।

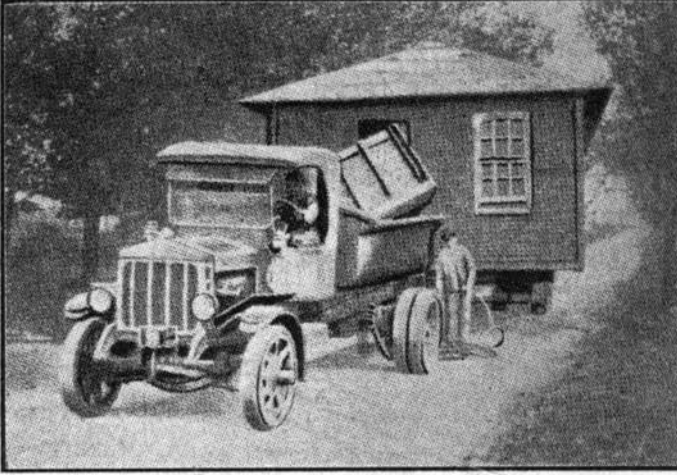
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসু।

বাড়ীর কথা

পৃথিবীর নানান দেশে আজকাল বাড়ীর বড় অভাব। কত দেশে কত হাজার হাজার বাড়ী কামানের গোলায় আর বোমার আঘাতে একেবারে চূরমার হ’য়ে গেছে। দেশের যারা মিস্ত্রী মজুর তারা যুদ্ধ করতে গিয়েছিল, তাই বাড়ী তৈয়ারীর কাজ একরকম বন্ধই ছিল। তা’ ছাড়া মাল মসলাও পাওয়া বড়ই মুশ্কিল ছিল।

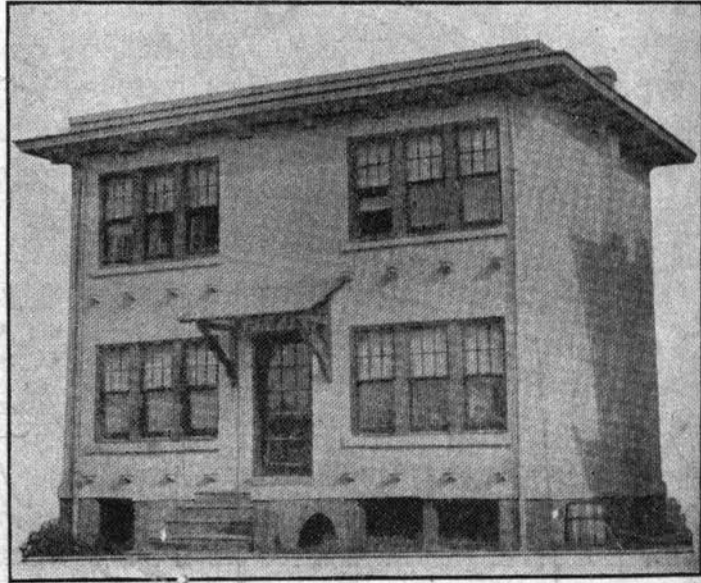
এই সব নানা কারণে আজকাল অনেক দেশেই তাড়াতাড়ি নূতন বাড়ী তৈরী করার দরকার হ’য়েছে। সেদিন কাগজে পড়্ছিলাম যে এক আমেরিকার মার্কিন রাজ্যেই (United Statesএ) এ বৎসর প্রায় দশ লক্ষ নূতন বাড়ী আবশ্যক। দেশ বিদেশের ইঞ্জিনিয়ারেরা এখন সহজ প্রণালীতে বাড়ী বানাবার উপায় চিন্তা করছেন। কিন্তু মার্কিনেরা এবিষয়ে যে রকম কৌশল আর উৎসাহ দেখিয়েছেন, এমন বোধ হয় আর কোথাও দেখা যায় না।

যুদ্ধের সময় গোলা-গুলি, বারুদ-বোমা, কামান-বন্দুক, আর যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম তৈয়ারী করবার জন্য শত শত কারখানা বসান হয়েছিল। সহর থেকে বহু দূরে সে সব কারখানা। তা’তে যারা কাজ করত কারখানার পাশেই তাদের জন্য ঘর বাড়ী বানান হয়েছিল। এখন যুদ্ধের পর সে সব ঘরবাড়ী আর কোন কাজে লাগে না। বাড়ীগুলির অধিকাংশই কাঠের আর লোহার, কেবল ছাতটা অগ্নি জিনিষেব, আর পাকা সিমেন্টের মেজে। সে সব বাড়ী যে জায়গায় ছিল, সেখানে এখন লোকজন থাকে না; জল, আলো, ডেন, কিছুই বন্দোবস্ত নেই; হাট-বাজারও কাছে নাই। সুতরাং সে সব বাড়ী কাজে লাগান যায় কি করে? মার্কিনেরা তার চমৎকার উপায় বার ক’রেছে। তারা সেই সব বাড়ী নিলামে চড়িয়ে বেচে দিচ্ছে—আর



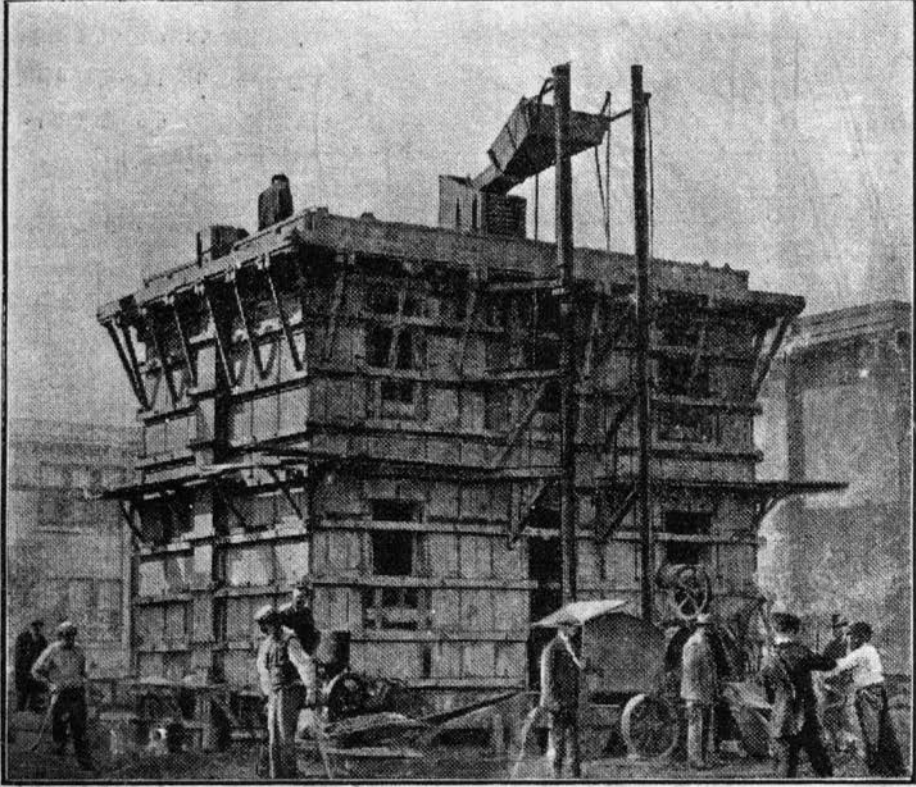
খরিদারেরা সস্তায়
আস্তু বাড়ী কিনে
নিয়ে বড় বড় মাল-
মোটরে চড়িয়ে,
অন্য গ্রাম কিস্বা
সহরে নিয়ে নূতন
পাকা মেজের উপর
বসিয়ে দিচ্ছে।
দেখ, ছবিতে একটা
বাড়ী কেমন মোটরে
ক'রে রওয়ানা
হয়েছে।

এতো গেল ছোট
ছোট বাড়ীর
কথা ; — বড়
বাড়ীরও তো
দরকার ? তার
জন্তুও উপায় বের
করা হ'য়েছে।
হাঁচে ঢেলে বাড়ী
তৈরী করবার
কথা বোধ হয়
তোমরা সন্দেশে
পড়েছ। মার্কিন
দেশে এখন
ঢালাই-করা
বাড়ী তৈরীর
ধুম পড়ে গেছে।



এই উপায়ে বেশ সস্তায় আর খুব তাড়াতাড়ি সব বাড়ী তৈরী

হচ্ছে। আস্ত একটা দোতালা বাড়ীর আগাগোড়া সবটা এক ছাঁচে ঢেলে একবারে সমস্তটা তৈরী হ'য়ে যায়। বাড়ীর ভিত যেই তৈরী হয়, অমনি তার উপর বড় বড় কাঠের ছাঁচ খাটিয়ে, তার ভেতর খোয়া, সুরকি, সিমেন্ট প্রভৃতি মালমশলা মিশিয়ে ঢেলে দেয়। দু'তিন দিন শুকিয়ে যাবার পর, ছাঁচের কাঠগুলোকে আস্তে আস্তে খুলে দেওয়া হয়, আর ভেতর থেকে একটা দোতালা বাড়ীর আস্ত কাঠাম বেরিয়ে আসে। তারপর তা'তে দরজা জানালা বসিয়ে রং-চুনকাম ক'রে শেষ করতে আর ক'দিন লাগে? এখন এক একটা বাড়ী এইভাবে তৈরী করতে প্রায় মাসখানেক সময়



লাগে, ক্রমে আরও কম লাগবে। দুসপ্তাহের মধ্যে কি ক'রে বাড়ী বানিয়ে ফেলা যায়, তার জন্তে এর মধ্যেই লোকে মাথা ঘামাতে আরম্ভ করেছে। খুব অল্প লোকের

সাহায্যে এ রকম বাড়ী তৈরী হ'তে পারে। ছবিতে দেখ, কেমন ক'রে ছাঁচের ভেতর খোয়া-সুরকি-সিমেন্টের মসলা ঢালা হচ্ছে। ছবিতে যে কয়টি লোক দেখছ, বাড়ী বানাতে তার চেয়ে বেশী লোকের দরকার করে না।

শ্রীস্ববিনয় রায়।

অন্ধের বর চাওয়া

অতি গরীব এক অন্ধ। তার ভারি দুঃখ—তার ঘর বাড়ী নাই, টাকা পয়সা নাই, ছেলে পিলে নাই, আর সে চোখে দেখতে পায় না। মনের দুঃখে অনেক কষ্টে তার দিন কাটে।

একদিন স্বর্গ থেকে দেবদূত এসে বললেন, “ওরে অন্ধ, তুই আর কাঁদিসনে, আমি তোকে বর দিতে এসেছি। তুই কি বর চাস, আমায় বল। একটি মাত্র বর তুই পাবি, সুতরাং ভাল ক'রে ভেবে চিন্তে বলিস্।”

অন্ধ কি বর চাইবে ভেবেই পায় না। একবার বলতে চায়, আমার চোখে দৃষ্টি এনে দাও—আবার ভাবে, শুধু দৃষ্টি দিয়ে করব কি, বলি, টাকা পয়সা দাও কিম্বা ঘর বাড়ী দাও। আবার তার মনে হয়, টাকা পয়সা ঘর বাড়ীই বা কার জন্তে চাই—আমার ছেলেপিলে কেউ নাই। আর দুদিন বাদেই যদি ম'রে যাই তাহ'লে এসব চেয়েই বা লাভ কি? আর সব পেয়েও যদি মনের সুখটুকু না পাই, তাহ'লে ত সবই বৃথা।

তার ভাবনা দেখে দেবদূত বললেন, “আচ্ছা, তুই এখন বলতে না পারিস, না হয় আমি কাল আবার আসব, তখন বলিস্। এর মধ্যে ভাল ক'রে ভেবে রাখ্।” অন্ধ বেচারার আর সারারাত ঘুমই হ'ল না। ভোর বেলা দেবদূত আবার ফিরে এসে বললেন “আমি এসেছি—এখন কি বর চাস্ বল।”

তখন অন্ধের বুদ্ধিটা হঠাৎ কেমন খুলে গেল। সে লাফিয়ে উঠে বলল, “আমায় খালি এই বর দিন যে আমি যেন হাসতে হাসতে দেখে যেতে পারি যে আমার নাতি নাংনৌরা চৌতলা বাড়ীতে সোনার পালঙ্কে বসে আমার চারিদিকে খেলা করছে।”

দেবদূত তার বরচাওয়ার বাহাজুরী দেখে হেসে বললেন, “আচ্ছা তাই হোক।”

এক বরে অন্ধের ছেলেপিলে, ঘরবাড়ী, টাকা পয়সা, চোখের দৃষ্টি, অনেক বয়স আর মনের সুখ, সবই চেয়ে নেওয়া হ'ল।

পালোয়ান !

ফটিকচাঁদ বাবু
শীতকালে খান সাবু
গরমেতে ঘোল
বছর ভ'রে তিনটি বেলা
গাঁদালের ঝোল।

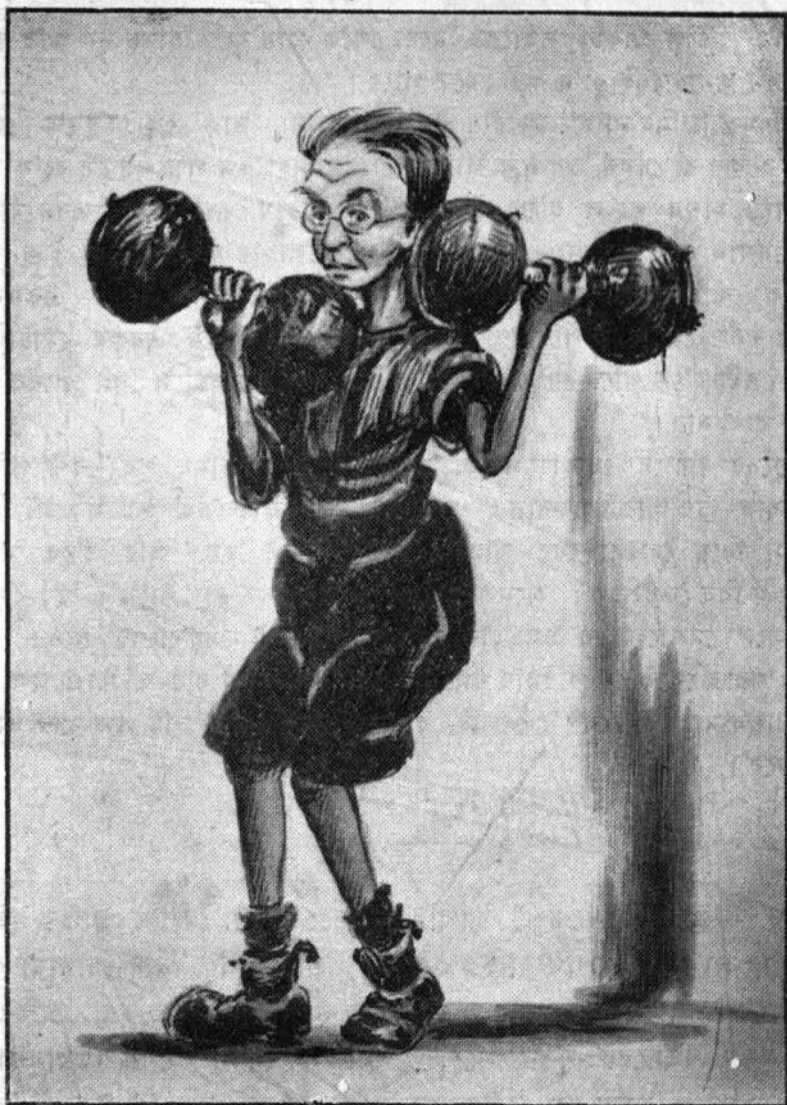
যেহ্নি সে জোয়ান
তেহ্নি পালোয়ান,
কাঠির মতন শক্ত
ঘুঁষির চোটে ঠিকরে ওঠে
ছারপোকায় রক্ত।
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার।

শরীরের মালমসলা

এখানে একটা বাস্ক আছে। বাস্কটা কাঠের তৈরী। শুধু কাঠ? না, তাতে লোহার কজা আর তালা, আর চার ধারে পিতলের কাজ আছে। আর কি আছে? আর তার গায়ে চক্চকে গালা বা বার্শিশ আছে। সামনে ঐ একটা বাড়ী তৈরী হচ্ছে। কি দিয়ে তৈরী হ'চ্ছে? ইট কাঠ লোহা চূণ সুরকি বালি সিমেন্ট-রং তেল, এই রকম সব জিনিষ। এই সমস্ত হ'ল তার মাল মসলা। যারা বাড়ী বানায়, তারা হিসাব ক'রে বলতে পারবে, এতে অমুক জিনিষ এতখানি আন্দাজ লেগেছে—তার বাজার দাম এত। আচ্ছা—সামনে একটা মানুষ ব'সে আছে—বলত' কিসের তৈরী মানুষ? কিসের তৈরী, তার একটু নমুনা শুনবে?

ছুমন ওজনের একটি মানুষের শরীরের মধ্যে হিসাব করলে একমণ জল পাওয়া যাবে—বেশ বড় বড় তিন চার কলসী জল। তার শরীরে যত রকম গ্যাস বাষ্প বা বাতাস আছে, তা যদি আল্গা ক'রে বার করতে চাও, তাহ'লে এত গ্যাস বেরুতে পারে যে তার জন্ত ১২ হাত লম্বা ১২ হাত চওড়া ৮ হাত উঁচু একটা ঘর লাগবে। তার মধ্যে এমন অনেকখানি গ্যাস পাবে, বাজারে যার দাম আছে—বিক্রী করতে পারলে প্রায় টাকা দশেক পাওয়া যায়।

ঐ ওজনের একজন সাধারণ মানুষের গায়ে যত চর্বি আছে, তা দিয়ে একপোয়া ওজনের প্রায় গোটা ত্রিশেক মোমবাতি তৈরী হ'তে পারে। তা ছাড়া খাঁটি অঙ্গার বা মূল-কয়লা এত পাওয়া যাবে যে তা দিয়ে দশহাজার পেন্সিলের সীস তৈরী হ'তে পারে। কারো সের পাথুরে কয়লার মধ্যেও অতখানি অঙ্গার থাকে না।



পালোয়ান !

খোঁজ করলে একটা শরীরের মধ্যে থেকে প্রায় কুড়ি চামচ নুন আর দু তিন মুঠো চিনি অনায়াসেই বা'র করা যেতে পারে।

যে সমস্ত জিনিষ না হ'লে শরীর টিকতে পারে না, তার একটি হ'চ্ছে লোহা। এই যে রক্তের রং দেখুচ্ছ, টক্টকে লাল, শরীরে লোহা কম পড়লেই সে রং ফ্যাকাসে হ'য়ে যায়, মানুষ দুর্বল হ'য়ে পড়ে, কঠিন ব্যারাম দেখা দেয়। তখন মানুষকে লোহা-মেশান ওষুধ খাওয়াতে হয়। শরীরে যে লোহার মশলা থাকে, ইচ্ছা করলে তা থেকে লোহা ধাতু বার ক'রে খাঁটি শক্ত লোহা বানান যায়। একজন সুস্থ মানুষের শরীর থেকে যে পরিমাণ লোহা বেরোয়, তা দিয়ে এরকম মোটা একটি পেরেক তৈরী হ'তে পারে যে একটা আস্থ মানুষকে অনায়াসে সেই পেরেক থেকে টাঙ্গিয়ে রাখা যায়।

মানুষের শরীরে যে হাড় থাকে, তা থেকে দুটি জিনিষ খুব বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়—চূণ আর ফস্ফরাস্। চূণ দিয়ে কত কাজ হয়, তা সকলেই জান। ফস্ফরাস্ দিয়ে দেশলাইয়ের জ্বালানি মশলা তৈরী হয়, আর ইঁদুর মারবার সাংঘাতিক বিষ তৈরী হয়। অনেক ওষুধেও ফস্ফরাসের ভাগ থাকে। হাড় পুড়িয়ে জমীর সঙ্গে মেশালে যে চমৎকার সার হয়, সেও ঐ ফস্ফরাসের গুণে। একটি মানুষের শরীর থেকে যে পরিমাণ খাঁটি ফস্ফরাস্ বার করা যায়, তা খাওয়ালে অন্তত পাঁচশ মানুষ মারা পড়বে! দেশলাই বানাতে তাতে প্রায় আট লক্ষ দেশলাইয়ের মশলা হবে।

মাঘ ফাল্গুনের “সন্দেশ” ছাপা হইতেছে, ২রা বৈশাখ বাহির হইবে। চৈত্রের সংখ্যা ১০ই বৈশাখ বাহির হইবে। তাহার পর, যদি আগামী বৎসর হইতে বেশ নিয়মিত ও সুন্দর ভাবে সন্দেশ চালান সম্ভব হয়, তবে ২৫শে বৈশাখ নূতন বৎসরের নূতন সন্দেশ বাহির হইবে। সেরূপ ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না হইলে আগামী বৎসর আর “সন্দেশ” বাহির হইবে না।

! নিম্নলিখিত

সম্পাদক।



সে বললে “কি আপদ ! মশাই ন্যাজ ধ’রে টানেন কেন ?
ছিঁড়ে যাবে যে !”

(“ছাতার মালিক” গল্প দেখ)



সপ্তম বর্ষ

মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩২৬

১০ম ও ১১শ সংখ্যা

আয়রে আলো আয়

পূব গগনে রাত পোহাল,
ভোরের কোণে লাজুক আলো নয়ন মেলে চায় ।
আকাশ তলে বলক জ্বলে,
মেঘের শিশু খেলার ছলে আলোক মাথে গায় ॥
সোণার আলো, রঙীন আলো,
স্বপ্নে আঁকা নবীন আলো—আয়রে আলো আয় ।
আয়রে নেমে আঁধার পরে,
পাষণ কালো ধৌত ক'রে আলোর বরণায় ॥
ঘুম ভাঙান পাখীর তানে
জাগ্রে আলো আকুল গানে অকুল নীলিমায় ।
আলসভরা আঁখির কোণে,
দুঃখ ভয়ে আঁধার মনে, আয়রে আলো আয় ॥

শেয়ালের বন্ধু

(পাঞ্জাবী গল্প)

এক শেয়াল আর এক তিতির পাখী, দুই জনে ভারি বন্ধুতা। শেয়াল কিন্তু ভারি খুঁৎখুঁতে, কিছুতেই তার মন উঠে না। সে বলে, “বন্ধু! তুমি মুখে আমায় ‘বন্ধু বন্ধু’ বলে খাতির কর, কিন্তু শুধু মুখের কথায় ত আর বন্ধু হয় না। আমাকে হাসাবে, কাঁদাবে, ক্ষিধের সময় খাওয়াবে আর বিপদ হলে উদ্ধার করবে—তবে ত বলি বন্ধু। তুমি সে সব পার কি?”

তিতির বলল—“এই কথা? আচ্ছা, দেখা যাক। তুমি একটু দূরে দূরে থেকে আমার পিছনে পিছনে এস ত? দেখি তোমাকে এখনই হাসাতে পারি কিনা—যদি না পারি তবে না হয় আমাকে খেয়ে ফেলো।”

বলেই ত তিতির উড়ে চলেছে। খানিক দূর গিয়েই দেখল, দুই জন লোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে,—একজন আগে, একজন একটু পিছনে। হেঁটে হেঁটে তারা হয়রান হ’য়ে পড়েছে। তাই সামনের জন করেছে কি, তার পুঁটলীটা লাঠিতে ঢুকিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে। পিছনের লোকটির পায়ে ফোসকা পড়েছে, সে পায়ের জ্বালায় জুতো জোড়াটা হাতে করে যাচ্ছে।

তিতির চোরের মত চুপি চুপি সামনের লোকের লাঠিতে গিয়ে বসল। লোকটি চলেই যাচ্ছে, তিতির যে তার লাঠির ডগায় বসেছে তা সে টেরও পায় নি। পিছনের লোকটি তিতিরটাকে দেখতে পেয়ে ভাবল—“বাঃ, ভগবান্ সরেস শিকার জুটিয়েছেন, তিতিরের মাংস খেতে চমৎকার।” এই ভেবেই তাড়াতাড়ি আর কিছু না পেয়ে সে হাতের জুতোই ছুঁড়ে মেরেছে। তিতির ত ফুড়ুং করে উড়ে গেল আর জুতোটা ধাঁক’রে ছুটে গিয়ে সামনের লোকটার পাগড়ীর উপর মেরেছে এক চাঁটি। আর যায় কোথা! সামনের লোকটা তখনি ফিরে চোখ রাঙ্গিয়ে বলল—“ভারি আম্পর্ক! ত—আমার মাথায় জুতো ছুড়ে মারছিস?”

পিছনের লোকটি থতমত খেয়ে বলল—“ভাই, আমি ইচ্ছে করে মারিনি, তোমার লাঠিতে একটা তিতির বসেছিল তাকেই মর্দতে গিয়েছিলাম—হঠাৎ তোমার পাগড়ীতে লেগেছে।”

সামনের লোকটি তখন অগ্নিশর্মা হয়ে বলল—“কি, আমার সঙ্গে তামাসা পেয়েছিস্? ধান্না দেবার আর জায়গা পাস্নি! দাঁড়া, তোকে একটু শিক্ষা না দিলে



চলছে না।” এই বলেই সে বাঘের মত লাফিয়ে গিয়ে পিছনের লোকটার উপর পড়েছে। তারপর দুজনে যেন গজকচ্ছপের যুদ্ধ! চটাপট ঘুঁসি, ধপাধপ কীল, ছুমাছুম্ লাথি—দেখতে দেখতে একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড! শেয়ালত হাসতে হাসতে পোট ফেটে মরে আর কি!

তিতির এসে বলল—“কি বন্ধু! হাসতে পেরেছিলে কি?” শেয়াল বলল—“হাঁ, হাসিয়েছ বটে! কিন্তু বন্ধু, হাসান ত নেহাৎ সোজা, কাঁদানটাই হচ্ছে কঠিন কাজ। তোমার জন্য আমার চোখের জল যদি না পড়ল, তা হলে আবার বন্ধুতা কিসের?”

তিতির বলল, “কাঁদতে চাও, কাঁদিয়ে দেব, তাতে আর মুন্সিল কিসের?” এই বলেই তিতির দেখল, এক শিকারী আসছে তার সঙ্গে একদল কুকুর। তখন সে শিয়ালকে বলল—“বন্ধু! ঐ দেখ। শীগগির এই গাছের গর্তে লুকোও দেখি, তারপর দেখাব। তোমার চোখ দিয়ে যদি ফোয়ারা না ছোটাই ত কি বলেছি।”

তিতিরের কথামত শেয়াল গাছের গর্তে ঢুকে দেখতে লাগল সে কি করে। এদিকে তিতির ফর্ক ফর্ক করে ঝোপঝাপের মধ্যে উড়তে লেগেছে। ক্রমে শিকারীর কুকুরগুলো যখন তাকে দেখতে পেল, তখন সেও গিয়ে সেই শিয়ালের

গর্ভের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। গন্ধে গন্ধে কুকুরগুলো গাছের তলায় গিয়ে উপস্থিত আর গাছে চড়তে না পেরে বিকট চীৎকার! ক্রমে শিকারী এসে ব্যাপারটা কি বুঝতে পেরে শেয়ালের বাছাকে লেজ ধরে গর্ভ থেকে টেনে বার করল। তারপর, বুঝতেই পার—কুকুরগুলো শেয়ালটাকে আঁচড়ে কামড়ে রক্তারক্তি করে যখন দেখল তার চোখ টুপ্টে শরীর আড়ষ্ট হ'য়ে গিয়েছে, তখন তাকে ছেড়ে দিল। শিকারী চলে গেলে খানিক বাদেই শেয়াল চোখ মেলেছে। সেত আর মরেনি, ওসব শেয়ালী ভেঙ্কি! চোখ মেলেই শেয়াল দেখল গাছের ডালে তিত্তির বসে আছে।

তিত্তির বলল—“বন্ধু! চোখের জলটল কিছু বেরুল কি?”

শিয়াল গায়ের জ্বালায় রেগে বলল—“আর বন্ধু বন্ধু বলে বন্ধুতা করতে হবে না, একটু দয়া করে চুপ করত বাপু! ভয়ে আমি আধমরা হয়ে গেছি।” বলে সে সেখানেই পড়ে রইল। ক্রমে ক্রমে তার কামড়ের জ্বালা যন্ত্রণা যখন একটু কমেছে, ততক্ষণে তার বেজায় ক্ষিধে পেয়েছে।

সে তিত্তিরের দিকে চেয়ে বলল—“এখন বন্ধুর কাজ কর দেখি? বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে, খাবারের জোগাড় করে দাও—তবে বুঝব তুমি কি রকম বন্ধু।”

তিত্তির বলল—“তা বেশ। তাহ'লে এখন একটু খুব মন দিয়ে দেখ। আমি খাবার যোগাড় করে দিচ্ছি, আর তুমিও ঝটপট কাজ সেরে নিও।”

ঠিক এই সময় কয়েকটি জ্বীলোক হাতে খাবারের পৌঁটলা নিয়ে রাস্তা দিয়ে মাঠের দিকে যাচ্ছে—ক্ষেতে তাদের স্বামীর কাজ করছে, তাদেরই জল খাবার।

তিত্তির পাখী করুণ শ্রুতে ‘কঁ-কঁ-ক, কঁ-কঁ-ক’ করে পাখার ঝাপটা মারতে মারতে ঝোপে জঙ্গলে উড়ে উড়ে পড়তে লাগল, দেখে মনে হয় যেন তার ডানা ভেঙ্গে গিয়েছে, ভাল করে উড়তেই পারে না।

অমনি মেয়েরা সবাই “ধর্ধর্ পাখীটাকে ধর” বলে তাকে তাড়া করল। পাখীও কি কম সেয়ানা? সে উড়ে উড়ে একটু যায় আর বসে। এই যেন সে ধরা দেয়, এই আবার সরে যায়। এমনি করে ছুটে ছুটে মেয়েরা ত ঘেমে টেমে অস্থির। সকলেরই হাতে এক একটা খাবারের পুঁটলী, তাতে আরও অশ্রুবিধা। তখন তারা করল কি, যে যার পুঁটলী মাটিতে রেখে একটু হাল্কা হয়ে আবার উৎসাহ করে পাখীর পিছনে ছুটল। এদিকে অবসর বুঝে শেয়ালও হামা দিয়ে এসে হাজির—আর দেখতে দেখতে খাবারগুলি নিঃশেষ হয়ে গেল।

খানিক বাদে তিতিরের সঙ্গে দেখা হলে সে জিজ্ঞাসা করল—“কি বন্ধু! পেট ভরল ত? এবারে খুসি হয়েছে ত?” শিয়াল বলল—“হাঁ বন্ধু! সবই মেনে নিচ্ছি। আগেই ত হাসিয়েছ, তারপর কাঁদালে বটে, কিন্তু তেমনি এখন আবার খাওয়ালেও বেশ। কিন্তু বন্ধুত্বের সব চেয়ে বড় পরখটা এখনও বাকি আছে—আমার প্রাণটা বাঁচাওনি ত? তা সেটা আর তোমার দ্বারা হবেই বা কি করে?”

শেয়ালের খুঁৎ-ধরা ব্যবহারে ভারি দুঃখিত হয়ে তিতির বলল—“সেটা নাও পারতে পারি। এই এত টুকু জন্তু আমি, আমার আর কতদূর সাধ্য! যাহোক, বড় বেল। হয়েছে, চল এখন বাড়ী ফিরি। নদী পার হতে হবে—তা, অনেক ঘুরে গিয়ে কাজ নেই, এখানেই পার হওয়া যাক। ভাবনা কি, আমাদের কুমীর বন্ধু পার করে দিবে এখন।”

নদীর কাছে গেলে পর কুমীর পার করে দিতে রাজি হল। শেয়াল তিতির হুজনে কুমীরের পিঠে বসেছে; ক্রমে মাঝ-নদীতে এলে তিতির বলল—“বন্ধু! কুমীরটা কি রকম করছে দেখেছ? আমার মনে হয়, ওর মতলব ভাল না। এখন যদি সে তোমাকে জলে ফেলে দেয়?”

শুনেই ত শেয়ালের ছুঁচল মুখ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে, সে তিতিরকে বলল—“তা হ’লে ত আমাদের ভারি বিপদ।” তিতির বলল—“আমার আর বিপদ কিসের? আমার ত পাখাই আছে, উড়ে গেলেই হল? কিন্তু তোমার গতি হবে কি?”

ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে শিয়ালের পা কাঁপতে লাগল। আর একটু পরেই কুমীর যখন গাঁ গাঁ করে বলে উঠল—“উল্হুহু! বড় ক্ষিধে পেয়েছে”—তখন শেয়ালের অবস্থা কি রকম হল বুঝতেই পার।

তখন তিতির বলল—“যাও যাও কুমীর ভায়া, আমাদের সঙ্গে বেশী চালাকি খেলতে হবে না। আমি ত ফুড়ুক্ করে উড়েই পালাব, আর তুমি আমার বন্ধুর যে কিছু করবে ভাবছ, সে পথও বন্ধ। সে কি এমনি বোকা যে বেড়াতে বাঁর হবার সময় প্রাণটা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে বেড়াবে? প্রাণটিকে কাগজে মুড়ে বাস্কের মধ্যে তালা চাবি দিয়ে বন্ধ করে তবে সে বেড়াতে বেরয়।”

একথায় ভারি আশ্চর্য্য হয়ে কুমীর জিজ্ঞাসা করল—“সে আবার কি রকম?”

তিতির বলল—“কি রকম, সেটা একটিবার চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবে। দেখনা একবার চেষ্টা করে, মজাটা টের পাবে। তখন ভড়কে গিয়ে কুমীর

বল্লে—“তাই নাকি ? এমন অদ্ভুত কথা ত কোন দিন জান্তাম না !” এই বলে শোয়ালকে ডাঙ্গায় তুলে দিয়ে সে ভাবতে ভাবতে বাড়ী চলে গেল।

শোয়াল ডাঙ্গায় উঠতেই তিতির জিজ্ঞাসা করল—“কেমন বন্ধু ! এবারে নিশ্চয়ই খুসী হয়েছ ?”

শোয়াল গম্ভীর হয়ে বল্ল—“তুমি হাসিয়েছ, কাঁদিয়েছ, পেট ভরে খাইয়েছ, তারপর এখন আমার প্রাণটাও বাঁচালে। কিন্তু ভাই, সত্যি বলছি, তুমি একটু অতিরিক্ত চালাক। এত বেশী সেয়ানা বন্ধু দিয়ে আমার কোন দরকার নাই। তাই আমি এখন চললাম—হুকাহুয়া—নমস্কার।”

সেই থেকে শোয়াল আর কখন বন্ধুর কাছেও যেত না।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

আংটির গুণ

হাসান আর তার স্ত্রী ফতেমা বড় গরিব। সামান্য জমিজমা, তাই চাষবাস ক’রে কষ্টেসৃষ্টে তাদের দিন চলে। একদিন হাসান বল্ল “এ ভাবে আর চলে না। শুনেছি ঐ মরুভূমিতে বালীর নীচে খুঁড়লে পরে গুপ্তধন পাওয়া যায়। তারই খোঁজে চললাম আমি।” ফতেমা তাকে কত ক’রে বোঝাল,—বল্ল, “শুনেছি ওখানে ভূত আছে, তারা লোকেদের ভয় দেখিয়ে মেরে ফেলে। কত লোক সেখানে গিয়েছে, তারা আর ফিরে আসেনি।” হাসান বল্ল, “তা হোক। এতদিন মিছামিছি হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে আমার আর ভাল লাগে না; এখন, হয় আমি গুপ্তধন পেয়ে বড়লোক হব, না হয় ধনের সন্ধানে গিয়ে সেখানেই আমার কবর হবে।”

তারপর ফতেমার কাছে বিদায় নিয়ে, সঙ্গে কিছু জল আর খাবার আর একটা কোদাল নিয়ে হাসান গুপ্তধনের সন্ধানে রওয়ানা হ’ল। সারাদিন বালী আর কাঁকড়ের পথে চ’লে চ’লে সন্ধ্যার সময় ক্রান্ত শরীরে সে একটা বড় পাথরের উপর বসতে না বসতেই ঘুমিয়ে পড়ল। খানিক বাদে আকাশে তারা দেখা দিল আর চারিদিক অন্ধকারে ছেয়ে গেল। তখন হঠাৎ তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তার মনে হ’ল যেন, শূন্যে ছায়ায় মত কি রকম সব দেখা যাচ্ছে; যেন কতগুলো বড়ো মানুষের ঝাপসা চেহারা। সামনেই একটা গাছের শুকনো গুঁড়ি; তারই আশে

পাশে ছায়াগুলো ঘুরছে আর কি যেন বলতে চাচ্ছে। হাসানের মনে হ'ল যেন তারা বলছে “এইখানে খোঁড়, এইখানে খোঁড়।”

হাসান কুঁড়েমি কাকে বলে একেবারেই জানত না। তাই সে এক মুহূর্তও দেরি না ক'রে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করল। ছায়াগুলো তার চারিদিকে



আগ্রহে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বার বার বলতে লাগল, “খুঁড়ে যাও! খুঁড়ে যাও! খবরদার থেমো না!” হাসানের মনে ভয় হ'ল; কিন্তু সে খুঁড়েই চ'লেছে, খুঁড়েই চ'লেছে।

হঠাৎ তার মনে হ'ল যে কুড়োলটা ঠং ক'রে কিসে গিয়ে ঠেকল। তাড়াতাড়ি সে মাটি সরিয়ে দেখতে পেল যে বহুকালের পুরানো একটা লোহার সিদ্ধুক, তার উপরে একটা আংটি, আর পাশেই একটা পিতলের কোটা। সিদ্ধুকটা এত পুরানো যে সামান্য একটু টান দিতেই ঢাকনিটা খুলে গেল আর তার ভেতর থেকে

অনেকগুলি দাড়িওয়ালা বুড়ো-মানুষ টল্‌তে টল্‌তে বেরিয়ে এল। সেই বোতলটার মধ্যে কি যেন একটা সুগন্ধি জিনিষ ছিল, তার গন্ধ শূঁকে শূঁকে তারা সকলেই তাজা হয়ে নেচে উঠল, আর আনন্দে হাসানকে ছুঁহাত তুলে আশীর্বাদ করতে লাগল। একজন বলল, “ভাই, তুমি আমাদের বড় উপকার করলে। বহুদিন আগে আমরা, এই পণ্ডিতের দল, একটা মস্ত গম্ভীর বিষয়ে গবেষণা করতে করতে এই সিদ্ধান্তের মধ্যে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম। এককাল পরে তুমি আমাদের উদ্ধার ক’রে প্রাণ বাঁচালে। ঐ কোটোটা আমাদের দাও আর তোমার পুরস্কার স্বরূপ ঐ আংটিটা তোমাকে দিলাম। ওতে তোমার যে-কোন একটা ইচ্ছা পূরণ করতে পারবে। কিন্তু মনে রেখো একটা ইচ্ছা পূরণ করেই এর ক্ষমতা চ’লে যাবে। সুতরাং চাইবার আগে বেশ ভেবে চিন্তে দেখো।” তারপর তারা সেই বোতলের সুগন্ধি জিনিষটার গন্ধ শূঁকতে শূঁকতে আর নেচে নেচে গান গাইতে গাইতে চলে গেল। ততক্ষণে ভোর হয়ে গেছে।

সেই আংটিটা নিয়ে হাসান অনেকক্ষণ ধরে ভাবল, তার কাছে কি চাইবে। একবারে বেশী টাকা পেলে খেতে খেতে মন যাবে না, কাজ করবার কিছুই থাকবে না, ক্ষেত খামার সব নষ্ট হবে। তাই টাকা চাইতে তার ইচ্ছা হ’ল না; অথচ কি জিনিষ যে চাইবে তাও সে ভেবে পেল না; মনে করল, পরে ভেবে চিন্তে যা হয় একটা কিছু চাওয়া যাবে। কাজেই তখন আংটিটা সঙ্গে নিয়ে সে রওয়ানা হ’ল।

সারাদিন হেঁটে সে এক সহরে গিয়ে উপস্থিত হ’ল আর সেখানে এক সরাই-খানায় রাত কাটাবার বন্দোবস্ত করল। সরাইওয়ালা বড় ধূর্ত লোক। হাসানকে ভাল মানুষ দেখে, সে আগেই তার সঙ্গে খুব ভাব পাতিয়ে গল্প জুড়ে দিল। কথায় কথায় হাসান তাকে সেই আংটির কথা জানাল; আর আংটিটা তাকে দেখিয়েও দিল।

রাত্রে যখন হাসান ঘুমিয়েছে, তখন সরাইওয়ালা চুপি চুপি ঘরে ঢুকে হাসানের আংটিটা চুরি ক’রে নিয়ে, ঠিক সেই রকমই একটা আংটি তার জায়গায় রেখে চম্পট দিল। তারপর, আরেকটা ছোট নির্জন ঘরে গিয়ে, খিল বন্ধ ক’রে আংটিকে বলল, “লাখ লাখ মোহর এখনই এখানে দাও।” যাই না এই কথা বলা, অমনি চারিদিক থেকে টুপটাপ রূপকাপ ক’রে সরাইওয়ালার গায়ে মোহর পড়তে লাগল। বেচারী কোন্দিকে যাবে তার ঠিক নেই—বৃষ্টির মত মোহর এসে তার উপরে পড়ছে। দেখতে দেখতে সে মোহরের গাদার নীচে চাপা প’ড়ে, দম আটকিয়ে মারা গেল।

এদিকে হাসান কিন্তু বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। রাত্রে সে স্বপ্ন দেখল, সে আবার তার বাড়ীতে ফিরে গেছে, আর দেখছে যে ফতেমা তার জন্ম ব'সে কাঁদছে। অনেক দিনের দুঃখে আর ভাবনায় বেচারা বড় রোগা হয়ে গেছে।

তখন আর তার ঘুম হ'ল না; মনটাও বড় খারাপ হ'য়ে গেল। ভোর না হ'তেই জিনিষ পত্র গুছিয়ে সে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হ'ল। আংটিটা যে বদল হয়েছে সে কথা সে জানেই না; কাজেই নকল আংটিটা নিয়েই চলল।

বাড়ী পৌঁছেই সে ফতেমাকে দেখতে পেল। ফতেমাও মনে ভেবে রেখেছে যে হাসান আর ফিরবে না, হাসানও ভেবেছে যে ফতেমা এতদিন দুঃখে কষ্টে বেঁচে আছে কি না সন্দেহ। দেখা হ'তেই আনন্দে দুজনের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তারপর হাসান ফতেমাকে সব ঘটনা বলল; আংটিটাও দেখাল। ফতেমা বলল, “এখন তো আমাদের কিছু চাই না; আংটিটা সিন্দুকের মধ্যে যত্ন ক'রে রেখে দাও; কখন বিপদের সময় দরকার হ'লে কিছু চাওয়া যাবে।”

হাসানের মনে তখন খুব ক্ষুণ্ণি আর সাহস। যদি কোন দিন খাটবার শক্তি চ'লে যায় তবে আংটিই তার ভরসা। এই ভেবে সে প্রাণপণে খেটে জমি চাষ কর্তে আরম্ভ করল। তার ফলে, সেই বৎসর থেকে তার জমীতে এমন ফসল হ'তে লাগল যে দেখতে দেখতে সুন্দর বাড়ী, গাড়ী-ঘোড়া, গাই-বাহুর, আসবাব-পত্র কিনেও তাদের বিস্তার টাকা জমতে লাগল। তখন তাদের যে কি আনন্দ হ'ল কি আর বলব! কিছুদিন বাদে তাদের একটি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে হ'ল। সেই আনন্দে তা'রা আংটির কথা একেবারেই ভুলে গেছে। বছরের পর বছর তাদের সুখেই কেটে যায়; তাদের ছেলেপিলে বড় হয়েছে; আর নাতি নাতনি দেখা দিয়েছে—আর বুড়ো হাসান আর বুড়ী ফতেমার ফোকলা মুখে সুখের হাসি লেগেই আছে।

তারপর আরো অনেক বৎসর কেটে গিয়েছে; হাসান আর ফতেমা দুজনেই স্বর্গে গেছে। তাদের ছেলেপিলেরা এখনও মাঝে মাঝে সিন্দুক খুলে আংটিটা দেখে; কিন্তু তারা জানে না যে তার কি গুণ। তারা শুনেছে যে সেই আংটিই তাদের বাপ-মায়ের অবস্থা ফিরিয়েছিল; আর, তারই গুণে তারাও আজ এত সুখে আছে। কাজেই সেই নকল আংটিই তারা অমূল্য জিনিষ ব'লে যত্ন ক'রে তুলে রাখে, আর ভাবে, যা কিছু হচ্ছে সব ঐ আংটির গুণে।

শ্রীহরিনন্দ রায়।

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা

‘বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা’ এই কথাটা অনেক সময়ে আমরা লোকের মুখে শুনি। কোন দুর্দান্ত ছুষ্ট লোক, যে অনেক লোককে নির্যাতন করে, তাহাকে যদি অশ্রু কেহ তাহার নিজেরই এলাকায় জব্দ করে, তখন আমরা বলি “বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা”। কোন জবরদস্ত পুলিশ কর্মচারী যে চোর ধরিতে ও ছুষ্ট দমন করিতে খুব ওস্তাদ, তাহার নিজের বাড়ীতে বা তাহার নিজের থানাঘরের মধ্যে যখন চুরি হয়, আমরা বলি “বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা”।

কথাটার অর্থ—বাঘ যে এমন প্রবল ও দুর্দান্ত জন্তু, তাহাকেও ভয় না করিয়া ঘোগ তাহারি ঘরে আড্ডা গাড়ে।

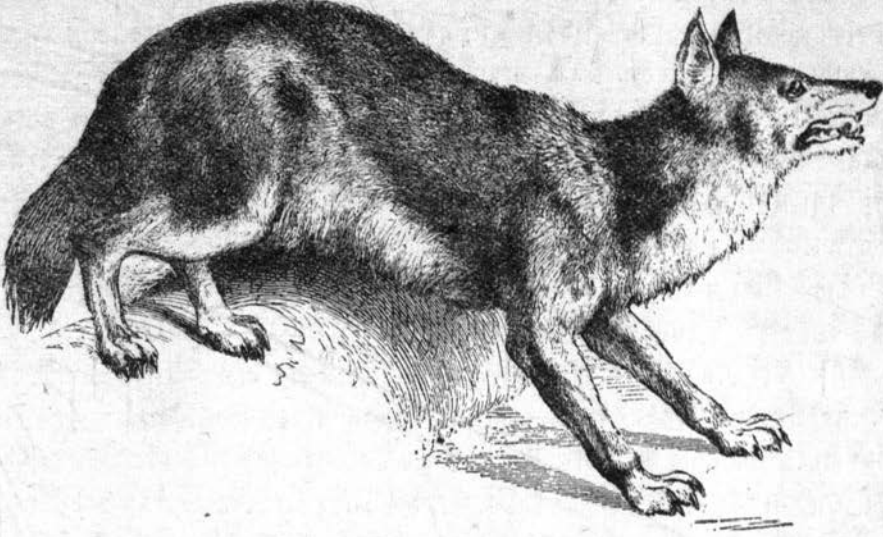
বাঘকে ত আমরা সকলেই চিনি, কিন্তু ‘ঘোগ’টা কি? সে কি রকম জন্তু যে বাঘকেও ডরায় না? সংস্কৃতে ‘কোক্’ একটা শব্দ আছে। অভিধানে কোকের প্রতিশব্দ—ঈহামৃগ আর বুক। ‘ঈহামৃগ’ বলে যে জন্তুর ‘ঈহা’ আছে। ‘ঈহা’র অর্থ উদ্ভম, চেষ্টা। যে জন্তু দৌড়িয়া তাড়া করিয়া শিকার ধরে, তাহাকে বলে ‘ঈহামৃগ’। ‘বুক’ বলে নেকড়ে বাঘ বা নেকড়ে বাঘের মত জন্তুকে।

সংস্কৃত রামায়ণে এক যায়গায় আছে “বনযুথপরিভ্রষ্টা মৃগী কোকৈরিবাদিতা”। অর্থাৎ দলছাড়া হরিণী কোকের দ্বারা ক্রিষ্ট হইলে যেমন হয়, তেমনি। হরিণ দল ছাড়া হইলে কোক তাহাকে তাড়া করিয়া মারে।

উড়িয়ায় এক জাতের বুনো কুকুর আছে তাহারা দেখিতে অনেকটা শিয়ালের মত, শিয়াল অপেক্ষা একটু বড়, আর তাহার ডাক অনেকটা কুকুরের মত, তাহাদের উড়িয়াতে খগ বলে। চলিত কথায় সচরাচর ‘বলিয়া কুকুর’ বলে। ‘বলিয়া’র অর্থ বলবান, অর্থাৎ এমন বলবান কুকুর যে কাহাকেও ভয় করে না, এমন কি বাঘকেও ডরায় না।

এই বুনো কুকুর দল বাঁধিয়া বাস করে ও দল বাঁধিয়া তাড়া করিয়া হরিণ প্রভৃতি শিকার করে। বোধ হয়, ‘কোক্’ শব্দ হইতেই খ-গ আর ঘোগ্ শব্দ হয়েছে। ঘোগ আমাদের দেশের বুনো কুকুর। ঘোগের গায়ের রং খড়ের রঙের মতন। পিঠের উপরটার রং খুব গাঢ়, প্রায় কালচে, আর বুক ও

পেটের রং সাদাটে। লেজটা লম্বা ও ঝাঁকড়া এবং নীচের দিকে ঝুলিয়া থাকে।



‘কোক’ বা ‘ঘোগ’ বা ‘বলিয়া কুকুর’।

লেজের আগটা কালো মতন। ইহার মাথা ও শরীর লম্বে তিন ফুট, লোমশুদ্ধ লেজ চৌদ্দ ইঞ্চি।

এই বুনো কুকুর বা ঘোগ কাশ্মীর হইতে আসাম পর্য্যন্ত হিমালয়ের অরণ্যময় পার্বত্যপ্রদেশে, খোলা পাহাড়ে যায়গায়, এবং দক্ষিণ ভারতের বড় বড় বনে, মেদিনীপুর, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের জঙ্গলময় পাহাড়ে—ভারতের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। ইহারা সাধারণতঃ দিনের বেলায় শিকার খুঁজিয়া বেড়ায়, কখন কখন রাত্রিতেও বাহির হয়। একেলা বা দলবদ্ধ হইয়া ইহারা যে সব জন্তু ধরিতে পারে তাহাই খাইয়া জীবন ধারণ করে। কখন কখন মৃতদেহ ও ফলমূলও খায়। সচরাচর ছয়টা হইতে দশ বারটা বুনো কুকুর একত্র দলবদ্ধ হয়। কখন কখনও এক একদলে কুড়ি পঁচিশটাও দেখা গিয়াছে। ইহারা সম্বর হরিণ, চিতা হরিণ, নীলগাই প্রভৃতি নানা প্রকার হরিণ, ও বুনো শূয়র প্রভৃতি, মারিয়া খায়। তিব্বত দেশে বঘুছাগ ও বঘুমেঘ মারিয়া খায়। ইহারা লোকালয় হইতে দূরে, গভীর বনের ধারে পাহাড়ে

যায়গায় বাস করে বলিয়া সচরাচর ইহাদিগকে দেখা যায় না। ইহাদের দ্বারা গৃহ-পালিত পশুও হত হয় না। তবে কখন কখনও শিকার না পাইলে ক্ষুধার তাড়নায় লোকালয়ে আসিয়া সুবিধা পাইলে ছাগ মেঘ বাছুর মারিয়া লইয়া যায়। জর্ডন ও ম্যাক্‌মাষ্টার সাহেব বলেন যে তাঁহারা ইহাদিগকে বড় পোষা মহিষ মারিতে দেখিয়াছেন। উড়িষ্যায় যে সব রাখাল পাহাড়ে বনে গরু ও মহিষের পাল চরায়, তাহারা অনেকেই আমায় বলিয়াছে যে ‘বলিয়া’ কুকুরের দল কখন নিবিড় বনের মধ্যে রাখালদের বা তাদের গরু মহিষকে তাড়া করে নাই, অথচ তাহাদের নিকটেই বড় হরিণকে তাড়া করিয়া মারিতেছে। বড় জন্তু মারিবার সময়ে দলের কয়েকটা সম্মুখ দিকে গিয়া গলায় ও নাকে মুখে কামড়াইয়া ধরে আর কয়েকটা পাশে গিয়া কামড়াইয়া পেট চিরিয়া ফেলে।

আমি উড়িষ্যার ঢেঙ্কানাল রাজ্যে একবার সেখানকার রাজা মহাশয় ও কটকের কমিশনার গ্রীয়ার সাহেবের সঙ্গে বনে বাঘ শিকার করিতে গিয়াছিলাম। বৈকালে ৪টার সময়ে ফিরিয়া আসিবার কালে সামনে দেখিলাম একটা জঙ্গলময় পাহাড়ের ধারে ছয় সাতটা বুনো কুকুর মিলিয়া খুব বড় সম্বর হরিণকে তাড়া করিতেছে। হরিণটা প্রাণপণে ছুটিতেছে। কুকুর কয়টা তাহার পিছনে দৌড়িতেছে, যে যেখানে পাইতেছে কামড়াইতেছে। হরিণ প্রাণভয়ে যে দিকে ছুটিয়া যাইতেছে কুকুরের দলও সেইদিকে ছুটিয়া তাহাকে তাড়া করিয়া যাইতেছে। কুকুরদের যেটা যখন সুবিধা পায় হরিণের দেহ হইতে এক এক কামড় মাংস তুলিয়া লইতেছে। হরিণ একবার গভীর বনে প্রবেশ করে আবার ফাঁকা যায়গায় বাহির হইয়া আইসে, কুকুরের দল সর্বত্রই তাহাকে তাড়া করিয়া যাইতেছে। আমরা ঘোড়ার গাড়িতে ছিলাম লোক-জনও অনেক সঙ্গে ছিল, আমাদের কাছ দিয়াই হরিণটা পালাইল, কুকুরের দল আমাদের দিকে অগ্রসর না করিয়াই আমাদের কাছ দিয়া চলিয়া গেল। তারপর হরিণটা এক জলাশয়ে ঝাঁপ দিয়া পড়িল কিন্তু সেখানেও নিস্তার পাইল না। অবশেষে ক্লান্ত, দুর্বল ও রক্তাক্ত কলেবর হইয়া কুকুরের হাতে মারা পড়িল। সাহেব পূর্বে কখন এরূপ ঘটনা দেখেন নাই, আর আমাদের দেশে নেকড়ে বাঘও দল বাঁধিয়া শিকার তাড় করে না। এগুলি নেকড়ে নয়, এক রকম বুনো কুকুর, শুনিয়া সাহেব ভারি আশ্চর্য্য হইলেন। কুকুরেরা যখন হরিণটাকে তাড়া করিতেছিল, সাহেব তখন গাড়ি হইতে নামিয়া গুলি করিয়া দলের দুটা কুকুর মারিলেন। তাহাতেও অপর

কুকুরেরা কিছুমাত্রও ভয় পাইল না। বাকি যে কয়টা ছিল তাহারা পূর্বের মতই হরিণটাকে মারিবার জন্য তাড়া করিতে লাগিল। অবশেষে তাহাদের হাতেই হরিণটা মরিল। আমি সেই মরা কুকুরের একটাকে গাড়িতে তুলিয়া বাড়িতে লইয়া আসিলাম। তাহার গায়ের গড়ন রং ও গায়ের মাপ সব খাতায় টুকিয়া রাখিলাম।

বুনো কুকুরের দল কখন কখন বাঘকেও আক্রমণ করে। বাঘ আত্মরক্ষার জন্য এক একবার থাবা মারে। যাহার গায়ে বাঘের এক চড় লাগে তাহারই মৃত্যু হয়; কিন্তু সেই সময়ে অপর কুকুরগুলি, যে যেমন পারে, কামড়াইয়া বাঘকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দেয়। এই যুদ্ধে পরিণামে বাঘের মৃত্যু একরূপ নিশ্চিত। যুদ্ধের পূর্বে পনের ঘোলটা কুকুর ছিল, যেখানে যুদ্ধের পরে হয়ত সেখানে চার পাঁচটা মাত্র জীবিত থাকে। যাহার বাঁচিয়া যায় তাহারাই পেট ভরিয়া বাঘের মাংস খায়।

বুনো কুকুর অনেক জন্তুকে মারিলেও, মানুষকে কখনও আক্রমণ করিয়াছে, এরূপ শুনা যায় নাই। বুনো কুকুরকে পোষ মানান ভারি কঠিন। শীতকালে ইহাদের ছানা হয়। দুই মাস গর্ভধারণ করিয়া কুকুরী বৃক্ষকোটরে, গর্ভে বা পর্বত গুহায় পাঁচ ছয়টি ছানা প্রসব করে।

বুনো কুকুর, নামে কুকুর হইলেও, নেকড়ে শিয়াল ও গৃহপালিত কুকুর প্রভৃতি প্রকৃত কুকুরগণীয় জন্তু হইতে একটু ভিন্ন। ইহাদের নীচের চোয়ালে দু'পাশে দু'টা করিয়া দাঁত থাকে। নেকড়ে শিয়াল ও কুকুরের তিনটা করিয়া থাকে। ইহাদের মস্তকের গড়নও ভিন্ন স্তনও সংখ্যায় অধিক। কুকুরগণীয় জন্তুর দশটা করিয়া স্তন হয়, ইহাদের বারটা, চৌদ্দটা করিয়া স্তন হয়।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

ঘাঘামুর

পুরাতন লেখা।

(৬ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত) ।



ক যে ছিল রাজা, তার ছিল একটি মেয়ে।
মেয়েটি হইয়া অবধি খালি অশুখেই ভুগিতেছে ;
একটি দিনের জন্তেও ভাল থাকে না। কত
বড়ি, কত ডাক্তার, কত চিকিৎসা, কত ওষুধ—
মেয়ে ভাল হইবে দূরে থাকুক, দিন দিনই রোগা
হইতেছে। এত ধন জন থাকিয়াও রাজার
মনে সুখ নাই। কিসে মেয়েটি ভাল হইবে,
তাঁহার কেবল সেই চিন্তা।

এমনি করিয়া দিন যায় ; এর মধ্যে একদিন
এক সাধু রাজার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন।
তিনি রাজার মেয়ের অশুখের কথা শুনিয়া বলি-
লেন, “মহারাজ, তোমার মেয়ে একটি লেবু
খাইয়া ভাল হইবে।”

একটি লেবু! সে কোন্ লেবুটি, কোথায়
কাহার বাগানে তাহা পাওয়া যাইবে, সাধু
তাহার কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেলেন। রাজা
আর উপায় না দেখিয়া দেশের লোককে এই
কথা জানাইয়া দিলেন যে, “যাহার লেবু খাইয়া
আমার মেয়ে ভাল হইবে, সে আমার মেয়েকে
বিবাহ করিবে, আর আমার রাজ্য পাইবে।”

এখন মুন্সিলের কথা এই যে, সেরাজে
লেবু মিলে না। কেবলমাত্র এক চাষার বাড়ীতে
একটি লেবুর গাছ আছে ; চাষা অনেক কষ্ট
করিয়া খ্রীহট্ট হইতে সেই গাছটি আনিয়াছিল।

সবে সেই বৎসর তাহাতে লেবু হইয়াছে। লেবু ত নয়, যেন রসগোল্লা! এক একটা

বড় কত ! যেন এক একটা বেল ! তেমন লেবু তোমরা দেখও নাই, খাওও নাই । আমিও দেখিতে পাই নাই ; দেখিতে পাইলে খাইতে চেষ্টা করা যাইত ।

চাষার তিন ছেলে ; যত্ন, গোষ্ঠ আর মাণিক । রাজার ছকুম শুনিয়া চাষা যত্নকে এক ঝুড়ি লেবু দিয়া বলিল যে, “শীগগির এগুলি রাজার বাড়ী নিয়ে যা । এর একটা খেয়ে যদি মেয়ের ব্যামো সারে, তবে রাজার মেয়েকে বিয়ে কর্ত্তে পারি ।”

যত্ন লেবুর ঝুড়ি মাথায় করিয়া রাজার বাড়ী চলিয়াছে, এমন সময় পথে একহাত লম্বা একটি মানুষের সঙ্গে তাহার দেখা হইল । সেই লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার ঝুড়িতে কিও ?” যত্ন বলিল, “ব্যাঙ ।” সেই লোকটি বলিল, “আচ্ছা, তাই হোক ।”

রাজার দরোয়ানেরা লেবুর কথা শুনিয়া যারপরনাই আদরের সহিত যত্নকে রাজার নিকট লইয়া গেল । রাজা মহাশয় ব্যস্ত হইয়া নিজেই ঝুড়ির ঢাকা খুলিলেন ; আর অমনি চার ব্যাঙ তাঁহার পাগড়ির উপর লাফাইয়া উঠিল । সেই ঝুড়িতে যতগুলি লেবু ছিল, সব কয়টাই ব্যাঙ হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং লেবু খাওয়াইয়া রাজার মেয়েকে ভাল করা, আর রাজার জামাই হওয়া, যত্নর ভাগ্যে ঘটিল না । সে বেচারী অনেকগুলি লাথি খাইয়া প্রাণে প্রাণে যে বাড়ী ফিরিল, তাহাই চোর বলিতে হইবে ।

এর পর চাষা আর এক ঝুড়ি লেবু দিয়া গোষ্ঠকে পাঠাইল । এবারেও সেই একহাত লম্বা মানুষটি কোথা হইতে আসিয়া গোষ্ঠর ঝুড়িতে কি আছে জিজ্ঞাসা করিল । গোষ্ঠ বলিল, “ঝিঙের বাঁচি ।” একহাত লম্বা মানুষ বলিল, “আচ্ছা, তাই হোক ।”

রাজবাড়ীর দরোয়ানেরা প্রথমে গোষ্ঠকে ঢুকিতে দেয় নাই । তাহারা বলিল যে, “তোমরই মতন একটা সেদিন এসে রাজা মশাইয়ের পাগড়ি নোংরা ক’রে দিয় গেছে । তুই আবার একটা কি ক’রে বস্বি কে জানে !” অনেক পীড়াপীড়ির পর গোষ্ঠ ঢুকিয়া রাজার মেয়েকে কিরূপ লেবু খাওয়াইল, বুঝিতে পান । সাজাটাও তার তেমনই হইল ।

মাণিককে সকলেই একটু বোকা মনে করে । কাজেই তাহাকে আর লেবুর ঝুড়ি দিয়া রাজার বাড়ী পাঠাইতে কেহ বলিল না । কিন্তু সে যাইবার জন্ত একেবারে

সাজিয়া গুজিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে। যতক্ষণ না চাষা তাহাকে যাইতে বলিল, ততক্ষণ তাহাকে কিছুতেই ছাড়িল না। শেষটা তাহাকেও এক ঝুড়ি লেবু দিয়া পাঠাইতে হইল।

পথে সেই একহাত লম্বা মানুষের সহিত মাণিকেরও দেখা হইল। একহাত লম্বা মানুষ ধিজ্ঞাসা করিল, “ঝুড়িতে কিও?” মাণিক বলিল, “ঝুড়িতে লেবু আছে; তাই খেয়ে রাজার মেয়ের অসুখ সারবে।” একহাত লম্বা মানুষ বলিল, “আচ্ছা, তাই হোক।”

রাজবাড়ীতে ঢুকিতে মাণিকের যারপরনাই মুঞ্চিল হইয়াছিল। অনেক মিনতি আর হাতযোড়ের পর দারোয়ানেরা তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল আর বলিল, “দেখিস্, যেন ব্যাঙ কি ঝিঙের বীচি টিচি হয় না। তা’ হ’লে কিন্তু তোর প্রাণটা থাকবে না।”

যাহা হউক মাণিকের ঝুড়িতে লেবুই পাওয়া গেল। রাজা মহাশয় ত খুবই খুসী! তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর লেবু পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন, “কেমন হয়, আমাকে খবর দিস্।” খবরের আশায় রাজা মহাশয় বসিয়া আছেন, এমন সময় মেয়ে নিজেই খবর লইয়া উপস্থিত। সেই লেবু মুখে দিতে না দিতেই তাহার অসুখ একেবারে সারিয়া গিয়াছে।

ইহাতে রাজা মহাশয় যারপরনাই আনন্দিত হইলেন; কিন্তু তাহার ‘পরেই’ ভাবিতে লাগিলেন—“তাই ত, করিয়াছি কি! এখন যে চাষার ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে হয়!” এই ভাবিয়া রাজা মহাশয় স্থির করিলেন, যে চাষার ছেলেকে যেমন করিয়াই হউক ফাঁকি দিতে হইবে।

মাণিকলাল ভাবিতেছে যে, ‘এর পরই বুঝি মেয়ে বিয়ে দিবে।’ এমন সময় রাজা মহাশয় তাহাকে বলিলেন, “বাপু, তুমি কাজটা ত বেশ ভালই করিয়াছ, কিন্তু রাজার মেয়ে বিবাহ করা সহজ কথা নয়। আগে, আর একখানা কাজ করিয়া দেও, তারপর দেখা যাইবে কি হয়। জলে যেমন চলে, ডাঙ্গায়ও তেমনি চলে, এইরূপ একখানা নৌকা আমাকে গড়িয়া না দিতে পারিলে, তোমার কোন আশাই নাই।”

মাণিক “যে আজ্ঞা” বলিয়া বিদায় হইল। তারপর বাড়ী আসিয়া সকল কথা বলিল।

বাড়ীর সকলেই মাণিককে নেহাৎ বোকা ঠাওরাইয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং তাহারা মনে করিল যে, “মাণিকে যখন রাজার মেয়েকে ভাল করিয়া আসিয়াছে, তখন নৌকাখানা ইচ্ছা করিলেই যে-সে ভয়ের করিতে পারে।”



মাণিকের খুড়িতে লেবুই পাওয়া গেল।

যত্ন একখানা কুড়াল লইয়া তখনই নৌকা গড়িতে চলিল। বনের ভিতর হইতে গাছ কাটিয়া সেইখানেই কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। ইচ্ছা, সেই দিনই নৌকা প্রস্তুত করিয়া ফেলে; পরিজ্ঞানেরও কসুর নাই। এমন সময় কোথা হইতে সেই একহাত লম্বা মানুষ আসিয়া উপস্থিত। “কিহে যত্ননাথ, কি হচ্ছে?” “গাম্‌লা।” “আচ্ছা, তাই হোক।”

‘তাই হোক’ বলিয়া একহাত লম্বা মানুষ চলিয়া গেল; যত্নে নৌকা গড়িতে লাগিল। কিন্তু সে যত পরিশ্রম করে তাহার সমস্তই বৃথা হয়। সে সর্বনেশে কাঠ খালি গামলার মতন গোল হইয়া ওঠে, নৌকার মতন সে কিছুতেই হইতে চায় না। শেষটা যত্নর রাগ হইয়া গেল। কিন্তু রাগের ভরে এক কাঠ ফেলিয়া দিয়া, ক্রমাগত আর দুই তিনটা কাঠ লইয়াও গামলা ছাড়া আর কিছু তয়ের করিতে পারিল না। যাহা হউক, গামলাগুলি হইল ভারি সরেশ। সুতরাং সন্ধার সময় যত্নাথ গোটা তিন চার গামলা ঘাড়ে করিয়া বাড়ী ফিরিল; এমন ভাল গামলাগুলি বনে ফেলিয়া আসিতে কিছুতেই তাহার ইচ্ছা রইল না।

তারপর গোষ্ঠ নৌকা গড়িতে চলিলেন, আর সেই একহাত লম্বা মানুষের অনুগ্রহে সন্ধ্যাবেলা পাঁচখানি অতিশয় উচুদরের লাক্ল কাঁধে ঘরে ফিরিলেন।

অবশ্য, এর পর মাণিক নৌকা গড়িতে গেল; আর তাহাকেও সেই একহাত লম্বা মানুষ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি হচ্ছে”? মাণিক সাদাসিধা উত্তর দিল;— “জলে যেমন চলে ডাঙ্গায়ও তেমনি চলে, এমন একখানা নৌকা গ’ড়ে দিতে পারলে, রাজা মশাই বলেছেন, মেয়ে বিয়ে দেবেন।” এই কথা শুনিয়া একহাত লম্বা মানুষ বলিল, “আচ্ছা, তাই হোক।”

মাণিক সবে নৌকার কাঠ কাটিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিয়াছিল। একহাত লম্বা মানুষের কথা শেষ হইতে না হইতেই সেই কাঠ ছুটিয়া চলিয়াছে। সে আর এখন কাঠ নাই; অতি চমৎকার একখানা নৌকা। তাহাতে দাঁড়ি নাই, মাঝি নাই, দাঁড় নাই, পাল নাই। যেখানে যাইবার দরকার, তাহা নিজেই বুঝিয়া লয়, সেখানে সে নিজেই থামে। রাজা রাজ্জার উপযুক্ত মখমলের গদি তাকিয়ায় তাহার ভিতরটা সাজান। বাহিরটা দেখিতে কি সুন্দর, তাহা কি বলিব। যে জিনিষে তাহা সাজাইয়াছে, তাহা সেই একহাত লম্বা মানুষের দেশে হয়; আমি তাহার নাম জানি না।

রাজা মহাশয় সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় মাণিকলালের নৌকা সেইখানে গিয়া উপস্থিত। সকলে নৌকার রূপ গুণ দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল, আর কত প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজা মহাশয়ও খুব আশ্চর্য্য না হইয়াছিলেন এমন নয়। কিন্তু তাহা চাপিয়া গিয়া মুখে মাণিককে বলিলেন, “এতেও হচ্ছে না; আর একখানা কাজ করিয়া দিতে হইবে। একগাছ ঘাঁঘানুরের লেজের পালক হইলে আমার

মুকুটের বেশ শোভা হয়। এই জিনিসটি আনিয়া দিলে, নিশ্চয় আমার মেয়ে বিয়ে করতে পাবে।” মাণিক “যে আজ্ঞা” বলিয়া ঘ্যাঘাসুরের পালক আনিতে চলিল।

খানিকটা পাখী, খানিকটা জানোয়ার, বিদ্যুটে চেহারা, খিটখিটে মেজাজ, ভারি জ্ঞানী, বেজায় ধনী, অসুর ঘ্যাঘা মহাশয়, এক মাসের পথ দূরে, অজানা নদীর ধারে, অচেনা সহরে, সোণার পুরীতে বাস করেন। মানুষটিকে দেখিতে পাইলেই, বসগোল্লাটির মত টপ্ করিয়া তাহাকে গিলেন। সেই ঘ্যাঘা মহাশয়ের পালক আনিতে মাণিক চলিয়াছে। যাহাকে দেখে, তাহাকেই ঘ্যাঘাসুরের মুল্লকের পথ জিজ্ঞাসা করে; আর ডাইনে বাঁয়ে না চাহিয়া ক্রমাগত সেই পথে চলে। রাত্রি হইলে কাহারও বাড়ীতে আশ্রয় লয়; আবার সকালে উঠিয়া চলিতে থাকে।

ঘ্যাঘাসুরের মুল্লকে যাইতেছে শুনিয়া, সকলেই তাহাকে আদর করিয়া জায়গা দেয়। একদিন রাত্রিতে এইরূপে সে একজন খুব ধনী লোকের বাড়ীতে অতিথি হইয়াছে। সেই ধনী অনেক কথাবার্তার পর তাহাকে বলিল, “বাপু, তুমি ঘ্যাঘাসুরের দেশে চলেছ; শুন্ছি, সে অনেক বিষয়ের খবর রাখে। আমার লোহার সিঁদ্বকের চাবিটা হারিয়ে ফেলেছি; ঘ্যাঘা তার কোন সন্ধান বলতে পারে কি না, জিজ্ঞেস করো ত।” মাণিক বলিল, “আচ্ছা মশাই, আমি জেনে আসুব।” আর একদিন সে আর এক বড় লোকের বাড়ীতে অতিথি হইয়াছে; সেই বড় লোকের মেয়ের ভারি অসুখ। তাহার বেয়ারামটা যে কি, কোন ডাক্তার কবিরাজ তাহা ঠিক করিতে পারে না। মেয়ে দিন দিন খালি রোগা হইয়া যাইতেছে। সেই বড় লোক মাণিককে খুব যত্ন করিয়া খাওয়াইয়া তারপর বলিলেন, “আমার মেয়ের অসুখ কিসে সারবে এই কথাটা যদি ঘ্যাঘার কাছ থেকে জেনে আসতে পার, তবে বড় উপকার হয়।” মাণিক বলিল, “অবিশিষ্ট মশাই, আমি নিশ্চয় জেনে আসুব।”

এইরূপে এক মাস চলিয়া মাণিক অজানা নদীর ধারে আসিয়া ওপারে ঘ্যাঘাসুরের সোণার বাড়ী দেখিতে পাইল। আজানা নদীর নৌকা নাই, খেয়া নাই; এক বুড়ো সকলকেই কাঁধে করিয়া পার করে। মাণিকও তাহারি কাঁধে চড়িয়া নদী পার হইল। বুড়ো তাহাকে বলিল, “বাপু, আমার এই ছুঁখু কবে দূর হবে, ঘ্যাঘার কাছে জিজ্ঞেস করো ত। আমার খাওয়া নাই, দাওয়া নাই, খালি কাঁধে ক’রে দিন রাত্তির মানুষই পার করছি। ছেলেবেলা থেকে এই কাজ করছি, আর এখন বুড়ো হয়ে গেছি।” মাণিক বলিল, “তোমার কিছু ভয় নেই, আমি নিশ্চয় তোমার কথা জিজ্ঞেস করব।”

নদী পার হইয়া মাণিক ঘ্যাঘার বাড়ীতে গেল। ঘ্যাঘা তখন বাড়ী ছিল না ; ঘেঁঘী ছিল। ঘেঁঘী তাহাকে দেখিয়া বলিল, “পালা বাছা, শীগ্গির পালা। ঘ্যাঘা তোকে দেখতে পেলেই গিলবে।” মাণিক বলিল, “আমি যে ঘ্যাঘার লেজের একগাছি পালক চাই। সেটি না নিয়ে আমি কেমন ক’রে যাব ? আর সেই যাদের চাবি হারিয়ে গেছে, সেই চাবিতে কোথায় আছে ? আর যাদের মেয়ের অশুখ, তারা ওষুধ জেনে যেতে বলেছে। আর যে বুড়ো পার ক’রে দিলে, সে বাড়ী যাবে কেমন ক’রে ?”

ঘেঁঘী বলিল, “প্রাণটি নিয়ে কোথায় পালাবে, না আবার তার পালক চাই, আর তাকে একশ খবর বলে দাও ! তুই করে বাপু ?” মাণিক বলিল, “আমি মাণিক। পালক না নিয়ে গেলে রাজা মেয়ে বিয়ে দেবে না ; একগাছি পালক আমার চাই।”

হাজার হো’ক জ্বীলোক। মাণিককে দেখিয়া ঘেঁঘীর দয়া হইল। সে বলিল, “আচ্ছা বাপু, তা’হলে তুই এই খাটের তলায় লুকিয়ে থাক। তোর ভাগ্যে থাকলে হবে এখন।” মাণিক ঘ্যাঘার খাটের তলায় লুকাইয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর ঘ্যাঘানুর বাড়ী আসিল। ঘেঁঘী তাড়াতাড়ি পা ধুইবার জল টল দিয়া, সোণার থালায় করিয়া খাবার হাজির করিল। ঘ্যাঘার মেজাজটি বড়ই খিটখিটে ; সবটাতেই সে দোষ ধরে। বাড়ী আসিয়াই সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল, “মানুষের গন্ধ কো’থেকে এল ? হুঁ হুঁ—মানুষের গন্ধ ! মানুষ দে, খাই।”

ঘ্যাঘার কথা শুনিয়া খাটের তলায় মাণিকলালের মুখ শুখাইয়া গেল ; ঘেঁঘীরও বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। সে অনেক কৌশল করিয়া ঘ্যাঘাকে বুঝাইল যে, একটা মানুষ আসিয়াছিল, কিন্তু সেটা ঘ্যাঘার নাম শুনিয়াই পলাইয়াছে। ইহাতে ঘ্যাঘা কিছু শাস্ত হইয়া খাবার খাইতে বসিল।

খাওয়া শেষ হইলে, ঘ্যাঘা খাটে শুইয়া নিদ্রা গেল। ঘুমের ভিতর তাহার লম্বা লেজটি লেপের বাহিরে আসিয়া খাটের পাশে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সেই লেজের আগায় অতি চমৎকার পালকের গোছা। মাণিক খাটের তলায় অপেক্ষা করিয়া আছে ; লেজ দেখিয়াই সে খ্যাচ করিয়া একটি পালক ছিঁড়িয়া লইল। অমনি ঘ্যাঘা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, “ঘেঁঘী, আমার লেজ ধরে যেন কে টান্লে ! হুঁ-হুঁ—মানুষের গন্ধ !”



ঘেঁষা, আমার লেজ ধরে যেন কে টানলে !

ঘেঘী বলিল, “তোমার ভুল হয়েছে। অত বড় পালকের গোছা কোথায় আটকে লেজে টান পড়েছে। আর মানুষ ত একটা এসেছিল বলেছি, এ ভারই গন্ধ। সেই মানুষটা কত কথা বললে। সেই কা’দের বাড়ী লোহার সিঁড়কের চাবি হারিয়ে গেছে—।” ঘেঘীর কথা শেষ হইতে না দিয়াই ঘ্যাঘা বলিল, “হাঁ, হাঁ! সেই লোহার সিঁড়কের চাবি! আমি জানি! সেটাকে তাদের খোকা গদীর ফুটোর ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে।” ঘেঘী বলিল, “আবার কা’দের মেয়ের কি অশুখ—।” অমনি ঘ্যাঘা বলিল, “কোণা ব্যাঙে ওর চুল নিয়ে গেছে; ঘরের কোণেই তার গর্ভ। ঐখান থেকে খুঁড়ে সেই চুল আন্লেই মেয়ের ব্যামো সারবে।” আবার ঘেঘী বলিল, “যে লোকটা মানুষ ঘাড়ে ক’রে নদী পার করে—?” ঘ্যাঘা বলিল, “সেটা একটা মস্ত গাধা। একজনকে কেন নদীর মাঝখানে নামিয়ে দেয় না? তাহ’লেই ত সে বাড়ী যেতে পারে। যাকে নামিয়ে দেবে সেই মানুষ পার করতে থাকবে।”

মাণিকের সকল কাজই আদায় হইল। এখন রাত পোহাইলে ঘ্যাঘা বাহিরে চলিয়া যায়, আর সেও বাহিরে আসিতে পারে। রাত ভোর হইলে ঘ্যাঘা জলখাবার খাইয়া, বেড়াইতে বাহির হইল; ঘেঘীও মাণিককে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া বিদায় করিল।

এর পর প্রথমেই সেই বুড়োর সঙ্গে দেখা। বুড়ো জিজ্ঞাসা করিল, “আমার কথা কিছু হ’ল?” মাণিক বলিল, “সে হবে এখন, আগে পার কর; আমার বড় তাড়াতাড়ি।” বুড়ো মাণিককে কাঁধে করিয়া পারে লইয়া গেলে পর ডাঙ্গায় উঠিয়া মাণিক বলিল, “এর পর একজনকে মাঝখানে নামিয়ে দিয়ো; তাহ’লেই তোমার ছুটি।” এই কথা শুনিয়া বুড়ো মাণিককে অনেক ধন্যবাদ দিয়া বলিল, “ভাই, তুমি আমার এমন উপকারটা করলে; আমার ইচ্ছা হচ্ছে, তোমাকে আর দুবার কাঁধে ক’রে পার করি।” মাণিক বলিল, “তুমি দয়া ক’রে যা করেছ তাই ঢের; আর আমার বুড়ো মানুষের কাঁধে চড়ে কাজ নেই। আমি এখন দেশে চললাম।”

চারিদিন চলিয়া মাণিক, যাহাদের মেয়ের অশুখ ছিল, তাহাদের বাড়ীতে আবার অতিথি হইল। বাড়ীর কর্তা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঘ্যাঘা কিছু বলেছে?” মাণিক বলিল, “হাঁ।” এই বলিয়া সে ঘরের কোণ হইতে কোণা ব্যাঙের গর্ভ খুঁড়িয়া যেই চুল বাহির করিল, আর অমনি যে মেয়ে দুই বৎসর যাবৎ মড়ার মতন পড়িয়াছিল, সে উঠিয়া হাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহাতে বাড়ীর

সকলে যে কত খুসী হইল, তাহা কি বলিব! মাণিককে তাহারা এত টাকা দিল যে, দশটা উটে তাহা বহিতে পারে না।

যাহাদের চাবি হারাইয়া গিয়াছিল, তাহারাও চাবি পাইয়া মাণিককে ঢের টাকা-কড়ি দিল। এই সমস্ত টাকাকড়ি লইয়া সে দেশে ফিরিয়া রাজা মহাশয়কে ঘ্যাঘাসুরের পালক বুঝাইয়া দিল। দেশের সকল লোক ইহাতে মাণিকের যারপর-নাই প্রশংসা করিল। তাহারা সকলেই বলিল যে, মাণিককে এত ক্রেশ দেওয়া রাজার ভারি অন্তায় হইয়াছে, তাহার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে আর দেরী করা উচিত নয়। রাজা মহাশয় আর কি করেন, শেষটা অনেক কষ্টে রাজি হইলেন।

তারপর খুব জাঁকজমকের সহিত রাজকন্ঠা ও মাণিকের বিবাহ হইল। মাণিক এত টাকাকড়ি লইয়া আসিয়াছে যে, তাহাতেই তাহার পরম সুখে দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু রাজা মহাশয়ের ইহাতে ভারি হিংসা হইল। তিনি মনে করিলেন যে, “ঘ্যাঘাসুরের দেশে গেলে যদি এত টাকা নিয়ে আসা যায়, তবে আমিও সেই-খানে যাব।”

এই ভাবিয়া রাজা মহাশয় ঘ্যাঘার মুল্লুকে যাত্রা করিলেন; কিন্তু তিনি সেখানে পৌঁছাইতে পারেন নাই। কারণ, অজানা নদী পার হইবার সময়, সেই বুড়ো তাঁহাকে মাঝখানে নামাইয়া দিল। রাজা মহাশয় প্রথমে আশ্চর্য হইলেন, তারপর চুটিয়া জ্বাল হইলেন, তারপর বুড়োকে গালি দিতে লাগিলেন, তারপর হাত ঘোড় করিয়া মিনতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু বুড়ো তাঁহার কথায় কাণ দিবার অবসরই পায় নাই। ততক্ষণে সে ডাঙ্গায় উঠিয়া উজ্জ্বলবাসে বাড়ীর পানে ছুটিয়াছে। তাড়াতাড়ি রাজামহাশয়কে ছুটি পাইবার কৌশলটি বলিয়া দিবার কথা তাহার মনে হয় নাই। সুতরাং রাজামহাশয় আজও সেই স্থানেই মানুষ্য পার করিতেছেন।

পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে কেহ যদি কখনও ঘ্যাঘাসুরের মুল্লুকে যান, তাহা হইলে দয়া করিয়া বেচারাকে সেই কথাটা বলিয়া দিবেন। কিন্তু পুনরায় নদীর এপারে ফিরিয়া না আসিয়া একথা বলিবেন না, কারণ তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অন্তর্বিধা হইতে পারে।



ঘোগের হরিণ শিকার

(২৮৪ পৃষ্ঠা)

আলো ছায়া

প্রজাপতির পিছনে ছুটতে ছুটতে একটু দূরে শাদা মতন একটা কি পড়ে রয়েছে দেখে ছায়া একবার থমকে দাঁড়াল! কিন্তু সেটাই বা কি, তাই জানবার কোঁতুহলে সে আবার এগিয়ে চলল। ওমা, এ যে দেখি তারি মত আর একজন! কিন্তু পোষাকটা যেন অগ্নি রকমের আর এর নড়বার চড়বার ক্ষমতাও যেন নেই। মরে যায় নি ত? ছায়া সেইখানে ঘাসের উপর বসে পড়ে আলোক কুমারের মাথা কোলের উপর তুলে নিয়ে, আন্তে আন্তে তার মাথায় মুখে হাত বুলতে লাগল! আলোক-কুমার চোখ খুলে চেয়েই ছায়ার সুন্দর মুখখানা দেখতে পেল। তার ভয় যেন একটু কমে গেল, সে জিজ্ঞাসা করলে “তুমি কে?”

ছায়া বললে “আমি ছায়া।”

আলোককুমারের তার নামটা বিশেষ ভাল লাগল না, সে বললে “তুমি বুঝি এই আঁধারের মানুষ, তুমি রাত্রিটাকে খুব ভালবাস?” ছায়া বললে, “জানি না। আমি হয়ত আঁধারের মানুষ, কিন্তু আমি রাত্রি ভালবাসিনা, আমি দিন ভালবাসি, আর সারারাত ঘুমই।”



ঈগলরাঙের ভীষণ রাগ

আলোককুমার বললে “তা কি করে হবে? এই যে এখন তুমি জেগে রয়েছে?”

ছায়া তার কথার কিছু মানে বুঝতে পারল না, কাজেই একটু হেসে সে আবার তার মুখে হাত বুলতে লাগল। আলোককুমারের মন থেকে ভয়টা একটু সরে গিয়েছিল, সে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ভাবতে লাগল “অত যে ভয় পেয়েছিলাম, সেটা সত্যি না স্বপ্ন?” কিন্তু মাথা তুলতেই তার চোখে পড়ল, ভাঙা চাঁদটা, আর রাত্রির অস্পষ্ট অঙ্ককার। ছায়ার কোলে মুখ লুকিয়ে সে বলে উঠল “কি ভয়ানক! কি ভয়ানক! কি লজ্জার বিষয়! ছি ছি! ওঃ আমার ভয়ানক ভয় করছে।”

ছায়া একটু অবাক হয় বললে “ভয় করছে কেন?” আলোককুমার বললে “দেখতে পাচ্ছ না, কি ভয়ানক আঁধার, চারিদিকে কারা সব গর্জন করছে?”

ছায়া হেসে বললে “গর্জন আবার কোথায়? ওত জলের গান, আর এত আমার অদৃশ্য বন্ধুর খেলার শব্দ। এতেই ভয় পাচ্ছ, তাহলে সে যখন রেগে উঠে গোঁ গোঁ করতে থাকে, তখন শুনলে না জানি তুমি কি করতে।”

আলোককুমার আবার শিউরে উঠে বললে “কি ভয়ানক আঁধার।”

ছায়া বললে “একে তুমি আঁধার বল? ভূমিকম্পে আমার ঘরের আলো যখন মরে গিয়েছিল, তখনকার আঁধার যদি দেখতে! এখন ত বেশ সুন্দর আলো। তোমার এত বড় বড় চোখ তবু তুমি দেখতে পাচ্ছ না? এই দেখ ঘাসের মধ্যে কেমন সুন্দর সুন্দর ফুল। তুমি একবার বড় আলোর দিকে চেয়ে দেখ, কেমন ঝক্ ঝক্ করছে। তুমি যে কেন ভয় পাচ্ছ তা আমি মোটেই বুঝতে পারছি না।”

আলোককুমারের ইচ্ছা করছিল যে সে চেষ্টা করে বলে ওঠে “তোমার বড় আলোটা ঠিক রাফসের মত দেখতে, ওর দিকে তাকালেই আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।” কিন্তু ভয়ে সে কথা বলতে পারল না। তার বড় আলোকে গাল দিলে যদি মেয়েটি রাগ করে তাকে ফেলে চলে যায়?

ছায়া জিজ্ঞাসা করল “তুমি এখানে এলে কি করে?”

আলোককুমার বললে “পাহাড় বেয়ে নেমে এসেছি।” ছায়া বললে “তোমার যখন ভয় কমে যাবে, তখন তুমি রোজ এখানে আমার সঙ্গে বেড়াতে এসো, কেমন? দেখ দেখ, এই গোলাপের কুঁড়িটা কি সুন্দর।”

আলোককুমারের বার বার চেখ খুলতে মোটেই ভাল লাগছিল না, সে যুখ গুঁজে



চূপ করে শুয়েই রইল। ছায়া হাসতে হাসতে বললে “একবার একটু সাহস করে চেয়ে দেখ দেখি, লক্ষ্মী মেয়ে।”

আলোককুমার রাগের চোটে একেবারে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলে “কি বললে। আমি মেয়ে ? তুমি যদি ছেলে হতে, তা হলে আমি তোমাকে মেরে ফেলতাম্।”

ছায়া অবাক হয়ে বললে “সে আবার কি ? তুমিও কি আমার মত মেয়ে নও ?”

আলোককুমার মাটিতে শুয়ে পড়ে বললে “না না আমি মেয়ে নই। এখন আমার কাণ্ড দেখে হয় ত কেউ আমাকে পুরুষ মানুষ বলবেনা ; কিন্তু আমি কঙ্কনো মেয়ে নই।”

ছায়া তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে “ও বুঝেছি, তাই বুঝি এত ভয় পাচ্ছ ? মেয়েরা কিন্তু কথায় কথায় অত ভয় পায় না।”

আলোককুমার লজ্জায় আর রাগে মাটির উপর গড়াগড়ি দিতে দিতে বলে উঠল “না, না, তুমি বুঝতে পারছ না। এই আঁধারটা আমার বুকের মধ্যে ঢুকে আমার গায়ের রক্ত জল করে দিচ্ছে। এরি জন্তে আমি মেয়েদের মত কান্নাকাটি করছি। আঃ, সূর্য্য উঠলে বাঁচি।”

ছায়া অবাক হ’য়ে বললে “সূর্য্য আবার কি ?”

আলোককুমার দশমুখে সূর্য্যের বর্ণনা করতে লেগে গেল। তার কত আলো, কত তেজ, কত রূপ, পৃথিবীর সে কত উপকার করে, সে থাকলে মানুষের মন সাহসে ভরে ওঠে, ভয় ডর কোথায় উড়ে যায় তার ঠিক নেই। ছায়া খানিকক্ষণ শুনে, চাঁদের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে বললে “এটা তাহলে সূর্য্য নয় ?”

আলোককুমার নাক সিঁটকিয়ে বলে উঠল “ওটা ? ওটা সূর্য্য না আরও কিছু ! ওটা বোধ হয় কোন মরা সূর্য্যের ভূত, তাই অমন বিজ্রী চেহারা।”

ছায়া চুপ করে রইল, আলোককুমার খানিকক্ষণ পরে বললে “দেখ আমার ঘুম আসছে। তুমি আমাকে আঁধারে একলা ফেলে পালাবে না ত ?”

ছায়া বললে “না, আমি তোমায় ফেলে যাবনা, তুমি ঘুমও।”

আলোককুমার ছায়ার কোলে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ছায়া বসে বসে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল,—চাঁদটা তা হলে কি ? আলোককুমার যাকে সূর্য্য বললে সেটাই বা কি জিনিষ ?

চাঁদটা আকাশের নীল বুকে ভাসতে ভাসতে ক্রমেই পশ্চিমের দিকে চলে পড়তে লাগল। ফুলের কুঁড়িগুলিও ভোরের শিশিরের লোভে আস্তে আস্তে নিজেদের দলগুলি একটু ফাঁক করে বাইরে উঁকি মারতে লাগল। বাতাস তখনও সব জিনিষে দোলা দিয়ে ফিরছে। একজায়গায় বসে বসে ছায়ার চোখ কখন এক সময় ঘুমে বুজে এল।

হটাৎ সে চমকে উঠে বসল। ওমা, এ কি রকম সব দেখাচ্ছে ? চাঁদটা যেন নিভে আসছে, অথচ চারিদিকের আলো ত কমছে না, বরং আরও বেশী পরিষ্কার মনে হচ্ছে। আলোটা *বুঝি চাঁদটাকে ছেড়ে আকাশময় ছড়িয়ে পড়ছে ?

ছায়ার কেমন ভয় করতে লাগল, এ রকম আলো সে কখনও দেখেনি। আলোক-কুমারের দিকে চেয়ে দেখল, সে তখনও খুব ঘুমচ্ছে। রাত্রে তার মুখখানা ভয়ে ক্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, এখন ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গালে যেন রক্তের আভাষ দেখা দিচ্ছে।

চাঁদটা পশ্চিমে যতই নিভে আসতে লাগল, আকাশের পূর্বদিকে ততই যেন বেশী করে আলো জ্বলে উঠতে লাগল। আর যেন চাওয়া যায়না, ছায়া মনে করল যে চাঁদের সঙ্গে সেও বুঝি এখনই নিভে যাবে। একবার তার ইচ্ছা হ'ল যে ছুটে নিজের আঁধার ঘরে পালিয়ে যায়। কিন্তু আলোককুমার যে তাকে যেতে বারণ করে ঘুমিয়ে পড়েছে, ছায়া কি করে যাবে?

হটাৎ আকাশের গায়ে লাল আগুনের কলসীর মত কি একটা লাফিয়ে উঠল, তার সারা অঙ্গ বেয়ে যেন আগুন ঝরে পড়ছে। ছায়া দুই হাতে চোখ চেপে ধরে চীৎকার করে উঠল। আলোককুমারও ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘুম ভেঙ্গে এক লাফে উঠে দাঁড়াল। তার ভয় ডর যে কোন রাজ্যে উড়ে গিয়েছে তার ঠিকানা নেই। ছায়া তার দিকে দুই হাত বাড়িয়ে কেঁদে বললে “তুমি আমাকে ফেলে যেওনা, তাহ'লে আমি এখুনি মরে যাব। আমার ভয়ানক ভয় করছে।”

আলোককুমার তখন এক মনে নিজের পাগড়ী বাঁধছে আর তীর ধনুক গোছাচ্ছে, ছায়ার কান্না শুনে সে রেগে বলল “আঃ কাঁদছ কেন? দিবি কেমন সূর্য্য উঠেছে, এখন আবার ভয়! আমি চললাম এখন শিকার করতে। তোমার কাছে বসে থাকবার আমার সময় নেই।”

ছায়া চীৎকার করে উঠল “আমাকে ছেড়ে যেওনা, তোমার সূর্য্য আমাকে পুড়িয়ে মারছে। আমাকে অন্ধকারে কোথাও রেখে এসো।”

আলোককুমার তার কথায় কান না দিয়ে ঝপাং করে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাতার দিয়ে ওপারে উঠেই সামনে দেখতে পেল একটা বুনো শুয়োর। আর তাকে পায় কে? তখনই ধনুকে তীর জুড়ে তাকে তাড়া করে সে পাহাড়ে উঠে পড়ল।

ছায়া তার কথার উত্তর না পেয়ে ভয়ে ভয়ে চোখ থেকে হাত সরিয়ে একবার চেয়ে দেখল। ওরে বাপু, একি ভয়ানক আলো। ছায়া কোন রকমে চোখ বুজে হাতড়াতে হাতড়াকে, নিজের আঁধার ঘরের মধ্যে গিয়ে পড়ল। সেখানে বসেও তার কেবলি মনে হতে লাগল যেন তার মাথার ভিতরেও সেই আগুনের

কলসীটা আলো ঢেলে দিয়েছে। 'থেকে থেকে তার সেই সুন্দর ছেলেটির কথা মনে হচ্ছিল, কিন্তু তার নির্ভুরতার কথা মনে হতেই বেচারীর চোখে জল ভরে আসছিল।

আলোককুমার কিন্তু শিকারের আনন্দে সব ভুলে গেল। রাত্রির ভয়ও তার মনে রইল না, ছায়াকেও মনে রইল না। কিন্তু বিকেল হয়ে আসতেই আগের রাত্রির কথা সব তার মনে পড়ে গেল। 'ছি, ছি, সে কিনা একটা মেয়ের সামনে অমন ক'রে নিজের ভীষণতা দেখিয়ে দিলে? নিশ্চয় তাকে কোনো ডাইনী মন্ত করেছিল। তার মত তীর ধনুক আর বর্ষা চালাতে আর কেউ জানে না, কিন্তু অন্ধকারে যে কিছু দেখা যায় না, কোথা দিয়ে যে কি ঘাড়ে এসে পড়বে তার ঠিক ঠিকানা নেই। আচ্ছা, অন্ধকারকে তার চেনা হয়ে গিয়েছে, আজ রাত্রে চেষ্টা করে দেখা যাবে, কার কত ক্ষমতা।

কিন্তু সূর্য্য ডুববার যেই জোগাড় হল অমনি কোথায় গেল তার সাহস আর কোথায় গেল তার তেজ। আগের দিনের মতই সে ভয়ে পাগল হয়ে ছুটতে ছুটতে আবার শেষে রাণীর বাগানে অজ্ঞান হয়ে গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু এবার আর চোখ চেয়ে ছায়ার সুন্দর মুখখানি সে দেখতে পেল না, দেখল কেবল চারিদিক জোড়া আঁধার, আর কালো আকাশের গায়ে তারাগুলো সব চোখ মেলে তাকিয়ে আছে।

ভয়ে ঝুয়েই তার রাত কোনোরকমে কেটে গেল।

সকালের সঙ্গে সঙ্গে তার সাহস ফিরে এল বটে, কিন্তু লজ্জাতে তার সমস্ত মন ভরে উঠল। আবার সে হেরে গেল? তাহ'লে তার নিজের সাহস বলে কি কিছুই নেই? যত সাহস সব আলোর? আচ্ছা, আর একবার দেখা যাক।

কিন্তু আর একবারও আগেকার দশাই হল। এই রকম করে সাত সাতবার চেষ্টা করে হেরে গিয়ে শেষে আলোককুমার হাল ছেড়ে দিলে। নিজের উপর ঘৃণায় আর লজ্জায় সে অস্থির হয়ে উঠল। তার শরীর মন ভেঙ্গে পড়ল, খাওয়া দাওয়া সব ঘুচে গেল। রাত্রির হিম লেগে আর ঠাণ্ডায় ভিজে মাটিতে শুয়ে তার অমন চমৎকার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। সে একেবারে বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গেল, আর ক্রমাগত ছটফট করতে করতে প্রাণাপ বকতে লাগল।

রাণীর যে অসুখ হয়েছিল, সে কথা ত আগেই বলেছি, আর অসুখে তাঁর মেজাজটা যে কি চমৎকার হয়ে উঠত সে ত গোড়াতেই শুনেছি। কাজেই তিনি

যখন শুনতে পেলেন যে, যে আলোককুমারকে 'তিনি' অত যত্নে মানুষ করেছিলেন, যার অমন চমৎকার স্বাস্থ্য ছিল, সেই বিছানায় শুয়ে প্রলাপ বকছে, তখন তিনি গেলেন বেজায় চটে। এমনি করে তাঁর কাজ মাটি করা? রাণী রেগে আগুন হয়ে নিজের চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে আলোককুমারের ঘরে ছুটলেন।

আলোককুমারের আরও যত্নবাড়ল। একে ত রোগের কষ্ট, তার উপর রাণীর অত্যাচার। তিনি এসেই প্রথমে ঘরের দরজা জানুলা সব বন্ধ করে দিয়ে ঘর আঁধার করে দিলেন। তারপর রাণী তার চুল ধরে টানতে লাগলেন, তারই তীরগুলো নিয়ে তাকে খোঁচা মারতে লাগলেন। আলোককুমার ত ভয়ে অস্থির। এ কি কাণ্ড? যে রাণী তাকে এত ভালবাসতেন তিনি আজ অমন করেন কেন? তিনি কি তাকে মেরে ফেলবেন নাকি? আলোককুমার ঠিক করলে, সুবিধা পেলেই সে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে যাবে। হয় ত বাইরে ঘুরতে ঘুরতে সে সেই সুন্দরী মেয়েটিকে আবার দেখতে পাবে। সে আলোককুমারকে কেমন যত্ন করেছিল, আর আলোককুমার কি নিষ্ঠুরভাবেই তাকে ফেলে চলে এল। সে মেয়েটি কি জলদেবী? জলের ধারেই ত সে বসে ছিল। তার যত ভয় দিনকে, রাত্রির আঁধারকে সে গ্রাহ্যই করেনা। তাকে পেলে আলোককুমারের আর ভাবনা থাকে না। কিন্তু সে কি বেঁচে আছে, না সূর্যের তেজ তাকে একেবারে শুকিয়ে মেরে ফেলেছে?

[আগামী বারে শেষ হইবে]

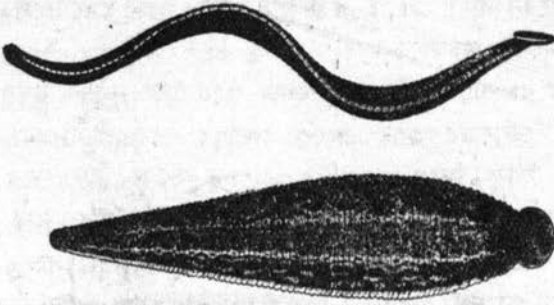
শ্রীসীতা দেবী।

জোক

ভাই সন্দেশ,

আমি একদিন পচা পানা পুকুরে পদ্মফুল তুলতে নেমেছিলাম। ফুল তুলে যখন ডাঙায় এলাম, তখন দেখি, আমার পায়ের এক যায়গা দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, আর এক যায়গায় একটা জোক লেগে আছে। জোকটা রক্ত খেয়ে বেশ মোটা ও বড় হয়েছে—তিনি ইঞ্চির উপর লম্বা হয়েছে। এটার গায়ের উপর দিকটা মেটে রঙের, তার উপর সরু সরু কাল ডোরা আর কাল কাল ফুটকি। তলার বা পেটের দিকটা ফ্যাকাসে, গায়ের দুই ধারে দুইটা হলুদে ডোরা আর দুজোড়া কাল ডোরা আছে।

পুকুরের ধারে একটা লোক গরু চরাচ্ছিল। সে বলল, “মশাই, ওটা ‘মহিষে জৌক’।” যে কোন জাতের জৌক খুব বড় হলেই তাহাকে আমাদের দেশে ‘মহিষা জৌক’ বলে। আর ছোট জাতের জৌক হলেই তাকে ‘ছিনা জৌক’ বলে।



জৌক। চ্যাপ্টা শরীর কিনা তাই উপর থেকে চ্যাটাল দেখায়, আর পাশ থেকে দেখায় সরু লম্বা মতন।

যে সব পুকুরে আর বিলে পাঁক থাকে আর জলে দাম, শেওলা ও পানা প্রভৃতি ভরে থাকে, সেই সব পুকুরে বিলে ডোবায় আর ধান-ক্ষেতে ছোট বড় অনেক জাতির জৌক দেখতে পাওয়া যায়। অনেক ছোট ছোট জৌক থাকে তারা বড় জৌকের বাচ্চা, বয়স হলে আরও বড় হবে; আবার কতকগুলি জৌক আছে যারা

জাতেই ছোট; তারা আর বড় হয় না। কোন কোন জাতি এক ইঞ্চি লম্বা হয়, তাদের জল থেকে তুললে একটা বড় মটরের মত গোল হয়ে যায়। সেইটাই আবার বৃষ্টি খেয়ে ফুলে উঠলে তিন ইঞ্চি লম্বা হয়ে যায়। কোন কোন জাতির জৌক হয়ত চার ইঞ্চি লম্বা থাকে—কিন্তু যখন রক্ত খেয়ে ফুলে ওঠে তখন সাত ইঞ্চি লম্বা হয়। আবার কোন কোন জৌক দেড় ফুট দুই ফুট পর্যন্ত লম্বাও হয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতির জৌকের গায়ের রং ভিন্ন ভিন্ন রকম। কোন কোন জাতির রং কালচে সবুজ হয় তাতে হল্‌দে ডোরা আর কাল ফুটকি থাকে, কোন কোন জাতির রং মেটে হয় আর তাতে কেবল কাল ডোরা আর কাল ফুটকি থাকে। কোন কোন জাতির গায়ে ডোরা থাকেই না অথবা খুব অস্পষ্ট থাকে। কোন কোন জাতির বড় জৌক বেশ চওড়া হয় আবার কোন জাতির বড় জৌক সূতোর মত সরু সরু হয়।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির জৌক দেখা যায়। আমাদের দেশে পাহাড়ের স্যাংসেঁতে যায়গায়, ঘাসে জঙ্গলে, পালে পালে এক রকমের ক্ষুদ্র জৌক দেখা যায়, তারা এক ইঞ্চি লম্বা আর বাঁটার কাঠির মত সরু—কিন্তু রক্ত খেয়ে যখন মোটা হয় তখন দুই ইঞ্চি লম্বা আর পেন্সিলের মত মোটা হয়ে পড়ে।

দার্জিলিং, আসাম, উড়িষ্যা, দক্ষিণ ভারতবর্ষের অনেক পাহাড়ে যায়গায় বনে জঙ্গলে এই ক্ষুদে বা ছিনা জেঁকের ভারি উৎপাত। ভিজা জায়গায় ঘাসে ও ঝোপঝাড়ের লতাপাতায় এই সব জেঁক লুকিয়ে থাকে। মানুষ ঘোড়া গরু ছাগল প্রভৃতি দেখলে কিলবিল করে দলে দলে চারিদিক হইতে বাহির হয়, আর সেই সব ক্ষুদ্র দিকে গিয়ে তাদের গায়ে লেগে রক্ত চুষে খায়। রক্ত খেয়ে পেট ভরে গেলে আপনা আপনি গা থেকে খসে পড়ে।

হাঁটু পর্যন্ত বড় মোটা মোজা বা পট্টি জড়িয়ে বুট জুতা পরে এই সব যায়গায় গেলেও অনেক সময়ে এই সব জেঁকের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না। ক্ষুদে জেঁকেরা মোজার সূতার ফাঁক দিয়ে বা পট্টির বেড়ের ফাঁক দিয়ে ঢুকে, কিম্বা জুতা মোজা বেয়ে ধুতি আর পায়জামার ভিতরে ঢুকে গায়ের রক্ত খায়। ঘোড়ায় চড়ে গেলেও রক্ষা পাওয়া যায় না। ঘোড়ার গায়ে জেঁক ত লাগেই, তাছাড়া ঘোড়ার উপরের মানুষের গায়েও লাগে। মাটির ঘাসপালা থেকে ঘোড়ার গা বেয়ে ওঠে, তাছাড়া আশের পাশের গাছপালা থেকেও মানুষের গায়ে লেগে যায়। এই সব বনের মধ্যে একবার খানিকক্ষণ ঘুরে এলে দেখতে পাওয়া যায় যে গায়ের নানা স্থানে অনেক জেঁক লেগে রক্ত খাচ্ছে।

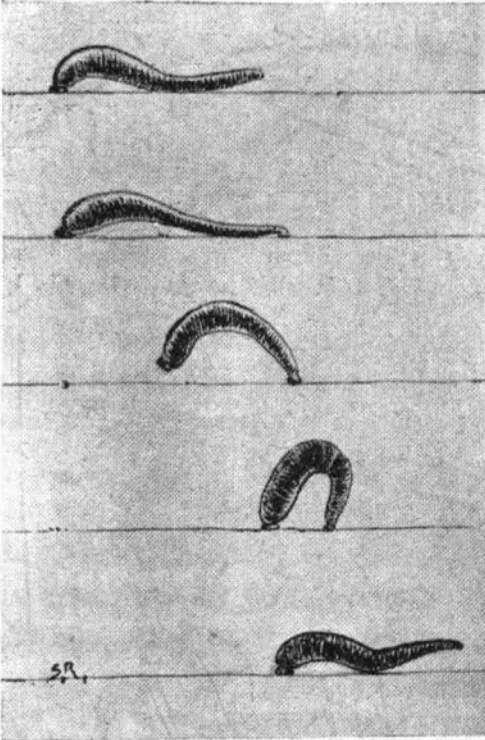
জেঁক যখন কামড়ায় তখন কিছুই টের পাওয়া যায় না। যখন রক্ত খেয়ে বেশ বড় হয়ে আমাদের গায়ের চামড়ায় ঝুলতে থাকে তখন তাদের ঠাণ্ডা গা আমাদের গায়ে লাগাতে গাটা ছাঁক ছাঁক করে, তাইতে আমরা টের পাই। আর জামা কোট মোজা খুলে ফেললে জেঁক লেগে আছে দেখতে পাই; অথবা গায়ের নানা স্থান দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে দেখতে পাই। তখন জানতে পারি জেঁক লেগেছে।



ক্ষুদে ছিনে জেঁকই বল আর বড় মহিষে জেঁকই বল—রক্ত-থেকে সব জাতের জেঁকের শরীরের গড়ন ও স্বভাব প্রকৃতি প্রায় একই রকমের। জলের জেঁক জলে সাঁতার দিতে পারে, আর জলের তলায় মাটিতে চলাফেরাও করতে পারে। ডাঙ্গার জেঁককে জলে ফেলে দিলে, সাঁতরাতে পারে না। জলের তলায় ডুবে মাটিতে চ'লে জল থেকে বেরিয়ে আসে। ডাঙ্গার জেঁকের কামড়ের দাগ জেঁক জলের মধ্যে অনেকক্ষণ ডুবে থাকতে পারে, কিন্তু বেশীক্ষণ ডুবিয়া রাখলে মরে যায়। জলের জেঁক জলে ডুবে থাকলেও মরে না।

সব জোঁকেরই গাটা যতক্ষণ ভিজা থাকে ততক্ষণ বাঁচে। গাটা শুকিয়ে গেলে, আর অনেকক্ষণ জল না পোলে ম'রে যায়। গোড়ার ছবিটা দেখ, ওটা একটা রক্তখেকো মহিষা জোঁকের ছবি। এদের শরীর লম্বা ও চেপ্টা। শরীরে অনেকগুলি গাঁইট বা চাকতির মত খণ্ড আছে। পা নাই। সামনের দিকটা সরু, তারপর শরীরটা ক্রমশঃ চোঁড়া হ'য়ে গেছে।

পিছনের দিকটা খানিকদূর পর্য্যন্ত বেশ মোটা হ'য়ে আবার শেষে সরু হ'য়ে এসেছে। শরীরের শেষ ভাগে একটা ছোট বাটির মত মাংসপিণ্ড আছে। এই



জোঁকের চলা।

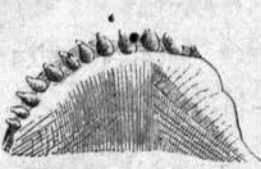
বাটির গোড়ায় একটা গলা বা বোঁটা আছে বলে এই বাটিটা স্পষ্ট দেখা যায়। শরীরের সামনের দিকেও ঐ রকম একটা ছোট বাটি আছে কিন্তু সে বাটিটা শরীরের সঙ্গে সমান, আর তার গলা বা বোঁটা নাই, তাই সেটা তেমন স্পষ্ট বুঝা যায় না। এই ছোট বাটি দিয়ে জোঁক চলা ফিরা করে।

চলবার সময় পিছনের বাটিটা মাটিতে চেপে দেয়। তাতেই তার ভিতরের বাতাস ও জল বাহির হ'য়ে গিয়ে বাটিটা মাটিতে আটকিয়ে যায়। জোঁক তখন তার শরীরটাকে যতদূর পারে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সামনের বাটিটা মাটিতে আটকিয়ে নেয়। তারপরে পিছনের বাটিটা মাটি থেকে আলাগা করে তুলে শরীরটাকে কুঁচকিয়ে সামনের দিকে টেনে, পিছনের বাটিটাকে সামনের বাটির কাছে এগিয়ে নিয়ে মাটিতে

লাগিয়ে দেয়। আবার সামনের বাটিটাকে তুলে শরীরটাকে আরও এগিয়ে দিয়ে

আবার সামনের দিকের মাটি চুষে ধরে। তারপর আবার পিছনের বাটিটা আলগা করে শরীরটাকে টেনে এগিয়ে আনে।

জ্যাক যখন কোন জন্তুর রক্ত খেতে চায়, তখন তার সামনের দিকের ছোট বাটিটা দিয়ে সেই জন্তুর গায়ের চামড়াটা চুষে ধরে। বাটির ভিতরে জ্যাকের মুখ।



মুখের পাশে তিনটা ছোট ছোট কাটা চাকার মত শক্ত চোয়াল আছে। তার ধারে করাতের মত অনেক খাঁজ কাটা থাকে। বাটিটা চেপে দিয়ে চোয়াল তিনটা সেই জন্তুর চামড়ার উপর ঘষলেই চামড়া কেটে যায় আর সেই কাটা জায়গা দিয়ে রক্ত বাহির হয়।

জ্যাকের মুখ দশগুণ বড় করে, আর তার করাতকাটা চোয়াল প্রায় ৫০০ গুণ বড় করে দেখান হয়েছে।

জ্যাক কামড়ালে আমাদের চামড়ায়

ত্রিভুজের মত তিনটা ছোট ছিদ্র হয় অথবা তিন দিকে তিনটা ছোট লম্বা কাটা দাগ হয়।

জন্তুদের গা থেকে রক্ত বেরোলে সেই রক্ত শীঘ্র জমে যায়। তাই জ্যাক তার মুখ থেকে থুতুর মত এক রকম রস বাহির করে সেই কাটা ঘায়ের মুখে ঢেলে দেয়— তাতে রক্ত আর জমতে পারে না, তরল থাকে। তারপর জ্যাক ধীরে ধীরে একটু একটু করে শরীরটাকে লম্বা করতে থাকে, আর সেই কাটা ঘা থেকে রক্ত বাহির হয়ে তার মুখের মধ্যে ঢুকতে থাকে, আর জ্যাকও রক্ত গিলতে থাকে। জ্যাকের পেট



জ্যাক কেটে তার শরীরজোড়া পেট দেখান হয়েছে।

বা উদর, মাথা থেকে গায়ের শেষ পর্যন্ত সর্বশরীর জোড়া। উদরে বা পাকস্থলীতে এগার যোড়া থলে থাকে। শেষের থলিযোড়া খুব লম্বা। এত বড় পেটে অনেক রক্ত ধরে। রক্ত খেয়ে খেয়ে যখন জ্যাকের সমস্ত পেট ভরে যায় আর সমস্ত গা

ফুলে ভারি হয়ে পড়ে, তখন জোঁকটা সেই জন্তুর শরীর থেকে খসে পড়ে যায়। এতটা রক্ত হজম হতে জোঁকের ছয় মাস থেকে এক বৎসর পর্য্যন্ত সময় লাগে। একবার পেট ভরে রক্ত খেলে জোঁক আর এক বৎসর পর্য্যন্ত কিছু খায় না, খাবার দরকারও হয় না। এতদিন পেটের মধ্যে রক্ত থাকলেও সে রক্ত জমে, যায় না। পেটের ভিতর থেকে একরকম রস বাহির হয়, তাতে রক্তকে তরল রাখে। কাটা ঘায়ের মুখে জোঁক তার মুখ দিয়ে রস ঢালে ব'লে জোঁকের কামড়ের রক্ত পড়া শীঘ্র বন্ধ হয় না।

জোঁক যখন কামড়িয়ে ধরে তখন যদি তার মুখে মূন বা মূনের জল, থুথু, চূণ, সরিষার তেল, ছাঁকার জল প্রভৃতি লাগিয়ে দেওয়া যায়, তবে জোঁক তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা পেয়ে তার কামড় ছেড়ে দিয়ে পড়ে যায়। অনেকে বলে যে তামাক-পোড়া ছাই বা সরিষার তেল খুব ক'রে পায়ে মেখে জলে নামলে, জোঁক ধরে না। যতক্ষণ এসব জলে ধুয়ে না যায় ততক্ষণ সুবিধা হতে পারে, কিন্তু একবার ধুয়ে গেলৈ তারপর কোন ফলই হয় না।

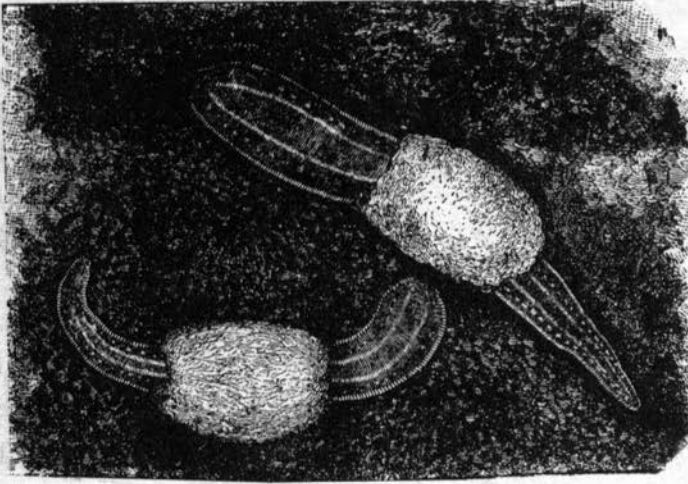
জোঁকের পিছন দিকে যে বাটি আছে তার মধ্যে কোন ছিদ্র নাই, আর তার সঙ্গে মুখ বা উদরের কোন সম্পর্ক নাই। সেদিন “পোকা মাকড়” নামে একখানা পুস্তকে পড়ছিলাম যে জোঁক ছদিক দিয়েই রক্ত চুষে খেতে পারে। একথা বড়ই ভুল। আজ পর্য্যন্ত কেউ কোন জোঁককে পিছন দিক দিয়ে রক্ত খেতে দেখে নি। তোমাদের কেউ যেন এ ভুল ক'রো না।

অনেকের বিশ্বাস, জোঁক কেবল আমাদের গায়ের বদ রক্ত খায়। আমাদের হাতে পায়ে গাঁটে বাত হ'লে, বা অশ্রু কারণে ফুলে বেদনা হ'লে, সেখানে একটা জোঁক লাগিয়ে দেওয়া হয়। জোঁক সেই যায়গার খানিকটা রক্ত খেয়ে ফেললে সেখানে রক্তের চাপ বা টান কম হ'য়ে যায়, তা'তে বেদনা সারে। কিন্তু জোঁক যে কেবল বদ রক্তই খায় তা নয়, ভাল রক্তও খায়।

ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বে ইউরোপে ও আমাদের দেশে ডাক্তারেরা রোগীর রোগ ও ব্যথা সারাবার জন্তু রোগীর গায়ে যখন-তখন জোঁক লাগিয়ে তার রক্ত বার ক'রে দিতেন। আজকাল ঐ সকল রোগ সারাতে সচরাচর আর জোঁক লাগান হয় না। তাই জোঁকের আর সে রকম চল নাই। সেই সময়ে ডাক্তারি কাষে ব্যবহারের জন্তু অনেকে জোঁক পুষে রাখত। এক পণ্ডিত হিসাব

করে দেখেছেন যে ১৮২৫ খৃঃ থেকে ১৮৩০ খৃঃ পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে এক পারিস নগরেই প্রতি বৎসর গড়ে ৬ লক্ষ জোঁক ডাক্তারি কাজে ব্যবহার হ'ত। ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে সেই সময়ে প্রতি বৎসর তিন কোটি জোঁকের দরকার হ'ত।

গ্রীষ্মের শেষে বর্ষার আরম্ভে জোঁকের ডিম পাড়বার সময় হয়। সেই সময়ে তারা পুকুরের পাড়ে কাদায় ঢুকে পড়ে। সেই সময়ে জোঁকের গায়ের মাঝামাঝি



যায়গা থেকে এক

রকম রস বাহির

হয়। সেই রস

শুকিয়ে গিয়ে

গায়ের চারিদিকে

একটা পাংলা

চামড়ার আংটি বা

বেলুট তৈয়ার হয়।

জোঁক সেই চামড়ার

বেড়ের মধ্যে দশটা

থেকে ষোলটা

পর্যন্ত ডিম ছেড়ে

দেয়। পরে শরীর-

টাকে গুটিয়ে কুঁচকিয়ে সেই আংটি থেকে বেরিয়ে আসে। শরীর থেকে

আলগা হ'য়ে পড়লেই আংটির দুই মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তখন সেটা একটা ছোট

কোষ বা থলের মত হ'য়ে যায়। তারপর জোঁক তার উপর আরও থুতু ঢেলে দেয়।

সেই থুতুর রসে মাটি কাদা লেগে শুকিয়ে গেলে কোষটা আরও শক্ত হয়। জোঁক

এই ডিম ভরা কোষটাকে কাদার ভিতর পুঁতে দেয়। তারপর এক মাস কি দেড়

মাস পরে সব ডিম ফুটে ছোট ছোট বাচ্চা বাহির হয়।

তারা জলের নানা রকম ছোট ছোট পোকা, কেঁচো

প্রভৃতির গায়ে লেগে তাদের রস খায়। খেয়ে খেয়ে ক্রমে

বড় হলে, শামুক ব্যাং প্রভৃতির রস আর রক্ত খায়।

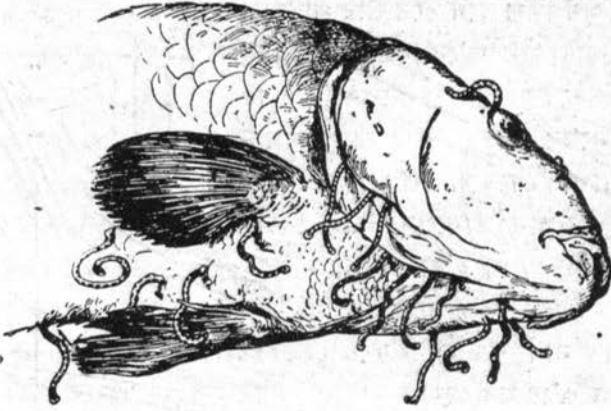
এক বৎসর দেড় বৎসর বয়স না হ'লে জোঁকেরা মানুষের গায়ের রক্ত খেতে পারে-



না। পাঁচ ছয় বৎসর বয়স হ'লে শরীর যতটা বাড়বার তা বাড়ে; তারপর আর বাড়ে না। এই সময়ে তার পূর্ণ বয়স। জোক পনের ষোল বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে।

আমাদের দেশের শ্রোতহীন নদীতে, পুকুরে, বিলে, আর ডোবায়, ঘোড়া, গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি জন্তু যখন জলে মুখ ডুবিয়ে জল খায়, তখন তাদের ঠোঁটে, মুখে, নাকের উপরে অনেক জোক লেগে যায়। আবার কখন কখন তাদের নাকের ছিদ্রের মধ্যেও জোক ঢুকে গিয়ে সেখানে রক্ত খায়।

সকল জাতের জোকের পেটের থলিয়ার সংখ্যা সমান থাকে না। জাতিভেদে সংখ্যায় কম বেশী হয়। সকল জাতের জোকের মুখে চোয়াল বা দাঁত থাকে না।



মাছের গায়ে জোক লেগেছে।

অনেকের মুখে একটা সরু শৃঙের মত নল আছে। তারা সেই শৃঙ বাহির ক'রে মাছ প্রভৃতির গায়ে লাগিয়ে তাদের রস খায়। অনেক জোক আবার সমুদ্রের লোনা জলে থাকে। কোন কোন জাতির গায়ে লোম থাকে, কোন কোন জাতির গায়ে ছোট ছোট উঁচু উঁচু মাংসপিণ্ড থাকে। কোন

জাতের জোক কেবল শামুক গুলি কেঁচো প্রভৃতির রস খায়। কোন কোন জাতের জোক হাঙ্গর আর শঙ্কর মাছের রক্ত খায়। কোন কোন জাতের জোক জলের মধ্যে একটা ক'রে ডিম পাড়ে। কোন কোন জোকের পেটের তলায় একটা চামড়ার ভাঁজ থাকে তারই ভিতর তারা ডিম রাখে। সে ডিম ফুটে বাচ্চা হলে, বাচ্চারা কিছুকাল মার পেটের থলিয়াতেই মার কাছে থাকে; পরে বড় হ'লে মাকে ছেড়ে নিজেরা খাবার সন্ধানে জলে ঘুরে বেড়ায়।

চীনেরা জোকের ঝোল খায়।

বুদ্ধিমান শিষ্য

(জাতকের গল্প)

টোলের যিনি গুরু, তাঁর অনেক শিষ্য। সবাই লেখে, সবাই পড়ে, কেবল একজনের আর কিছুতেই কিছু হয় না। বছরের পর বছর গেল, তার বিদ্যাও হল না, ধৃদ্ধিও খুলল না। সকলেই বলে—“ওটা মূর্খ, ওটা নির্বোধ, ওটার আর হবে কি? ওটা যেমন বোকা, তেমনিই থাকবে।” শেষটায় গুরু পর্য্যন্ত তার আশা ছেড়ে দিলেন। বেচারার কিন্তু একটি গুণ সকলেই স্বীকার করে,—সে প্রাণপণে গুরুর সেবা করতে কখন ক্রটি করে না।

একদিন গুরু শুয়ে আছেন, মূর্খ শিষ্য বসে বসে তাঁর পা টিপে দিচ্ছে। গুরু বলেন, “তুমি ঘুমতে যাবার আগে খাটিয়াটা ঠিক ক’রে দিও। পায়াগুলো অসমান আছে।” শিষ্য উঠবার সময় দেখল, একদিকের পায়াটা একেবারে ভাঙ্গা। এখন উপায়? বেচারী খাটের সেই দিকটা নিজের হাঁটুর উপর রেখে সারারাত জেগে কাটাল। সকালে গুরু ঘুম থেকে উঠে ব্যাপার দেখে অবাক।

গুরুর মনে ভারি দুঃখ হল। তিনি ভাবলেন, আহা বেচারী এমন ক’রে আমার সেবা করে, এর কি কোন রকম বিদ্যা বুদ্ধি হ’বার উপায় নাই? পুঁথি পড়ে বিদ্যালান্ধ সকলের হয় না, কিন্তু দেখে শুনেও ত কত লোকে কত কি শেখে? দেখা যাক, সেই ভাবে একে কিছু শেখান যায় কি না। তিনি শিষ্যকে ডেকে বললেন, “বৎস, এখন থেকে তুমি যেখানেই যাও, ভাল ক’রে সব দেখবে—আর কি দেখলে, কি শুনলে, কি করলে, সব আমাকে এসে বলবে।” শিষ্য বলল, “আজ্ঞে, তা বলব।”

তারপর কিছুদিন যায়, শিষ্য একদিন জঙ্গলে কাঠ আনতে গিয়ে একটা সাপ দেখতে পেল। সে টোলে ফিরে এসে গুরুকে বলল, “আজ একটা সাপ দেখেছি।” গুরু উৎসাহ ক’রে বললেন, “বেশ, বেশ। বলত সাপটা কি রকম?” শিষ্য বললে, “আজ্ঞে, ঠিক যেন লাঙ্গলের ঈষৎ।” শুনে গুরু বেজায় খুসী হ’য়ে বললেন, “হাঁ হাঁ, বেশ বলেছ। অনেকটা লাঙ্গলের ডাঙার মতই ত। সরু, লম্বা, বাঁকা আর কালো মতন। তুমি এমনি ক’রে সব জিনিস মন দিয়ে দেখতে শেখ, আর ভাল ক’রে বর্ণনা করতে শেখ, তা হ’লেই তোমার বুদ্ধি খুলবে।”

শিষ্য ত আহ্লাদে আটখানা। সে ভাবলে, তবে যে লোকে বলে আমার বুদ্ধি নেই। আর একদিন সে বনের মধ্যে গিয়ে ফিরে এসে গুরুকে বলল, “আজ একটা হাতী

দেখলাম”। গুরু বললেন, “হাতীটা কি রকম ?” শিষ্য বললে, “ঠিক যেন লাঙ্গলের ঈষৎ”। গুরু ভাবলেন, “হাতীটাকে লাঙ্গলদণ্ডের মত বলছে কেন ? ও বোধ হয় শৃঙটাকেই ভাল ক’রে দেখেছে। তা ত হবেই,—শৃঙটাই হ’ল হাতীর আসল বিশেষত্ব কিনা। ও শুধু হাতী দেখেছে তা নয়, হাতীর মধ্যে সবচাইতে যেটা দেখবার জিনিস, সেইটাই আরও বিশেষ ক’রে দেখেছে”। সুতরাং তিনি শিষ্যকে খুব উৎসাহ দিয়ে বললেন, “ঠিক, ঠিক, হাতীর শৃঙটা দেখতে কতকটা লাঙ্গলের ঈষের মতই ত”। শিষ্য ভাবলে, গুরুর তাক্ লেগে গেছে—নাজানি আমি কি পণ্ডিত হ’লাম রে !

তারপর শিষ্যরা একদিন গেছে নিমন্ত্রণ খেতে। মূর্খও সঙ্গে গিয়েছে। খেয়ে দেয়ে ফিরে আসতেই গুরু বললেন, “কি ক’রে এলে ?” শিষ্য বললে, “দুধ দিয়ে, দৈ দিয়ে, গুড় মেখে খেলাম”। গুরু বললেন, “বেশ করেছ। বল ত, দৈ দুধ কি রকম ?” শিষ্য একগাল হেসে বলল, “আজ্ঞে, ঠিক যেন লাঙ্গলের ঈষৎ”।

গুরুর ত চক্ষু স্থির ! তিনি বললেন, “ও মূর্খ ! এই বুদ্ধি তোরা বিড়ো ! আমি ভাবছি যে তুই বুদ্ধি বুদ্ধি খাটিয়ে সব জবাব দিচ্ছিস্। তুই লাঙ্গলও দেখেছিস্, দুধ দৈও খেয়েছিস্, তবে কোন্ আক্কেলে বললি যে লাঙ্গলের ঈষের মত ? দূর দূর দূর ! কোন দিন তোরা কিছু হবে না।”

শিষ্য বেচারী হঠাৎ এমন তাড়া খেয়ে একেবারেই দমে গেল। সে মনে মনে বলতে লাগল, “এদের কিছুই বোঝা গেল না। ঐ কথাটাই ত ক’দিন ধ’রে ব’লে আসছি, শুনে রোজই ত খুসী হয়। তাহ’লে আজকে কেন বলছে ‘দূর দূর’ ! ছত্তারি ! এদের কথার কিছু ঠিক নেই।”

ধাঁধা নয়

প্রশ্ন

‘ছুটু’ যদি ‘টুছু’ হয়, ‘নব’ হয় ‘বন’,
‘বাবা’ তবে কি যে হয়, বলত এখন ?

উত্তর

‘কাকা’ ‘মামা’, ‘দাদা’ নিয়ে কর আগে চেষ্টা ;
বাবা পরে কি যে হয় বুঝা যাবে শেষটা।

ত্রিযোগীন্দ্রনাথ সরকার।

ছাতার মালিক

তারা দেড়বিঘ্ন মানুষ।

তাদের আড্ডা ছিল, গ্রাম ছাড়িয়ে, মাঠ ছাড়িয়ে, বনের ধারে, ব্যাং-ছাতার ছায়ার তলায়। ছেলেবেলায় যখন তাদের দাঁত ওঠেনি, তখন থেকে তারা দেখে আসছে, সেই আত্মিকালের ব্যাঙের ছাতা। সে যে কোথাকার কোন্ ব্যাঙের ছাতা, সে খবর কেউ জানে না, কিন্তু সবাই বলে “ব্যাঙের ছাতা।”

যত সব ছুঁছুঁ ছেলে, রাত্রে যারা ঘুমোতে চায়না, মায়ের মুখে ব্যাঙের ছাতার গান শুনে শুনে তাদেরও চোখ বুজে আসে।—

গালফোলা কোলা ব্যাং, পালতোলা রাঙা ছাতা

মেঠো ব্যাং, গেছো ব্যাং, ছেঁড়া ছাতা ভাঙা ছাতা।

সবুজ রং জবরজং জরির ছাতা সোণাব্যাং

টোকা-আঁটা ফোকলা ছাতা কোঁকড়া মাথা কোণাব্যাং ॥

—কত ব্যাঙের কত ছাতা!

কিন্তু, আজ অবধি ব্যাংকে তারা চোখেও দেখেনি। সেখানে, মাঠের মধ্যে ঘাসের মধ্যে, সবুজ সবুজ পাগুলা ফড়িং, থেকে থেকে তুড়ুক করে মাথা ডিঙিয়ে লাফিয়ে যায়; সেখানে, রং-বেরঙের প্রজাপতি, তারা ব্যস্ত হ’য়ে ওড়ে ওড়ে আর বসতে চায়, বসে বসে আর উড়ে পালায়; সেখানে, গাছে গাছে কাঠবেড়ালী সারাটা দিন গাছ মাপে আর জরিপ করে, গাছ বেয়ে ওঠে আর গাছ বেয়ে নামে, আর রোদে বসে গৌফ তাওয়ায় আর হিসেব কষে। কিন্তু, তারাও কেউ ব্যাঙের খবর বলতে পারে না।

গ্রামের যত বুড়োবুড়ী, দিদিমা আর ঠাকুরমা, তাঁরা বলেন, আজও সে ব্যাং মরে নি, তার ছাতার কথা ভোলেনি। যখন ভরা বর্ষায় বাদল নামে, বনবাদাড়ে লোক থাকে না, ব্যাং তখন আপন ছাতায় তলায় ব’সে মেঘের সঙ্গে তর্ক করে। যখন নিশ্চুত রাতে সবাই ঘুমোয়, কেউ দেখে না, তখন ব্যাং এসে তার ছাতার ছাওয়ায় ঠ্যাং ছড়িয়ে বুক ফুলিয়ে তান জুড়ে দেয়, “ছাখ্ ছাখ্ ছাখ্, এখন ছাখ্।” কিন্তু যেদিন সব ছুঁছুঁ ছেলে, জটুলা ক’রে বাদলায় ভিজে দেখতে গেল, কই তারাত কেউ ব্যাং দেখেনি। আর যেবার তারা নিঝুম রাতে ভরসা ক’রে বনের ধারে কাণ পেতেছে, সেবার ত কই গান শোনে নি!

কিন্তু, ছাতা যখন আছে, ব্যাং তখন না এসে যাবে কোথায়? একদিন না একদিন ব্যাং ফিরে আসবেই আসবে,—আর বলবে, “আমার ছাতা কই?” তখন তারা বলবে “এই যে তোমার আঙিকালের নতুন ছাতা,—নিয়ে যাও। আমরা ভাঙিনি, ছিঁড়িনি, নষ্ট করিনি, নোংরা করিনি, খালি ওর ছায়ায় ব’সে গল্প করেছে।”—কিন্তু ব্যাংও আসে না, ছাতাও সরে না, ছায়াও নড়ে না, গল্পও ফুরোয় না।

এমনি করেই দিন কেটে যায়, এমনি করেই বছর ফুরোয়। হঠাৎ একদিন সকাল বেলায় গ্রাম জুড়ে এই রব উঠল, “ব্যাং এসেছে, ব্যাং এসেছে। ছাতা নিতে ব্যাং এসেছে।”

কোথায় ব্যাং? কে দেখেছে? বনের ধারে, ছাতার তলায়; লালু দেখেছে, ফালু দেখেছে, চাঁদা ভোঁদা সবাই দেখেছে। কি করছে ব্যাং? কি রকম ব্যাং? লালু বললে, “পাটুকিলে লাল ব্যাং—যেন হলুদগোলা চুণ। এক চোখ বোজা, এক চোখ খোলা।” ফালু বললে “ছাইয়ের মতন ফ্যাক্সা রং—এক চোখ বোজা এক চোখ খোলা।” চাঁদা বললে, “চক্চকে সবুজ, যেন নতুন কচি ঘাস—এক চোখ বোজা, এক চোখ খোলা।” ভোঁদা বললে, “ভূষো-ভূষো রং, যেন পুরোনো তেঁতুল—এক চোখ বোজা, এক চোখ খোলা।”

গ্রামের যত বড়ো, যত মহা মহা পণ্ডিত, সবাই বললে, “কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। তোরা কি দেখেছিস্ আবার বল।” লালু ফালু চাঁদা ভোঁদা সবাই বললে “ছাতার তলায় জ্যান্ত ব্যাং, তার চার হাত লম্বা লম্বা।” শুনে সবাই মাথা নেড়ে বললেন “উইঁ, উইঁ! তাহ’লে কক্ষনো সেটা ব্যাং নয়, সেটা বোধ হয় ব্যাঙের বাচ্চা ব্যাঙাচি। তা নইলে ল্যাজ থাকবে কেন?”

ব্যাং না হো’ক্, ব্যাঙের ছেলেত বটে—ছেলে না হো’ক নাতি, কিম্বা ভাইপো, কিম্বা ব্যাঙের কেউত বটে। সবাই বললে, “চল চল দেখবি চল, দেখবি চল।” সবাই মিলে দৌড়ে চলল।

মাঠের পারে, বনের ধারে, ব্যাং-ছাতার আগায় ব’সে কে একজন রোদ পোয়াচ্ছে। রংটা যেন শ্যাওলা-ধরা গাছের বাকল, ল্যাজখানা তার ঘাসের উপর ঝুলে পড়েছে, এক চোখ বুজে এক চোখ খুলে একদৃষ্টে সে তাকিয়ে আছে। সবাই তখন চৌচিয় হয়ে, “তুমি কেহে? কিস্তম্? তুমি কোন্ হায়? হু আর ইউ?” শুনে সে ডাইনেও তাকালে না, বাঁয়েও তাকালে না, খালি একবার রং বদলিয়ে খোলা

চোখটা বুজলে আর বোজা চোখটা খুললে, আর চিড়িক্ ক'রে এক হাত লম্বা জিভ বার ক'রেই তক্ষুনি আবার গুটিয়ে নিলে।

গ্রামের যে হোমরা বুড়ো, সে বললে “মোড়ল ভাই, ওটা যে জবাব দেয় না? কালো নাকি?” মোড়ল বললে “হবেও বা।” সর্দার খুড়ো সাহস ক'রে বললে, “চলনা ভাই এগিয়ে যাই, কাণের কাছে চেষ্টিয়ে বলি।” মোড়ল বললে “ঠিক বলেছ।” হোমরা বললে “তোমরা এগোও। আমি এই আঁকশি নিয়ে ঐ ঝোপের মধ্যে উচিয়ে বসি। যদি কিছু করতে আসে, ঘ্যাচাৎ ক'রে কুপিয়ে দেব।”

তখন সর্দার সেই ছাতার উপর উঠে ল্যাজওয়ালাটার কাণের কাছে হঠাৎ “কোন হা—া—য়” ব'লে এমনি জোরে হাঁকড়ে উঠল যে সেটা আরেকটু হ'লেই ছাতার থেকে প'ড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু অনেক কষ্টে সামলে গিয়ে, খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে, হুচোখ তাকিয়ে বললে, “উঃ! অত চেষ্টান কেন মশাই? আমি কি কালো?” তখন সর্দার নরম হ'য়ে বললে, “তবে যে জবাব দিচ্ছিলে না?” ল্যাজওয়ালা বললে “দেখছেন না, মাছি খাচ্ছিলাম? কি বলতে চাচ্ছেন বলুন না?”

সর্দার তখন খতমত খেয়ে আমতা আমতা ক'রে বললে, “বলছিলাম কি, তুমি কি ব্যাঙের ছেলে, না ব্যাঙের নাতি, না ব্যাঙের—” ল্যাজওয়ালা তখন বেজায় চটে গিয়ে বললে, “আপনি কি আরম্মুলার পিশে? আপনি কি চামুচিকের খোকা?” সর্দার বললে, “আহা, রাগ করছ কেন?” সে বললে “আপনি আমায় ব্যাং ব্যাং করছেন কেন?” সর্দার বললে “তুমি কি ব্যাঙের কেউ হওনা?” জন্তুটা তখন “না—না—না—না—কেউনা-কেউনা-কেউনা” ব'লে দুই চোখ বুজে ভয়ানক রকম ছলতে লাগল।

তাইনা দেখে সর্দার বুড়ো চীৎকার ক'রে বললে, “তবে যে তুমি ছাতা নিতে এয়েছ?” সঙ্গে সঙ্গে সবাই চেষ্টাতে লাগল, “নেমে এসো, নেমে এসো,—শীগগির নেমে এসো।” মোড়ল খুড়ো ছুটে গিয়ে প্রাণপণে তার ল্যাজটা ধ'রে টানতে লাগল। আর হোমরা বুড়ো ঝোপের মধ্যে থেকে আঁকশিটাকে উচিয়ে তুলল। ল্যাজওয়ালা বিরক্ত হ'য়ে বললে, “কি আপদ! মশাই, স্নাজ ধ'রে টানেন কেন? ছিঁড়ে যাবে যে।” সর্দার বললে, “তুমি কেন ব্যাঙের ছাতায় চড়েছ? আর পা দিয়ে ছাতা মাড়াচ্ছ?” জন্তুটা তখন আকাশের দিকে গোল, গোল চোখ ক'রে অনেকক্ষণ তাকিয়ে বসে, “কি বল্লেন? কিসের কি?” সর্দার বললে “বললাম যে ব্যাঙের ছাতা।”

যেমনি বলা, অমনি সে খ্যাক্ খ্যাক্ খ্যাক্ খ্যাক্ খ্যাক্ খ্যাক্ ক'রে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে একেবারে মাটির উপর গড়িয়ে পড়ল। তার গায়ে লাল নীল হলদে সবুজ রামধনুর মত অদ্ভুত রং খুলতে লাগল। সবাই ব্যস্ত হ'য়ে দৌড়ে এল, “কি হ'য়েছে? কি হ'য়েছে?” কেউ বললে, “জল দাও,” কেউ বললে “বাতাস কর।” অনেকক্ষণ পর জন্তুটা ঠাণ্ডা হ'য়ে, উঠে বললে “ব্যাঙের আবার ছাতা কি হে? ওটা বুঝি ব্যাঙের ছাতা হ'ল? যেমন বুদ্ধি তোমাদের! ওটা ছাতাও নয় ব্যাঙেরও কিছু নয়। যারা বোকা, তারা বলে ব্যাঙের ছাতা।” শুনে কেউ কোন কথা বলতে পারলে না, সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। শেষকালে ছোকরামত একজন জিজ্ঞাসা করলে “আপনি কে মশায়?” ল্যাজওয়ালা বললে “আমি বহুরূপী—আমি গিরিগিটির খুড়তুত ভাই, গোসাপের জাতি। এটা এখন আমার হ'ল—আমি বাড়ী নিয়ে খাব।”

এই ব'লে সে “ব্যাঙের ছাতা”টাকে বগলদাবাই ক'রে নিয়ে গম্ভীরভাবে চলে গেল। আর সবাই মিলে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল।

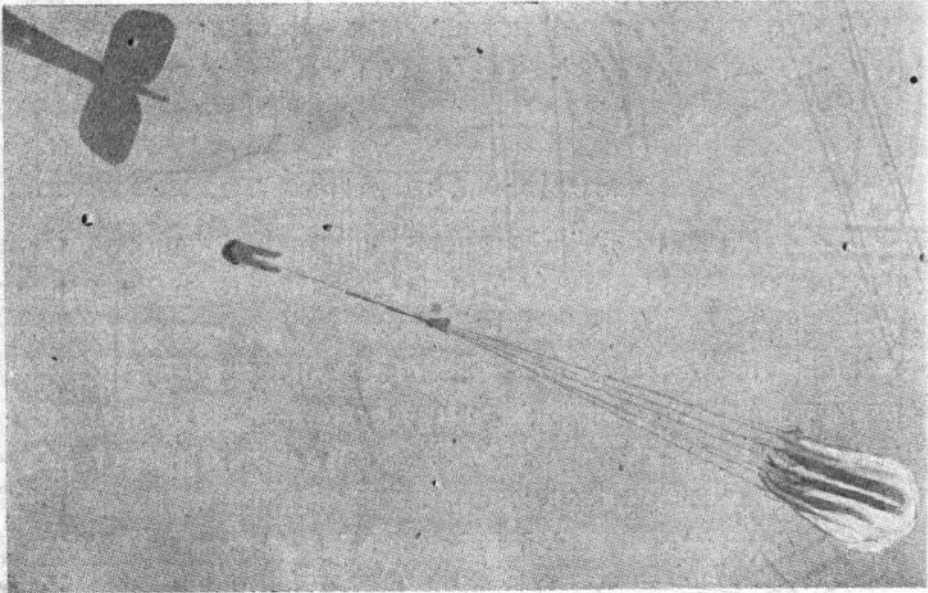
আকাশ-পথের বিপদ

“জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ”। মানুষের যখন পাঁলাবার পথ থাকে না, তখন লোকে এই রকম বলে। কিন্তু আজকালকার লোকে আকাশ দিয়েও পালাতে জানে। তা ব'লে সেইখানটাই কি মানুষের পক্ষে নিরাপদ? যুদ্ধের সময়ে সেটা যে খুব সুবিধার জায়গা নয়, তা তোমরা জান,—কিন্তু অশ্রু সময়ে? জলের জন্তু অনেক আছে যাদের ভয়ে মানুষ পালায়; ডাঙ্গায়ও তেমন শত্রুর অভাব নাই। কিন্তু আকাশের পাখিকেও কি মানুষের ভয় ক'রে চলা দরকার? মাঝে মাঝে দরকার বই কি! বছর ছয়েক আগে আল্প্‌স্‌ পাহাড়ের কাছে এক সাহেব এরোপ্লেন ক'রে অনেক উঁচুতে উড়ছিলেন। পরিস্কার দিন, ঝড় বাতাসের চিহ্নও নাই, কোথাও ভয়ের কোন কারণ দেখা যায় না। এর মধ্যে হঠাৎ কলের ভীষণ ভন্ডভন্ড শব্দের উপর, চিলের চীংকারের মত একটা কর্কশ শব্দ শোনা গেল—আর সেই সঙ্গে প্রকাণ্ড এক ঈগল পাখী সাহেবের মুখের উপর ডানার সাপ্টা লাগিয়ে দুই পায়ের নখ দিয়ে তার মাংস ছিঁড়ে নেবার জোগাড় ক'রে তুলল! একবার নয় দুবার নয়, পাঁচ সাতবার ঘুরে ঘুরে

সে সাহেবকে তার রাগখানা জানিয়ে গেছিল।* সাহেবের গায়ের জামা থেকে সে বেশ দুই এক খাবল কাপড়ও তুলে নিয়েছিল, গায়েও যে দুচারটা আঁচড় লাগায়নি, এমন নয়।

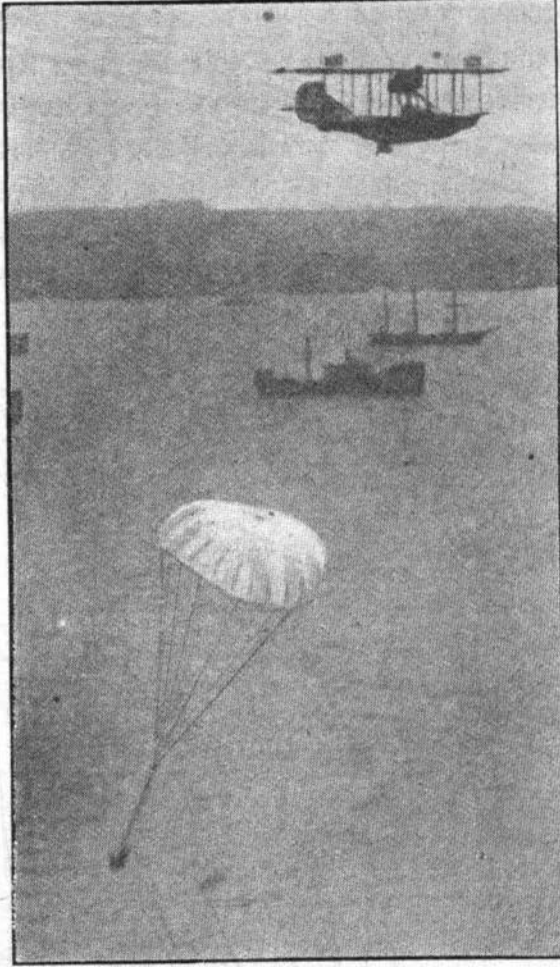
তারা আলিস্ পাহাড়ের রাজবংশী ঈগল, যুগের পর যুগ আকাশের মেঘের উপর সকলের চোঁইতে উচু নীল ময়দানের হাওয়া এতদিন তারাই কেবল খেয়ে আসছে। সেখানে আর কোন পাখীরও যাওয়ার সাধ্য নাই। কাজেই পৃথিবীর মানুষকে অতটা দূর স্পর্ধা করতে দেখে তার ত রাগ হবারই কথা।

যুদ্ধের সময়ে কেউ কেউ প্রস্তাব ক'রেছিলেন যে, দলে দলে ঈগলপাখী পুষে শত্রুর এরোপ্লেনের উপর ছেড়ে দিলে মন্দ হয় না। সে রকমের পরীক্ষাও নাকি করা হ'য়েছিল। যারা এরোপ্লেন চালায় তাদের চোখে মস্ত গোল চশমা থাকে।



কোণে এরোপ্লেনের ল্যান্ডটুকু দেখা যাচ্ছে। তার নীচেই লোকটাকে দেখ, সোসবেমাত্র প্যারাহুট নিয়ে লাক দিয়েছে। মানুষ উপরে, প্যারাহুট নীচে। যতক্ষণ ছাতাটা ভাল ক'রে না খুলছে, ততক্ষণ অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ! বেচারা ভীষণ বেগে নামছে, আর ভাবছে কতক্ষণে প্যারাহুট খুলবে।

ঐ রকম চশমাধারী মূর্তি গ'ড়ে, যদি তার উপর ঈগল পাখীকে রোখ করতে শেখান



যায়, তা হ'লেই সময় বুঝে তাকে কোন এরোপ্লেনের উপর লেলিয়ে দিলেই চলবে। কিন্তু একবার ছাড়া পেলে পর সে শত্রু মিত্র চিনবে কি করে, সেটাই হ'চ্ছে ভাববার কথা।

আকাশের পথে কোন বিপদ উপস্থিত হ'লে সব চাইতে মুঞ্চিল এই যে, চট্ ক'রে কোথাও পালাবার পথ থাকে না। শূন্যে উঠে দু তিন মাইল উচুতে উড়তে উড়তে হঠাৎ যদি বেলুন বা এরোপ্লেনে আগুন ধ'রে যায়, তখন যে চট্ ক'রে ডাঙ্গায় নামবে তার আর উপায় থাকে না। জাহাজ হ'লেও না হয় জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়া যায়, হাঙ্কা শোলার কোমরবন্ধ এঁটে কোন রকমে সঁতার কেটে পালান যায়। জাহাজ ডুবলেও 'লাইফ-বোট' ভাসিয়ে প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু আকাশযাত্রীর উপায় কি?

বড় বড় বেলুন যখন

প্যারাসুটের ছাতা খুলেছে। এখন পড়বার বেগ কমে গিয়েছে, হ'সিয়ার আকাশে ওঠে, তখন অনেক হ'লে নামতে পারলে আর হাত পা ভাঙ্গবার ভয় নেই।

সময়ে তার গায়ে, গোটান

ছাতার মত একটা প্রকাণ্ড জিনিষ ঝোলান থাকে—সেটাকে বলে প্যারাসুট।

হঠাৎ বিপদে পড়লে, বা চট করে নামবার দরকার হ'লে বেলুনবাজ তার কোমরে প্যারাসুটের দড়ি জড়িয়ে বেলুন থেকে লাফ দিয়ে পড়বে। অমনি ছাতাটা খুলে গিয়ে, প্রকাণ্ড গোল হ'য়ে ফুলে উঠবে, আর তাতেই পড়বার চোট সামলিয়ে যাবে। কিন্তু এরোপ্লেন থেকে সেরকম ছাতা ঝোলান সম্ভব নয়; তাতে চলবার বাধা হয়, আর ছাতার দড়িদড়া ফোঁথাও কলকজায় আটকে গেলে, সেও এক সাংঘাতিক বিপদ। তাই আজকাল এরোপ্লেনে ব্যবহারের জন্য নূতন রকম প্যারাসুট তৈরী হ'য়েছে। সেটাকে পোষাকের মত ক'রে পরতে হয়। ছাতাটাকে চমৎকারভাবে কলে পাট্ ক'রে ফিতে দিয়ে কোমরের সঙ্গে বাঁধে। ফিতেগুলোও আবার কত রকম কায়দা-মাফিক ভাঁজ ক'রে ক'রে গুটিয়ে রাখতে হয়। তারপর দরকারের সময় হাত পা মেলে লাফ দিলেই হ'ল। কাজটা শুনতে যেমন সহজ হয়, আসলে যে সে রকম নয়, তা শূন্ততোলা ফটো ছুখানি দেখলেই বুঝতে পারবে।

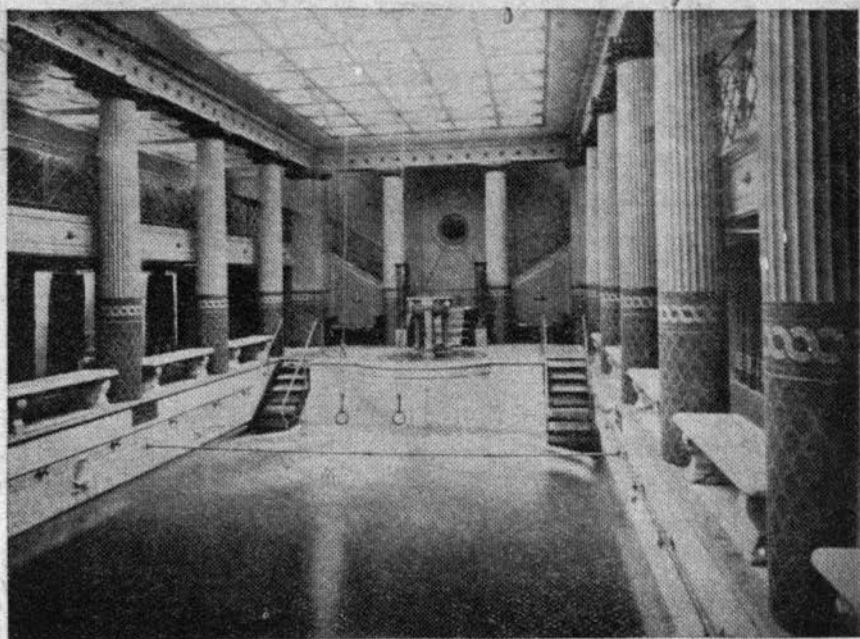
ভারি সুবিধা !

পাঠশালেতে
যেদিন পড়া শুরু
সেদিন থেকে দাঁতুর কাণে
নেজর দিলেন গুরু।
টানের চোটে
বাড়লো ক্রমে বেশ
তাতেই কিন্তু দাঁতুর এখন
মজাটি একশেষ।
রাত্তিরে খুব
ঠাণ্ডা যেদিন থাকে,

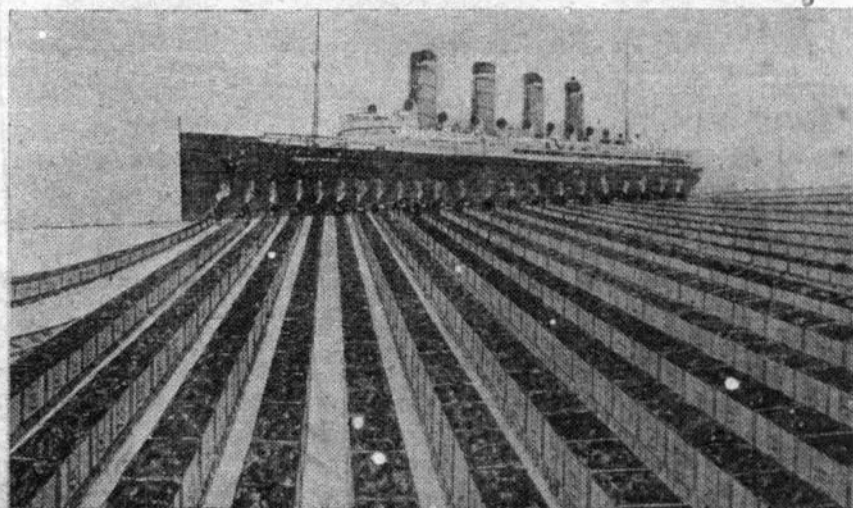
কাণটি টেনে লেপের মত
অঙ্গটি তার ঢাকে।
মেঘের দিনে
বৃষ্টি বাদল হলে,
ছাতার মত মাথার উপর
কাণটি রাখে তুলে।
রোদে যখন
আর সকলে কাবু,
পাখার মত কাণের হাওয়া
খান বসে বাবু।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার।

চৈত্রের সন্দেশ যন্ত্রস্থ। ১৬ই বৈশাখের মধ্যে না পাইলে সন্দেশ আফিসে জানাইবেন। যাঁহারা আগামী বৎসরও “সন্দেশ” চালাইবার জন্য আশ্রয়াদিগকে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়াছেন, এবং নানারকমে সাহায্য করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। বৈশাখের নূতন সন্দেশ সোমবার ২৭শে বৈশাখ সন্দেশ আফিসে পাওয়া যাইবে।



জাহাজের সঁতার ঘর



একটি জাহাজের এক সপ্তাহের কয়লা খোরাক



• জাহাজের হোটেল

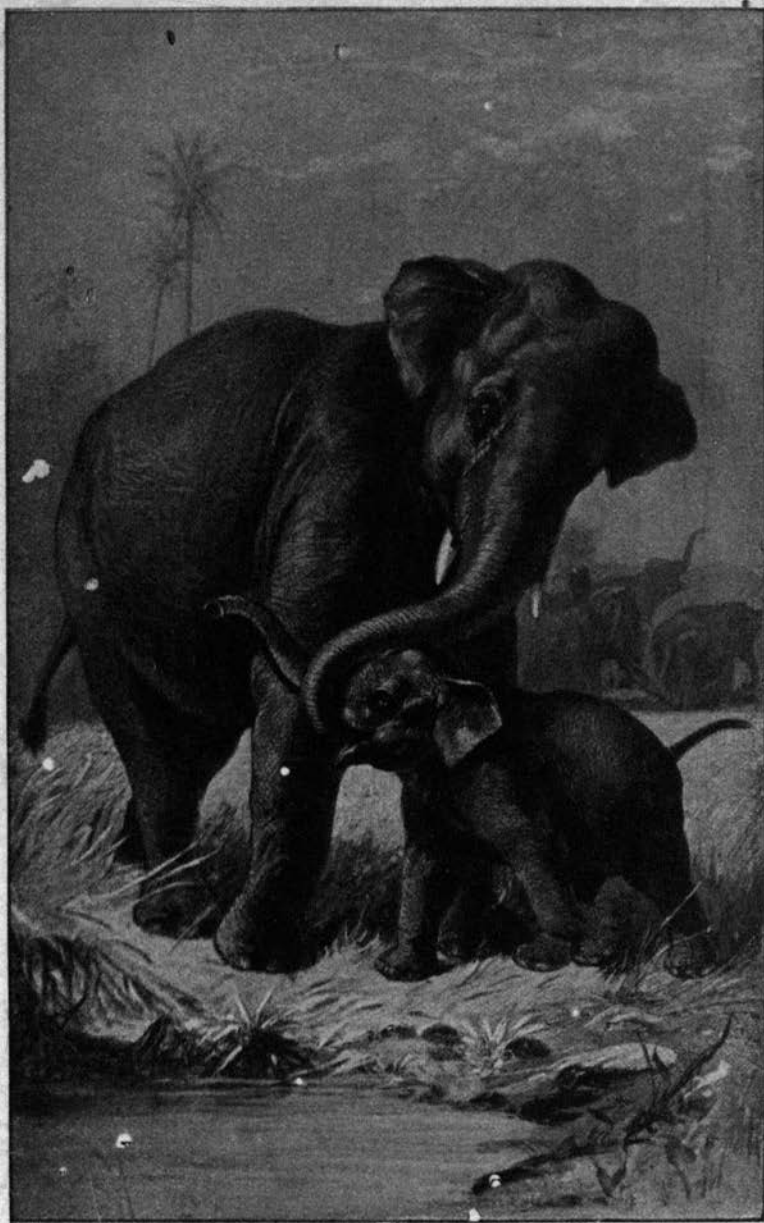
অতিকায় জাহাজ

সৌখিন ধনীদেবের জাহাজ আর বড় বড় ব্যবসায়ীদের জাহাজ যে সমস্ত জাহাজ অভিজাতিক মহাসাগরের খেয়া পারাপার করে, তেমন বড় জাহাজ পৃথিবীর আর কোথাও নাই। কি ক'রে খুব তাড়াতাড়ি সাগর পার করা যায় আর আয়ামে পার করা যায়, আর একসঙ্গে অনেক লোককে বিনা কষ্টে পার করা যায়, তার জাহাজ বড় বড় জাহাজ-কোম্পানিদের মধ্যে রেবারেচি চলে। এক একটা জাহাজ ত নয়, যেন এক একটা সহর, রাজা রাজড়ার থাকবার মত সহর। তারই খুব বড় দু একটির নমুনা দেওয়া হ'য়েছে।

জাহাজের সাতার ঘরটি দেখ। মধ্যকার চৌবাচ্চাটি হ'চ্ছে ২২ গজ লম্বা আর ১৮ গজ চওড়া। এ ছাড়া নানারকম স্নানের ঘর, তুর্কী হামাম, কোয়ারা স্নান প্রভৃতির আলাদা বন্দোবস্ত আছে। ১২তলা জাহাজ, তার মাঝিমাল্লা যাত্রী সব নিয়ে লোকসংখ্যা ৫০০০ হবে। পাঁচটি জাহাজ লম্বালম্বি সার বৈধে দাঁড়ালে এক মহিল পথ জুড়ে বসবে।

একটি জাহাজের এক সপ্তাহের খোরাক হ'ল ২২টা ট্রেন বোঝাই কয়লা—এক একটা ট্রেনে সাড়ে আট হাজার মণ। জাহাজের মানুষগুলোর খোরাকের হিসাবটিও বড় কম নয়। এক এক যাত্রায় পশুমাংস ৭০০ মণ, পাখীর মাংস ১৫০ মণ, মাছ, ১২৫ মণ, ডিম ৪৮,০০০, আলু ১৬০০ মণ, তরিতরকারি ৪০০ মণ, টিনের সব্জি ৬০০০ টিন আর কাফি ও চা ৯০ মণ লাগে। তা ছাড়া, ফল দুধ কোকো চকোলেট ইত্যাদিও সেই রকম পরিমাণে।

জাহাজের মধ্যে বড় বড় খানার চা-ঘর ইত্যাদি অনেকগুলি ত আছেই, তাছাড়া নানারকম হোটেল সুরাইয়ের অভাব নেই। ধোপা, নাপিত, ডাক্তার, ফুলের দোকান, ছবির দোকান, মিঠাইয়ের দোকান, প্রকাণ্ড থিয়েটার ও নাচঘর এসবও জাহাজের মধ্যেই পাবে। উঠবার জাহাজ লিফট বা চলতি ঘর। ইচ্ছা করলে আর টাকা থাকলে, সেখানে খাদ্য বাড়া-ভাড়ার মত করেও থাকা যায়—একবারের (অর্থাৎ ৫ দিনের) বাড়ী ভাড়া, ধর ১৫,০০০। এক একটি জাহাজ করতে খরচ হয় আর দু তিন কোটি টাকা।



আত্মরে ছেলে



সপ্তম বর্ষ

চৈত্র, ১৩২৬

১২শ সংখ্যা

মনের মতন

কান্না হাসির পৌঁটলা বেঁধে, বর্ষভরা পুঁজি,
বৃদ্ধ বছর উধাও হ'ল ভূতের মূলুক শুঁজি।

নূতন বছর এগিয়ে এসে হাত পাতে ঐ দ্বারে,
বল দেখি মন, মনের মতন কি দিবি তুই তারে?

আর কি দিব?—মুখের হাসি, ভরসাভরা প্রাণ,
সুখের মাঝে দুখের মাঝে আনন্দময় গান।

আলো ছায়া।

সূর্যের আলো দেখার পর থেকে ছায়া যেন কি এক রকম হয়ে গিয়েছিল। সূর্যের আলো তার সমস্ত গায়ে যেন জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল। সে কথা মনে করলেই তার সর্বদা শিউরে উঠত। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ত সেই সুন্দর ছেলেটির কথা, যাকে সে সান্নারাত বসে বসে আগলে ছিল, আর যে দিনের আলো দেখবামাত্রই তাকে ফেলে চলে গেল। সে কথা মনে করলেই ছায়ার কান্না আসত। সে রাত-দিন এই সব কথাই ভাবত, বাইরে পালিয়ে যাবার উৎসাহ তার আর ছিল না। কিন্তু বেচারীর আঁধার ঘরের আশ্রয়ও বেশীদিন রইল না।

রাণীর অসুখ বাড়তে বাড়তে তিনি শেষে একেবারে পাগল হয়ে গেলেন। আলোককুমারের ঘর থেকে বেরিয়েই হঠাৎ তাঁর ছায়ার কথা মনে হয়ে গেল,—তাই ত, ঐ মেয়েটাকে আর বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ান কেন? বাইরের আলোয় ফেলে দিলেই ত হয়, রোদের ঝাঁঝে ছটফট করে মরে যাবে, সে বেশ মজা হবে। ছপুর বেলা ছায়া যখন ঘুমচ্ছিল, তখন ছ সাত জন লোক মিলে রাণীর কথামত তাকে গুহার বাইরে বয়ে নিয়ে এল। তারপর প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে মাঠ পার হ'য়ে অনেকদূরে বনের কাছাকাছি একটা জায়গায় তারা ছায়াকে ফেলে দিয়ে এল। ছায়া অত আলোর মধ্যে এসে পড়ে হঠাৎ ধড়ফড় করে উঠে বসল, কিন্তু তখনই আবার ভয়ে চোখ বুজে মাটিতে শুয়ে পড়ল। রাণী নিজের ছাদ থেকে ব্যাপার দেখে বেজায় খুসি হয়ে বলে উঠলেন, “এইবার বেশ হয়েছে, এখনি ওটা পুড়ে মরবে।”

বন থেকে একটা প্রকাণ্ড বুনো মহিষ বেরিয়ে এসে ছায়াকে দেখেই তার দিকে ছুটে এল। রাণী ভাবলেন এইবার মেয়েটার ঠিক দফা নিকেষ হবে। কিন্তু মহিষটা ঘুরে ফিরে ছায়াকে শুঁকে হঠাৎ লেজ তুলে উল্লসাসে ছুটে পালিয়ে গেল। রাণী বেজায় চটে নীচে চলে গেলেন।

ছায়া উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে রইল। তার চুলের রাশ তার মুখের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে অনেকটা আলো আটকিয়ে রাখছিল। একবার চোখ খুলে তার মনে হল, আলো যেন একটু একটু কমছে, কাজেই সে ঘাসের উপর মুখ দিয়ে যেমন পড়েছিল, তেমনই পড়ে রইল। রাণী আর একবার ছাদে উঠে ছায়াকে অমন করে পড়ে থাকতে দেখে ভাবলেন “যাক, আপদ গেছে, এতক্ষণে মেয়েটা নিশ্চয় মরেছে। এইবার দেখা যাক ছেলেটা কি করছে।”

ছেলেটার খোঁজ নিতে গিয়ে তিনি তাকে এমন আলিয়ে তুললেন যে, আলোক-কুমার ঠিক করলে এবার সে নিশ্চয় পালিয়ে যাবে। কাজেই রাণী ঘর থেকে বেরবামাত্র সে নিজের অস্ত্রশস্ত্র আর এক পুঁটুলি খাবার নিয়ে এক ছুটে বেরিয়ে পড়ল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে।

কিন্তু তার বেশী দূর যাবার ক্ষমতা ছিল না,—একে অসুখ, তাতে আঁধারের ভয়। মাঠের মাঝখানে একজায়গায় বসে পড়ে সে ভাবতে লাগল যে এখন কি করা যায়। বসে বসে কখন তার ঘুম এসে গেল, ঘাসের উপর শুয়ে পড়ে সে ঘুমতে লাগল। খানিক পরে চোখ চেয়ে দেখে, ওমা একি, সেই সুন্দর মেয়েটি আবার এসে তার মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে। সে আনন্দে চীৎকার করে বলে উঠল “জলের দেবি, তুমি আবার ফিরে এসেছ?”

ছায়া বললে “আমি ত জলের দেবী না, আমি আঁধার গুহায় থাকি, আলোতে এলে আমার ভারি ভয় করে।”

আলোককুমার বললে “হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে, সেবার তুমি আলো দেখে ভয় পেয়েছিল বটে। আমি সেবার তোমায় অমন ক'রে ফেলে পালিয়েছিলাম বলে তুমি আমার উপর রাগ করেছ? তুমি রাগ কোরো না। এবার আমি তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাব।”

গল্প করতে করতে দুজনেই জান্তে পারল যে রাণী তাদের উপর কি রকম অত্যাচার করছেন। তখন তারা ঠিক করল যে দুজনে রাণীর রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে। আলোককুমার বললে “সূর্য্য উঠবামাত্রই আমরা বেরিয়ে পড়ব, আর কখন এ রাজ্যে ফিবে আসব না।” ছায়া বললে “না, না, চল এখুনি যাই, সূর্য্য উঠলে আমি আর হাঁটতে পারব না, মরে যাব।”

আলোককুমার বললে “কিন্তু আঁধারে যে কিছু দেখা যায় না, বাঘ ভালুক যদি হটাৎ আমাদের গায়ে বাঁপিয়ে পড়ে তা হলে আমি তাদের দেখতেও পাব না, মারতেও পারব না।”

ছায়া বললে “আমি আঁধারে সব দেখতে পাই, আমি তোমার হাত ধরে নিয়ে যাব। বাঘ ভালুক এলে আমি অনেক দূর থেকে গন্ধে তা টের পাব, আমি তোমাকে বাঁচিয়ে চলব।”

আলোককুমার আর কি করে, ছায়ার হাত ধরে চলতে আরম্ভ করল। কিন্তু

রাত শেষ হতে তখন খুব কমই বাকি ছিল, খানিকক্ষণ হাঁটবার পরেই পূর্বের আকাশ রাঙা হয়ে উঠল। ছায়া অমনি ভয় পেয়ে কেবলি চোখে হাতের আড়াল দিতে লাগল, আর আলোককুমার মনের আনন্দে ভয় ডর সব ভুলে গিয়ে খুব গটু গটু করে চলতে লাগল।

সূর্য্যটা ঋন্ত আগুনের গোলার মত টপ করে আকাশের গায়ে লাফিয়ে উঠল, অমনি ছায়া আলোককুমারের হাত ছেড়ে দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বলে উঠল, “আমি আর চলতে পারছি না। যাও, তুমি এখন একলা চলে যাও।”

আলোককুমার কিন্তু এবার তাকে ফেলে পালাল না। সে ছায়াকে মাটির থেকে তুলে বললে “না, আমি আর কোনদিন তোমাকে ফেলে যাব না। তুমি রাত্রিতে আমাকে যেমন রক্ষা করেছ, আমি দিনে তোমাকে তেমনি রক্ষা করব। তোমার কোনো ভয় নেই, আমি তোমাকে ঠিক নিয়ে যাব।” এই বলে সে ছায়াকে নিয়ে চলতে আরম্ভ করলে।



এদিকে ভোর হতেই রাণী ছাদে গিয়ে উঠেছেন, দেখতে ত হবে হতভাগা ছেলেরা

আঁর মেয়েটা মরেছে কি না। দেখেন কি, মরা ত কোথায় যাক, ছোটোয় মিলে মনের আনন্দে ঐ অনেক দূরে মাঠ পার হয়ে চলেছে। রাণীর মাথায় যেন আগুন ধরে গেল, তিনি প্রকাণ্ড একটা বর্ষা নিয়ে ঝড়ের মত তাদের দিকে ছুটে চললেন, তাঁর কালো চুলের রাশ খুলে তাঁর চারদিকে উড়তে লাগল।

আলোককুমার চলতে চলতে হটাৎ একটা শব্দ শুনে ফিরে তাকাল। দেখল, কি একটা কালো মতন তাদের দিকে ছুটে আসছে। ছায়াকে একটা গাছ তলায় বসিয়ে সে বললে “তুমি একটু বোসো, একটা কি জানোয়ার আমাদের দিকে ছুটে আসছে। আমি সেটাকে মেরে এখুনি ফিরে আসছি।

আলোককুমার ধনুকে তীর জুড়ে ফিরে দাঁড়াল, আর দেখতে দেখতে তীর ছুটে গিয়ে ছুঁচুরাণীর বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। সে সেইখানে টিপ করে গড়িয়ে পড়ে গেল। আলোককুমার ছুটে তার কাছে গিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়েই চীৎকার করে বলে উঠল “আমি জানোয়ার ভেবে রাণীকে মেরে ফেলেছি, শীগ্গির দেখো এসে।” ছায়া কিন্তু দেখতে চাইল না, সে যেখানে চোখ বুজে বসেছিল, সেইখানে বসেই কাঁদতে লাগল।

ছুঁচুরাণীই যদি মরে গেল, তা হলে আর তার পালাবার কি দরকার? আলোককুমার আবার ছায়াকে নিয়ে ফিরে চলল। রাজপ্রাসাদে খবর পৌঁছতেই মহা গোলমাল লেগে গেল। এক দল লোক ছুটল রাণীর সংকার কর্তে, কিন্তু গিয়ে দেখে বাঘ ভালুকে খেয়ে তাকে শেষ করে ফেলেছে।

তখন রাজ্যের সব লোক মিলে আলোককুমারকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে দিলে। আর ছায়া হ’ল রাণী।

প্রথম প্রথম তাদের সুন্দরী রাণীকে দিনের বেলায় দেখতে না পেয়ে রাজ্যের লোক ভারি দুঃখ করত। কাজেকাজেই রাজা রাণীকে অল্ল অল্ল করে আলো সওয়াতে লাগলেন, আর তিনিও রাত্রে রাণীর সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়িয়ে আঁধারের ভয় ভুলতে লাগলেন। এমনি করে রাজারাণী দুজনেরই ভয় ঘুচে গেল। তখন তাঁরা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে লাগলেন।

শ্রীমতী দেবী।

উপরিচরের অধঃপতন

(মহাভারত)

পূর্বকালে একদিন দেবতা ও মুনিগণের মধ্যে ভারি তর্ক উপস্থিত হইল—পশু বলি দিয়া যজ্ঞ করা উচিত কিনা। যজ্ঞে যাহা উৎসর্গ করা হয়, দেবতারা তাহার অংশ পাইয়া থাকেন, আর তাঁহাদের লোভটাও কিছু বেশী। তাঁহারা বলিলেন—“ছাগ বলি দিয়া যজ্ঞ করাই উচিত, কারণ শাস্ত্রমতে ছাগপশুকেই ‘অজ’ বলে।” মুনি ঠাকুরেরা বলিলেন—“বেদে বলা হইয়াছে, ধাত্ত ও শস্ত্রবীজের দ্বারাই যজ্ঞ করিবে। বীজের নামই অজ ; সুতরাং যজ্ঞে ছাগ বা পশু বলি দেওয়া কখনই উচিত নয়। যে ধর্ম্মে পশুবলি দেওয়া হয়, সে ধর্ম্ম কখনও সাধু লোকের ধর্ম্ম হইতে পারে না।”

কিছুতেই তর্কের মীমাংসা হইতেছে না, এমন সময় দেখা গেল মহারাজ উপরিচর স্বর্গ হইতে আকাশপথে সেই দিকে আসিতেছেন। উপরিচর পূর্বে চন্দ্রবংশের মহা ক্ষমতাশালী, পরম সাধু এবং বিযুভক্ত রাজা ছিলেন, তখন তাঁহার নাম ছিল ‘বসু’। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত তাঁহার বন্ধুতা ছিল। ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ‘বৈজয়ন্তী মালা’ ও একখানি আকাশগামী রথ দিয়াছিলেন। সেই রথে রাজা বসু প্রায়ই উপরে (অর্থাৎ আকাশে) চলা ফিরা করিতেন, তাই তাঁহার নাম হইয়াছিল ‘উপরিচর’।

উপরিচর অনেককাল পৃথিবী পালন করিয়া মৃত্যুর পর স্বর্গে গেলেন। স্বর্গে গিয়াও তিনি পূর্বের অভ্যাস ছাড়িতে পারেন নাই; প্রায়ই তিনি আকাশপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

রাজা উপরিচরকে আসিতে দেখিয়া মুনি ঠাকুরেরা বলিলেন—“ভালই হইল, এই মহাত্মাই আমাদের তর্কের মীমাংসা করিবেন। এই রাজা সারাজীবন ধরিয়া যাগ যজ্ঞ অনেক করিয়াছেন; ইনি পরম সাধু, পরম দাতা, এবং সকল বিষয়ে সকলের অগ্রণী। ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সত্য কথা জানা যাইবে।”

দেবতা ও ঋষিগণ এইরূপ পরামর্শ করিয়া রাজা উপরিচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“মহারাজ! তোমার নিকট আমরা একটা প্রশ্নের মীমাংসা চাই—ছাগ ও বীজ এই দুইএর মধ্যে কোনটি দিয়া যজ্ঞ করা উচিত? এই বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে তর্ক হইয়াছে। এখন তুমি যাহা বলিবে তাহাই আমরা প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইব।”

তখন রাজা উপরিচর বলিলেন—“আপনাদিগের মধ্যে কাহার বিরূপ মত আগে সেটা বলুন।” মুনিঠাকুরেরা বলিলেন—“দেবতারা বলিতেছেন, যজ্ঞে ছাগপশু বলি দেওয়াই বিধি। কিন্তু আমরা বলিতেছি, বীজ ও ধান দিয়াই যজ্ঞ করা উচিত। এখন আপনার কি মত, বলুন।”

উপরিচর নিজের কোন যজ্ঞে কখন প্রাণিহত্যা করিতে দেন নাই, তিনি জানিতেন,



যে যজ্ঞে পশু বলি দেওয়া হয় সে যজ্ঞ অতি নিকৃষ্ট। তবু দেবতা দেব খুসী করিবার জন্য তিনি বলিলেন—“ছাগপশু বলি দিয়া যজ্ঞ করাই ঠিক।” এই কথা শুনিয়া সেই মহাতেজস্বী ঋষিদের রাগ দেখে কে! তাঁহাদের চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল। তাঁহারা রাজা উপরিচরকে বলিলেন—“বটে! তুমি বিচার করিতে বসিয়া পক্ষপাত করিতেছ? এখনই দেবলোক হইতে পড়িয়া যাও—আজ হইতে তোমার

দেবলোকের গতি বন্ধ হইল। আমাদের শাপে এখনই তুমি মাটি ভেদ করিয়া

তাহার মধ্যে প্রবেশ কর।” মুনিঠাকুরেরা এই শাপ দিবামাত্র উপরিচর আকাশ হইতে পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

কি সর্বনাশ! দেবপক্ষ টানিতে গিয়া রাজা উপরিচর কি বিপদেই পড়িলেন! এখন উপায়? দেবতার মহা ভাবনায় পড়িলেন, “এখন কিরূপে রাজাকে উদ্ধার করা যায়? আমাদের সম্মান রাখিতে গিয়াই ত তাঁহার এই বিপদ হইল।” তখন দেবতার রাজাকে বলিলেন—“মহারাজ! মুনিদের কথা মিথ্যা হইবার নহে, তোমাকে কিছুকাল মাটির নীচে থাকিতেই হইবে। যাহা হউক, তুমি ভাবিও না—তুমি বিষ্ণুর ভক্ত, বিষ্ণুই তোমার শাপ দূর করিবেন। এখন আমরা তোমাকে এই বর দিতেছি যে—তুমি ভূগর্ভে যতদিন থাকিবে, ততদিন যজ্ঞের সময় ব্রাহ্মণেরা ঘরের মেঝেতে যে ঘাঁ ঢালিবেন সেই ঘাঁ খাইয়া এবং আমাদের তেজের বলে তোমার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হইবে।” রাজা উপরিচরকে এই বর দিয়া দেবতার মুনিঠাকুরদের সঙ্গে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

উপরিচর ভূগর্ভে পড়িয়া একান্তমনে নারায়ণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তখন নারায়ণ গরুড়কে ডাকিয়া বলিলেন—“গরুড়! পরম ধার্মিক উপরিচর মিথ্যা বলার অপরাধে মুনিদের শাপে মাটির নীচে ঢুকিয়াছেন। এখন তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্ট হইয়াছে, অতএব, এখন গিয়া তাঁহাকে ভূগর্ভ হইতে লইয়া আইস।” বিষ্ণুর আদেশে গরুড় চক্ষের নিমেষে রাজা উপরিচরকে ভূগর্ভ হইতে আনিয়া আকাশে ছাড়িয়া দিল। লজ্জিত উপরিচর স্বর্গলোকে ফিরিয়া গেলেন।

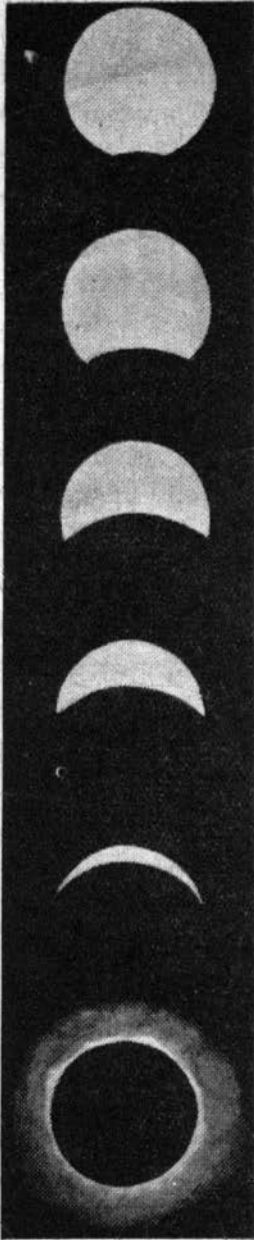
ত্রিকূলদারজন রায়।

পুরাতন লেখা

(উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী)

সূর্যগ্রহণ

পৃথিবী যেমন সূর্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, চন্দ্রও তেমনি পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে চন্দ্র যদি পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে আসে, তাহা হইলে কিছুকালের জন্য সে সূর্যকে আমাদের চোখের আড়াল করিয়া দাড়ায়। ইহাকেই আমরা সূর্যগ্রহণ বলি।



গ্রহণ একটা তেমন ভয়ানক বা আশ্চর্য্য জিনিস কিছুই নহে ; কিন্তু আগে লোকে গ্রহণের সময় ভারি ভয় পাইত । অনেক দেশের লোকেরই এরূপ বিশ্বাস, যে একটা ভয়ঙ্কর দানব বা রাক্ষস চন্দ্রসূর্য্যকে গিলিতে আইসে, তাহাতেই গ্রহণ হয় । মহাভারতে লেখা আছে, যে দেবতার সমুদ্রমস্থন করিয়া অমৃত পাইয়াছিলেন । দানবদিগকে সেই অমৃতের ভাগ না দিয়া দেবতারা তাহা খাইতেছিলেন, এমন সময় রাজ নামে একটা দানব, দেবতা সাজিয়া আসিয়া তাঁহাদের দলে মিশিয়া পড়িল । সাদাসিধে ভালমানুষ দেবতাটির মতন মুখ গম্ভীর করিয়া সে হাত পাতিয়া বসিয়া আছে, এখন অমৃতের হাঁড়িটা একবার কাছে আসিলেই হয় । ইহার মধ্যে চাঁদ আর সূর্য্য ছুভাই মুঞ্চিল বাধাইল । তাহারা রাজ মহাশয়কে চিনিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি বিষুকে বলিয়া দিল ; বিষু সুদর্শন চক্র দিয়া তাহার মাথাটা কাটিয়া ফেলিলেন । যাহা হউক, ততক্ষণে সে অমৃত হাতে লইয়া মুখে দিয়া, তাহা গলার ভিতরে অবধি নিয়াছিল । স্মরণ্য তাহার মাথাটা মরিল না । তোমরা হয়ত মনে করিতেছ, যে শুধু মাথাটা বাঁচিয়া থাকিলেই বা কি করিতে পারে ! কিন্তু তাহা বলিলে কি হয় ! সে জাতিতে দানব, সহজে ছাড়িবে কেন ? চন্দ্রসূর্য্যের উপর তাহার সেই দিনকার ঝাল আজও মিটে নাই । তাই তাহার সেই কাটা মাথাটাই এখনও আকাশের এক কোণে ওত পাতিয়া বসিয়া আছে ;—চন্দ্র অথবা সূর্য্যের সঙ্গে একবার দেখা হইলেই তাহাকে জলযোগ করিবে । ভাগ্যিস শুধু মাথাটাই আছে, পেটটা নাই ; তা নইলে এতদিনে কখন গিলিয়া হজম করিয়া বসিত ! শুধু মাথাটা আছে বলিয়া, মুখের ভিতরে ঢুকিয়াও গলার ছিদ্র দিয়া বাহিরে চলিয়া আসা যায়, তাই রক্ষা ।

এইরূপ এক একটা দানবের কথা অনেক জাতিই বিশ্বাস করে। তাই গ্রহণের সময় তাহারা ভারি ভয় পায়, আর কাঁশর, ঘণ্টা, শাঁখ বাজাইয়া দানব তাড়াইতে চেষ্টা করে। গ্রহণ শেষ হইলে তাহারা মনে করে যে, এত করিয়া কাঁশর ঘণ্টা বাজাইবার পরিশ্রমটা সার্থক হইল। যাহা হউক, যে দানব কাঁশর ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া ভয় পায়, সূর্য্যকে গিলা তাহার কর্ম্ম নয়, একথা নিশ্চয় বলা যায়। সূর্য্যটাকে চাখিয়া দেখিবার অবকাশ আমার হয় নাই, সুতরাং সেটা খাইতে কেমন লাগে, জানি না। কিন্তু যদি অনেকগুলি সন্দেশ আর রসগোল্লা কোন সহৃদয় পাঠক বা পাঠিকা আমাদের গিলিতে আনিয়া দেন, তবে আমি লিখিয়া দিতে পারি যে, খালি কাঁশরঘণ্টা বাজাইয়া আমাদের সেখান হইতে তাড়াইতে পারিবেন না।

এখন আমরা জানিতে পারিয়াছি, গ্রহণ কেন হয়; সুতরাং এ সম্বন্ধে আর বেশী বলার দরকার দেখি না। সেদিন যখন গ্রহণ হইয়াছিল,* তখন আমরা সকলে মিলিয়া একটা দূরবীণ দিয়া সূর্য্যগ্রহণ দেখিয়াছিলাম। চন্দ্রটাকে তখন এত পরিষ্কার দেখা গিয়াছিল যে, তাহার পর্ব্বতগুলি পর্য্যন্ত স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সেটাকে কোন জানোয়ারের মুখের মত আদবেই দেখা যায় নাই। রাত্ৰ হইলে অন্ততঃ তাহার ছ'একটা দাড়ি গৌরুও দেখা যাইত। রাত্ৰর নাকি আবার একজন সঙ্গী আছেন; তাঁহার নাম কেতু, জাতিতে সর্প। ইহঁর সঙ্গে চন্দ্রসূর্য্যের কি লইয়া শত্রুতা তাহা জানিতে পারি নাই। যাহা-হউক তিনি আসিলে, তাঁহার লকলকে চেরা জিভটি একটিবার না দেখাইয়া কখনই থাকিতে পারিতেন না।

সূর্য্যের সামনে দিয়া চিল উড়িয়া গেলে যাহা হয়, চন্দ্র চলিয়া গেলেও একটু বড় ধরণে তাহাই হয়। চিলের যেমন ছায়া পড়ে, চন্দ্রেরও তেমনি ছায়া পড়ে। চিল উড়িয়া যায়, আর তাহার ছায়াটা সঙ্গে সঙ্গে ছোটে। চন্দ্রের ছায়াটাও তেমনি চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে ছোটে। সে ছোটা যে কি ভয়ানক বেগের সহিত ছোটা, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। এবারকার সূর্য্যগ্রহণের সময় চন্দ্রের ছায়া প্রথমে আফ্রিকার পশ্চিম ধারে পড়ে*। সেখান হইতে পূর্ব্বমুখী ছুটিয়া ৩ ঘণ্টায় একেবারে চীন দেশে গিরা উপস্থিত হয়। আফ্রিকা হইতে সমুদ্র পার হইয়া এই ছায়া যখন প্রথমে রত্নগিরির কাছে আসিয়া ভারতবর্ষে পৌঁছায়, তখন তাহার বেগ মিনিটে প্রায় ২৫ মাইল ছিল। এর পর ক্রমেই তাহার বেগ বাড়িতে

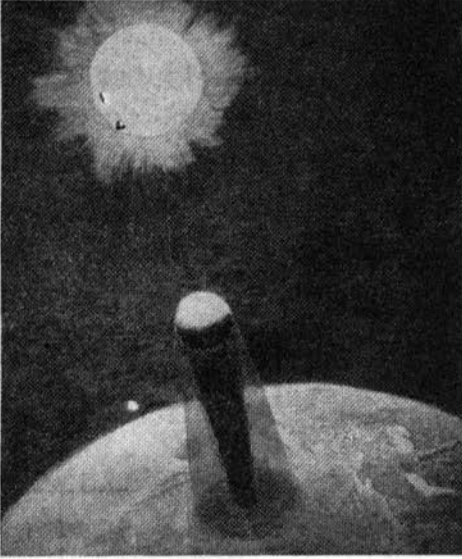
* ইহা ১৮৯৮ জানুয়ারি মাসের কথা।

লাগিল। তিনপোয়া ঘণ্টার ভিতরে সেই ছায়া সমস্ত ভারতবর্ষটা পার হইয়া চলিয়া গেল। যখন তিব্বতে লাসা নগরের কাছে যায়, তখন ছায়ার বেগ মিনিটে ৫০ মাইল ছিল; আর তখনও তাহা ক্রমেই বাড়িতেছিল।

এরূপ ভয়ানক বেগে একটা জিনিসকে ছুটিতে দেখিলে মনে কেমন একটা ভয় হয়। অনেকে উচু পর্বতের উপরে দাঁড়াইয়া নীচের সমতল স্থানে চন্দ্রের ছায়া ছুটিয়া চলিতে দেখিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন, যে তখন তাঁহাদের মনে কেমন একটা গম্ভীর ভয়ের ভাব আসিয়াছিল। ছায়ার পাশের খানিকটা স্থান (১০।১৫ মাইল) একটু হৃদে রঙের দেখা গিয়াছিল। এই হৃদে রঙের কথাটা আমাদের দেশের অনেকেই জানে। যাহারা একথা জানে, তাহারা খুব সতর্ক হইয়া গ্রহণের সময় সাদা জিনিসের উপর রৌদ্রের রং পরীক্ষা করে। যখন সাদা জিনিস-গুলিকে ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণের দেখা যায়, তখনই তাহারা বুঝিতে পারে, যে গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে—অর্থাৎ চন্দ্রের ছায়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই হৃদে রং টুকু কয়েক সেকেন্ড মাত্র থাকে, সুতরাং খুব সতর্ক না থাকিলে তাহা টেরই পাওয়া যায় না।

গ্রহণের সময় সূর্য্যকে দেখিতে সকলেরই ইচ্ছা হয়। কিন্তু এত উজ্জ্বল জিনিসকে শুধু চোখে দেখা সম্ভব নহে, সুতরাং ইহার জন্ত কোন রকম উপায় অবলম্বন করা চাই। কালো পাত্রে জল রাখিয়া তাহাতে সূর্য্যের ছায়া অনেকেই দেখে। শিশু-কাল প্রথম যে গ্রহণ দেখিয়াছিলাম, তাহা এই উপায়েই দেখিয়াছিলাম। আমার বেশ মনে আছে, তখন জলে হাওয়া লাগায় জলটা একটু কাঁপিতেছিল, সুতরাং সূর্য্যের ছায়াটাও কাঁপিতেছিল। বড় হইয়া পরে বুঝিতে পারিয়াছি, যে জল কাঁপার দরুণই সূর্য্যের ছায়া কাঁপিয়াছিল; কিন্তু সেই প্রথম গ্রহণ দেখার দিন অল্প রকম ভাবিয়াছিলাম। আমি নিজেই মনে করিয়াছিলাম, কি অল্প কেহ বলিয়া দিয়াছিল, তাহা আমার মনে নাই; কিন্তু সূর্য্য যে রূপকে দেখিয়া ভয়ে এরূপ কাঁপিতেছিলেন, এ কথা আমার খুবই বিশ্বাস হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পরে আর একবার গ্রহণ হইয়াছিল। ততদিনে ভূগোল টুগোল পড়িয়া তোমাদের অনেকের মতন পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। আর ঠিক সেই গ্রহণের দিন একজন আমাকে কালো কাচের ভিতর দিয়া সূর্য্য দেখিবার সঙ্কেত শিখাইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং সৈবারে রাহু বা কেতুর কেতুর কোন সন্ধান পাই নাই। কালো কাচ সকল সময় সহজে যোটে না;

কিন্তু প্রদীপের শিখায় একখণ্ড কাচকে সহজেই কালো করিয়া লওয়া যায়। সেই ধোঁয়া-মাখান কাচের ভিতর দিয়া গ্রহণ দেখার খুব সুবিধা।



পৃথিবীর উপর চাঁদের ছায়া পড়েছে। যারা ঐ মধ্যকার ঘন ছায়াটুকু ভিতরে পড়েছে, তারা একেবারে পূর্ণগ্রহণ দেখতে পাচ্ছে। তার আশে পাশের হালকা ছায়ার মধ্যে যারা আছে, তারাও গ্রহণ দেখছে কিন্তু পূর্ণ গ্রহণ নয়। চন্দ্র সূর্যকে পৃথিবীর খুব কাছে আর ছোট করে দেখান হয়েছে, তা না হ'লে ছবিটা প্রকাণ্ড হ'লে পড়ত।

ইহার পূর্বের বার সম্পূর্ণ গ্রহণ হয় নাই, কিন্তু চন্দ্রের চারিধারে আংটির আকারে সূর্যকে দেখা গিয়াছিল। এরূপ গ্রহণকে বলয় গ্রহণ বলে।

সূর্য অতি প্রকাণ্ড জিনিস; কিন্তু চোখের সামনে একখানি বই ধরিলে, সেই ছোট বইয়ের দ্বারাই সূর্য ঢাকা পড়ে। বইখানিকে ক্রমে দূরে লইয়া গেলে, আর তাহাতে সূর্য ঢাকা পড়ে না। ছোট জিনিস চোখের কাছে থাকিলে, তাহার দ্বারা একটা বড় জিনিস ঢাকা পড়িতে পারে। সেই ছোট জিনিসকে ক্রমে দূরে লইয়া গেলে, শেষটা তাহা দ্বারা আর সেই বড় জিনিস ঢাকা পড়ে না।

এইরূপ করিয়া তোমরা অনেকেই গ্রহণ দেখিয়া থাকিবে। একটু একটু করিয়া সূর্যটা ক্রমে “৫”এর মতন হইয়া গেল, তবুও কমিতে লাগিল। আকাশ কেমন অন্ধকার হইয়া আসিল; বাহিরের জিনিসপত্রের রং ময়লা হইয়া গেল। আরো অন্ধকার হইলে, দু'একটা করিয়া তারাও দেখা দিত। কয়েক বৎসর পূর্বে যে সূর্য-গ্রহণ হইয়াছিল, তখন একটা তারা দেখা গিয়াছিল। কলিকাতায় এই ছবারের একবারও সম্পূর্ণ গ্রহণ দেখা যায় নাই। চন্দ্র যদি সূর্যকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলে, তাহা হইলে সম্পূর্ণ গ্রহণ হয়। তখন দিনের বেলায় রাত্রির মতন অন্ধকার হয়, পাখীরা হতবুদ্ধি হইয়া বাসায় ফিরে। এবারে ভারতবর্ষের অনেক স্থান হইতেই সম্পূর্ণ গ্রহণ দেখা গিয়াছিল।

বইখানি চোখের সামনে ধরাতে যখন সূর্য্য ঢাকা পড়ে, তখন যদি বইটাকে স্থির রাখিয়া, চক্ষুকে একটু পাশের দিকে সরান যায়, তাহা হইলে সূর্য্যকে আবার দেখিতে পাওয়া যায়। বইয়ের ঠিক পিছনে খানিকটা যায়গা ভিন্ন আর সকল স্থান হইতেই সূর্য্যকে দেখা যাইবে।

গ্রহণের সময়েও ঐরূপ হয়। চন্দ্র সূর্য্য অপেক্ষা অনেকখানি ছোট। খালি সে সূর্য্যের তুলনায় আমাদের খুব আছে আছে বলিয়াই সূর্য্য তাহার আড়ালে ঢাকা পড়ে; তাহাও অতি কষ্টেসৃষ্টে। চন্দ্রের ঠিক পিছনে যাহারা থাকে তাহারাই ঐ ঢাকাপড়া দেখিতে পায়। ইহার উপর আবার যদি গ্রহণের সময়ে চন্দ্র পৃথিবী হইতে একটু বেশী দূরে থাকে, তাহা হইলে তাহার ঠিক পিছনে থাকিয়াও তাহা দ্বারা সূর্য্যকে ঢাকা পড়িতে দেখা যায় না। পূর্বেই বলিয়াছি ঐরূপ গ্রহণকে বলয় গ্রহণ বলে।

প্রতিজ্ঞার দায়

আরব দেশের এক বেছয়ীন, তার ভারি সখ হ'ল, সে একটা উট কিনবে। বাজারে দেখল, একটা চমক্কার উট পাওয়া যাচ্ছে; তার অসম্ভব দাম। কিন্তু দাম যতই হোক, তেমন উট আর সে মূল্যে মিলবে না। বেছয়ীন তার যুথাসর্ব্বস্ব খরচ ক'রে উটটাকে কিনে বাড়ী নিয়ে এল।

যেমন উট, তার তেমনি যত্ন। বেছয়ীন রোজ নিজের হাতে তাকে নাওয়ায় খাওয়ায়, দিনের মধ্যে সাতবার তাকে ঝেড়ে মুছে বুরুষ করে, রাত্রেও বার বার উঠে দেখে, উট ঠিক আছে কি না, ভাল ক'রে ঘুমাচ্ছে কি না। উটের তোয়াজ দেখে পাড়ার লোকে অবাক হ'য়ে থাকে।

হঠাৎ একদিন সকালে উঠে বেছয়ীন দেখে, যে তার সাধের উট কোথায় যেন চলে গিয়েছে। তখন সে পাগলের মতন হয়ে উটের সন্ধানে চারদিকে ছুটে বেড়াতে লাগল। এদিকে যায়, ওদিকে যায়, যাকে দেখে তাকেই উটের কথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু কোথাও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। এমনি ক'রে ছত্ধিন গেল, দশদিন গেল, তখন সবাই বলতে লাগল “কি আর পাওয়া যাবে? তোমার ও উট জন্মের মত গিয়েছে। কোথাও কোন্ চোরে নিয়েছে, কি ডাকাতে নিয়েছে, কিম্বা সিংহে খেয়েছে;

ওর আশা ছেড়ে দাও।” বেচারী বেছয়ীনে শুনে আল্লার দোহাই দেয়, আর কেঁদে বলে, “আমি আমার উট ফিরে চাই না। খালি জানতে চাই যে সে বেঁচে আছে কি ম’রে গেছে। যদি বেঁচে থাকে, তবে একটবার তাকে দেখতে পেলোও আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হ’ত।”

একদিন বাজারের মাঝখানে মসজিদের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মনের দুঃখে সে বলে ফেলল—“অকৃতজ্ঞ জানোয়ার! সর্বস্ব বাঁধা দিয়ে ওকে কিনলাম, এত করে খাওয়ালাম দাওয়ালাম, আর ও কিনা উটে আমাকে এই কষ্টটা দিলো! ভাই সকল, তোমরা সবাই শোন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, হতভাগা উট যদি আবার ফিরেও আসে, তবে আমি এক পয়সায় ওকে বেচে ফেলব।” এই কথা ব’লে সে বাড়ী ফিরে গিয়ে দেখে যে কোথা থেকে তার সেই উট এসে হাজির!

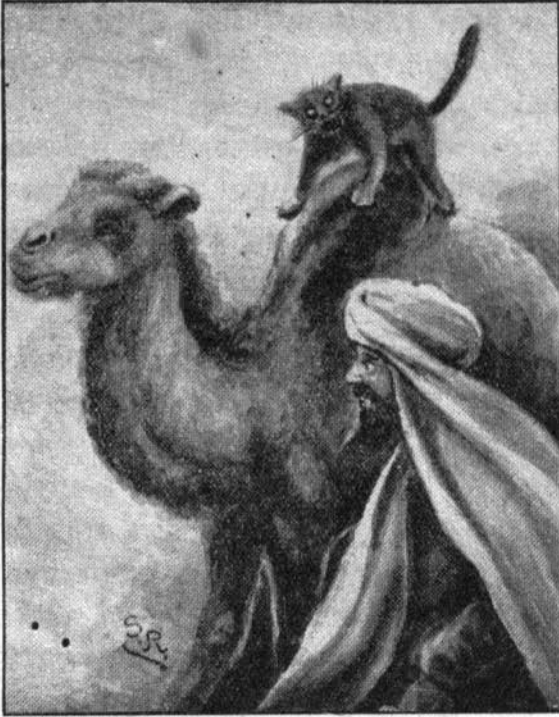
হারানো উট ফিরে পেয়ে প্রথমটা বেছয়ীনের খুবই আনন্দ হ’ল, সে উটের গলা জড়িয়ে ধ’রে অনেকক্ষণ কাঁদল; কিন্তু তারপরেই তার মনে পড়ল—সেই বেচে ফেলবার কথা। মসজিদে দাঁড়িয়ে এতগুলি লোকের সামনে সে বলে ফেলেছে, স্বয়ং কাজীসাহেবের পর্য্যন্ত তা শুনে বাকি নেই। এখন উপায়? সত্যিই যদি কেউ এক পয়সায় উট কিনতে আসে?

নিজের বোকামির জন্ত যেমন তার আপশোষ হতে লাগলো, উটটার অবিবেচনা দেখেও তেমনি রাগ হতে লাগল। সেই যদি ফিরেই এলিরে বাপু, তবে একদিন আগে আসতে কি হয়েছিল? যেই না টাটকা প্রতিজ্ঞা করা, অমন সময় বুঝে এসে উপস্থিত! না হয় ক’দিন দেরী করে এলেও ত চলত; ততদিনে হয়তো প্রতিজ্ঞার কথাটা লোকে ভুলে যেতো। কি ক’রে প্রতিজ্ঞার দায় এড়ান যায়, এই ভাবনায় বেচারার সারারাত ঘুমই এল না।

এদিকে তো রাতারাতি চারদিকে খবর রাষ্ট্র হয়ে গেছে যে বেছয়ীনের উট ফিরে এসেছে; এখন এক পয়সায় বিক্রী হবে। ভোর হ’তে না হ’তে রাজ্যের যত লোক তার দরজায় এসে হাজির—স্বয়ং কাজীসাহেব পর্য্যন্ত ব্যাপার কি দাঁড়ায়, দেখবার জন্ত উপস্থিত। সবাই উটওয়ালার তারিফ করতে লাগল, আর বলতে লাগল “আহা! অতি মহাশয় ধোক! অত সাধের অমন উট, এক পয়সায় বেচে দিচ্ছে।”

সবাই এই বলছে আর দরজার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে, এমন সময়ে উটের মালিক তার আঙ্গিনাথেকে উটটিকে নিয়ে বেরিয়ে এল। সকলে চেয়ে দেখল,

উটের পিঠে একটা বিচ্ছিরি, রোগা, নোংরা, কাদামাখা বেড়াল। উটওয়ালা এসে



সকলকে সম্বোধন করে চৈঁচিয়ে বলতে লাগল, “ভাই সকল, তোমরা অনেকেই জানো, যে আমি প্রতিজ্ঞা ক’রেছি, এই উটটিকে এক পয়সায় বিক্রী করবো। কিন্তু একথা বোধ হয় তোমরা জাননা, যে আমি এরকমও প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আমার এই বেড়ালটাকেও আমি বিক্রী করব—একলাখ টাকায়। ছোটোকেই কিন্তু এক সঙ্গে বেচবো, আলাদা ক’রে বেচতে পারবো না। এখন কে নেবে নাও—এই আমি বেচে দিচ্ছি—উটের দাম এক পয়সা, বেড়ালের দাম লাখ-টাকা। একসঙ্গে বিক্রী—কে নেবে নিয়ে যাও।”

যারা সঙ্গে ক’রে পয়সা এনেছিল, তারা বেছয়ানের ছুঁছুবুদ্ধি দেখে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো। তখন কাজীসাহেব এগিয়ে এসে উটওয়ালার পিঠে থাবড়ে বল্লেন “সাবাস! তোর বুদ্ধির দাম আছে বুটে। যা, তোর উট তুই ঘরে নিয়ে যা।”

শুনে সবাই হাসতে হাসতে বাড়ী চ’লে গেল, আর উটের মালিক ছুহাত তুলে খোদাকে ধন্যবাদ ক’রে বললে, “ভাবনায় পড়েছিলাম, উট রাখি, না প্রতিজ্ঞা রাখি? ভাগ্যিস সময় বুঝে বুদ্ধি খুলল, তাই উটও রইল, প্রতিজ্ঞাও রইল।”

শ্রীপূর্ণাঙ্গতা চক্রবর্তী।

অসিলক্ষণ পণ্ডিত

রাজার সভায় মোটা-মোটা-মাইনেওয়ালা অনেকগুলি কর্মচারী। তাদের মধ্যে সকলেই যে খুব কাজের লোক, তা নয়। দুজন চারজন খুটে খেটে কাজ করে আর বাকী সবাই ব'সে ব'সে মাইনে খায়।

যারা কৃষ্ণ দিগ্বে রোজগার করে, তাদের মধ্যে একজন আছেন, তিনি অসিলক্ষণ পণ্ডিত। তিনি রাজার কাছে এসে বললেন, তিনি অসিলক্ষণ, (অর্থাৎ তলোয়ারের দোষগুণ) বিচার করতে জানেন। অমনি রাজা বললেন “উত্তম কথা, আপনি আমার সভায় থাকুন, আমার রাজ্যের যত তলোয়ার আপনি তার লক্ষণ বিচার করবেন।”

সেই অবধি ব্রাহ্মণ রাজার সভায় ভর্তি হ'য়েছেন, মোটারকম মাইনে পাচ্ছেন, আর প্রতিদিন তলোয়ার পরীক্ষা করছেন, আর বলছেন, “এই তলোয়ারটা ভাল, এই তলোয়ারটা খারাপ।” ভারি কঠিন কাজ! কত তলোয়ার ঘেঁটে ঘুঁটে, দেখে আর শুঁকে, চটপট তার বিচার করছেন।

তাঁর বিচারের নিয়মটি কিন্তু ভারি সহজ! তলোয়ার এনে যখন তাঁর হাতে দেওয়া হয়, তখন তিনি সেটাকে শুঁকে দেখেন। তলোয়ার যারা বানায়, তারা তলোয়ারের গায়ে তাদের মার্কা এঁকে দেয়। তাই দেখে বোঝা যায় কোন্টা কার তলোয়ার। পণ্ডিত মহাশয় শুঁকবার সময়ে সেই মার্কটুকু দেখে নেন। যাদের উপর তিনি খুব খুসী থাকেন, যারা তাঁকে পয়সা টয়সা দেয়, আর খাইয়ে দাইয়ে তোয়াজ করে, তাদের তলোয়ার দেখলেই তিনি নেড়েচেড়ে টিপেটুপে বলেন, “খাসা তলোয়ার! দিব্যি তলোয়ার! হাজার টাকা দামের তলোয়ার!” আর যাদের উপর তিনি চটা, যারা তাঁকে ঘুষও দেয় না, খাতিরও করে না, তাদের তলোয়ার যত ভালই হোক না কেন, তাঁর কাছে পার পাবার যো নেই। সেগুলি হাতে পড়লেই তিনি অমনি একটু শুঁকেই নাক সিঁটকিয়ে ব'লে ওঠেন, “অতি বিচ্ছিরি! অতি বিচ্ছিরি! তলোয়ার ত নয়, যেন কাস্তে গড়েছে!”

এমনি ক'রেকত ভাল ভাল কারিকর, কত চমৎকার চমৎকার তলোয়ার বানিয়ে আনে, কিন্তু বিচারের গুণে তার ছটাকাও দাম হয় না। এর মধ্যে একজন ওস্তাদ কারিকর আছে, সে বেচারি মনপ্রাণ দিয়ে এক একখানি তলোয়ার গড়ে, আর

বিচারক মশাই “দূর! দূর!” ক’রে সব বাতিল ক’রে দেন। এই রকম হ’তে হ’তে শেষটায় কারিকর গেল ক্ষেপে।

একদিন সে করল কি, একখানি তলোয়ার বানিয়ে, তার গায়ে বেশ ক’রে লঙ্কার গুঁড়ো মাখিয়ে অসিলক্ষণ পণ্ডিতের কাছে এনে হাজির করল। পণ্ডিত নিতান্ত



তাচ্ছিল্য ক’রে “আব্বার কি গড়ে আনলি? দেখি?” বললে, যেমনি তাতে নাক ঠেকিয়ে শুঁকতে গেছেন, অমনি লঙ্কার গুঁড়ো নাকে ঢুকতেই হ্যাঁ—চো ক’রে এক বিকট হাঁচি, আর সেই সঙ্গে তলোয়ারের আগায় ঘ্যাচ্ ক’রে নাক কেটে ছুথান!

চারিদিকে হৈচৈ পড়ে গেল, “জল আনরে”, “কবিরাজ ডাকরে”,—ততক্ষণে তলোয়ার-ওয়ালা লম্বা লম্বা পা ফেলে তার বাড়ী পর্য্যন্ত পিঠটান দিয়েছে।

অসিলক্ষণ পণ্ডিতের মহা মুঞ্চিল। একেত কাটা নাকের যজ্ঞণা, তার উপর সভায় বেরুলে সবাই ক্ষেপায় “নাককাটা পণ্ডিত” বলে। বেচারার এখন মুখ দেখানই দায়, সে সভায়ও যেতে পারে না, চাকরীও করতে পারে না। তাকে দেখলেই লোকে জিজ্ঞাসা করে, “তলোয়ারটা কেমন ছিল?”

অদ্ভুতমাল

কোশলের রাজা প্রসেনজিতের পুরোহিত ছিলেন, ভার্গব। ভার্গবের পুত্রের নাম ছিল অহিংসক। অহিংসক জাম্বীবামাত্র নাকি রাজধানীর নানাস্থানের অস্ত্র-শস্ত্র, দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া দৈবজ্ঞ

পণ্ডিতেরা বলিলেন,—“এই শিশু বড় হইয়া ভীষণ দস্যু হইবে।” কি ভয়ানক কথা ! ভার্গবের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, তিনি স্থির করিলেন, এমন ভয়ানক শিশুকে বধ করিবেন ! এই কথা রাজা প্রসেনজিতের কাণে গেল, তিনি পুরোহিতকে ডাকিয়া বলিলেন—“সাবধান ! এরূপ পাপ কার্য্য কখনই করিতে পারিবেন না।” রাজার আদেশে অহিংসকের প্রাণ রক্ষা হইল।

অহিংসক বড় হইলে পর তক্ষশিলা নগরে বিখ্যাত এক পণ্ডিতের নিকট বিদ্যা-শিক্ষা করিতে গেলেন। তাঁহার বুদ্ধি ছিল অসাধারণ, তার উপর চেষ্টা যত্নেরও ক্রটি ছিল না। কাজেই অল্প ছাত্রেরা তাঁহার সঙ্গে কিছুতেই পারিয়া উঠিত না। ক্রমে তাহাদের মনে ভারি হিংসা হইল। তাহারা প্রতিদিন গোপনে গুরুর নিকট অহিংসকের নামে নানারকম কুৎসা করিতে লাগিল। ক্রমে তাহা শুনিতে শুনিতে গুরু তাহাদের কথা বিশ্বাস করিলেন এবং একদিন অহিংসককে ডাকিয়া বলিলেন—“বৎস অহিংসক ! এখানে তোমার আর স্থান হইবে না। তবে নিতান্তই তুমি যদি আমার শিষ্য থাকিতে চাও, তাহা হইলে এক কাজ কর। এক হাজার বার নরহত্যা করিয়া এক হাজার মানুষের আত্মা আনিয়া যদি আমাকে দেখাইতে পার, তবেই আবার তোমাকে লেখা পড়া শিখাইব।”

গুরু হয়ত ভাবিয়াছিলেন, এরূপ ভয়ানক কথা শুনিয়া অহিংসক নিশ্চয়ই নিরস্ত হইবে, কিন্তু ফল হইল তাহার বিপরীত। গুরুর কথায় অহিংসকের মাথায় রীতিমত খুন চাপিয়া গেল, তিনি এক বনে গিয়া নরহত্যা আরম্ভ করিয়া দিলেন। বনের মধ্যে বড় বড় আটটা রাস্তা আসিয়া মিলিয়াছে, সেখানে অনেক লোক সর্বদাই যাতায়াত করে। কাজেই প্রথমটা মানুষ মারা কিছু কঠিন হইল না। মানুষ মারিয়াই তাহার আত্মা কাটিয়া লইতেন বলিয়া ক্রমে লোকে তাঁহার নাম দিল “অঙ্গুলিমাল”।

অঙ্গুলিমালের উৎপাতে সমস্ত কোশল রাজ্যের লোক ভয়ে দিশাহারা হইয়া উঠিল। রাজা প্রসেনজিৎ ভাবিলেন, সৈন্তসামন্ত লইয়া গিয়া এই দারুণ দস্যুকে মারিয়া ফেলিবেন। পুরোহিত ভার্গব বুঝিতে পারিলেন যে, এ দস্যু আর কেহ নয়, তাঁহারই পুত্র “অহিংসক”। ইহা বুঝিয়াও তিনি পুত্রের উদ্ধারের কোন চেষ্টা করিলেন না। কারণ তাঁহার ভয় হইল পাছে সে তাঁহাকেই মারিয়া ফেলে !

ভার্গব পুত্রের উদ্ধারের কোন চেষ্টা করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী কিছুতেই শাস্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি পুত্রের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া আকুল হইলেন, এবং সংকল্প করিলেন যে যেমন করিয়া হউক অঙ্গুলিমালাকে খুঁজিয়া বাহির করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার প্রাণ যায়, সেও ভাল।

এই সময়ে বুদ্ধদেব জেতবনে থাকিতেন। দস্যুর কথা এবং তাঁহার মায়ের ছুঃখের কথা জানিতে পারিয়া তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশে অঙ্গুলিমালার বনে চলিলেন। পথে গ্রামের রাখালেরা তাঁহাকে কত বারণ করিল—“ঠাকুর! আপনি এ পথে যাইবেন না। অঙ্গুলিমালার ভয়ে, ৪০।৫০ জন একসঙ্গে মিলিত না হইলে লোকে কখন এ পথে যাইতে ভরসা পায় না।” কিন্তু মহাপুরুষ বুদ্ধ তাহাদের কথায় কাণ দিলেন না।

এদিকে অঙ্গুলিমালা ক্রমে ৯৯৯ জন লোক মারিয়াছেন, আর একটি লোক বধ করিতে পারিলেই তাঁহার কাজ শেষ হয়। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বনে অপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু একটি লোকও সেখান দিয়া যায় না। তখন তাঁহার মনের অবস্থা ঠিক উন্মত্তের মত। নিজের পিতামাতাকে সম্মুখে পাইলেও তিনি অনায়াসে তাহাদের হত্যা করিতে পারেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর হঠাৎ অঙ্গুলিমালা দেখিলেন—প্রসন্ন গম্ভীর এক ভিক্ষুসন্ন্যাসী একা সেই পথে আসিতেছেন। যাই দেখা, অমনি সন্ন্যাসীর পিছনে তাড়া। কিন্তু ক্রমাগত ৫১৬ ক্রোশ দৌড়িয়াও ভিক্ষুকে ধরা দূরে থাকুক তাঁহার নিকটেও যাইতে পারিলেন না। সে অদ্ভুত ভিক্ষু তাঁহাকে ধরাও দেন না, অথচ একেবারে পলাইয়া যাইবারও কোন চেষ্টা করেন না। অঙ্গুলিমালা দৌড়িয়া ঘোড়া হরিণ প্রভৃতি জন্তকেও পিছনে ফেলিয়াছেন, আর আজ কি না সামান্য একজন ভিক্ষুকে ধরিতে পারিলেন না?

বিস্মিত দস্যু চীৎকার করিয়া ভিক্ষুকে থামিতে বলিলেন। ভিক্ষুবেশী বুদ্ধ তৎক্ষণাৎ থামিয়া বলিলেন—“তুমিও তবে যেখানে আছ সেখানেই থাক, আমার দিকে আর এক পাও আসিও না।” সেই গম্ভীর আদেশ শুনিবামাত্র অঙ্গুলিমালা মত্তমুগ্ধের মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইলেন। তখন বুদ্ধের মুখ হইতে ধর্মের অমৃতময় বাণী বাহির হইতে লাগিল, মহাদস্যু অঙ্গুলিমালা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। তারপর বুদ্ধদেব তাঁহার ডান হাতখানি তুলিয়া অতি স্নেহের স্বরে ডাকিলেন—“এহি ভিক্ষো” (“হে ভিক্ষু, এসো”), আর অঙ্গুলিমালা বুদ্ধের চরণে



“এহি ভিক্ষা”

লুটাইয়া পড়িলেন। দস্যুকে উদ্ধার করিয়া বুদ্ধ তাঁহাকে জেতবনের আশ্রমে লইয়া আসিলেন। তখন হইতে অঙ্গুলিমাল হইলেন আশ্রমের একজন পরম সাধু ভিক্ষু।

এদিকে, তাঁহার পিতা মাতা তাঁহার সন্ধানে বাহির হইয়াছেন। তাঁহারা ত আর এসব সংবাদ জানিতেন না, কাজেই অনেকক্ষণ খুঁজিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

রাজা প্রসেনজিতও ভাবিতেছেন, দস্যু অঙ্গুলিমালকে সাজা দিতে না পারিলে রাজার পক্ষে লজ্জার কথা হইবে। তাহার যেরূপ সাহস ও শক্তি তাহাতে সাজা দিতে যাওয়াটাও বড় নিরাপদ নহে। প্রসেনজিৎ ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া এ বিষয়ে বুদ্ধের উপদেশ লইবার জন্য জেতবনে গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বুদ্ধ তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—“প্রভু! ছুরাচার দস্যু অঙ্গুলিমালকে দমন করা প্রয়োজন। কিন্তু, কি উপায়ে দমন করিব বুঝিতে পারিতেছি না।”

বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা, অঙ্গুলিমাল যদি এখন সাধুশ্রেষ্ঠ ভিক্ষু হইয়া থাকে, তবে তাহার কিরূপ সাজার ব্যবস্থা করিবেন?”

প্রসেনজিৎ বলিলেন, “সে যদি সত্যসত্যই ভিক্ষু হয় তবে আমি অবশ্যই তাহাকে যথোচিত সম্মান করিব।”

অঙ্গুলিমালের মত ভীষণ দস্যুকেও যে উদ্ধার করা সম্ভব, একথা রাজা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে, সত্যসত্যই সেই দস্যু ভিক্ষু হইয়া সেই বিহারেই (ভিক্ষুদের আশ্রমে) উপস্থিত আছে, তখন তাঁহার মনে ভয় হইল। বুদ্ধদেব রাজার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তখনই অঙ্গুলিমালকে তাঁহার নিকট পরিচিত করাইয়া দিলেন। প্রসেনজিৎ দস্যুর পরিবর্তন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া মণি-মুক্তার কাজ-করা কটিবন্ধটি খুলিয়া তখনই অঙ্গুলিমালকে উপহার দিলেন। কিন্তু অঙ্গুলিমাল এখন ভিক্ষু সন্ন্যাসী, কিছুর প্রতি তাঁহার আর লোভ নাই—তিনি সে উপহার গ্রহণ করিলেন না।

তখন রাজা প্রসেনজিৎ বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলেন, তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, তিনি বলিলেন—“কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! পাষণ গলিয়া জল হইয়াছে, মহাদস্যু ভিক্ষু হইয়াছে, লোভী দানশীল হইয়াছে, পাপাসক্ত ছুরাচার পুণ্যবান্

হইয়াছে! হে বুদ্ধ! হে তথাগত! এ তোমার আশ্চর্য্য মহিমা! আমি রাজা, পাপীকে সাজা দিয়া তাহার শরীর চূরমার করিয়া দিতে পারি, কিন্তু তাহাকে উদ্ধার করিয়া পুণ্যবান করিবার ক্ষমা একবিন্দুও আমার নাই।”

শ্রীকুলদারজন রায়।

আলিপূরের বাগানে

আলিপূরের চিড়িয়াখানায় আমাদের একটি বন্ধু আছেন। আমরা যখনই আলিপূর যাই, অন্তত একটিবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ভুলি না। দেখা করবার সময় শুধুহাতে যাওয়াটা ভাল নয়, তাই বন্ধুর জন্ত প্রায়ই কিছু উপহার নিয়ে যাই। তিনিও তাঁর সাধ্যমত নানারকম তামাসা কসরৎ ও মুখভঙ্গী দেখিয়ে আমাদের আপ্যায়িত করেন।

অনেকে চিড়িয়াখানায় গিয়ে গোড়া থেকেই বাঘের ঘরটা দেখবার জন্ত ব্যস্ত হ'ন। সাপ, কুমীর, উটপাখী, গণ্ডার আর হিপোপটেমাস্,—কেউ কেউ এঁদেরও খুব খাতির ক'রে থাকেন। কিন্তু যে যাই বল, বাগানে ঢুকতে না ঢুকতেই আমাদের মনটা সকলের আগে বলতে থাকে, বন্ধুর বাড়ী চল, বন্ধুর বাড়ী চল। বন্ধুর সঙ্গে কেন যে আমাদের এত ভাব, তা যদি শুন্তে চাও, তাহ'লে তাঁর নামের পরিচয়, গুণের পরিচয়, বিছার পরিচয়, সব তোমাদের শুন্তে হয়।

বন্ধুটির নাম হ'চ্ছে শ্রীযুক্ত ওরুংচন্দ্র ওটান্। আফ্রিকা নিবাসী, আলিপূর প্রবাসী।

অমন অমায়িক চেহারা, অমন ঢিলাঢালা প্রশান্ত স্বভাব, অমন ধীর গন্তীর মেজাজী চাল, সমস্ত আলিপূর খুঁজে আর কোথাও দেখবে না।

কত যে ভাবনা আর কত যে হিসাবশত্রু সর্বদা তাঁর মাথার মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছে তাঁর এই প্রকাণ্ড কপালজোড়া হিজিবিজি রেখাগুলো! দেখলেই তা বুঝতে পারবে। যখন তিনি চিংপাত হ'য়ে শুয়ে, মুখের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে, পেট চুলকাতে থাকেন, আর তাঁর



কাল কাল হাংলা-মতন চোখ ছুটি মিটমিট ক'রে তাকিয়ে থাকে, তখন যদি তাঁর মনের মধ্যে কাণ পেতে শুনতে পারতে, তাহ'লে শুনতে সেখানে অনর্গল হিসাব চলছে—“আর চারটে কলা, আর দু-ঠোঙা বাদাম, আর কতকগুলো বিস্কুট, আর ঐ নাম-জানি-না গোল-গোল-মতন অনেকখানি”—ইত্যাদি। যখন তিনি খাঁচার ছাত থেকে গরাদ ধ'রে অত্যন্ত ভালমানুষের মত ঝুলতে থাকেন, আর ছুলতে থাকেন,—যেন সংসারের কোন কিছুতে তাঁর মন নেই,—তখন যদি তাঁর মনের কথা শুনতে, তা হ'লে শুনতে পেতে, সে কেবলই ভাবছে, কেবলই ভাবছে, “এই লোকটার পাগড়ী, না হয় ঐ লোকটার চাদর, না হয় এই সাহেবটার টুপি, না হয় ঐ বাবুটার ছাতা—নেবই নেব, নেবই নেব।”

একদিন আমরা চিড়িয়াখায় গিয়ে দেখি, ওরাংবাবু দোলনা বেঁধে দোল খাচ্ছেন। কোথেকে কি ক'রে, কার একটা পাগড়ী তিনি আদায় ক'রেছেন, আর সেইটাকে ছাতের গরাদের উপর থেকে ঝুলিয়ে অপূর্ব দোলনা তৈরী হ'য়েছে। তিনি ছহাতে তার দুই মাথায় ধ'রে মনের আনন্দে ছলছেন। তাঁর মুখখানা যেন সর্দীনন্দ শিশুর মত, নিজের বাহাছুরি দেখে নিজেই অবাক।

হঠাৎ তাঁর কি খেয়াল হ'ল, পাগড়ীর একটা দিক ছেড়ে দিয়ে তিনি গেলেন মাথা চুলকোতে। অমনি পাগড়ীর একটা মাথা ভারি হয়ে নেমে পড়ল, আর আরেক মাথা আলগা পেয়ে শুড়ুৎ ক'রে গরাদের উপর দিয়ে পিছলে বেরিয়ে এল। ব্যাপার খানা বুঝবার আগেই ওরাংবাবু মেঝের উপর চিংপাত। আর কেউ হ'লে অপ্রস্তুত হ'ত, কিন্তু বন্ধু আমাদের অপ্রস্তুত হবার পাত্রই ন'ন। তিনি প'ড়েই একটা ডিগ্বাজি খেয়ে উঠলেন আর এমন ভাবে ফিরে দাঁড়ালেন, যেন আগাগোড়া তিনি ইচ্ছা ক'রেই আমাদের তামাসা দেখাচ্ছিলেন। তারপর অনেকখানি ভেবে আর অনেক বুদ্ধি খরচ ক'রে আবার তিনি দোলনা খাটালেন। কাপড়টাকে গরাদের উপর দিয়ে গলিয়ে, তার দুটো মাথাকেই যে ধ'রে রাখতে হয়, এটা বুঝতে তাঁর কিছুক্ষণ সময় লেগেছিল। তিনি পাগড়ীটাকে ঝুলিয়ে এক মাথা ধ'রে টানেন, আর হুস্ ক'রে দোলনা খুলে আসে, তাতে প্রথমটা বেচারার ভারি ভাবনা হ'য়েছিল।

আমাদের বন্ধুটির নানারকম বিছা আছে। তিনি পান খেতে ভারি ভালবাসেন। পানটা হাতে দিলে আগে সেটাকে খুলে পরীক্ষা ক'রে দেখেন, তারপর হাতের মুঠোর মধ্যে মুড়ে টপ্ ক'রে মুখের মধ্যে দিয়ে ফেলেন। যখন পান খেয়ে তাঁর মুখখানা

লাল হয়, আর গাল বেয়ে পানের রস পড়তে থাকে, তখন তিনি মাটির মধ্যে থুতু ফেলেন, আর লাল রঙের থুতু দেখে খুসী হ'য়ে তাকিয়ে থাকেন। একদিন গিয়ে দেখি, তিনি জবাফুলের মালা গলায় দিয়ে অত্যন্ত লাজুক ছেলের মত চুপচাপ ক'রে বসে আছেন। আমাদের দেখে তাঁর কি খেয়াল হ'ল জানি না, তিনি ফুলগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেললেন। শুনেছি, তিনি নাকি লুকিয়ে সিগারেট খেতেও শিখেছেন আর সুযোগ পেলে মালীদের হুকোতেও দু'একটান দিতে ছাড়েন না।

বন্ধু গানবাজনার সমজদার কিনা, অথবা “সন্দেশ” পড়তে পারেন কিনা, সেটা পরীক্ষা ক'রে দেখবার সুযোগ পাই নি, কিন্তু তিনি যে সুগন্ধ জিনিষের কদর বোঝেন, তার পরিচয় অনেক পেয়েছি। তুলোয় ক'রে খানিকটা এসেন্স দিয়ে দেখেছি, সেই তুলোটুকু নাকে ঠেকিয়ে শুঁকতে শুঁকতে আরামে তাঁর দুই চোখ বুজে আসে, জোরে জোরে নিশ্বাস টানতে টানতে তিনি চিৎপাত হ'য়ে শুয়ে পড়েন। অনেকক্ষণ শুঁকে শুঁকে তারপর তুলোটাকে যত্ন ক'রে তুলে রেখে দেন, আর থেকে থেকে ফিরে এসে তার গন্ধ শৌকেন। একবার আমরা তামাসা দেখবার জন্য তুলোয় ক'রে খানিকটা ঝাঁঝাল এমোনিয়া দিয়েছিলাম। সেটাকে শুঁকে যেরকম অদ্ভুত চোখমুখের ভঙ্গী তিনি ক'রেছিলেন, আর যে রকম ক'রে বারবার হাতে আর রেলিঙে নাক ঘষেছিলেন, সে কথা মনে হ'লে আজও আমাদের হাসি পায়। একবার শুঁকেও তাঁর কৌতূহল মেটেনি, খুব সাবধানে দূর থেকে আরও ছচার বার তুলোটাকে শুঁকে, আর ছচারবার চমৎকার মুখভঙ্গী ক'রে, তিনি সেটাকে তাঁর প্রতিবেশী এক বেবুনের ঘরের মধ্যে ফেলে দিলেন। সেই হতভাগা বেবুনটাও, কথা নেই বার্তা নেই, তুলোটুকু নিয়েই কপ্ ক'রে মুখে দিয়ে ফেলেছে। তারপর যদি তার ছুরবস্থা দেখতে! অনেকক্ষণ পর্যন্ত নাক রগড়িয়ে হাঁচতে হাঁচতে, আর হাঁ ক'রে জিভের জল ফেলতে ফেলতে, বেচারী অস্থির!

এই বেবুনটার সঙ্গে ওরাংওটানেবু' একটুও ভাব নেই। আরেকবার ওরাং আমাদের কাছ থেকে একটা লাঠি আদায় ক'রেছিলেন। লাঠিটা পেয়েই তিনি ব্যস্তভাবে বাইরে গিয়ে রেলিঙের ফাঁক দিয়ে তাঁর নিশ্চিন্ত প্রতিবেশীর ঘাড়ের উপর এক খোঁচ! তখন যদি বেবুনের রাগ দেখতে! আমরা সেবার দুই খাঁচার মাঝখানে কলা গুঁজে দিয়ে বেবুন আর ওরাংওটানের ঝগড়া দেখেছিলাম। বোকা বেবুনটা যতক্ষণে আঁচড় কামড় আর কীল ফুঁষ চালাতে থাকে ততক্ষণে ওরাংবাবু

গম্ভীরভাবে ঘাড় গুঁজে কলাটুকু বাঁক'রে নেন। কলাটি নিয়ে মুখে দিয়ে তারপরে তাঁর উল্লাসে আর ভেঁচি। বেবুনটা রাগে যতই পাগলের মত হ'য়ে উঠতে থাকে, বন্ধুর ততই ফুঁটি বাড়ে।

এসব কথা কিন্তু চুপিচুপি খালি তোমাদের কাছেই বললাম। তোমরা আলিপূরের কর্তাদের কাছে কক্ষনো এসব বল না; তাহ'লে আমাদের বাগানে যাওয়া মুশ্কিল হবে।

ব্যোমকেশের মাঞ্জা

“টোকিও,—কিয়োটো,—নাগাসাকি,—য়োকোহামা”—বোর্ডের উপর প্রকাণ্ড ম্যাপ্ বুলিয়ে হারামচন্দ্র জাপানের প্রধান নগরগুলি দেখিয়ে যাচ্ছে। এর পরেই ব্যোমকেশের পালা, কিন্তু ব্যোমকেশের সে খেয়ালই নাই। কাল বিকেলে ডাক্তার বাবুর ছোট্ট ছেলের সঙ্গে প্যাঁচ খেলতে গিয়ে, তার যে ছোট্ট ছোট্ট ঘুড়ি কাটা গিয়েছিল, সে কথাটা ব্যোমকেশ কিছুতেই আর ভুলতে পারছে না। তাই সে ব'সে ব'সে সূতোর জন্তো খুব কড়া রকমের একটা “মাঞ্জা” তৈরীর উপায় চিন্তা করছে। চীনে শিরিস গালিয়ে, তার মধ্যে বোতলচূর আর কড়কড়ে ‘এমেরি পাউডার’ মিশিয়ে সূতোয় মাখালে পর কি রকম চমৎকার মাঞ্জা হবে, সেই কথা ভাবতে ভাবতে উৎসাহে তার দুই চোখ কড়িকাঠের দিকে গোল হ'য়ে উঠেছে। মনে মনে মাঞ্জা দেওয়া ঘুড়ির সূতোটা সবে তালগাছের আগা পর্যন্ত উঠে আশ্চর্য্য কায়দায় ডাক্তারের ছেলের ঘুড়িটাকে কাটতে যাচ্ছে, এমন সময়ে গম্ভীর গলায় ডাক পড়ল— “তারপর, ব্যোমকেশ এস দেখি।”

এরকম ভীষণ উত্তেজনার মধ্যে, সূতো, মাঞ্জা, ঘুড়ির প্যাঁচ সব ফেলে, আকাশের উপর থেকে ব্যোমকেশকে হঠাৎ নেমে আসতে হ'ল, একেবারে চীনদেশের মধ্য-খানে। একেত ওদেশটার সঙ্গে তার পরিচয় খুব বেশী ছিল না, তার উপর যা ও দু একটা চীনদেশী নাম সে জানত, ওরকম হঠাৎ নেমে আসবার দরুণ সেগুলোও তার মাথার মধ্যে কেমন বিজিরি রকম ঘণ্টা পাকিয়ে গেল। পাহাড়, নদী, দেশ উপদেশের মধ্যে ঢুকতে না ঢুকতেই বুঝাচারা বেমালুম পথ হারিয়ে ফেলল। তার কেবলই মনে হ'তে লাগল যে চীনদেশের চীনে-শিরিস, তাই দিয়ে হয় মাঞ্জা। মাঞ্জার

মশাই দুই দুইবার তাড়া দিয়ে যখন তৃতীয়বার চড়া গলায় বল্লেন, “চীন দেশের নদী দেখাও”, তখন বেচারী একেবারে দিশাহারা আর “মরিয়া” মতন হ’য়ে বললে— “শাংহাই।” শাংহাই বলবার আর কোন কারণ ছিল না, বোধ হয় তার সেজমামার যে স্ট্যাম্প সংগ্রহের খাতা আছে, তার মধ্যে ঐ নামটাকে সে পেয়ে থাকবে— বিপদের ধাক্কায় হঠাৎ কেমন ক’রে ঐটেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

গোটা দুই চড় চাপড়ের পর ব্যোমকেশ বাবু তাঁর কাণের উপর মাষ্টার মশায়ের প্রবল আকর্ষণ অনুভব ক’রে বিনা আপত্তিতে বেঞ্চের উপর আরোহণ করলেন। কিন্তু কাণ দুটো জুড়োতে না জুড়োতেই মনটা তার খেই-হারাণ ঘুড়ীর পিছনে উধাও হ’য়ে আবার সূতোর মাঞ্জা তৈরী করতে বসল। সারাটা দিন বকুনি খেয়েই তার সময় কাটল, কিন্তু এর মধ্যে কত যে উচুদরের মাঞ্জা দেওয়া সূতো তৈরী হ’ল আর কত যে ঘুড়ী গণ্ডায় গণ্ডায় কাটা পড়ল, সে কেবল ব্যোমকেশই জানে।

বিকাল বেলায় সবাই যখন বাড়ী ফিরছে, তখন ব্যোমকেশ দেখল, ডাক্তারের ছেলেটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মস্ত একটা লাল রঙের ঘুড়ি কিনছে। দেখে ব্যোমকেশ তার বন্ধু পাঁচকড়িকে বলল, “দেখেছিস্ পাঁচু, আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে আবার ঘুড়ি কেনা হ’চ্ছে! এ সব কিন্তু নেহাৎ বাড়াবাড়ি। না হয় দুটো ঘুড়িই কেটেছিস্ বাপু, তার জন্তে এত কি গরিববাড়ি!” এই ব’লে সে পাঁচুর কাছে তার মাঞ্জা তৈরীর মতলবটা খুলে বলল।

শুনে পাঁচু গম্ভীর হ’য়ে বলল, “তা যদি বলিস্, তুই কি আর মাঞ্জা তৈরী ক’রে ওদের সঙ্গে পারবি, ভেবেছিস্? ওরা হ’ল ডাক্তারের ছেলে, নানা রকম ওষুধ মশলা জানে। এই ত সেদিন ওর দাদাকে দেখলুম, শানের উপর কি একটা আরক ঢেলে দিলে, আর ভস্ ভস্ ক’রে গাঁজালের মত তেজ বেরুতে লাগল। ওরা যদি মাঞ্জা বানায়, তা হ’লে কার মাঞ্জার বাপের সাধি নেই যে তার সঙ্গে পেরে ওঠে।”

শুনে ব্যোমকেশের মনটা কেমন দর্মে গেল। তার ক্রবরকম বিশ্বাস হ’ল যে ডাক্তারের ছেলেটা নিশ্চয় কোন আশ্চর্য্যরকম মাঞ্জার খবর জানে। তা নইলে ব্যোমকেশের চাইতেও তার বছরের ছোট হ’য়ে সে কেমন ক’রে তার ঘুড়ি কাটল? ব্যোমকেশ স্থির করল, যেমন ক’রে হোক ওদের বাড়ীর মাঞ্জা খানিকটা ভোগাড় করতেই হবে। সেটা একবার আদায় করতে পারলে, তারপর সে ডাক্তারের ছেলেকে দেখে নেবে।

বাড়ী গিয়ে তাড়াতাড়ি জলখাবার সেরে নিয়েই ব্যোমকেশ দৌড়ে গেল ডাক্তার বাবুর ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করতে। সেখানে গিয়ে সে দেখে কি, কোণের বারান্দায় বসে সেই ছোট্ট ছেলেটা একটা ডাক্তারি খলের মধ্যে কি যেন মশলা ঝাঁটছে। ব্যোমকেশকে দেখেই সে একটা চোকির তলায় সব লুকিয়ে ফেলে সেখান থেকে সরে পড়ল। ব্যোমকেশ মনে মনে বলল, “বাপু হে! এখন আর লুকিয়ে করবে কি? তোমার আসল খবর আমি টের পেয়েছি।” এই বলে সে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল, কোথাও কেউ নেই। একবার সে ভাবল কেউ আসলে পর একটুখানি চেয়ে নেবে; আবার মনে হ’ল, কি জানি, চাইলে যদি না দেয়?—তারপর ভাবলে, দূর! ভারি ত জিনিষ তা আবার চাইবার দরকার কি? এই এতোটুকুন মাজা হ’লেই প্রায় ছশো গজ সূতোয় শান দেওয়া হবে। এই ভেবে সে চোকীর তলা থেকে এক খাবল মশলা তুলে নিয়েই এক দৌড়ে বাড়ী এসে হাজির।

আর কি তখন দেরী সয়? দেখতে দেখতে দক্ষিণের বারান্দা জুড়ে সূতো খাটিয়ে মহা উৎসাহে তার মাজাদেওয়া শুরু হ’ল। যাই বল, মাজাটা কিন্তু ভারি অদ্ভুত—কই, তেমন কড় কড় করছে না তো! বোধ হয়, খুব মিহি গুঁড়োর তৈরী—আর কালো কাচের গুঁড়ো। ছুঁথের বিষয়, বেচারার কাজটা শেষ না হ’তেই সন্ধ্যা হ’য়ে হল, আর তার বড়দা এসে বললে, “যা, যা! আর সূতো পাকাতে হবে না, এখন পড়গেঁ যা।”

সে-রাত্তিরে ব্যোমকেশের ভাল ক’রে ঘুমই হ’ল না; সে স্বপ্ন দেখলে যে ডাক্তারের ছেলেটা হিংসে ক’রে তার চমৎকার সূতোয় জল ফেলে সব নষ্ট ক’রে দিয়েছে। সকাল হ’তে না হ’তেই ব্যোমকেশ দৌড়ে গেল তার সূতোর খবর নিতে। কিন্তু গিয়েই দেখে, কে এক বুড়ো ভদ্রলোক ঠিক বারান্দার দরজার সামনে বসে তার দাদার সঙ্গে গল্প করছেন, তামাক খাচ্ছেন। ব্যোমকেশ ভাবলে, দেখ ত কি অশ্রায়! এর মধ্যে থেকে এখন সূতোটা আনি কেমন ক’রে? যাহোক্ খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ ক’রে সে খুব সাহসের সঙ্গে গিয়ে চট্ ক’রে তার সূতো খুলে নিয়ে চলে আসছে,—এমন সময়ে হঠাৎ কাশতে গিয়ে বুড়ো লোকটির কল্কে থেকে খানিকটে টিকে গেল মাটিতে প’ড়ে। বুদ্ধ তখন ব্যস্ত হ’য়ে হাতের কাছে কিচ্ছু না পেয়ে, ব্যোমকেশের সেই মাজা-মাখান কাগজটা দিয়ে টিকেটাকে তুলতে গেলেন।

সর্বনাশ! যেমন টিকের উপর কাগজ ছোঁয়ান, অমনি কিনা ‘ভস্-ভস্’ ক’রে কাগজ জ্বলে উঠে, ভদ্রলোকের আঙ্গুল টাঙ্গুল পুড়ে, আর বারান্দার বেড়ায় আগুন টাঙ্গুন লেগে এক ছলছল কাণ্ড! অনেক চোঁচামেচি ছুটোছুটি আর জল-ঢালাঢালির পর যখন আগুনটুকু নিভে এল, আর ভদ্রলোকের আঙ্গুলের ফোঁসায় মলম দেওয়া হ’লে দাদা এসে তার কাণ ধ’রে বললেন, “হতভাগা! কি রেখেছিলি, কাগজের মধ্য বল্ ত”! ব্যোমকেশ কঁাদ কঁাদ হ’য়ে বললে, “কিছু ত রাখিনি, খালি সূতোর মাঞ্জা রেখেছিলাম”। দাদা তার কৈফিয়তটাকে নিতান্তই আজগুবি মনে ক’রে, “আবার এয়ার্কি হ’চ্ছে?” ব’লে বেশ ছচার ঘা কষিয়ে দিলেন।

বেচারি ব্যোমকেশ এই ব’লে তার মনকে খুব খানিক সাস্থনা দিল যে, আর যাই হোক, তার সূতোটুকুন রক্ষা পেয়েছে। ভাগ্যিস সে সময়মত খুলে এনেছিল, নইলে তার সূতোও যেত, পরিশ্রমও নষ্ট হ’ত। বিকাল বেলায় সে বাড়ী এসেই চটপট ঘুড়ি আর লাটাই নিয়ে ছাতের উপর উঠল। মনে মনে বলল, “ডাক্তারের পো আজ একবার আসুক না—দেখিয়ে দেব পাঁচ খেলাটা কাকে বলে”। এমন সময়ে পাঁচকড়ি এসে বড় বড় চোখ ক’রে বললে, “শুনেছিস?” ব্যোমকেশ বললে “না,—কি হ’য়েছে?” পাঁচু বললে “ওদের সেই ছেলেটাকে দেখে এলুম, সে নিজে নিজে দেশলাইয়ের মশলা বানিয়েছে আর চমৎকার লাল নীল দেশলাই তৈরী করছে”। ব্যোমকেশ হঠাৎ লাটাই টাটাই রেখে এতদো বড় হাঁ ক’রে জিজ্ঞাসা করলে, “দেশলাই কিরে! ‘মাঞ্জা’ বল্?” শুনে পাঁচু বেজায় চ’টে গেল—“বল্ছি লাল নীল আলো জ্বল্ছে, তবু বলবে ‘মাঞ্জা’,—আচ্ছা গাধা যা হোক”।

ব্যোমকেশ কোন জবাব না দিয়ে দেশলাইয়ের মশলা-মাখান সূতোটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ঠিক সেই সময়ে ডাক্তারদের বাড়ীথেকে লালরঙের ঘুড়ি উড়ে এসে ঠিক ব্যোমকেশেরই মাথার উপর ফর্ফর্ ক’রে তাকে যেন ঠাট্টা করতে লাগল। তখন সে তাড়াতাড়ি নিজের ধরে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল; বলল, “আমার অস্থখ ক’রেছে।”

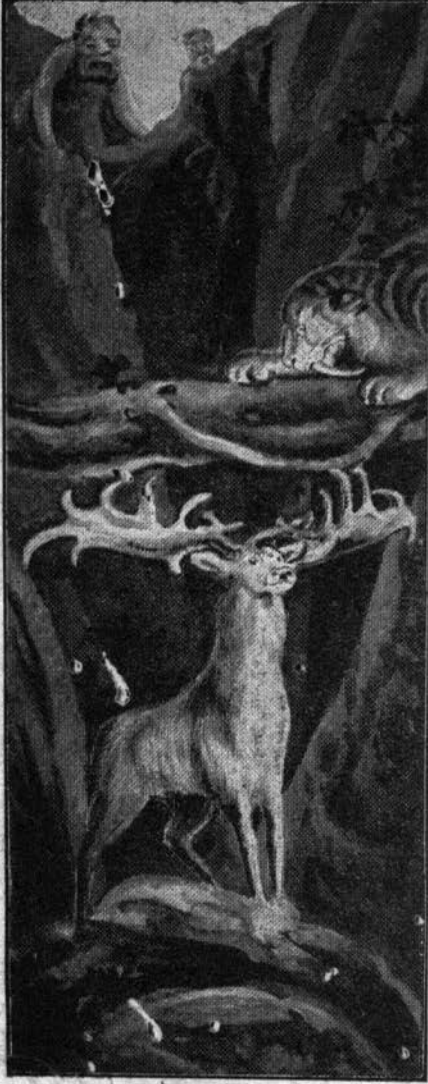
সেকালের কীর্তি

পঞ্চাশ বছর আগেকার লোকের যেরকম চালচলন ছিল, তার কথা বলতে গেলে আমরা বলি “সেকালে ধরণ”। একালের মানুষ আমরা, এইটুকু সময়ের তফাৎ দেখলেই বলি “একার আর সেকাল”।—আর সেকালের মানুষদের ভারি একটা কৃপার চক্ষে দেখবার চেষ্টা করি। আহা! সেকালের মানুষ, তারা কিছুই দেখল না; তারা না চড়ল এরোপ্লেন, না দেখল বায়োস্কোপ, না শুনল গ্রামোফোনের গান, না খেল বিদ্যুৎ পাখার হাওয়া; টেলিফোনের কথাবার্তা আর বিলাজের টেলিগ্রাফ এসব আশ্চর্য্য ব্যাপার কিছুই তারা জানল না। আরও আগেকার কথা ভাব, একশ’ দেড়শ’ বা দুশ’ বছরের কথা—তখন কোথায় বা কলের জাহাজ, কোথায় বা রেলের গাড়ী আর কোথায় বা সাগরজোড়া টেলিগ্রাফের তার? তখনকার মানুষ ফটোও তোলে না, ডাকটিকিটের ব্যবহারও জানে না, এমন কি সাইকেলও চড়ে না। আরও খানিক পেছিয়ে দেখবে ছাপাখানা বা খবরের কাগজেরও নাম গন্ধ পর্য্যন্ত পাবে না।

দুশো’ বা পাঁচশ’ বছরে যদি এতখানি তফাৎ হয়, তা হ’লে দশ বিশ বা পঞ্চাশ হাজার বছরে আগে না জানি কেমন ছিল! সেই বুনো গোছের মানুষ; যার ঘর নাই, বাড়ী নাই, গুহার মধ্যে থাকে; যে লিখতে জানে না, পড়তে জানে না, হয়ত খালি অল্প স্বল্প কথা বলতে শিখেছে; কাপড় জামা পর্য্যন্ত তৈরী করতে পারে না, বড় জোর জানোয়ারের চামড়া বা গাছের বাকল জড়িয়ে থাকে। এমন যে মানুষ, তাকে কি আর পূর্বপুরুষ ব’লে কেউ খাতির করতে চায়? বল দেখি?

কিন্তু যখন ভেবে দেখি যে, এরকম বেচারা মানুষ, গাছ পাথর ছাড়া কোন অস্ত্র যার সম্বল নাই, সে কি ক’রে সেই সময়কার বড় বড় দুর্দান্ত জন্তুগুলোকে ঠেকিয়ে রাখল, তখন ভারি আশ্চর্য্য বোধ হয়, আর মানুষটার সম্বন্ধেও মনে একটু একটু সন্দেহ আসে।

ইউরোপের নানাদেশে পাহাড়ের গহবরের মধ্যে প্রাচীন গুহাবাসীদের নানারকম চিহ্ন পাওয়া যায়; তা থেকে সেই সব মানুষদের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য খবর পাওয়া যায়। এক একটা গুহার মধ্যে মানুষের হাড়ের সঙ্গে আরও অনেক রকম জন্তুর হাড় পাওয়া যায়। তা দেখে বোঝা যায় যে ঐ সব গুহার মধ্যে মানুষ ছাড়া অন্য অন্য



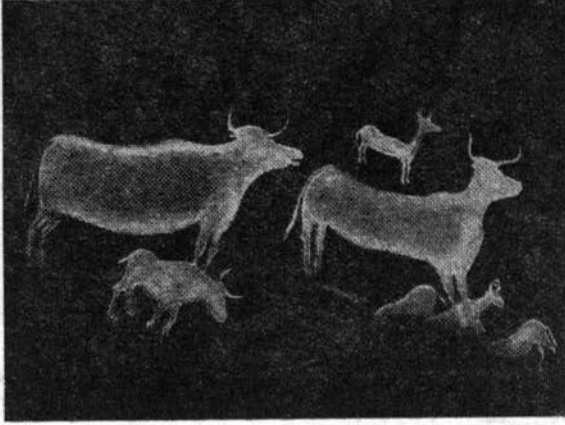
সেকালের মানুষ, খড়্গদস্ত বাঘ আর মহাশূঙ্গী হরিণ।

জন্তুরাও থাকত, মানুষ এসে তাদের তাড়িয়ে গুহা দখল ক'রেছে। আবার অনেক সময়ে হয় ত এমনও হ'য়েছে যে তাদেরই অত্যাচারে মানুষকে গুহা ছেড়ে পালাতে হ'য়েছে।

সেকালের গুহা-ভল্লুক, খড়্গদস্ত বাঘ, লোমশ গণ্ডার, মহাশূঙ্গী হরিণ, অতিকায় হস্তী এরাই ছিল মানুষের প্রধান সঙ্গী, শিকার ও শত্রু। পণ্ডিতেরা গুহার ভিত্তি খুঁড়ে স্তরের পর স্তর মাটি পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন। এক এক স্তরের এক এক রকম ইতিহাস। খুঁড়তে খুঁড়তে কোথাও হয় ত দেখবে এক জায়গায় খালি ছুড়ারের হাড়, তার নীচের স্তরেই মানুষের তৈরী অস্ত্র শস্ত্রের চিহ্ন—অর্থাৎ সেখানে আগে মানুষ ছিল, তারপর তারা ছুড়ারের অত্যাচারে পালিয়েছে। পোলাণ্ডের এক গুহার মধ্যে প্রায় হাজার খানেক অতিপ্রকাণ্ড ভল্লুকের হাড় পাওয়া গিয়েছে। ওয়েল্‌স্ দেশের একটা গুহার মধ্যে মানুষ ছাড়া প্রায় ১৭ রকম জন্তুর হাড় পাওয়া গিয়েছে—তার মধ্যে অনেক জন্তুই আজকাল পাওয়া যায় না।

মানুষের চিহ্নের মধ্যে কঙ্কাল আর অস্ত্র শস্ত্রই বেশী। খুব শক্ত চক্‌মকি পাথরকে নানারকমে ঠেকে আর শান দিয়ে, সে সমস্ত অস্ত্র তৈরী হ'ত। খুঁটি

নাটি ঘরাও কাজের জন্ত হাড়ের অস্ত্রও ব্যবহার হ'ত। আর তা ছাড়া ভালরমক একটা গাছের ডাল, কিম্বা অতিকায় হস্তীর পায়ের হাড় পেলেও ত বেশ একটা উচুদরের মুণ্ডর তৈরী হ'তে পারে।

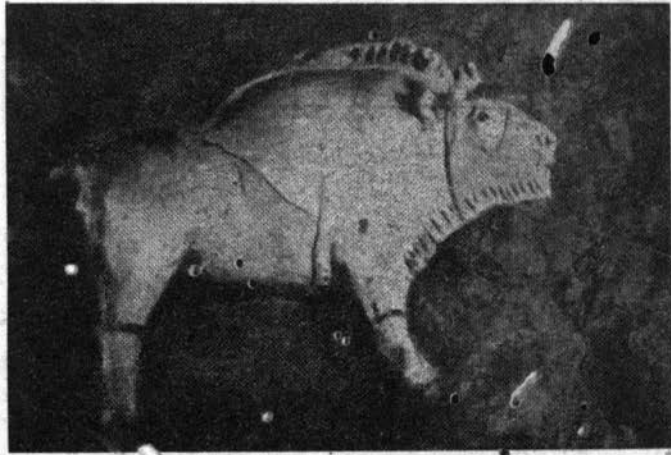


এ সময়কার মানুষে তীর ধনুকের ব্যবহার জানত কিনা সন্দেহ, কাশী আজ পর্যন্ত ধনুকের কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি; কঠোর জিনিষ কিনা, বেশী দিন টেকে না। হু একটা অস্ত্র দেখে মনে হয় যেন তীরের ফলক, কিন্তু সেগুলো বর্ষার মুখেও হ'তে পারে। আজকালকার বড় বড় শিকারীদের যদি এই

গুহার দেয়ালে আঁকা ছবি।

রকমের অস্ত্র নিয়ে সুন্দরবনে বাঘ শিকার করতে বলা হয়, তবে তারা যে খুব উৎসাহ প্রকাশ করবে, এমন ত বোধ হয় না; অথচ কেবল এই সবেল জোরেই গুহাবাসীরা সকল রকম সাংঘাতিক জন্তকে শিকার করত।

সে যে মানুষ, অর্থাৎ বুদ্ধিমান জীব, এ অস্ত্র-গুলোই তার প্রমাণ। তা ছাড়া, সে



মাটির গড়, বাইসনের মূর্তি।

আগুনের ব্যবহার জান্ত তার প্রমাণ, গুহার মধ্যে কাঠ কয়লা আর ছাইয়ের চিহ্ন। তাই নয়, তার আসবাবের সঙ্গে মোটা মোটা হাড়ের ছুঁচ পাওয়া গিয়েছে, সুতরাং গুহাবাসীদের মেয়েরা তাদের চামড়ার কাপড় সেলাই করতে জান্ত। কি দিয়ে সেলাই কর্ত? বোধ হয় চামড়ার কিছা তাঁতের ফিতে, না হয় গাছের তন্ত দিয়ে। কে জানে, হয়ত তাদের মধ্যেও নানা রকম বাহার দেওয়া পোষাকের ফ্যাসান ছিল। কিন্তু তাদের সব চাইতে বড় কীর্তি হ'চ্ছে এই যে, তারা ছবি আঁকতে পারত। সেগুলো হ'চ্ছে পৃথিবীর আদিম ছবি, গুহার দেয়ালের উপর লাল মাটি আর ভূষা কালি দিয়ে আঁকা। মাঝে মাঝে দু একটা মাটির মূর্তি আর হাড়ে পাথরে বা হাতীর দাঁতের উপর নানা রকম চেহারার নক্সা। প্রায় সমস্তই জানোয়ারের ছবি; হরিণ, ঘোড়া, বাইসন, হাতী এই সব।

আগামী বৎসরের সন্দেশ

বৈশাখ মাসের সন্দেশ ২৭শে বৈশাখ বাহির হইবে। ষাঁহারা ১৩২৭ সনে গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা অল্পগ্রহ করিয়া পূর্বেই আমাদিগকে জানাইবেন, নতুবা আমাদের অনর্থক ভি, পি, খরচ হইবে। ষাঁহারা গ্রাহক থাকিবেন তাঁহাদের টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইলে ভাল হয়। গ্রাহক নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। ২৭শে বৈশাখ মধ্যে ষাঁহাদের টাকা আসিথে ২৮শে বৈশাখ তাঁহাদের কাগজ ডাকে দেওয়া হইবে। ষাঁহাদের কাগজ ভি, পি, ডাকে যাইবে তাঁহাদের কাগজ পাইতে বিলম্ব হইবে।

“সন্দেশ” কার্য্যাব্যক্ষ,

২১-২ সুকিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা।